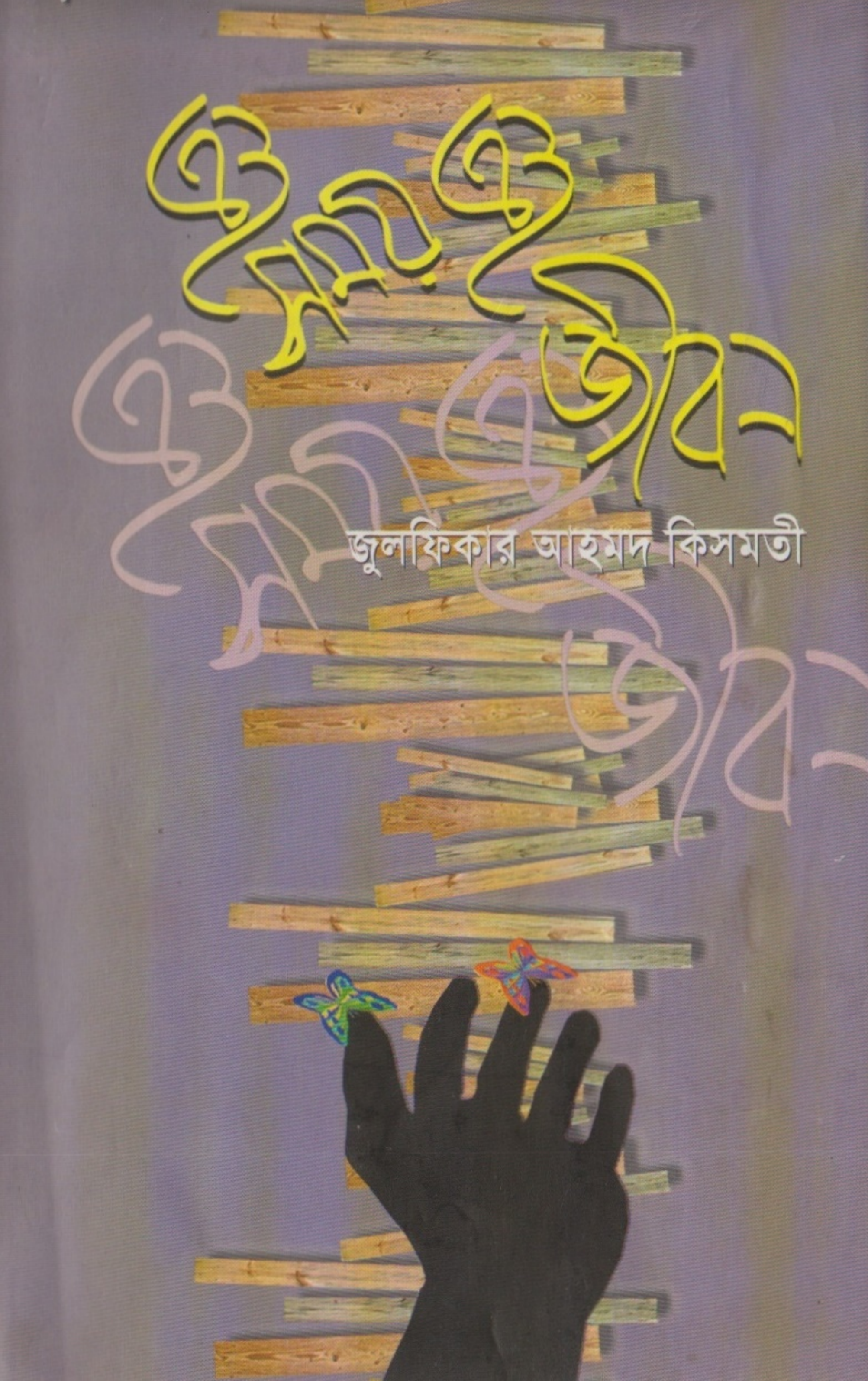
এই সময় এই জীবন
জুলফিকার আহমদ কিসমতী

এই সময়
এই জীবন

জুলফিকার আহমদ কিসমতি

মিজান পাবলিশার্স

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশক
লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী
মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪, বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৩৯১, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল ঃ ০১১-৮৬৪৩২৬, ০১৭১-৪০০২১৮
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১১২৩৯১

প্রকাশকাল ❑ ২১শে বইমেলা ২০০৬

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোমিনউদ্দীন খালেদ

বর্ণবিন্যাস
লাভলী কম্পিউটার
৩৮, বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৩৯৫

মূল্য
৩০০ টাকা

ISBN
984-8685-27-8

Ai Samoy Ai Jibon, Written by Zulfikar Ahmad Kismati
Published By : Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary,
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka- 1100.
Printed By : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt.) Limited
24, Srish Das Lane, Dhaka- 1100.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মুনশী সেকান্দর আলী
ও মাতা মরহুমা জমিলা খাতুন এবং
ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত যুগযুগের
যুব সমাজের উদ্দেশে উৎসর্গকৃত।

—লেখক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্বকথা

বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে অতীত অভিজ্ঞতা বিরাট সহায়ক। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের বর্তমান-ভবিষ্যতের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কর্মনীতি গ্রহণে সেসব অভিজ্ঞতা মস্তবড় দিক নির্দেশক। অভিন্ন চরিত্রের অতীত ঘটনাবলী পশ্চাৎ জীবনের ভালো-মন্দ, সফলতা-ব্যর্থতা ও আনন্দ বিষাদের স্মৃতি যেকোনো নতুন পদক্ষেপে মানুষকে আত্মপ্রত্যয়ী হতে সহায়তা করে। তদ্রূপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কিংবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারধর্মী কোনো ঘটনা তখনকার এই স-ব কিছু সমাজ চিত্র পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরে, যেগুলো সকলের জন্যে অনুপ্রেরণাদায়ক হিসাবে কাজ করে। বলাবাহুল্য, মানব জীবনে জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশে এই প্রত্যেকটি ঘটনাচিত্রই ইতি ও নেতিবাচকভাবে চিত্তকে নাড়া দেয়। এ কারণেই মানুষ আবহমান কাল ধরে অতীতকে ধরে রাখতে নানান ভাবে প্রয়াস পেয়ে আসছে। মূলত অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা উত্তরসুরীদের আলোকিত থাকা ও বহুমুখী জ্ঞানে আলোকিত হবার এ তাগিদ থেকেই ইতিহাসের জন্ম। আজকের অডিও ভিডিও সিডি ইত্যাদি বর্তমান ও ভবিষ্যতের পাঠককে হয় নতুন কিছু সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করে, নয়তো কোনো বিপদজনক পরিস্থিতির মোকাবেলায় শক্তি-সাহস যোগায়। পেছনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তার কারণসমূহ যেমন ধরা পড়ে, তদ্রূপ এতে সফলতার রহস্যটিও সামনে আসে। ফলে উত্তরসুরীদের ব্যর্থতার পথ এড়িয়ে চলতে ও সফলতার পথ গ্রহণে ইতিহাসের এই দর্পন বিরাট সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

ইতিহাস বলতে এক সময় শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজায় রাজায় হানাহানি, স্বশস্ত্র সৈন্যবাহিনী ও লয়লস্কর ইত্যাদি নিয়ে অপরের দেশ দখল, ক্ষমতার অদল বদল ইত্যাদি ঘটনাবলীর বিবরণকেই বুঝাত। অথচ অতীতের এসব বিষয়সহ প্রাত্যহিক জীবনের জাতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়াদির উপর জ্ঞানী-গুণীদের বহুমুখী জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ও তথ্যাবলী সমৃদ্ধ মন্তব্য-প্রতিবেদন সম্বলিত লেখাসমূহও ইতিহাসের সেই অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে বিরাট ভূমিকার দাবী রাখে।

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও ফিচার ইত্যাদি এমনকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিঠিও একইভাবে অতীতকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। সময়ের বিবর্তনে, কালের পরিক্রমায় সংঘটিত ঘটনাবলীর উপর লিখিত ঐসব লেখা-রচনা 'ইতিহাস' অভিধায় আখ্যায়িত না হলেও অতীতের স্মৃতি, ঘটনাবলী ও বাস্তবতাকে নিখুঁতভাবে সামনে তুলে ধরতে সক্ষম। এ কারণে ঐ সকল লেখাও এক ভিন্ন স্বাদের ইতিহাস, যা প্রচলিত অর্থের ইতিহাসের চাইতে অনেক ক্ষেত্রে অতীত ঘটনা ও পরিস্থিতি মূল্যায়নে অধিক কার্যকর। লেখকদের ওসব মন্তব্য উপভোগ্যও বৈ কি। কেননা, তখনকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ঘটনাবলী ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সে সময়কার জ্ঞানীগুণী বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে ভাল-মন্দের বিশ্লেষণ, আলোচনা, পর্যালোচনা করেছেন, সংবাদপত্রে তাদের প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও তথ্যপূর্ণ

www.pathagar.com

প্রতিবেদনমূলক লেখাসমূহে ইতিহাসেরই এক বাস্তব ছবি ফুটে ওঠে। মূলত এই হিসাবে প্রত্যেক যুগের সমকালীন দৈনিক সংবাদপত্র, মাসিক ও সাময়িকীর এ জাতীয় লেখাগুলোই ইতিহাসের এই দিকটিকে যথাযথ সামনে নিয়ে আসে।

'এই সময় এই জীবন' গ্রন্থটি কথিত চরিত্রের ইতিহাসেরই একটি অংশ। এ জাতীয় বিষয়াদির ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রেক্ষিতেই সাম্প্রতিক কালে এই বাংলা ঐ বাংলায় সাংবাদিকতার সাথে দীর্ঘদিন জড়িত ব্যক্তিবর্গ এ শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেন। অতীত সংবাদপত্রে তৎকালীন রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ চরিত্র ও বিষয়কেন্দ্রিক প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা মন্তব্যও জাতির জন্য পথনির্দেশনামূলক বিধায় শেষোক্ত সংজ্ঞার ইতিহাস হিসাবেই পাঠক সমীপে **"এই সময় এই জীবন"** নামের গ্রন্থটি পেশ করা হলো। গ্রন্থটির বিষয়বস্তুসমূহের প্রথম প্রকাশের তারিখসহ এখানে উপস্থাপন করা হলো। উল্লেখিত বিষয়াদির উপরই আমার লিখিত প্রবন্ধাদি সহকারে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। তারিখের উল্লেখে লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত ধারণা সৃষ্টির বিষয়টি গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধররা এসব লেখা পড়ে যথেষ্ট আলো পাবে বলে আশা করি।

দেশের খ্যাতিমান প্রকাশনা সংস্থা **মিজান পাবলিশার্স**-এর স্বত্বাধিকারী লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটোয়ারী আমার এই গ্রন্থখানা প্রকাশ করে পাঠক মহলে-এর আসার সুযোগ দানের জন্যে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। গ্রন্থটি প্রকাশে পরামর্শ দান থেকে এর প্রকাশ পর্যন্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভূমিকা রাখার জন্য ধন্যবাদ জানাই বিশিষ্ট কবি ও কলামিস্ট বিপ্লব ফারুককে। সেই সাথে গ্রন্থটির নামকরণে অধুনালুপ্ত ফ্রাংকলিন পাবলিকেশন্সে "বাংলা বিশ্ব কোষ" রচনায় কর্মজীবনের সাথী খ্যাতনামা সাহিত্যিক, গ্রন্থকার অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমানের সহযোগিতার জন্যে তাঁকে জানাই মোবারকবাদ।

নিজস্ব লেখাসমূহকে গ্রন্থাকারে রূপদানের জন্যে যারা সর্বপ্রথম আমাকে পরামর্শ ও বারবার তাকিদ-তাম্বী দিয়ে আসছিলেন, সেই সাহিত্যিক ও টিভি উপস্থাপক প্রিয় মাহবুবুল হক এবং কবি তাহমীদুল ইসলামের কথাও এ মহূর্তে বারবার স্মৃতি পটে ভেসে উঠছে।

১৯৮৮ সালে আমার লিখিত "চিন্তাধারা" নামক সাড়ে ৬শ পৃষ্ঠার যেই গ্রন্থটি আরও ৩টি বইসহ বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে, একইভাবে **"এই সময় এই জীবন"** গ্রন্থটিও পাঠক মহলে সমাদৃত হবে বলে প্রত্যাশা রইল।

লেখক-
জুলফিকার আহ্মদ কিসমতী
১লা জানুয়ারী ২০০৬ ইং।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

আফগানিস্তান ঘিরে নতুন সংকট সৃষ্টি না হোক ১১
জাতি গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা ১৫
দলীয়করণ প্রবণতার বলি আর কত চলবে? ২৩
কুকুর বাহিনী প্রসঙ্গ ২৫
ইসলাম ও মধ্যপন্থা নীতি ২৭
রমযানের পবিত্রতা রক্ষায় সরকারি ভূমিকায় বৈপরীত্য প্রসঙ্গে ৩১
অপরাধ প্রবণতা দূরি করণে এর শিকড়ে যেতে হবে ৩৫
"মাদ্রাসা শিক্ষায়ও নকল" এবং কিছু কথা ৩৯
সূর্যসেন যা, তাকে তাই বলা উচিত ৪৪
তালিবান সরকারের কতিপয় ঘোষণা ৫২
নতুন বসনিয়া কসোভো সমস্যা কোন পথে? ৫৬
আত্মরক্ষা, স্বাধিকারের সংগ্রাম ও সন্ত্রাস ৬১
সামূদ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের পরও কি ইরাক বিরোধী যুদ্ধোন্মাদনা থামবে? ৬৭
জাতীয় ঐক্যে ফাটল ও তার সুফল ভণ্ডুলের অপচেষ্টা চলছে ৭০
গাফ্ফার চৌধুরীগং গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছেন? ৭৪
হত্যা পাল্টা হত্যার এই ধারাবাহিকতা কি থামবে না? ৭৮
মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র ৮১
আগুনের গ্রাস থেকে দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ ও প্রাণ রক্ষার কি ব্যবস্থা হবে না? ৮৭
এক অপরাধের প্রতিবাদে অন্য অপরাধ ৯০
সুধী-বুদ্ধিজীবীদের একটি হুঁশিয়ারি ৯২
সমাজ ধ্বংসে বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্বহীনতা ৯৫
কসোভোর মানবাধিকার ও অন্যদের নীরবতা ৯৮
কাশ্মীর প্রশ্নে অবৈধ মার্কিনী চাপ ১০১
মনুষ্যত্বের বিকাশ বর্জিত জাগতিক উন্নতি নিছক পাশব শক্তি বৃদ্ধিরই সহায়ক ১০৪
বাংলাদেশের ছিটমহল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য ১০৮
নারীর সম্ভ্রম ও সম্মান রক্ষার প্রশ্ন ১১০
"মামুন ও নিজামীর জ্ঞাতার্থে" প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে ১১৪
ইরান সিরিয়া ও সুদান পরিস্থিতি কোন দিকে ১১৯
পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ১২৫
সেই সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া ১৩০
শেখ হাসিনার হুমকি প্রসঙ্গে ১৩৬
রমযানের ডাক ঃ ফযীলত ও প্রাসঙ্গিক কথা ১৪০
'মৌলবাদে'র 'হুক্কা হুয়া' কারীরা কাদের স্বার্থরক্ষায় নেমেছেন? ১৪৪
তালেবানদের মূর্তি ধ্বংসের প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ১৪৭
নমরূদী স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ইব্রাহিমী ত্যাগ চেতনা সৃষ্টিই কুরবানীর লক্ষ্য ১৫২
সৌদি আরবে 'গুরু অপরাধে' 'গুরুদণ্ড' দান প্রসঙ্গে ১৫৮
ভারত ও বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা উচ্ছেদ ষড়যন্ত্রের অন্তরালে ১৬২
দায়িত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ উক্তি অবিচ্ছিন্ন ১৬৭
বন্ধু সরকারের আমলে ভারত সীমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যার সংখ্যাবৃদ্ধি ১৬৯
'কেসাস' আইনের অনুপস্থিতিই ৬০ খুনের আসামী এরশাদ শিকদারদের জন্ম দিয়েছে ১৭২

www.pathagar.com

কুরআনের আইন বিকৃত করার অপপ্রয়াস! ১৭৫
উপমহাদেশের শান্তি এবং কাশ্মীর ১৭৯
'হত্যা অপরাধীর প্রাণদণ্ডে রয়েছে অন্যদের জীবনের নিরাপত্তা' ১৮২
অভাবই স্বভাব নষ্টের একমাত্র কারণ নয় ১৮৪
আফগানিস্তানে শান্তি চুক্তির আলোচনা ১৮৭
"খেলাফতভিত্তিক রাষ্ট্রই জনদুর্গতি লাঘবের উপায়" ১৯১
মহানবী (সাঃ)-এর মি'রাজ গমন ১৯৪
মিরাজের বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রসঙ্গ ১৯৬
পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র সংশোধন বিতর্ক ২০০
নিছক শ্লোগান ও দেহ প্রদর্শনী নারীমর্যাদা নয় ২০৫
ভাষা সাহিত্য ব্যবহারের আল্লাহনির্দেশিত ক্ষেত্র ২১০
সার্কনেতৃ বৃন্দের প্রতি একটি মানবিক আবেদন প্রসঙ্গ ২১২
তাবলীগ -এ দ্বীনের সফলতার জন্য চাই [redacted] ইযহার -এ-দ্বীন ও ইকামত- এ-দ্বীন ২১৫
একটি নিহত সত্যের পুনরুজ্জীবন ও প্রাসঙ্গিক কথা ২২৪
এই বিপুল অস্ত্রসম্ভার কার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে? ২২৮
ভবিষ্যতে ইরাকী স্টাইলই কি হবে সবলদের হাত থেকে দুর্বলদের বাঁচার উপায়? ২৩২
সৌদি আরবে আত্মঘাতী বোমা হামলা ও প্রাসঙ্গিক কথা ২৩৬
সন্ত্রাস-দুর্নীতি দমনে কুরআনী শাসনের দাবী প্রসঙ্গ ২৪১
অপরাধ প্রবণতার কারণ অবৈধ উপার্জনের সুযোগ ২৪৩
অপসংস্কৃতি দ্বারা ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্র নবী জীবনেই শুরু হয়েছিল ২৪৫
পারমাণবিক গুণ্ডামি ঃ আজ ইরান কাল সিরিয়া পরশু পাকিস্তান? ২৪৮
আরাফাতের বহিষ্কৃতি সকল আরব নেতারই বহিষ্কৃতির সংকেত ২৫২
কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা জরুরী ২৫৫
শ্বেতপত্রের সব দুর্নীতির বিচার না হওয়াতেই দুর্নীতি উৎসাহ পাচ্ছে ২৬০
রাজনীতি নিরপেক্ষ আলেমদের সুরে এ দেশে মওদূদী বিরোধিতার রহস্য কোথায়? ২৬৪
বিকৃত সন্তানের নির্মম শিকার এবার খোদ মা-বাবাও ২৭১
এই বিপুল অস্ত্রসম্ভার কার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে? ২৭৬
বাংলাদেশের যুবশক্তি কি এভাবে খুনাখুনি করে শেষ হতে থাকবে? ২৭৯
আমাদের ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক কাঠামো ও ক্রমবর্ধমান সামাজিক অপরাধপ্রবণতা ২৮২
মার্কিনী বক্তব্য : "ইসলামী সরকার হতে দেবো না" ২৮৭
বিশ্বময় সৃষ্ট গণ-চেতনাকে এগিয়ে নেয়াই সমস্যা উত্তরণের পথ ২৯১
আত্মঘাতী হামলা ও বিশ্বনেতৃত্বের ভাববার বিষয় ২৯৩
রাজনৈতিক অঙ্গনের অপসংস্কৃতি দূর হোক ২৯৭
সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গ দিয়েও সাদ্দাম রক্ষা না পেলে অন্যেরা পাবে কিভাবে? ৩০২
ইরাক-আফগানযুদ্ধ মুসলিম নেতাদের চোখ খুলে দিক ৩০৫
বিশ্বব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জনের ডাকে সাড়া ৩১২
জাতিসংঘের প্রতি বুশ-ব্লেয়ারদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শনের নেপথ্য রহস্যঃ দ্যাগ হেমারশোল্ডকে কেন হত্যা করা হয়েছিল? ৩১৮
দত্তদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির অপচেষ্টা রুখতে হবে ৩২৪
ইরাকের উপর সম্ভাব্য হামলা সুদূরপ্রসারী মার্কিন পরিকল্পনারই অংশ? ৩২৮
দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের রাজনৈতিক কর্মসূচি জনগণের আদৌ কাম্য নয় ৩৩১

www.pathagar.com

আফগানিস্তান ঘিরে নতুন সংকট সৃষ্টি না হোক

[প্রকাশ ঃ ৮. ৯. ৯৮ ইং]

মুসলিম দেশসমূহের ভিতরে বাইরে আজ অগণিত সমস্যা। পরন্তু যেসব দেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী অনুশাসনের প্রয়াস বিদ্যমান কিংবা সেই শাসনবিধি চালুর সম্ভাবনা ঘনিষ্ঠ অথবা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের লোকেরা সংশ্লিষ্ট দেশের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল, ঐ সকল দেশের বিরুদ্ধে ইসলামের আন্তর্জাতিক শত্রুরা অতীব সক্রিয়। ঐসব বৈরী শক্তি প্রথমে চায় দেশটির অভ্যন্তরে তাদের নিয়োজিত এজেন্ট ও ভাবশিষ্যদের দ্বারা উক্ত ইসলামী দলকে ঘায়েল করতে, তাদের দ্বারা সেই দল ও দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে। নিজেদের অনুগত সরকার দ্বারা দলটিকে কোনঠাসা করতে। দলের প্রচার মিডিয়াকে অচল বা দুর্বল করতে। আর যেখানে খোদ্ ইসলামী দলই ক্ষমতায় এবং দেশে ইসলামী আইন চালুর ব্যাপারে আপোসহীন, সেখানে উক্ত আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তি হয় দেশটিতে অতীতকালের ন্যায় শীয়া-সুন্নী ঝগড়া-কলহের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে দিবে, নয়তো এক ইসলামী দলের বিরুদ্ধে অপর ইসলামী গ্রুপকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে প্রথমোক্তটিকে ভাতৃঘাতি সংঘাতে জব্ধ করতে চাইবে। যেখানে সেই সুযোগ না থাকবে, তখন উক্ত ইসলামপ্রয়াসী দেশের কোনো প্রতিবেশীকে ছুতানাতায় তার বিরুদ্ধে হামলা করতে প্ররোচিত করবে। এভাবে কোনো-না কোনো কিছুকে উপলক্ষ করে দুটি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ জাগিয়ে তাদের উভয়কেই ঘায়েল করার উদাহরণ বহু রয়েছে। যদি প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্র উক্ত সম্ভাব্য ইসলামী দেশটির সাথে বিরোধে জড়াতে না চায় আর বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাধাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন ঐ বৈরী শক্তি যে নিজেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সকল নিয়ম রীতি উপেক্ষা করে সেই মুসলিম দেশটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারই নগ্ন দৃষ্টান্ত হলো সুদান ও আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ও প্রাণসম্পদের হানি। মুসলিম দেশগুলোর কোনো কোনোটিতে বিরাজমান ঠিক এমন একটি পরিস্থিতিতেই খবর পাওয়া গেল যে, ইসলামী রাষ্ট্র কাবুলের সীমান্তে ইরান গত মঙ্গলবার (১লা সেপ্টেম্বর '৯৮) ৭০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে এক নজিরবিহীন সামরিক মহড়া শুরু করেছে। এই মহড়া লক্ষ্য করে অনেকেই অনুমান করছে যে, হয়তো ইরান আফগানিস্তানের উপর হামলা করবে। কারণ ইরানী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একই সঙ্গে আফগানিস্তানে ইসলামী তালেবান বাহিনীর হাতে তাদের ১০ জন কূটনীতিক আটক রয়েছে বলে যেই অভিযোগ করে আসছে, তাদের ফেরত দেয়ার প্রশ্নেও সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছে। এদিকে তালেবান নেতাদের পক্ষ থেকেও ইরানের সাথে উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে জাতিসংঘের মধ্যস্থতার অনুরোধ জানানো হয়েছে বলে এএফপি জানিয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্বাঞ্চলীয় খোরাসান প্রদেশে তুরবত-এ

www.pathagar.com

জাম থেকে খাফ পর্যন্ত ৬শ' বর্গ কিলোমিটার (২৪০ বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে মহড়া চলছে।

আফগানিস্তানের প্রায় পুরোটাই এখন তালিবানের দখলে চলে যাওয়ায় প্রচণ্ড উত্তেজনার মাঝে এই সামরিক সমাবেশ শুরু হয়। দেশটিতে ঐতিহ্যগতভাবে বরাবরই ইরানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বজায় ছিল। তালেবান ক্ষমতায় আসার পর ইরান তাদের ভালো চোখে দেখেনি বরং নিজের নিরাপত্তার সম্ভাব্য হুমকির ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছে আর এ থেকেই তালেবান বিরোধী সাবেক সরকারের প্রতি সকল দিক থেকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। ইরানী বিপ্লবী রক্ষীদের স্থলবাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ আলী জাফরী বলেছেন, ইরানের শীর্ষ নেতা ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আয়াতুল্লাহ্ আলী খামেনী আফগানিস্তানে যুদ্ধের বিস্তার ঘটার পর এই মহড়ার নির্দেশ দেন। তালেবানের বিরুদ্ধে ইরানের দেয়া সাম্প্রতিক উস্কানিমূলক বক্তব্য যেমন অপরিনাম দর্শিতা তেমনি, সামরিক মহড়ার নামে আফগান সীমান্তের কাছে ৭০ সহস্রাধিক ইরানী সৈন্যের সমাবেশ স্বভাবতঃই এ অঞ্চল এবং গোটা বিশ্বের স্থিতিশীলতার জন্যে মহাবিপজ্জনক। একটু ভুল-ভ্রান্তিতে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সহজেই বিরোধ বেধে যেতে পারে এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র প্রয়োগ হতে পারে, যা এ অঞ্চলে কখনই দেখা যায় নি। ৭০ হাজার ইরানী সৈন্যের ট্যাংক নিয়ে আফগান সীমান্ত থেকে ৪০ মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব ইরানে সামরিক মহড়াকে তালেবান মস্তবড় হুমকি বলে মনে করে এবং নিখোঁজ ইরানী ১০ কূটনীতিকের ভাগ্য সম্পর্কে 'কিছুই জানে না' বলে প্রকাশ করে আসছে। পরবর্তী এক খবরে জানা গেছে, ক্ষমতাসীন তালেবানদের জঙ্গী বিমান গত শুক্রবার কাবুলের উত্তরে সীমান্তবর্তী বিরোধীয় অঞ্চলে বোমা বর্ষণ করে। এর পাল্টা বিরোধী বাহিনীও রাজধানী কাবুলে রকেট হামলা চালায়।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তিগুলো ইসলাম ও মুসলিম দেশসমূহের ব্যাপারে যেই ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত রয়েছে, তার ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোকে জড়িয়ে একটা কিছু অঘটন ঘটাতে চাচ্ছে। দেশে দেশে ইসলামী সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে, ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটিয়ে একের বিরুদ্ধে অপরকে ক্ষেপিয়ে তুলে বৃহত্তর ইসলামী ঐক্যের পথে কৌশলে অন্তরায় সৃষ্টির দ্বারা তারা অনেক আগে থেকেই একাজ শুরু করেছে। হালে তাদের এ তৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে সম্প্রতি পাকিস্তানের সফল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো এবং ইরান কর্তৃক ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন ও আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর পরাজয়ের মধ্যদিয়ে তালেবান সরকারের মাজার শরীফ এলাকা পুনর্দখলের পর ষড়যন্ত্রের হোতারা যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এছাড়া মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর সাথে ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক সহযোগতিামূলক কোনো চুক্তি বা তাদের পারস্পরিক ঐক্য ও বন্ধুসুলভ সম্পর্কও ষড়যন্ত্রকারীদের চক্ষুশূল কম নয়। পর্যবেক্ষকদের মতে, ষড়যন্ত্রকারীরা মুসলমানদেরকে এই অবস্থায় ছেড়ে দেয়াকে নিজেদের গ্লোবেল পলিটিক্স, অর্থনীতি ও আধিপত্যবাদের জন্যে প্রতিবন্ধক বলে মনে করছে। তাই তারা এক গুলোতে দুই শিকার নয় বরং

www.pathagar.com

আরও বহুবিধ স্বার্থ শিকারে অনেক দূর দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে কোনোভাবে একই ভৌগোলিক অঞ্চলের এসব মুসলিম দেশে বিরোধ বাধানো যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সমকালীন ইতিহাসে তাদের এই জঘন্য খেলার সাক্ষী হয়েও মুসলিম নেতারা তার থেকে তেমন শিক্ষা গ্রহণের প্রমাণ দিচ্ছেন না। এমনকি অনেকে ঐ ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ শিকার হয়ে নিজ দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ ও অগণিত লোকের প্রাণহানির শিকার হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম বিদ্বেষীদের নেপথ্য ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে বসেন। বিভিন্ন দেশের মুসলিম নেতাদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের বেলায় তাদের ষড়যন্ত্রও বৈরিতার একটি অংশ। তারা জনগণের কাছে নেতাদের ভাবমর্যাদা বিনষ্টের জন্যে ঐসব নেতার চরিত্র হননের সুকৌশলে চেষ্টা করে। এ শ্রেণীর ষড়যন্ত্রের শিকার নেতাদের সিরিয়ালে এবার এসেছেন আরেকটি মুসলিম দেশের এক প্রভাবশালী নেতা -আনোয়ার ইবরাহীম।

আফগান মুজাহিদদের হাতে সাবেক সোভিয়েত বাহিনীর পরাজয় এবং তাদেরই পুতুল সরকারের পতনের পর দেশটিতে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু তা না হয়ে সেখানে ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারবদ্ধ মুজাহিদ নেতাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হয় এবং পরে তারা ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তার নেপথ্যে কারা কাজ করেছে? যুদ্ধবিধ্বস্ত শত শত আফগান নাগরিকের রক্তে দেশটি রঞ্জিত হয়ে আসছে, যার জের এখনও চল্‌ছে। এটি কি সেই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রেরই ফল নয়? এই দীর্ঘ ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিভিন্ন মুজাহিদ দলের বহু নেতা-কর্মীর প্রাণহানি ঘটেছে আর ষড়যন্ত্রকারীরা পরস্পরের প্রতি চোখ ঠেরে বলছে', " দেখো ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী মুজাহিদ ও তাদের নেতাদের শেষ পরিণতি। তা না হলে কি আর ইসলাম।" মজার ব্যাপার হলো, একদিকে মুজাহিদ দল ও নেতাদের আত্মঘাতী কাজে লাগিয়ে দিয়ে অপরদিকে ছাত্রদেরকে যুদ্ধরত নেতাদের বিরুদ্ধে বোঝানো হলো যে, "ও বেটারা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটাকে সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলল। তোমরা এগিয়ে না এলে দেশটি ছারেখারে যাবে।" শান্তি, ন্যায় ও ইসলামের প্রেমিক আফগান ছাত্রেরা (তালেবান) আগে থেকেই আত্মকলহে লিপ্ত নেতাদের প্রতি ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। অতঃপর তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রব্বানী সরকারের বিভিন্ন অন্যায় অব্যবস্থার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে একটি শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে। দেশের দুই তৃতীয়াংশ তাদের শাসনাধীন থাকে। অপর অংশটি বিদ্রোহীদের দখলে। তারপর তালেবানের দ্বারা যা হবার তাই হচ্ছে। তারা নিজেদের প্রদত্ত ইসলামী প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদেরকে যারা ক্রীড়নকে পরিণত করে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছিল তালেবানের ইমানী চেতনার কাছে সেই ষড়যন্ত্র টিকতে পারেনি বলেই মনে হচ্ছে, যদ্দরুন তাদের দেশ শুধু সরাসরি 'ক্রুজ মিজাইলের হামলারই শিকার হয়নি আরও নানান ভাবেও তারা চাপের মুখে পড়েছে। উল্লেখ্য, তারা বিদ্রোহী ক্ষমতাচ্যুত রাব্বানী সরকারের সেনাপতি আহমদ শাহ্ মাসউদ এবং রশিদ দোস্তম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে সম্প্রতি মাজার শরীফ এলাকা দখলের পর দেশটির পুনঃর্গঠন কাজে এখন হাত দিয়েছে। ঠিক এমন এক পরিস্থিতিতেই ইরান

www.pathagar.com

৭০ হাজার সৈন্য ও শত শত ট্যাঙ্ক ইত্যাদির বিপুল সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে আফগান সীমান্তে অবস্থান করছে।

'৭৯ সালে ইরানে রেজা শাহ পাহ্‌লভীর রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ইসলামী গণজাগরণের মুখে যখন শাহের পতন ঘটে, সেই শাসনের ধ্বংসাবশেষের ওপরই ইরানী নেতৃত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের বিজয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। তখন দেশটির শাহী যুগের সেনাবাহিনীর কাঠামো প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। ইসলামী বিপ্লবের কর্মীরাই তখন এ শ্রেণীর সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করতো। ইরানী প্রতিরক্ষা বাহিনীর এহেন এলোমেলো অবস্থায় অপর কোনো ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশের ইরানের ওপর হামলার বিষয়টি কল্পনাও করা যায় না। এমনকি অপর কোনো বৃহৎ শক্তির চাপ বা প্ররোচণায় কোনো অবস্থায়ই সে সময় দেশটির ওপর হামলা করা যায় না। কিন্তু কি দেখা গেল? প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র ইরাক ইরানের ওপর প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী হামলা করলো। ইরানের তেলক্ষেত্র দখল করলো। কোটি কোটি টাকার তেল পারস্য উপসাগরে ভেসে গেল। দীর্ঘ প্রায় দশ বছর স্থায়ী যুদ্ধে কোটি কোটি টাকার সম্পদ ও হাজার হাজার মুসলমানের প্রাণহানি ঘটলো। এই যুদ্ধে অপর ভ্রাতৃ প্রতীম দেশের অংশ দখল পুনর্দখল কাজে শুধু দুটি মুসলিম দেশেরই নয়-গোটা মুসলিম দুনিয়ায় অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়লো। মুসলিম ইতিহাসের এই সর্বনাশা অর্থহীন যুদ্ধটি কার প্ররোচণায় এবং কোন লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল? ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের বিরুদ্ধে নয় কী? এখন যে ইরান ও এর রাষ্ট্রনায়কদের সন্ত্রাসী অভিধায় আখ্যায়িত করে দেশটির ক্ষতির পাঁয়তারা চালানো হচ্ছে, তার পেছনেও কি ইসলামবিদ্বেষীদের অভিন্ন দুরভিসন্ধি কাজ করছে না? ইরান-ইরাক যুদ্ধের ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই ৯১ সালে পুনরায় একই ইরাক কর্তৃক ভ্রাতৃপ্রতীম প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র কুয়েতের উপর হামলা ও তা দখল করে নেয়ার মত মারাত্মক ঘটনাটি কিভাবে কার চক্রান্তে ঘটেছিল এবং বর্তমান গোটা আরবের অর্থনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধে তার পরিণতি স্বরূপপাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির কিরূপ স্থায়ী কুপ্রভাব পড়ছে, নিকট অতীতের এসব ঘটনার মূল নায়কদের কথা কোনো মুসলিম শাসকের ভুলে যাবার কথা নয়। তেলের সুবাদে অর্থনৈতিক দিক থেকে হঠাৎ সমৃদ্ধির স্পর্শে দিশেহারা দাম্ভিক আরব শাসকরা তখন ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের তাৎপর্য বিস্মৃত না হলে আজ তারেদকে সাবেক দারিদ্র প্রক্রিয়ার দৃশ্য দেখতে হতো না। এরই দুই দশক পূর্বে মিসরে বাদশা ফারুক ও পরে জামাল নাসিরের আমলে বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ ও আইনবিদদের ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে শহীদ করা এবং অমানবিক জুলুম-নিপীড়ন চালিয়ে ইসলামের অসংখ্য ভক্তের উপর কারা-নির্যাতন চালানোর পেছনে কি ইসলামের এসব শক্তির চক্রান্তই কাজ করেনি?

মোটকথা-মুসলিম ও ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তিগুলোর এসব জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের ইতিহাস সামনে থাকা সত্ত্বেও দুই মুসলিম রাষ্ট্রের কোনো ইস্যু নিয়ে বিরোধের মুহূর্তে হঠাৎ মাথা গরম করে বড় রকমের যুদ্ধ প্রস্তুতি কারুর পক্ষ থেকেই সঙ্গত নয়। আজকের বিশ্বমুসলিম একে অবশ্যই নিন্দার চোখে দেখবে। আফগান সীমান্তে ইরানী বিপুল সৈন্য সমাবেশের এই পরিস্থিতিতে কোনো উত্তেজনার মুহূর্তে

www.pathagar.com

যদি যুদ্ধ লেগেই যায়, তাহলে এই যুদ্ধে প্রতিবেশী অন্যান্য দেশ বিশেষ করে পাকিস্তান ও ভারত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে না যে তার কোনো নিশ্চয়তা আছে কী? এভাবে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের দুরভিসন্ধি নিয়ে ইসরাইল বা অপর কোনো শক্তি যদি পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনা কিংবা ইরানের সামরিক কোনো বিশেষ স্থাপনার উপর চুপিসারে এসে মারাত্মক ধরনের বোমা নিক্ষেপ করে যায়, তাহলে বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বা দাঁড়াতে পারে, তা ইরানীদের চিন্তা করা উচিত। এছাড়া পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যদি আন্তর্জাতিক আরও কোনো শক্তি তালেবানের পাশে এসে দাঁড়ায়, তখনও বা পরিস্থিতি কি ভয়াবহ রূপ নিবে, সেদিকেও নজর দেয়া কর্তব্য। সুতরাং কোনো যুক্তিতেই আফগানিস্তানে যেমন হামলা সঙ্গত নয়, তেমনি মুসলিম দুনিয়ার কাছেও ইরানের এই পদক্ষেপ হবে নিন্দিত। তাই শক্তি নয়, আলোচনার দ্বারাই সমস্যার সমাধান কাম্য। ইরানের উচিত প্রতিবেশী পাকিস্তানসহ মিলেমিশে আফগানিস্তানে কিভাবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আসতে পারে, তা নিয়ে চিন্তা করা এবং আফগানিস্তানে স্থিতিশীলতার স্বার্থে বর্তমান তালেবান সরকারের বিরোধী গ্রুপকে কোনোরূপ সহায়তা না করা। অন্যথায় শত্রুদেরই উদ্দেশ্য সফল হবে এবং তালেবান কর্তৃক ইরানের উপর হামলার যেই অমূলক আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেই আশঙ্কাকে খোদ ইরান কর্তৃক বাস্তবতায় ডেকে আনারই নামান্তর হয়ে যেতে পারে। বাকি থাকলো আটক ইরানী কূটনীতিকদের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের ঠাণ্ডা মাথায় উত্তেজনাহীন পরিবেশে একটি ফরমূলায় উপনীত হওয়া সম্ভব। ইরান যদি তার বর্তমান উত্তেজনাকর অবস্থা থেকে পিছে হটে যায় এবং ইরানী প্রেসিডেন্ট খামেনাই আফগানিস্তানের উপর অনাক্রমণের সর্বশেষ যেই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, এটাই যদি ইরান সরকারের মনের কথা হয়ে থাকে, তা হলে উত্তেজনার বিষয়টির এখানেই অবসান ঘটা উচিত– এটাই সময়ের দাবী।

জাতি গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা

[প্রকাশ ঃ ১৭. ১. ২০০৩ ইং]

দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। এ যুগে সংবাদপত্র একদিকে যেমন বিশ্বের বিচিত্র ধরনের ঘটনার খবর পাঠকের কাছে বহন করে আনে, তেমনি একটি স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারেও থাকে এর বিরাট ভূমিকা। জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি, বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কিংবা জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোনো অশুভ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সমাজের সামগ্রিক চেতনাকে চাঙ্গা করে গণজাগরণের সৃষ্টির ক্ষেত্রে এর কোন জুড়ি মিলে না। সংবাদপত্র হচ্ছে আজকাল বহুমুখী জ্ঞানের আধার। সংবাদপত্র যেমন দেশকে উঠাতে পারে, তেমনি ডুবাবারও ক্ষমতা তার বিরাট। ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্বের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দেশ ও জাতির ধ্যান-ধারণা সঠিক পথে পরিচালনায় সংবাদপত্রের বিরাট ক্ষমতার প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে এর উপর বিরাট গুরু দায়িত্বও এসে বর্তায়। এ

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালনে ইচ্ছা অনিচ্ছাকৃত যে-কোনো ব্যর্থতা দেশ ও জাতির ভাগ্যে ডেকে আনে মস্তবড় বিড়ম্বনা। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবনদর্শন আর আমাদের জাতীয় চিরায়ত জীবনবোধের সংঘাত থেকে সৃষ্ট মত পার্থক্যের দরুন জাতীয় জীবনে যে অস্বস্তি রয়েছে, এ দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য আমাদের সাংবাদিকতাকেও আজ প্রভাবিত করেছে। এ দ্বন্দ্বে জাতীয় স্বার্থবিরোধী প্রবণতাও এ পেশায় নিয়োজিত কোনো কোনো সদস্যের মধ্যে দেখা যায় বৈ কি। যা অতি সাম্প্রতিক কয়টি ঘটনার মধ্যদিয়ে স্পষ্ট। এমন অবস্থা জাতীয় জীবনের জন্যে নেহায়েতই ক্ষতিকর। জাতির কল্যাণে দৃষ্টিভঙ্গিগত এই পার্থক্যের অবসান একান্ত জরুরি। একে কেন্দ্র করেই একটি দেশে আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তির অবৈধ প্রভাব ও অনুপ্রবেশ ঘটে। তদ্রূপ ব্যক্তি অথবা কোটারি স্বার্থ যেমন এ দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি কোনো কায়েমী স্বার্থবাদী স্বৈরাচারী শাসন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হলেও সাংবাদিক তার যথার্থ দায়িত্ব পালনে অপারগ হয়ে পড়ে।

প্রাক-স্বাধীনতা আমলে বহুবার এ দেশের সাংবাদিকতা এই মানসিকতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। একদিকে সাংবাদিকরা ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের শিকার হয়েছে, অপরদিকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের রোষাণলে পতিত হয়ে বারবার এ পেশাজীবীদের যাত্রাপথ বিঘ্নিত হয়েছে অথবা নিজেদের যথার্থ ভূমিকা পালনে হয়েছে তারা ব্যর্থ।

জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যেই স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। যাবতীয় শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান ঘটানো এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়েই অতীতে এ দেশের স্বৈরাচারী কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির বিরুদ্ধে গণবিস্ফোরণ ঘটেছিল। তারই পটভূমিতে অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে এ দেশবাসী লাভ করে স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশের স্বাধীন পরিবেশে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন সাংবাদিকতার আশা করে। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশবাসীকে সকল গণতান্ত্রিক অধিকার বঞ্চিত হয়ে প্রাক-স্বাধীনতা আমলের চাইতেও অনেকগুণ বেশি শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য, দুর্ভোগ ও একনায়কত্বের অকটোপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়তে হয়, যে কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারেনি এ দেশে সংবাদপত্রকে হারাতে হবে নিজের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা। সে অবস্থা আর এ দেশে কোনো দিন ফিরে না আসুক।

সংবাদপত্রের যথার্থ দায়িত্ব পালনে সাংবাদিকদের ঐ অনিচ্ছাকৃত ব্যর্থতার সাথে সাথে জাতীয় আশা-আকাজ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে অনেকের সজ্ঞান ব্যর্থতাও ছিল খুবই ন্যাক্কারজনক। পূর্বে যেমন অনেকে গণস্বার্থের তোয়াক্কা না করে কায়েমী স্বার্থের কার্বন কপি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের অবস্থায়ও কেউ কেউ সে চরিত্রেরই অভিনয় করেছে। ক্ষেত্র বিশেষে "রাজা যত বলে পারিষদ তার শত গুণ"-এর ভূমিকা পালন করা হয়েছে। ব্যক্তিগত হীন কোটারী স্বার্থের কাছে দেশের অগণিত জনতার স্বার্থ নির্মমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। দেশ ও জাতির মূল চাহিদা এবং আশা-আকাজ্ক্ষার প্রতি কোনোরূপ ভ্রূক্ষেপ না করে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবিশেষদের

www.pathagar.com

মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কারুর 'হাঁ-এর সঙ্গে হাঁ' এবং 'না'-এর সঙ্গে না মিলানো কিংবা কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে স্তাবকতায় কারুর মুখ দিয়ে 'হাঁ' বা না' বলানোর নজিরই ছিল প্রবল। এ অবস্থায় বিশেষ কারুর স্বার্থরক্ষা হলেও জাতির স্বার্থ রক্ষা পায় না।

পূর্বে যেমন কেউ কেউ সাংবাদিক সততা বিসর্জন দিয়ে স্বার্থ-প্রণোদিতভাবে নিজেদের ভিন্ন মতের কোনো দল সম্পর্কে ভিত্তিহীন উক্তি করে বসত, এমনকি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা মহল থেকে প্রকাশিত উক্তির প্রতিবাদ করলেও তা পৌনঃপুনিক চর্চা করে ঐ ব্যক্তি বা দল সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির নির্লজ্জ প্রয়াস চালাতো, দেশ স্বাধীন হবার পরও তেমনিভাবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এরূপ অনুদার ও অসহিষ্ণু মনের পরিচয় লক্ষ্য করা গেছে এবং এখনো এক শ্রেণী তা করে যাচ্ছে।

এহেন সাংবাদিকতা কেবল দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনেই ব্যর্থ হয় না বরং জাতির জন্য বহুবিধ অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে যেমন সংবাদপত্রের উপর থেকে জনগণ আস্থা হারিয়ে বসে, তেমনি প্রয়োজনে সংবাদপত্রের কোনো মহত্তর ডাকে সাড়া দিতেও তাদের ইতস্তত করা স্বাভাবিক। পৃথিবীতে বহু একনায়ক শাসককে নিয়ে একশ্রেণীর সংবাদপত্রের নিজেদের কোটারীগত উদ্দেশ্য হাসিলের মানসে এরূপ ভূমিকা পালনের নজির রয়েছে। এমন এক সময় ছিল যখন ইন্দোনেশিয়ার পরলোকগত প্রেসিডেন্ট ডক্টর আহমদ সুকার্নোর বিরাট ছবি সে দেশের একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় প্রায় দিন শোভা পেতো এবং তার যে-কোন বক্তব্য পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রধান শিরো নামের মর্যাদা পেতো। একদিকে অর্থ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে দেশের বড় বড় প্রকল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় উপকরণাদির অভাবে শিল্প কারখানায় উৎপাদন হ্রাস পেয়ে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হচ্ছে, অফিস-আদালত দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে, অপর দিকে ঐ শ্রেণীর সংবাদপত্র জাতির 'পাপু'র প্রশস্তি গেয়ে "সব ঠিক হ্যাঁয়" বলে তাকে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখছে। দেশ ও জাতির দরদে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো মহল পরিস্থিতির 'অপর পিঠ' তুলে ধরার জন্যে এগিয়ে এলে, তাদেরকে ঐ সকল সংবাদপত্র 'পঞ্চম বাহিনী' এবং 'নেতাকে ক্ষমতাচ্যুতকারী' হিসাবে চিত্রিত করতো আর তাদের প্রতি সরকারি দমন নীতি চালানোর ওকালতি করতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ তোয়াজ- তোষামোদে নীতির পরিণতি কি দাঁড়িয়েছিল? তা বিশ্ববাসীর জানা। তাতে দেশের অগণিত জনতার দুর্ভোগ ও অশান্তিই কেবল বাড়ে না, এরূপ তোষামোদ ও তোয়াজে সাংবাদিকতা প্রত্যেক দেশের সংশ্লিষ্ট শাসককেও ডুবায়। অনেক সময় তাদের নিজেদের ও ডুবতে দেখা যায়। এ দৃশ্য যেমন দেখা গেছে সাবেক পাকিস্তানে আইয়ুবী দশকে, তেমনি দেখা গেছে জামাল নাসেরের শাসনামলে মিসরেও।

বাংলাদেশ গঠিত হবার অব্যবহিত পর আমাদের সাংবাদিকতার ধারা যে খাতে বয়ে চলেছিল, তা সমাজের অনেক বিবেকবান মানুষের দৃষ্টিতেই পীড়াদায়ক ও নৈরাশ্যকর ঠেকে ছিল। কেননা কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ঐ সময় অনেকেই অবাস্তব ও ভিত্তি হীন প্রশংসা ও তোষামোদে ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, জনগণের অধিকার, তাদের কৃষ্টি-তমদ্দুন ও ন্যায্য দাবী-দাওয়াসমূহের ব্যাপারে

www.pathagar.com

সরকারকে সচেতন করার জন্যে স্বল্প সংখ্যক সাংবাদিকেরই প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর অবদান ছিল তখন এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতার পরিচয়ও কেউ দেয়নি যে, তা নয়।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কারও কারও ভূমিকা ছিল নিজেদের প্রচারিত দীর্ঘদিনের আদর্শের বিপরীত। অনেকের আচরণ মধ্যযুগীয় শাসকদের দরবারে 'এনাম' প্রত্যাশী এক শ্রেণীর স্তাবকদের কথাই তখন সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কেউ দেশের বড় বড় আসন বা পদ লাভের প্রত্যাশা বাস্তবায়নের জন্যে দল বিশেষ ও নেতা বিশেষের বাস্তব অবাস্তব বিশেষণবহুল স্তাবকতায় উঠে পড়ে লেগে যায়, অথচ তাদের পূর্ব ভূমিকা ছিল তাদের অনুসৃত এ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

স্বাধীনতার পরবর্তী শাসনামলে আমাদের অনেকে সাংবাদিক-সুলভ দায়িত্ব পালন করার পরিবর্তে রীতিমত রাজনীতিকে পরিণত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক পক্ষকে দিয়ে তাঁদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। স্বাধীনতার পর সরকারীভাবে যেখানে কারুর ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছিল এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে স্বাভাবিকতায় আনতে চেষ্টা চলছিল, তখন আমাদের অনেকের মাত্রাতিরিক্ত হিংসাত্মক মনোভঙ্গি দেশে জাতীয় ঐক্য এবং দ্রুত শান্তি-নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টির পরিবর্তে ছিল প্রতিশোধ গ্রহণের উস্কানিমূলক।

এভাবে মহলবিশেষকে উত্তেজিত করে বিভেদমূলক ভাবকে স্থায়ী করে রাখার প্রবণতা কিছুতেই নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার আওতায় পড়ে না। তাতে দেশ ও জাতির কোনো কল্যাণও নিহিত থাকে না। তাতে জাতীয় জীবনে অনৈক্য ও হানাহানির পরিধিই বৃদ্ধি পায়। সাংবাদিকতার মানের ক্ষেত্রে আমরা বহু দূর নিচে নেমে গিয়েছিলাম। যাবতীয় গণতান্ত্রিক অধিকারসহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, একদিন এখানকার সংবাদপত্র যে ঐতিহ্য স্থাপন করেছিল, তা সেদিন বহুলাংশে হয়েছিল কলঙ্কিত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণসহ অপরাপর অন্যায়ের সমর্থন এবং অপরকে টেক্কা মেরে নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থের সংরক্ষণ বা তার পরিধি বৃদ্ধিতেই অনেককে অধিক তৎপর দেখা গেছে। সাংবাদিকদের সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্বে সমাসীনদের যথাযথভাবে নিজেদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা তৎকালীন সরকারকে বিভিন্ন সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধেও সহায়তা করেছে। সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টার চাইতে সহজ পন্থায় সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রবণতা ছিল কারুর মধ্যে সুস্পষ্ট। সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন অপেক্ষা রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন যেন অনেকের মুখ্য কর্তব্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কোনো দায়িত্বশীলের বিশেষ রাজনৈতিক দলে শামিল হবার পরোক্ষ অনুপ্রেরণা দান অনেককেই সেদিন হতবাক করেছে। জনগণ এবং সংবাদপত্রের অধিকার হরণকারীদের কণ্ঠে সুবিধাভোগী দায়িত্বশীলদের পুষ্পমাল্য অর্পণসহ ইত্যাদি তোষামোদ পরোক্ষভাবে সংবাদপত্র দলনকেই উৎসাহিত করেছে। সাংবাদিকদের এহেন ন্যাক্কারজনক ভূমিকা তখন আন্তর্জাতিক প্রচার সংস্থাসমূহের দৃষ্টিকেও এড়ায়নি। দেশে-বিদেশে সর্বত্র এখানকার সাংবাদিকতার তৎকালীন অনুসৃত ভূমিকাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে।

www.pathagar.com

তৎকালীন ফ্যাসিবাদিতার রাজত্বে অধিকাংশ সংবাদপত্র সরকারী কর্তৃত্বাধীনে চলে যাওয়াতে সরকারী কাগজের সাংবাদিকরা বেশি মাত্রায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে বেসরকারী কাগজের সাংবাদিকরা তাদের নিম্নতম সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত থেকেছেন। তখন আমাদের মধ্যকার দুস্থ সাংবাদিকদের প্রতি প্রসারিত হয়নি কারুর ঐক্যবদ্ধ সহানুভূতির হস্ত। এ জাতীয় আরও বহুবিধ কারণ সাংবাদিকদের স্বার্থের প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তিসহ অন্যান্য বিষয় সাংবাদিকতার পেশায় স্বাভাবিকতার পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

গণতান্ত্রিক দেশে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্র থাকা উচিত নয় বলে আইয়ুব খান এ নীতি অনুসরণ করলে একসময় যারা এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন, বাংলাদেশ হবার পরক্ষণেই আইয়ুবের আমলের চাইতেও অধিক সংখ্যায় সংবাদপত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেয়ার সময় তার কার্যকর প্রতিবাদতো দূরের কথা বরং সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকার সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্যে অধিক ব্যস্ত হয়ে উঠতে অনেককে দেখা গেছে। আমাদের দেশে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের উপর চেপেবসা ঐ জগদ্দল পাথর তখনই অপসারিত হয়, যখন এদেশ ও জাতির সেই চরম ক্রান্তিলগ্নে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াউর রহমানের হাতে দেশের ক্ষমতা আসে। পরবর্তীতে তাঁর সহধর্মিনী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার পরতো বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দ্বার এতই উন্মুক্ত করে দিলেন যে, দেশে সংবাদপত্রের সয়লাব বয়ে গেল।

সংবাদপত্রের উপর চরম আঘাত আসার পূর্বে তথাকথিত বন্ধু রাষ্ট্র 'বেজার' হবার আশংকায় নিজ দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ ও অস্ত্র পাচার হওয়ার কালে কোনো কোনো সংবাদপত্র নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে খতম ও হেস্তনেস্ত করার উস্কানি দানকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এটা কিছুতেই সাংবাদিক সুলভ ভূমিকা বলা চলে না। দেশ গড়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সাংবাদিকতার পেশার দায়িত্ব পালিত হওয়া উচিত।

দেশের কৃষ্টি, তমদ্দুন ও জাতীয় ভাবধারাকে অক্ষুণ্ন রাখা, এর উৎকর্ষ বিধানে সচেষ্ট হওয়াও জাতীয় সংবাদপত্রের অন্যতম দায়িত্ব। তেমনি বিজাতীয় অপসংস্কৃতি, কৃষ্টি-তমদ্দুন ও ভাবধারা যাতে এদেশের মানুষের কৃষ্টি-তমদ্দুন, জীবনাদর্শ ও মুল্যবোধকে প্রভাবিত করে জাতীয় ঐক্যের বুনিয়াদে ফাটল ধরাতে না পারে, ঐ ব্যাপারেও সংবাদপত্রের অতন্দ্র প্রহরা থাকা কর্তব্য। স্বাধীনতার পূর্বে এবং বিশেষভাবে পরে সাংবাদিকতার এ দায়িত্বের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে আসা হচ্ছে। বরং ক্ষেত্র বিশেষে বিপরীতমুখী ভূমিকাই পালন করা হয়েছে। এটা যে এদেশের জাতীয় সত্তার জন্যে জহরে হলাহল, সে ব্যাপারে সকলের বোধোদয় ঘটা দরকার।

রাজনৈতিক ময়দানে গণতান্ত্রিক অধিকার ও বাক-স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে যেমন একশ্রেণীর লোক দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে, তেমনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সুযোগেরও কোনোরূপ অপব্যবহার কারুর কাম্য নয়। রাজনীতি ও সাংবাদিকতা উভয়টিই দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার। এতে দায়িত্বহীনতা জাতির দুর্গতিই বাড়ায়। রাজনৈতিক চর্চার সুযোগকে কোনো রাজনীতিক কর্তৃক অপব্যবহারের ফলে তার আশু পরিণতির কথা

www.pathagar.com

ভেবে অনেক সরকার দলননীতি অবলম্বন করেন। তা করতে গিয়ে করা হয় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। এ জন্যে উভয়েরই উচিত পরিস্থিতিকে অতদূর পর্যন্ত যেতে না দেয়া। সংবাদপত্রের বেলায় প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার প্রবণতা যেমন রোধ হওয়া প্রয়োজন, আবার তাকে নিয়ে ক্ষমতাবানেরা বাড়াবাড়ি করুন–এটাও কেউ চায় না। সৎ এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার সোনালী পরশে দেশ ও জাতি নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অনুপ্রাণিত হলে এবং দেশগড়া ও তার শ্রীবৃদ্ধির কাজে উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে এলে, তবেই আমাদের সাংবাদিকতা সার্থক হতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একশ্রেণীর সংবাদপত্রের অনুসৃত আরেকটি দিকের প্রতিও আলোকপাত করা জরুরী বলে সে সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই, সেটা হলো অশ্লীল সংবাদের প্রচার।

অশ্লীল ঘটনাকে মার্জিত ভাষায় প্রকাশ করার মধ্যদিয়ে বর্ণনাকারীর রুচিশীলতারই প্রকাশ পায়। অশ্লীল ঘটনাকে অশ্লীল শব্দ দ্বারা প্রকাশ করার মধ্যে কৃতিত্বের কিছু নেই বরং তাতে শ্রোতা বা পাঠক বিরক্তিই বোধ করে এবং বর্ণনাকারীকেও নির্লজ্জ ও রুচিহীন বলেই মনে করে। কারণ, এতে শ্রুতিকটুতা ছাড়াও এর মধ্য দিয়ে অশ্লীলতার প্রতি লেখক বা বক্তার অহেতুক মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের ভাব প্রকাশ পায়। পরন্তু যে গর্হিত বিষয়টি অপ্রকাশিত ছিল, যে সম্পর্কে অনেক পাঠক বা শ্রোতা কোন দিন কল্পনাও করেনি, তাদের মন-মস্তিষ্কেও এ দ্বারা বিষয়টির স্মৃতিকে তাজা করে দেয়া হয়। তাতে অনেক সময় এর ফল দাঁড়ায় সেই প্রবাদ বাক্যের অনুরূপ–"পাগলারে পাগলা পুল নাড়া দিস্ না।"–আর অমনি সে "আচ্ছা, ভাল কথাই তো মনে করে দিয়েছো" বলে সত্যিই সে পুল নাড়তে শুরু করে দিল। এ কারণেই অন্যদের সাবধান করা কিংবা ঘটনার প্রতিকারের প্রয়োজনে কোনো অশ্লীল ঘটনা বা অশ্লীলতাজনিত অপরাধ বর্ণনার প্রয়োজন দেখা দিলে, দায়িত্বশীলরা চিরকালই ইঙ্গিতমূলক মার্জিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারপরও অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের এ জাতীয় ঘটনার কথাবার্তা থেকে দূরে রাখার একটি সযতন চেষ্টা বহাল থাকতো। এর ফলে এ জাতীয় অপরাধের প্রতিকারে যেমন কোনো অসুবিধা হতো না, তেমনি এর স্পষ্ট বর্ণনার বিপরীত প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার হাত থেকেও অনেকটা রেহাই পাওয়া যেত। কিন্তু ইদানীং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অশ্লীল ঘটনা বা অশ্লীলতাজনিত অপরাধের সবিস্তার বর্ণনা ও খবর প্রকাশ অনেকটা সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে। বিশেষ করে সংবাদপত্রের অসম বয়সী পুরুষ কর্তৃক অপর মুহাররামার সাথে অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি ধরনের খবর প্রচার অপরাধ ও অশ্লীলতা দমানোর ব্যাপারে যত না কল্যাণকর হচ্ছে, তার চাইতে অপরাধের ধারণাকেই অধিক প্রসার দেয়া হচ্ছে। সংবাদপত্রে এসব কথার অধিক চর্চা সকলের অলক্ষ্যেই যেন মন থেকে এ সংক্রান্ত হায়া-শরমকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে দেয়। যে কথা একসময় কানে বা মুখে তুলতে ঘৃণা বোধ হতো, অবশেষে তাই অবলীলাক্রমে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে, অপরের মুখে শুনতেও তেমন শ্রুতিকটু মনে হয় না। অতীতে লজ্জা-শরমের কোনো কথাকে সরাসরি না বলে কিরূপ ইঙ্গিতমূলক শব্দে ব্যবহার করা হতো, তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকায়

www.pathagar.com

আজও বিদ্যমান। যেমন, কারুর মলমূত্র ত্যাগ করার বিষয়টিকে সরাসরি না বলে বলা হয় 'প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া'। অন্যান্য ভাষায় একই রীতির অনুসরণ লক্ষণীয়, যেমন উর্দু-ফারসি ও আরবিতে বলা হয় 'ইসতিনজা' করা। খোদ মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালাও হায়া-শরমের ক্ষেত্রে ইঙ্গিতমূলক শালীন শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন পর-পুরুষ তথা নর-নারীর অবাধ মেলামেশার ক্ষতিকর দিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি যৌনভাব জাগ্রত হবার কথাটি সরাসরি না বলে ঐ স্থলে ইরশাদ করেছেন ঃ

"(এতে) যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি পাবে।' বলা বাহুল্য, এখানে ব্যাধি বলতে পর-নারীর প্রতি কামভাবকেই বুঝানো হয়েছে। বস্তুত মুসলিম সমাজে সকল সময় অশ্লীল ও যৌন বিষয়ক ব্যাপারে ধার্মিক অভিজাত মহলে ইঙ্গিতমূলক মার্জিত শব্দের ব্যবহার পদ্ধতি মূলত আল-কুরআনের এই বাক-রীতিরই উত্তরাধিকার।

কোনো কোনো সংবাদপত্র বা প্রচারমাধ্যম আজকাল অশ্লীলতাজনিত অপরাধসমূহের খবর পরিবেশন করতে বা বর্ণনা দিতে গিয়ে রোমান্স সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিংবা পত্রিকার কাটতি বৃদ্ধির জন্যে যেভাবে, যে ভাষায় এ জাতীয় ঘটনাকে পাঠক, দর্শক, শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করে থাকে, তার মধ্য দিয়ে এ সংক্রান্ত অপরাধের ব্যাপারে সমাজকে সচেতন করা কিংবা এর প্রতিকারার্থে অনুরূপ ভাষণ ও বর্ণনার আশ্রয় না নিলেও বোধ হয় চলে। অনেকের বর্ণনা তো রীতিমতো অশ্লীলতাকেই উৎসাহিত করে, যা যুব চরিত্রের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অনেকে ভিন্ন সমাজের অপসংস্কৃতিকে চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহ থেকে সংবাদপত্রে টেনে এনে যুব চরিত্র ও সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংসের কাজ করতে আদৌ দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয় না।

দেশ ও জাতির প্রতি সংবাদপত্রের গুরুদায়িত্বের প্রেক্ষিতে শুধু সংবাদ পরিবেশনই একটি সংবাদপত্রের দায়িত্ব নয়, জাতির জন্যে প্রকাশিতব্য সংবাদটির কল্যাণ-অকল্যাণকারিতার দিকটিও লক্ষ্যণীয়। জাতির বিনির্মাণে তথা তাকে অধিকার সচেতন করা, তার উন্নয়ন পথের যাবতীয় কাটা অপসারণের দ্বারা জাতিকে এগিয়ে নেয়া ও তাকে রুচিশীল, চরিত্রবান ও সুখী-সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তার সুস্থ মননশীলতা গড়ে তোলার প্রশ্নে একটি সংবাদপত্রের থাকে বিরাট ভূমিকা।

নেতিবাচক সমালোচনা দ্বারা জাতির মনকে বিষায়িত করার সাথে সাথে সমাজের যাবতীয় কলুষতার মূল কারণসমূহ কোথায়, সেগুলো চিহ্নিত করাও প্রচার মাধ্যমসমূহের অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু সে কাজটি না করে অর্থাৎ খারাবির উৎসসমূহের ব্যাপারে জাতিকে সতর্ক বা পথ নির্দেশনা না দিয়ে কেবল খারাবির নগ্ন সমালোচনা কিছুতেই সুফল বয়ে আনতে পারে না বরং তার উল্টো প্রতিক্রিয়া সমাজের জন্যে আরো অধিক ক্ষতিই বয়ে আনে। সমাজ মানসে নিষ্ঠুরতাই গা-সওয়া হয়ে উঠে। এ প্রবণতা আজকাল প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে লক্ষ্যে হোক কি অলক্ষ্যে সমাজে নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি যাবতীয় অপরাধ প্রবণতার বর্ণনা দানে অনেকে যে পরিমাণ উৎসাহ প্রদর্শন করে থাকে, সে তুলনায় তার কারণসমূহ বর্ণনায় সৎ সাহস দেখাতে পারে না। এটা করতে গেলে হয়তো ইসলামের কথা বলতে হবে,

www.pathagar.com

এজন্য তারা এদিকটি এড়িয়ে যায়। আর কেউ সচেতনভাবেই এ থেকে দূরে থাকে। কারণ, তাদের কাছে সর্বরোগের মহৌষধ একটিই—অর্থাৎ বিশেষ একটি অর্থনৈতিক মতবাদ। সেটির অনুপস্থিতির কারণেই নাকি সমাজের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অথচ কার্যত দেখা যায়, যারা অর্থাভাবে জর্জরিত তাদের তুলনায় ঐ সকল ব্যক্তি জঘন্য অপরাধে বেশি লিপ্ত, যারা প্রাচুর্যে আকুণ্ঠ ডুবে আছে-যারা সচ্ছল।

পরিবেশনার মাধ্যমের দিক থেকে একশ্রেণীর খবর সম্পর্কে সত্য মিথ্যা উভয়েরই অবকাশ থাকে। এ কারণে কোনো সংবাদপ্রাপ্তির সাথে সাথেই তার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তার বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করার প্রয়োজন থাকে বৈ কি। আল-কুরআনেরও এটিই শিক্ষা। খোদ মহানবী (স)ও অবাঞ্ছিত কোনো কথা কানে আসা মাত্রই বাছ-বিচার না করে তার ভিত্তিতে কিছু রটানোর ব্যাপারে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। মহানবীর এ বাণীর আলোকে আমাদের সামনে সাংবাদিকতার একটি গাইড লাইন ফুটে উঠে। এ লাইনটির অনুসরণে সংবাদ পরিবেশনাজনিত অনেক ক্ষতিকর বিষয় থেকেই রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে যেগুলো চারিত্রিক কলুষতা সংক্রান্ত খবর, এগুলোর পরিবেশনায় ও শব্দ ব্যবহারে অনেক দিক থেকেই সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন। কারণ, আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও মূল্যবোধ এমন যে, এ ব্যাপারে কোনো নিছক খবরই অনেক সময় অনেক পরিবারকে সামাজিকভাবে সকল সময়ের জন্যে হেয় প্রতিপন্ন করে ফেলে। তন্মধ্যে যদি অশ্লীলতার বিস্তারিত বিবরণ সহকারে কারো সম্পর্কে কোনো খবর প্রকাশ পায়, তাহলে সে খবর ঐ পরিবারের জন্যে হিতে পিবরীত হয়ে মারাত্মক রূপ ধারণ করে। যেমন, কোনো উপজেলার কোনো ইউনিয়ন ও গ্রামের একটি যুবতী নারী অপহরণ কিংবা তাকে এক বা একাধিক পুরুষের ধর্ষণ সংক্রান্ত কোনো খবর দেশের জাতীয় পত্র-পত্রিকাসমূহে নামধাম সহকারে যদি প্রকাশ করা হয়, তাতে তার যত না উপকার করা হয় সম্ভবত সংশ্লিষ্ট নারী ও তার পরিবারটির ক্ষতি করা হয় তার চাইতে অনেক বেশি।

এজন্যে সংশ্লিষ্ট থানা উপজেলায় মোকদ্দমা চলা এবং ন্যায়বিচার হওয়াটাই আসল কথা। দেশময় লোকের এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ জানার তেমন প্রয়োজন হয় না। বড় জোর অপরাধের রেকর্ড রাখার জন্যে অমুক এলাকায় একটি নারী ঘটিত ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে, এতদূরই যথেষ্ট। যেখানে এর বিচার হবে, সেখানে তো বাদীর আরজীতে সব বিবরণ বিস্তারিতভাবেই আছে। তা না করে, কোন গ্রামের কোন বাড়ি কোন ঘরের কোন ব্যক্তির কত নম্বর মেয়ে বা বোন বা অমুক নাম্নীয় পুত্রবধু-হত্যাকারী পরিচয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও পরিবারের জন্যে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে বিরাট সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিকভাবে কোনো ব্যক্তি, পরিবারের বিশেষ করে কোনো নারীর জন্যে এ ক্ষতিটি কিছুতেই মামুলি নয়- এ অপমানের বোঝা হয়তো অনেকের কয়েক যুক পর্যন্ত বহন করতে হবে। মোটকথা, সংবাদপত্রে যে কোনো বিষয় প্রকাশকালে ব্যক্তিগত আর্থিক বা অন্য কোনো সুযোগ সুবিধা লাভ কিংবা খ্যাতি ইত্যাদির চাইতে জাতীয় স্বার্থই সকল কিছুর উর্ধ্বে রাখাই সাংবাদিকতার প্রধান লক্ষ্য ও কর্তব্য হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

দলীয়করণ প্রবণতার বলি আর কত চলবে?

[প্রকাশ ঃ ১. ৬. '৯৮]

সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের মেধাবী ছাত্র এমবিবিএস দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী হাসিবুর রহমান মহসিনের শাহাদাতের ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হলো, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে দলীয়করণের চিন্তা মাথায় নিয়ে যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসমুক্ত করার বড় বড় বুলি আওড়িয়ে থাকেন, তাদের এই চিন্তা ভ্রান্ত, প্রহসনমূলক ও অসাধুতাপূর্ণ। তাতে আবারও প্রমাণিত হলো, যারা গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বড় বড় কথা বলে ক্ষমতায় গিয়েছে, তাদের এসব নীতিকথার মতলব ছিল জনগণকে প্রতারিত ও বিভ্রান্তি করে ভোট আদয় করে নেয়া। অন্যথায় তারা যেখানে ক্ষমতায় যাবার পূর্বে রাষ্ট্রের অন্যান্য ক্ষেত্রসহ শিক্ষাঙ্গনকে দলীয়করণের তীব্র নিন্দা করতো, তাদের নিন্দিত-ধিকৃত সেই 'দলীয়করণ' প্রবণতায় উন্মত্ত হয়ে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে বিনষ্ট করার জন্য কেন নিজেদের ছাত্র সংগঠনকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপরাপর ছাত্রদের বিরুদ্ধে এভাবে লেলিয়ে দেবেন? যদ্দরুন কোথাও কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে শান্তি-শৃংখলার মাধ্যমেই দীর্ঘদিন ধরে লেখাপড়ার কাজ চলে আসছিল, সেখানে পুলিশের সহায়তায় সরকারি ছাত্র সংগঠনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চরদখল অভিযান চালানো হয়। তাতে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো ছাত্র-ছাত্রীরই শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে না , বরং সেখানে এক অরাজকতাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে এবং জনজীবন ও শহরের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। পুলিশের সহায়তায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি ছাত্র সংগঠনের প্রভাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি তার বড় প্রমাণ। ঠিক দলীয়করণের প্রবণতা থেকে সৃষ্ট অপরাপর ছাত্র সংগঠনের ছাত্রদের প্রতি বিদ্বেষ ও বৈরীভাব থেকেই সম্প্রতি তুচ্ছ একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা এমবিবিএস দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মহসিন সরকারি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের হাতে নিহত হবার ঘটনাটি ঘটে। অপরদিকে সম্ভবত একই ঘটনার জের হিসেবেই পরদিন রোববার শহরের সাগরদিঘীর পাড় এলাকায় সৌমিত্র বিশ্বাস নিহত হয়। দুটি হত্যাকাণ্ডের জন্যই আমরা এখানে কর্তৃপক্ষের অন্ধভাবে দলীয়করণ নীতির অনুকরণ এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে ফ্যাসিবাদী কায়দায় দেশের একশ্রেণীর ছাত্রকে গড়ে তোলাকে দায়ী না করে পারছি না। স্বাভাবিকভাবেই আজ প্রশ্ন জাগে, সিলেটে সংঘটিত এ দুটি ছাত্রের জীবনহানির মধ্যদিয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদ্বয়ের মাতা-পিতাদের যেই বুক খালি হলো, পুত্রকে কেন্দ্র করে তাদের বুকভরা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে যেভাবে হত্যা করা হলো, এই হত্যার নিমিত্ত সৃষ্টিকারীরা সেই অভিভাবকদের সামনে আজ কি জবাব দেবেন?

www.pathagar.com

মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের কোনো মুসলিম ছাত্র বা ছাত্রসংগঠন যদি ইসলামের কথা বলে এবং অপরকে ইসলামী শিক্ষা আদর্শের অনুসরণ করে ভাল মানুষ, সৎ নাগরিক ও ভাল ছাত্র হবার জন্য আহ্বান জানায়, এ জন্য সে ছাত্রকে কেন জীবনে শেষ করে দিতে হবে? এই হিংস্র ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দর্শন দিয়ে যারা দেশে রাজনীতি করতে চায়, তারা এ দেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তো নয়ই কোনো ধরনের নেতৃত্ব দানেরই যোগ্য হতে পারে না। কারণ এটি একটি অমানবিক, অগণতান্ত্রিক, পাশবিক, ফ্যাসিবাদী দর্শন। এ দর্শনের রাজনীতির সাথে জড়িতদের হাতে যতদিন কোনো দল বা দেশের নেতৃত্ব থাকে। সে দলের দ্বারা যেমন কোনো দেশে গণতন্ত্র, শান্তি ও জনগণের কল্যাণ আসতে পারে না, তেমনি সে দলটি দেশের নেতৃত্ব-কর্তৃত্বে থাকাবস্থায় শিক্ষাঙ্গনে হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসী তৎপরতাও বন্ধ হওয়া অসম্ভব। অনুরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট মুসলিম দেশটির জনগণের ধর্মীয়, গণতান্ত্রিক, মৌলিক, মানবিক অধিকার এমনকি তাদের স্বাধীনতাও নিরাপদ নয় বলে নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশে বর্তমানে এমন একটি হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিই বিরাজ করছে। আমরা মনে করি, শিক্ষাঙ্গনের এসব হত্যাকাণ্ড এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যাবতীয় সন্ত্রাসী তৎপরতাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা বলে গণ্য করার কোনো অবকাশ আর নেই বরং বছরকে বছর এসব ঘটনা এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাশক্তিকে ভিন্ন দিকে নেয়ার একটি গভীর ষড়যন্ত্র, যাতে তাদের ব্রেইন ওয়াশ করা যায়। অন্যথায় প্রতিবেশী কোনো দেশ বিশেষ করে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে '৪৭ সালের পর থেকে আদৌ কোনো ছাত্র সংঘাত বা এ জন্য সেসব শিক্ষাঙ্গন বন্ধ করে দেয়া অথবা বছরকে বছর ধরে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা পরিবেশ বিনষ্ট থাকার কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা শোনা যায় না, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই অবস্থা কেন? ডিশ এন্টিনা লাগানো নিয়ে বাকবিতণ্ডা হতে পারে, এ জন্য দ্বন্দ্ব-কলহ হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আবার তাও খোদ্ থানার ওসি-পুলিশ ও কলেজ অধ্যক্ষের সম্মুখের ঘটনা! এমনকি পরক্ষণে গ্রেফতারকৃত একজন সশস্ত্র ছাত্রকে তার দলীয় ক্যাডারদের সাহায্যে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া-এসব দেখে বুঝার উপায় নেই যে, দেশে কোনো সরকারি প্রশাসন আছে বা থাকলেও খুনী-হত্যাকারীদের দমন তাদের দ্বারা সম্ভব। বরং ঘটনা প্রবাহ উল্টো এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, এখানকার প্রশাসন খুনীদের দমন নয় বরং লালনের নীতিই অনুসরণ করে চলেছে। এই অবস্থায় কি প্রতীয়মান হয় না যে, বর্তমান রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের দ্বারা কেবল দেশের শিক্ষাঙ্গনকেই সন্ত্রাসমুক্ত করা অসম্ভব নয়, সমাজ অঙ্গনের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকেও সন্ত্রাস নির্মূল তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। বিশেষ করে এ প্রশাসন আমলে স্বাধীনতার অকৃত্রিম দরদী ছাত্র সংগঠনসমূহ এবং ইসলামী ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে এর যেই অন্যায় দমন নীতি ও হত্যা নির্যাতন, মামলা-হামলা

www.pathagar.com

চালানো হচ্ছে, তাতে তো স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এসব ঘটনার পেছনে মূলত বাংলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতাপ্রিয় দলগুলোকে দমন করার নীতিই অনুসৃত হয়েছে, যাতে এ দেশের স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখ খোলার মতো কেউ না থাকে। সার্বিক ঘটনাবলীকে এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেশবাসীর আজ চিন্তা করার সময় এসেছে বলে আমরা মনে করি। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র হত্যার রাজনীতির স্থায়ী অবসানকল্পে গোটা জাতির আজ ভিন্নভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে বলে আমাদের মনে হয়।

মোটকথা, কোনো দল বিশেষের খামখেয়ালি বা রাজনৈতিক স্বার্থদুষ্ট দর্শনের ভিত্তিতে সকল কিছুকে দলীয়করণের ভ্রান্তনীতির বলিতে পরিণত হয়ে মহসিন হোক কি সৌমিত্র কোনো ছাত্রের মায়ের কোলই খালি না হোক এবং দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহ সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে শিক্ষা পরিবেশ ফিরে আসুক এটাই সকলের কাম্য।

মৃত্যুর অমোঘ বিধানের কাছে একদিন সকলকেই ধরা দিতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো কোনো মৃত্যু উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের দিক থেকে মৃত ব্যক্তিকে মহত্ত্বের উত্তুঙ্গ চূড়ায় সমাসীন করে। বিশেষ করে মহসিনের শাদাতকে আমরা সে ধরনের একটি মৃত্যু বলেই মনে করি, যার একাধিক নামাযে-জানাযাতে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতি এবং তার জন্য তাদের কান্নায় ভেঙ্গে পড়া—এ কথাই প্রমাণ করে। এই হত্যাকাণ্ডে আমরা গভীর শোকাহত হওয়া সত্ত্বেও এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শহীদ মহসিনের পিতা-মাতা, আপনজনদেরকে অন্তত আমরা এই সান্ত্বনা দিতে পারি যে, তাদের প্রিয় মহসিনের মৃত্যু অপর দশটি মৃত্যুর মতো নয়। তবুও আমরা মহান আল্লাহর নিকট তাদের ধৈর্য ধারণের তাওফিক দান করার দোয়া করছি, শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সহানুভূতি। এ সাথে এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী এবং নিমিত্ত সৃষ্টিকারী সকলের উপযুক্ত বিচার ও শাস্তি আমরা কামনা করি।

কুকুর বাহিনী প্রসঙ্গ

[প্রকাশ ঃ ২২. ২. '২০০১]

সরকার অপরাধীদের চিহ্নিত করার জন্য বৃটেন থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাঁচটি দক্ষ কুকুর এবং সংশ্লিষ্ট কুকুরের ২০টি বাচ্চা আমদানি করছে বলে জানা যায়। এ কুকুর বাহিনী পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের জন্য একজন দক্ষ বৃটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তাসহ পাঁচজন প্রশিক্ষক বাংলাদেশে আসবেন। তারা কুকুর বাহিনীর কাজকর্ম এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের বিস্তারিতভাবে অবহিত করবেন। হত্যাসহ বড় ধরনের জটিল অপরাধীদের দ্রুত সনাক্ত করে গোয়েন্দা পুলিশের তদন্তে সহায়তা করার জন্য সরকার কর্তৃক এ ডগ স্কোয়াড আমদানি করা হচ্ছে। প্রকল্পটিতে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে প্রকাশ। আমদানিকৃত কুকুরগুলো আসন্ন মে মাসেই ঢাকায় এসে পৌঁছবে বলে জানা যায়। পুলিশের

www.pathagar.com

অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল আরও জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বাহিনীতে দু'ধরনের কুকুর থাকবে। এক ধরনের কুকুর কেবলমাত্র পদচিহ্ন বা এরূপ কোনো সূত্র ধরেই অপরাধীকে দ্রুত সনাক্তকরণ কাজে সহায়তা করবে আর অপর ধরনের কুকুরের কাজ হবে ঘ্রাণ থেকে সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে খুঁজে বের করা।

সমাজকে অপরাধমুক্ত রেখে সমাজে শান্তি-সুখ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অপরাধীদের খুঁজে বের করা এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দান একান্ত জরুরি। এ কাজে কারও দ্বিমতের অবকাশ থাকার কথা নয়। বিশেষ করে কোনো দেশে যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় অপরাধ সংঘটিত হয় এবং অপরাধ দমন বিভাগের সদস্যরা শত চেষ্টা করেও কিছুতেই অপরাধের সূত্র বের করতে ব্যর্থ হয়, সেই সমাজে তো অপরাধীদের সনাক্ত করার জন্য এহেন বিশেষ প্রক্রিয়ার আমদানি অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু যেই দেশে অপরাধী চিহ্নিতকরণ কিংবা অপরাধীদের ধরাটা সমস্যা নয়-প্রধান সমস্যা হচ্ছে অপরাধীদের বিচার পর্যন্ত আটক রাখা কিংবা তাদেরকে বিচারের কাঠগড়া পর্যন্ত পৌঁছিয়ে অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি বিধান নিশ্চিত করা, সেদেশে ব্যয়বহুল এই কুকুর প্রকল্প স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের সৃষ্টি না করে পারে না। বিশেষ করে বিদেশ থেকে কোনো কিছুর আমদানির পেছনে বিভিন্ন সময় লক্ষ্যের চাইতে নানান উপলক্ষের বিভিন্ন অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয়িত অর্থ সম্পূর্ণ অকাজে বা নামেমাত্র ব্যয়িত হবার অতীত তিক্ত অভিজ্ঞতা কারও স্মৃতিকে এদিকে নিয়ে গেলে তাকে কিছুতেই দোষ দেয়া যায় না। আমাদের দেশে অপরাধী চিহ্নিত করণে যেমন আমাদের পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনীর দক্ষতা স্বীকৃত, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই দক্ষতা বিস্ময়করও, সে ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থাধীন পুলিশ বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারকৃত অপরাধীদের বিচার পর্যন্ত আটকে রাখতে কি কি বাধা এবং তাদের অপরাধের দ্রুত বিচার ও শাস্তি দানের পথে কি কি অন্তরায়, সেসব নিয়েই কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠাসহকারে বেশি ভাবা দরকার ছিল। কিন্তু সেসব অতীব জরুরি বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না দিয়ে যেটি এই মুহূর্তে প্রায় অপ্রয়োজন, সেই ব্যয়বহুল দিকটিকে অধিক প্রাধান্য দানের তাৎপর্য আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। আমাদের দেশে অপরাধী তো ধরা পড়ছেই, অপরাধীরা কোন্ তরকারি দিয়ে ভাত খায় তাও পুলিশ জানে। অপরাধীদের কারা অর্থ দিয়ে অস্ত্র দিয়ে প্রভাব দিয়ে নানানভাবে লালন করে, সেটাও সকলের কাছে স্পষ্ট। এমতাবস্থায়ও অপরাধীরা ছাড় পেয়ে যায়, বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় তারা অপরাধ করে দিবালোকে সমাজে বুক ফুলিয়ে চলে অথচ তাদের দমন ও শাস্তি দানের তেমন উদ্যোগ নেই। অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোগ গৃহীত হলেও তা হয় পক্ষপাতদুষ্ট, বরং তাদেরকে সমাজের প্রভাবশালী মহলের কেউ কেউ যে নিজেদের বিভিন্ন হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে সেটাও প্রায় সকলের পরিজ্ঞাত। অপরাধী দমনে এসব বাধা দূর হলে এমনিতেই সমাজ অপরাধমুক্ত হতে বাধ্য। তা না হওয়াতে এবং যুব সমাজকে প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে নানানভাবে বেশি পরিমাণে অপরাধমূলক নাটক ও ছায়াছবি দেখানোর কারণেই অপরাধ প্রবণতার দৌরাত্ম্য সমাজে অধিক। পরন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা ও গণমাধ্যমগুলোতে যেই নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং

www.pathagar.com

মূল্যবোধ নাগরিকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনে বিরাট সহায়ক, আজকাল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সেগুলোকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে— ঐসবের ধারক-বাহক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে সমাজের সামনে খাটো করা হচ্ছে। ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী চক্রের ষড়যন্ত্রে পরিকল্পিতভাবে এসব বিষয়ের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে এবং তা দূরীকরণে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে অপরাধ প্রবণতা সমাজে হ্রাস পেতো। তেমনি অপরাধীরাও সামাজিক প্রতিরোধ ও নানানভাবে এমনিতেই কোনঠাসা হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত থাকতো। অপরাধীদের শাস্তির একটি দিক হলো, জেলে আটক রাখা, যেখানে তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়া উচতি ছিল কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায় সাধারণ অপরাধীও সেখান থেকে অসাধারণ অপরাধী হয়ে বের হয়ে আসে। সুতরাং আমরা মনে করি, অপরাধীদের চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থাটিকে কর্তৃপক্ষ যে পরিমাণ অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, চিহ্নিত অপরাধীদের শাস্তিদান এবং সমাজে নতুন অপরাধী সৃষ্টির ছিদ্র পথসমূহ বন্ধকরনেও তাদের নিষ্ঠা সহকারে এগিয়ে আসা কর্তব্য। অন্যথায় অপরাধীদের চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ঘটা করে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বাহিনী আমদানি ও এই প্রকল্প খাতে অর্থ ব্যয় একটি বিলাসিতা ও অর্থহীন ঘটনারূপেই চিহ্নিত হবে।

ইসলাম ও মধ্যপন্থা নীতি

[প্রকাশ ঃ ২৮. ১১. '২০০৪]

বস্তু উপাদান তৈরি মানুষের স্বাভাবিক ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের জন্যে বস্তুগত উপকরণ অপরিহার্য, তাতে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। কেউ তাতে দ্বিমত পোষণ করে অন্যভাবে জীবন পরিচালনা করতে চাইলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাকে ও অধীনস্থদের ভোগ করতেই হয়। এ কারণেই ইসলাম সংসারবিরাগী অস্বাভাবিক জীবন অবলম্বনের বিরোধী। খ্রিস্টীয় যুগে কিছু খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতা এরূপ চিন্তায় আবেগাপ্লুত হয়ে একবার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তারা স্রষ্টার প্রেমে সর্বক্ষণ নিজেদের নিমগ্ন রাখতে সাংসারিক সকল কর্মকাণ্ডের ঝামেলা মুক্ত থাকতে চান এবং তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় দিবারাত্র নিয়োজিত থাকবেন। এই লক্ষ্যে তারা লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়চূড়ায় গিয়ে আস্তানা স্থাপন করলেন। কিন্তু আল্লাহ্ সেটা পছন্দ করলেন না। কারণ, তিনি চান পরিবার ও সমাজের আরও দশজনের সাথে মিলেমিশে থেকে ওসব ধর্মীয় নেতা নিজেরা আল্লাহর বিধান মেনে চলুক এবং নানা প্রতিকূল অনুকূল অবস্থার মধ্যে আল্লাহর বিধান প্রচার করুক। তেমনি, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তার বিধানের অনুশীলন দ্বারা তারা মানুষের চিন্তা-কর্ম ও আত্মাকেও পরিশুদ্ধ করার কাজ করুক। এভাবে আল্লাহর ইচ্ছা ও নীতি-আদর্শের অনুসরণ দ্বারা নিজের ও সমাজের অন্যদের সার্বিক মুক্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক।

www.pathagar.com

দ্বীন ও দুনিয়ার ভারসাম্যপূর্ণ এ জীবনবোধই মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের শান্তি নিশ্চিত করতে পারে। কেননা, মানব সত্তা যে দুটি বস্তু দ্বারা গঠিত-অর্থাৎ জড় দেহ ও আত্মা, মূলতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গির জীবনবোধের দ্বারাই উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকতে পারে। কিন্তু চলমান বিশ্বে পারলৌকিক জীবনে আপন এই বৈষয়িক জীবনের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতার অনুভূতিশূন্য নিছক পশ্চিমা ভোগবাদী ও জড়বাদী জীবনবোধের অভ্যুদয় ঘটায় বিশ্ব মানবসমাজে আজ চরম বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। মানবতার সেই চরম অপমান ও সামাজিক মূল্যবোধের এই বিপর্যয় গোটা মানব গোষ্ঠীকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে ঘেরাও করে আসছে। বিশ্ব বিবেক যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ন্যায় ও সত্যের স্বপক্ষে সৎসাহসজনিত প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর হয়ে যাচ্ছে যেন স্তব্ধ। বলাবাহুল্য, আফগানিস্তান ও ইরাকের যুদ্ধও সেখানে মানবাধিকারের দুর্গতিই তার বড় প্রমাণ।

কারণ, পশ্চিমের ভোগবাদী জীবন দর্শন মানুষের বাহ্যিক বস্তুগত দিকের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ দেখালেও তাতে আত্মিক উন্নতি ও পরিশুদ্ধির কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ মানুষের আত্মাই তার বাইরের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে ও তাকে ভারসাম্য রাখে। তা না থাকাতে পৃথিবীতে এই বিপর্যয় কর অবস্থা ঠিক এমন এক বিশ্বপরিস্থিতি ও মানবতার দুর্দিনে বিশ্ব মানবসমাজের সামনে মুক্তি ও কল্যাণের বারতা নিয়ে উপস্থিত হবার যোগ্যতা একমাত্র ইসলামী জীবনবোধেই রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের নির্যাতিত ও ভুক্তভোগী মানুষেরা যাতে মানবতাবিরোধী দানবীয় নেতৃত্বের সেই কঠোর বন্ধন থেকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হতে না পারে, তাই ভোগবাদী ঐ শক্তি মানবতার মুক্তির একক পথ ইসলাম থেকে বিশ্ব মানবসমাজকে ফিরিয়ে রাখার এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদে নিজেদের মানবতাবিরোধী কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব শৃঙ্খলে সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোকে আবদ্ধ করার লক্ষ্যে অজুহাত হিসাবে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের কুৎসা রটনার পথকেই বেছে নিয়েছে। তারা ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন, ও সে গুলোর নেতৃত্বকে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করণের জন্যে মিডিয়ার সাহায্যে অসত্য প্রচারণার মহা অভিযান চালাচ্ছে। কারণ , তারা মনে করে, তাদের ভোগবাদী জীবন-দর্শন ভিত্তিক সমৃদ্ধি পৃথিবীতে বাহ্যিক জৌলুস সৃষ্টিতে সফলকাম হলেও, মানবসত্তার অপর উপাদান আত্মার উন্নতি বিধানে তাদের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে তাদের ভোগবাদী সভ্যতার বিশাল প্রাসাদ অচিরেই ধ্বসে পড়বে আর দুনিয়াবাসী যথার্থ উন্নতি শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির গ্যারান্টিদাতা দেহ-আত্মার উন্নতিমূলক দর্শন ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়বে। তখন বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক সকল নেতৃত্বই মুসলিম উম্মাহর হাতে চলে যাবে। এই আশংকা থেকেই তারা শান্তি ও ন্যায়বিচারকামী বিশ্ববাসীকে বুঝাবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে যে, ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম আর মুসলমানরা হচ্ছে সন্ত্রাসী।

www.pathagar.com

এ জন্যে তারা যে শুধু নিজেদের বিভিন্ন শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমকেই কাজে লাগাচ্ছে তা নয়, প্রত্যেক মুসলিম দেশে নানাভাবে প্রভাব বিস্তারসহ সেখানকার মুসলিম নামের বহু তল্পীবাহক ও চাটুকার শাসকও নিয়োগ করেছে। এদের অনেকে স্বার্থান্ধ ও ক্ষমতার লোভে তাদের স্বার্থেই কাজ করছে এবং ইতোমধ্যেই মুসলমানদের সামনে তারা চিহ্নিতও হয়েছে।

ইসলাম ও নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুর্নাম ছড়িয়ে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র হিসাবেই নিজেরা উসামা বিন লাদেন, আল-কায়েদা, জঙ্গী ইসলামী গ্রুপ ইত্যাদি তৈরি করেছে আর ইতোমধ্যে সংঘটিত টুইন টাওয়ার ইত্যাদি ঘটনার সূত্র ধরে ঐ জন্যে এদের দায়ী করে আফগানিস্তান, ইরাকসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ ধ্বংস করেছে। সেখানকার প্রাণ ও সম্পদের বিপুল ক্ষতি সাধন করা হয়েছে ও হচ্ছে।

ঠিক একই লক্ষ্যে বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতে বিভিন্ন ইসলামী নামের কিছু সংগঠনকেও এমন কাজ করতে দেখা যাচ্ছে, যাতে ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তি ও ভোগবাদী সভ্যতার ধ্বজাধারীদেরই তাতে মতলব হাসিল হয়। নতুন গজানো ওসব ইসলামী সংগঠন দ্বারা এমন সব অযৌক্তিক ধর্মীয় কথা পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে বলানো হচ্ছে কিংবা এমন কিছু কাজ করানো হচ্ছে, যেগুলোর সাথে ইসলামী জীবন ও মূল্যবোধের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ বরং সাংঘটিক। তাদের এসব কাজে সাময়িকভাবে কেউ উৎফুল্ল হলেও মূলতঃ ঐ কাজগুলোর সাথে ইসলামী মূল্যবোধ, আল্লাহর বিধান ও নবী জীবনের আদর্শের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং সেসব কাজকে দুশমনরা ইসলামী লোকদের সন্ত্রাসী তৎপরতা হিসাবে দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, এখানেও সন্ত্রাসী আল-কায়েদা, উসামাপন্থী ও জঙ্গিবাদী ইসলামী লোক রয়েছে। সুতরাং তা দমনের জন্যে এখানেও ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার। বলাবাহুল্য, জনৈক উর্দু কবির উক্তি অনুযায়ী [দুশমন লাখো বুরা চাহে তু কে হ্যায়, ওহী হোতা হ্যায়, জু মনজূরে খোদা হোতা হ্যায়।] সম্ভবত এ কারণেই আজ দিবালোকের মতো এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইরাকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ছিল, মিথ্যা।

সুতরাং অনুরূপ কোনো মিথ্যা ষড়যন্ত্রের নিমিত্ত এদেশেও সৃষ্টির যাতে কেউ সুযোগ না পায়,-ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে এমন কোনো ষড়যন্ত্র যেন এখানে কেউ করতে না পারে, দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

ইসলাম একটি মধ্যপন্থার খোদায়ী জীবন ব্যবস্থা, যা খোদ আল্লাহই ঘোষণা করে বলেছেন, মুসলিমরা হচ্ছে "উম্মাতান ওসাতান" মধ্যপন্থী জাতি। আর তাদের প্রতি নির্দেশ হলো, "উম্মতে মুহাম্মদীকে পাঠানো হয়েছে গোটা মানব গোষ্ঠীর কল্যাণে।" তোমরা "খায়রা উম্মাত" তথা উত্তম জাতি। তোমাদের নবী "রাহমাতুল্লিল আলামীন"– "গোটা বিশ্বজাহানের জন্যে রহমতের মূর্ত প্রতীক।" তোমরা মানুষকে তোমাদের প্রভুর পথে ডাকবে, সদোপদেশ ও সদাচরণ দ্বারা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিগ্রাহ্য পন্থায়। তোমাদের জন্যে এ ব্যাপারে তোমাদের নবীই "উসওয়াতুন হাসানা" সর্বোত্তম আদর্শ।

www.pathagar.com

তিনি অত্যাচারিত হয়েও জালিমদের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন নিজের জাতশত্রুদের প্রতি দয়া ও উদারতার যেই অতুলনীয় আদর্শ দেখিয়েছেন, তা লক্ষণীয়। সুতরাং যারা অন্যায় করে, তাদের অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে নিরপরাধ মানুষ হত্যা ও তাদের সম্পদ বিনষ্ট না করার সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্মরণে রেখে মুসলমানদের কাজ করতে হবে। মহান আল্লাহর দ্বীনের কাজে তাগুতি শক্তি সাময়িকভাবে জয়ী হলেও নৈতিকভাবে তারা পরাজিত। আর তাদের নৈতিক পরাজয়ই একদিন নিজেদের চূড়ান্ত পরাজয় ডেকে আনে। সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এ নীতিই অনেক সময় গ্রহণ করতে হয়। তবুও ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করার যেই সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চলছে, সই ফাদে পা দেয়া কোনো অতি উৎসাহী ইসলাম ওয়ালাদের উচিত নয়।

এই বহুজাতিক পৃথিবীতে ইসলামের অনুসারী মুসলমানরা নিজেদের মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবোধের অধিকারী ও সত্যের আহ্বায়ক হিসেবে কিভাবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির উপর অটল থেকে জীবনযাপন করবে, এ মর্মে কুরআনের এই বাণীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, “তোমরা গায়রুল্লাহর উপাসনাকারীদেরকে গালি দিও না। তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে।” আয়াতটি হলো “লা-তাসুব্বুল্লাযীনা ইয়াবুদূনা মিনদুনিল্লাহ্ ফাইয়া সুব্বুল্লাহা, আদভান বেগায়েরে ইল্‌মিন।”

নিঃসন্দেহে এই আয়াত যেমন ইসলামের আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং বহুজাতিক এই পৃথিবীতে অন্য জাতির কাছে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা প্রচারের বুদ্ধিবৃত্তিক সহনশীলতাপূর্ণ পথের সন্ধান দেয়, তেমনি তাতে ইসলাম প্রচারে কঠোরতা, অসদাচরণ, অমার্জিত-অপ্রীতিকর বক্তব্য পরিহারেরও নির্দেশ দেয়। সুতরাং ইসলামী জীবন বিধান এবং এর দর্শনের মর্মবাণীকে সামনে রেখেই মুসলমানদের কাজ করতে হবে। আল্লাহতায়ালা এজন্যেই নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন, “আমি তোমাকে দারোগা করে পাঠাইনি।” তেমনি বলেছেন, “তুমি ইচ্ছা করলেই কাউকে হেদায়েতের পথে আনতে পারবে না।” “তাদেরকেই হেদায়াত করো যে হেদায়েতের দিকে আসতে আগ্রহী।” অবশ্য মুসলমানদের ব্যাপারে ইসলামী অনুশাসন মানার প্রশ্নে ব্যাপারটি এমন, যেমন সেনাবাহিনীতে কেউ নাম লেখাবার পর, সেই বাহিনীর নিয়ম লঙ্ঘনকারী সেনাসদস্যকে কোর্ট মার্শালের সম্মুখীন হতে হয়। এজন্যে ইসলাম গ্রহণ করা কিংবা না করার এই অধিকার মুসলমানদের জন্যে নয়— বাইরের লোকদের জন্যে। সেদিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ বলেছেন, “ইসলামে কোনো জবরদস্তি নেই।”

অতএব, এজন্যে মহানবীর আদর্শ বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কোনো সময় অত্যাচারিত হওয়া কিংবা নৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে দুশমনকে পরাজিত করার নীতিও অবলম্বন করতে হয়।

www.pathagar.com

রমযানের পবিত্রতা রক্ষায় সরকারি ভূমিকায় বৈপরীত্য প্রসঙ্গে

[প্রকাশ ঃ ২২. ২. '২০০১]

মানব জীবনকে সুখী সুন্দর ও পরিশীলিত চরিত্রের অধিকারী মহাস্রষ্টা অভিসারী সত্তারূপে গড়ে তোলাই ইসলামী জীবনবোধ ও এর সকল নিয়ম-বিধির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে মানুষ সাফল্যের অধিকারী হোক এটাই মহান আল্লাহর অভিপ্রায়। মানুষ নিষ্ঠা সহকারে এই লক্ষ্যাভিসারী হলে নিজের অলক্ষ্যেই তার চারিত্রিক পরিশুদ্ধি ঘটে। তখন তার বস্তুজীবন যেমন সুখ-সমৃদ্ধিময় হবার পথে আর কোনো বাধা থাকে না, তেমনি পারলৌকিক জীবনের দুঃখ-কষ্টের কারণগুলোও তার থেকে দূরীভূত হতে থাকে। কিন্তু এজন্যে শর্ত হলো মানুষের ব্যক্তিচরিত্রের উন্নতির সাথে সাথে তার সামষ্টিক জীবনকেও একই লক্ষ্যাভিসারী করে তোলা। এ জন্যে ইসলাম উক্ত সুমহান লক্ষ্যে ব্যক্তিগত জীবনকে সংশোধন করার প্রক্রিয়া হিসেবে তার চিত্তবৃত্তিকে উন্নত করার যেমন খোদায়ী প্রক্রিয়া বাৎলে দিয়েছেন, তেমিন এই প্রক্রিয়ার অনুসারীদের সামষ্টিক জীবনকেও একই লক্ষ্যাভিসারী করে তোলার জন্যে ব্যক্তির উপর অনেকগুলো করণীয় অপরিহার্য করেছেন। পবিত্র মাহে রমযানে বছরের দীর্ঘ এগার মাসের ইবাদাতসমূহের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ইবাদাত সার্বিক কৃচ্ছ্র সাধনা মূলতঃ মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনকে সফল করে তাকে মহাপ্রভু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

তাই রমযানের সিয়াম সাধনা বা রোযা পালন মূলত মানবজীবনের মূল লক্ষ্যে পৌছার পথে বৃহত্তর সমাজ জীবনের আঁকেবাকের যাবতীয় বাধা অতিক্রমের একটি পরীক্ষামূলক প্রশিক্ষণ। অন্যকথায় এটি চিত্তবৃত্তির ষড় রিপুজনিত অসৎ প্রবণতার সাথে লড়াই করে দেহসত্তার সৎবৃত্তিগুলোকে জয়ী করে তোলার এক মস্তবড় পরীক্ষামূলক সংগ্রাম বা যুদ্ধ। মানব সত্তার যাবতীয় চিন্তা-প্রবণতা ও কর্মকাণ্ডের মূল উৎসকেন্দ্র কলব বা আত্মার পরিশুদ্ধির প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে এ মাসের গোটা কর্মসূচি যারা বাস্তবায়িত করলো, তারা মূলতঃ ভবিষ্যৎ এগার মাসের দৈনন্দিন জীবনের বৃহত্তর পরীক্ষাকেন্দ্রের সকল ক্ষেত্রের সকল জটিল পরীক্ষার জন্যে নির্বাচিত বলে বিবেচিত হলো। বিচিত্র কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতময় কাজে যারা ইসলামের উদারতা টিকে থাকার দিক থেকে এ মাসের প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে এই বড় পরীক্ষার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো, তারাই মূলতঃ সফলকাম হলো এবং মুত্তাকীর তালিকাভুক্ত হলেন। যাদের জন্য জান্নাত ও তার সকল অনুপম সুখ-সমৃদ্ধির উপকরণ তৈরি করে রেখেছেন বলে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। সর্বোপরি যাদেরকে সকল মানুষের চির কাঙ্ক্ষিত বিশ্বস্রষ্টার দীদার নসীব হবে বলে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু যেই পরীক্ষার্থী

www.pathagar.com

রমযানের কঠোর অনুশীলন পরীক্ষাতেই ফেল করলো কিংবা এই পরীক্ষায় নির্বাচিত হলেও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজে বড় ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নমালার উত্তরদানে ব্যর্থ হলেন, সর্বত্র অসংযমী হয়ে শয়তান ও নিজের কুপ্রবৃত্তির গোলামি করে আত্মাকে কলুষিত করলেন, তাঁকে কিভাবে সফলকাম বলা যাবে? কি করেই বা মোত্তাকী পদের লকব পেয়ে এই পদাধিকারীরা খোদায়ী সম্মানে ভূষিত হবেন, এটিই সকল রোযাদারের আত্মজিজ্ঞাসার বিষয়।

বস্তুত আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত সম্ভারে সমৃদ্ধ পৃথিবী গ্রহের অধিবাসী এই মানব জাতি যাবতীয় কলহবিবাদ মুক্ত হয়ে এই সম্পদ সমভাবে ভোগ করুক এবং প্রতি মুহূর্তে কথা, কর্ম, চিন্তা, মনন, সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণ করতে করতে নিজের মধ্যবর্তী এ জীবন অতিবাহিত করে পরকালের অনন্তজীবনের সাফল্য লাভে এগিয়ে যাক, এটাই আল্লাহ চান। মহাপ্রভু কর্তৃক মানবসৃষ্টির এই লক্ষ্য অর্জনের পথে তাঁর সৃষ্ট সম্পদ ও তাঁর থেকে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার প্রতিযোগিতায় মানুষ যাতে তার আসল লক্ষ্য বিস্মৃত না হয়, সে কথা সকলের চিত্তমূলে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যেই সতর্ক স্মারকরূপে এগার মাসের আনুষ্ঠানিক ইবাদাতসমূহ ছাড়াও রমযানের এই ইবাদাত অনুশীলন ব্যবস্থা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নানান কারণে ওহীর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সতর্ক স্মারকরূপী এসব খোদায়ী ইবাদাত ও তার বিধিমালার মূল তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে আমরা পৃথিবীর সম্পদরাজির খোদায়ী ব্যবহার বিধিকে উপেক্ষা করায়, এনিয়ে কাড়াকাড়ি এ সম্পদের ভাগবৈষম্য, শোষণ, বঞ্চনা ও তার প্রতিকারের ঝামেলাতেই নিজেদের জীবন শেষ করছি, অথচ শান্তির মুখ দেখতে পারছি না। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় যেমন প্রতিটি মানুষকে মুত্তাকী, সংযমী ও খোদায়ী নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে সকলকে ব্যক্তিগত ও মানসিকভাবে সক্রিয় হতে হবে, তেমনি গোটা সমাজকে মুত্তাকী সমাজে পরিণত করার সংগ্রামকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈষয়িক সকল দিক থেকে জোরদার করতে হবে। এছাড়া যে নিজেকে যত কিছুই ভাবি না কেন আল্লাহর নির্দেশিত এই পথ পরিহার করে না আমাদের পক্ষে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে বৈষয়িক সমস্যাবলির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে, না আমরা নিজেদের জীবনের শেষ পরিণতিকে সুখী ও আনন্দময় করনে সফলকাম হবো।

স্মর্তব্য যে, মাহে রমযানের সিয়াম সাধনার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের দ্বারা যেখানে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক তথা গোটা জাতীয় জীবনকে উন্নত, সুন্দর ও সুখী-সমৃদ্ধ করার মস্তবড় সুযোগ নিতে পারি, যা জাতীয় তহবিলের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও সম্ভব হচ্ছে না, সেই সুযোগ থেকে আমরা আজ বঞ্চিত। আর এই বঞ্চনার প্রধান কারণ হলো রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃত্ব সকল সময় এই পবিত্র মাসের আগমন লগ্নে মাসটির পবিত্রতা বজায় রাখার জন্যে গোটা জাতির প্রতি আহ্বান জানালেও কার্যতঃ সেই আহ্বান অনুসারে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনার কোনো

www.pathagar.com

বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয় না। বরং অনেক সময় সরকারি অনুসৃত নীতি রাষ্ট্রীয় শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের এই উপলক্ষে প্রচারিত আহ্বানের পরিপন্থী হতেও দেখা যায়। ফলে প্রতবিছরই আমাদের মাঝে মাহে রমযানের মতো-জাতীয় জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতার অধিকারী মাসটি আসে আবার তা চলেও যায় কিন্তু আমরা সামষ্টিক জীবনে এর কোনো সুফল ভোগ করতে পারি না। আমাদের চরিত্র রমযানের পূর্বে যেমনটি থাকে রজযানের পরেও একই চরিত্রই বহাল থেকে যায়। এভাবেই চলছে আমাদের সমাজে রমযানের আগমন-নির্গমনের অবস্থা। এই অবস্থার পরিবর্তন যেমন জরুরি তেমনি এজন্যে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণও আবশ্যক। কারণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ যুগে মানব সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের এই পর্যায়ে মানুষের জীবনকে যেসব অবাঞ্ছিত বিষয় বিকল করে রেখেছে, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও যেই বৈকল্য দূরীভূত করা সম্ভব হচ্ছে না। রমযানের সিয়াম সাধনা দ্বারা যদি সেই বৈকল্যের উৎসকে ধ্বংস করা যায়, আমরা কেন তা করবো না? এখন প্রশ্ন হলো, এ পথের প্রধান বাধা যেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব-নেতৃত্বের এক ধরনের মানসিকতা, সেই মানসিকতা দূরীকরণের উপায় কি? কারণ দেশের তাওহীদবাদী কোটি কোটি জনতা সিয়ামের তাৎপর্যে গোটা সমাজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট ও আকাঙ্ক্ষী হলেও ঐ মানসিকতার দরুনই তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপ লাভ করতে পারছে না। দেশের শাসন, প্রশাসন, প্রচার মাধ্যম, শিক্ষার মাধ্যম সকল কিছুই ঐ মানসিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই অবস্থার নগ্নরূপ আমরা সারা বছর নানাভাবে প্রত্যক্ষ করলেও রমযান মাসেও যে এ দেশের কোটি কোটি রোজাদারকে তা দেখতে হবে, এটা কেউ ভাবেনি। যেমন এবার অস্বাভাবিক শৈত্যপ্রবাহের দরুন জনগণের কষ্টের এবং দুস্থ-মানবতার কল্যাণের অজুহাত দেখিয়ে ব্যয় সংকোচনের লক্ষ্যে সর্বপ্রথমই এ মাসের চিরন্তন ইসলামী কালচার সরকারি ইফতার মাহফিলের উপর নিষেধাজ্ঞার খড়গ নেমে আসে। অথচ ঐ খাতে দুস্থ মানবতার সাহায্যার্থে সরকারি আরও বহু অর্থখাত ছিল। সেসব খাত থেকে অনায়াসেই তা সম্পন্ন করা যেতে পারতো। সরকারি বিভিন্ন খাত থেকে আমোদ-প্রমোদ চিত্তবিনোদন ও সফর ইত্যাদি ক্ষেত্রে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হয়ে থাকে। সে সময় এরূপ ব্যয় সংকোচনের প্রশ্ন উঠতে দেখা যায় না। বরং ঐসব খাতের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিই জাতি শুনে থাকে। এ কারণেই সরকারি ইফতার মাহফিলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবার সাথে সাথেই সরকারি এই মানসিকতার বৈপরীত্য ও যেই কারণ দর্শিয়ে তা করা হয়েছে, তার স্বরূপ উন্মোচিত করে চতুর্দিক থেকে এর তীব্র সমালোচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ দ্বারা রাজনৈতিক সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা হতে পারে। তাতে আসল কাজ কিছুই হবার নয়। বরং এ দ্বারা আঙ্গুলে গোনা সে সকল মনোভাবের লোকদেরকেই খুশি করা হয়েছে, যারা এদেশ ও সমাজ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী কালচারকে চিরতরে উৎখাত করতে চায়। যারা চায় এ দেশের মানুষের ইসলামী পরিচিতিকে মিটিয়ে দিয়ে এই জাতিসত্তাকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির সাথে একাকার করে দিয়ে আমাদের প্রিয় স্বাধীনতাকে পর্যন্ত খতম করে

www.pathagar.com

দিতে। বলার অপেক্ষা রাখে না, যাদের অশুভ চক্রান্তে কর্তৃপক্ষ সরকারি পর্যায়ে সামষ্টিক ইফতার মাহফিলের অনুষ্ঠান বাতিল করলেন, এভাবে সরকারি পর্যায়ে তাদের মতামত অগ্রাধিকার পেতে থাকলে, এক সময় তারা কুরবাণীর ন্যায় আরেক ব্যয়বহুল অথচ অপরিসীম আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে বিমণ্ডিত ইবাদাত অনুষ্ঠানটি নিষিদ্ধ করার জন্যেও সুকৌশলে সরকারের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা অসম্ভব কিছু নয়। এমনিভাবে এক সময় মসজিদ, মাদ্রাসাবহুল এ দেশে এগুলোর সংখ্যা হ্রাস ইসলামী শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানে মাসব্যাপী সীরাত মাহফিল ও ইসলামী প্রকাশনা খাতে অর্থ হ্রাসের প্রস্তাব আসাও বিচিত্র কিছু নয়।

সরকারি পর্যায়ে একদিকে রমযানের পবিত্রতা রক্ষা, অপরদিকে টিভি, চলচ্চিত্রে ও পত্রপত্রিকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রচার বাহনে এই পবিত্রতা বিরোধী কার্যকলাপের ছড়াছড়িতে সরকারি অনুসৃত নীতি ছাড়াও সবচাইতে এবার দেশের কোটি কোটি রোজাদারকে যেই বিষয়টি অধিক পরিমাণে আহত করেছে, সেটি হলো এই পবিত্র মাসের তাৎপর্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে এ মাসে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ও কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগতিমূলক খেলা। এ দেশের ধর্মানুসারী ও ধর্মীয় ব্যাপারে শিথিল সকল শ্রেণীর মুসলমানই কমবেশি ক্রীড়ামোদী। ফুটবল বিশেষ করে ক্রিকেট খেলা আসলে তো সময় ক্ষেপণে অধিকাংশ মানুষই অস্থির হয়ে ওঠে। তাতে ছাত্র, কর্মজীবী, সকল শ্রেণীর মানুষেরই কি পরিমাণ রিডিং আওয়ার, ওয়ার্কিং আওয়ার ও রেস্ট আওয়ার বিনষ্ট হয়, অনুন্নত দেশেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার কারও সময় থাকে না। এবারকার ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে কত রেগুলার নামাযী ও রোজাদারের নামায, তারাবীহর জামায়াত, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদাত যে নষ্ট হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। খেলাটি রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ঢাকা স্টেডিয়ামে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের অতি নিকটে অনুষ্ঠিত হওয়ায় মসজিদের নামাযীদের ইবাদাতে বিরাট ব্যাঘাত ঘটার অভিযোগ শোনা গেছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক ব্যয়ের ছড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত এই খেলাটির আয়োজন কি পবিত্র মাসের পর কোনো এক সময় করা যেতে পারতো না? এর ফলে সরকারি পর্যায়ে মাহে রমযানের পবিত্রতা বিরোধী কাজ আর কি হতে পারে, যেখানে এই পবিত্রতা রক্ষার আহ্বানকারী সরকারি শীর্ষপর্যায়ের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র মাসের পবিত্রতা বিরোধী এ কাজ এবং এই উপলক্ষে যেসব নামাযী, রোজাদারের ইবাদাতের ক্ষতিসাধিত হলো, এ জন্যে মহান আল্লাহ যদি সে সকল ব্যক্তিকেই দায়ী করে বসেন, যারা এর নিমিত্ত, তাহলে এ জন্যে তাদের কাছে এর কোনো জবাব আছে কি?

সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা যাই হোক, অন্তত ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব-নেতৃত্বের নিছক আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে কিছু করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। পরিশেষে, এ মর্মে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের দৃষ্টি আরও আকর্ষণ করতে চাই যে,

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ প্রতি বছর পবিত্র রমযান মাসে আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনে সৎ মানুষ, সৎ নাগরিক ও সৎ সমাজ গঠনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের যেই সুযোগ এনে দেন, রাষ্ট্রীয় অনুসৃত নীতিকে তার অনুকূলে কাজে লাগাবার জন্যে সচেষ্ট হওয়া তাদের একটি মস্তবড় জাতীয় ও ধর্মীয় কর্তব্য। এই কর্তব্যে অবহেলা আমাদের ইহ ও পারলৌকিক উভয় দিকেরই সর্বনাশ ডেকে আনছে। জাতীয় চরিত্রকে সংশোধনে রাষ্ট্রীয় তহবিলের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে যেই কাজ সম্ভব হয় না, সিয়ামের মাসে সরকারি গুরুত্ব সহকারে সৎ মানুষ, সৎ নাগরিক সৃষ্টির এই মহান সুযোগটি অর্থবহভাবে কাজে লাগুক এবং যাবতীয় আনুষ্ঠানিক ও কৃত্রিমতার স্পর্শ থেকে এটি মুক্ত থাকুক, এটাই দেশবাসীর একমাত্র প্রত্যাশা।

অপরাধ প্রবণতা দূরি করণে এর শিকড়ে যেতে হবে

[প্রকাশ ঃ ১০. ৪. '৯৮]

সারা দেশের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হচ্ছে রাজধানী ঢাকা। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীসহ রাষ্ট্রীয় সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা বিধানের যাবতীয় শক্তির উৎস এখানে।

জাতীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগের পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় রাজধানী থেকে। এখানেই সকল নীতিনির্ধারক ও আইনের নির্বাহী কর্মকর্তাদের অবস্থান। রাজনৈতিক হোক বা অপর কোনো কারণে দেশের রাজধানীতে অপরাধ প্রবণতার বিষদাঁত ভাঙ্গা সম্ভব না হলে, সে দেশের সর্বত্র এর বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। পরিতাপের বিষয় যে, আমরা আজ এই দুঃসহ অবস্থার শিকার। খোদ্ রাজধানীতেই চলছে অপরাধ প্রবণদের বেপরোয়া উল্লম্ফন। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র গুলিস্তানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদেরই নাকের ডগার উপর অপরাধপ্রবণ লোকদের হাতে নিরীহ নাগরিকবৃন্দ ও তাদের সহায় সম্পদ যিম্মী হয়ে পড়ে অথচ অপরাধীদের গায়ে আঁচড় লাগে না। তারা গ্রেফতার হয় না। বরং তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ অন্যায় আচরণ দৃষ্টে মনে হয়, তারাই এখন সকল কিছুর হর্তাকর্তা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে তারা কেয়ারই করে না। আর ঐ বাহিনীর সদস্যদের ভাবভঙ্গিও ক্ষেত্র বিশেষে এমন যে, তারা যেন আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী এবং অপরাধ প্রবণদের গায়ে হাত দিতে ভয় পায়। ফলে একদিকে এই বাহিনী অপরদিকে প্রকাশ্য দিবালোকে অপরাধ প্রবণদের সন্ত্রাসী তৎপরতা উভয়ের মধ্যে যেন পারস্পরিক কোনো অঘোষিত সমঝোতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যা প্রত্যক্ষ করে রাজধানীর জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং সদা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। গত ৫ এপ্রিল সোমবার রাজধানীর রমনা, গুলিস্তান এলাকায় দীর্ঘ প্রায় ২ ঘণ্টা যাবত সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব লীলায় একদল সন্ত্রাসী কর্তৃক প্রায় অর্ধশত গাড়ী ভাংচুর করার দুঃসাহস দেখিয়ে তাদের অক্ষত এবং গ্রেফতারহীন থাকা উক্ত

www.pathagar.com

আতঙ্কজনক পরিস্থিতিরই প্রমাণ বহন করে। জানা যায়, একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ গুলিস্তান মুক্তিযোদ্ধা সংসদে গিয়ে মোটা অংকের চাঁদা দাবী করে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নেতৃবৃন্দ চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে চাঁদাবাজরা তাদের উপর অতর্কিত সশস্ত্র হামলা চালায়। হামলাকারীরা ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিসের ক'জনকে মারধোর করে। এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ঈদের বাজারে কেনাকাটা করতে আসা লোকজন ও অন্যান্য পথচারী, প্রাইভেট গাড়ীর মালিক ও সকল শ্রেণীর মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিগবিদিক ছুটে যায়। প্রশ্ন জাগে অপরাধপ্রবণ ও সন্ত্রাসীরা কি করে এই ঔদ্ধত্য দেখাতে সাহস পেল? তাদের মধ্যে কেন আইনের ভয় দেখা গেল না?

এই কেন-এর জবাব খুঁজতে গেলে এ সত্যটিই প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, আসলে অপরাধীরা ভয় পাবার যেসব কারণ থাকে সেসব কারণ এখন তারা দেখতে পাচ্ছে না। প্রথমতঃ যারা অপরাধ দমনের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদেরকে অপরাধমুক্ত থাকতে হয়। অপরাধ দমনে তাদের হতে হয় নিষ্ঠাবান, আপোসহীন ও নিরপেক্ষ। কিন্তু বর্তমানে অপরাধ প্রবণরা দেখছে, যারা অপরাধ দমনের দায়িত্বে নিয়োজিত তারাও একই কাজের সাথে অনেক ক্ষেত্রে জড়িত। নেই তাদের মধ্যে নিরপেক্ষতা। কোথাও অপরাধীদের সাথে থাকে তাদের নিবিড় সম্পর্ক। আবার অপরাধীরা এও দেখে যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী ক্ষমতাসীন দলের কোনো অপরাধীকে ধরলে বিশেষ প্রভাবে সেই অপরাধী ছাড়া পেয়ে যায়। পুলিশ তখন 'ঠুঁটো জগন্নাথ' -এর ভূমিকায় পড়ে। তেমনি অপরাধ প্রবণরা এও লক্ষ্য করে যে, সরকারের কোনো কোনো অঙ্গসংগঠনের কর্মীদের হাতে অবৈধ অস্ত্র থাকলেও একথা বলার কেউ থাকে না যে, তাদের হাতে কারা অস্ত্র তুলে দিয়েছে। অস্ত্র আইনে তারা কেন অভিযুক্ত হয়ে সাজা পায় না।? মোটকথা, আমাদের সমাজের অপরাধ প্রবণরা আজ দিব্যি দেখতে পাচ্ছে, দেশে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তে চলছে অপরাধনির্ভর ও সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতি। চলছে কথায়-কাজে জঘন্য বৈপরীত্য। এমতাবস্থায় সমাজের সুস্থ চিন্তার অনেকের পক্ষে যেমন এই কলুষিত ও বিকৃত পরিবেশে নীতি-নৈতিকতার উপর অটল থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি বিবেকের তাড়নায় কোনো অপরাধীর সৎপথে এসে অপরাধমুক্ত জীবন যাপনের দ্বারও দিনের দিন যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে। কোনো সমাজে অপরাধীদের মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অপরাধবোধ নিয়ে নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে চিন্তা করা, কিংবা অপরাধ থেকে ফিরে আসার জন্যে যেই সামাজিক পরিবেশ বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন, সেই অবস্থা বর্তমানে আদৌ নেই বল্লেই চলে। পরন্তু যেই আইনের ভয় অপরাধ প্রবণদেরকে অপরাধ সংগঠন থেকে বিরত রাখে, সেটাও চলে গেলে অপরাধপ্রবণদেরকে তাদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার আর কি উপায় থাকে? একসময় সম্মিলিত গণপ্রতিরোধ বা সামাজিক বয়কটের দ্বারা অপরাধীদের সমাজে কোণঠাসা করে রাখার ব্যবস্থা ছিল। এখন কোনো গ্রামের সরদার-মাতব্বররা কোনো অপরাধীকে 'সমাজের বার' করে রাখার কথা বললে, তাদের নিজেদের জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে সমাজে বসবাস করাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ফলে সরদার-

www.pathagar.com

মাতব্বরদেরকেও আজ সমাজ বিরোধীদেরকে 'হাতে রেখেই' বিচার-আচার করতে হয়। অর্থাৎ তাদের সরদারী ও মাতব্বরীও আজ দেশের কারও কারও রাজনীতির ন্যায় বহুলাংশেই সন্ত্রাস ও অপরাধনির্ভর। আর এই অবস্থাটিই এখন সমাজের অধিকাংশ শান্তিপ্রিয় মানুষকে এক আতঙ্কজনক অবস্থায় রেখেছে। তারপরও অনেক সময় সমাজের ভুক্তভোগী জনগণ অতীষ্ঠ হয়ে সৎসাহসের পরিচয় দিয়ে সমাজ বিরোধী, অপরাধপ্রবণদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু আইন রক্ষাকারী সংস্থার লোকদেরকে তখন প্রতিবাদী জনতার প্রতি আইনের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। আর সেই সুযোগে প্রতিবাদীদেরকে সমাজ বিরোধীদের হুমকি-ধমকি ও রক্তচক্ষুর মুখে বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। বরং কখনও তাদের সহায়-সম্পদও সেসব দুষ্কৃতকারী লুটেরাদের শিকার হয়ে পড়ে। এমনকি প্রতিবাদকারীদেরকেই নানান মিথ্যা মোকদ্দমার আসামী হয়ে হয়রানি ভোগ করতে হয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক নানান দিক থেকে তাদেরকে হতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত ও কোণঠাসা। এ কারণেই আজ সমাজ বিরোধীদের দমন অভিযানে সরকার জনগণের সহযোগিতা কামনা করলেও এ ব্যাপারে কেউ এগিয়ে আসতে চায় না। এছাড়া দ্বিতীয় যে কারণে অপরাধপ্রবণদের আইনভীতি চলে গেছে, সেটি হলো, কোনো কোনো রাজনৈতিক সংগঠন কর্তৃক তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। কোনো দল ক্ষমতায় আসার জন্য কিংবা ক্ষমতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে শেষ অবলম্বন হিসেবে যখন সমাজ বিরোধীদের হাত করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধপ্রবণদের সাহস বহুগুণ বেড়ে যায়। কারণ, এই শ্রেণীর অপরাধপ্রবণদের নির্দিষ্ট কোনো দল থাকে না। যখন যেই সরকার ক্ষমতায় আসে, তারা কোনো উপায়ে সে দলের সমর্থক সেজে যেমন নিজের অতীত অপকীর্তির শাস্তি থেকে বাঁচতে চায়, তেমনি প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়া পাবার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নতুন উদ্যমে অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক পক্ষকে অন্যায়ভাবে ঘায়েল করার জন্য কোনো কোনো রাজনৈতিক দল সুপরিকল্পিতভাবে এহেন সমাজ বিরোধী লোকদের দলে ভিড়িয়ে আত্মতৃপ্তিও লাভ করে। তাদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার নীতি অনুসরণ করে অপরাধীদের সমাজে টিকিয়ে রাখো এরূপ নেতৃত্বের সমাজ থেকে সন্ত্রাস-অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণের কথা বলা নিছক ভণ্ডামি অথবা অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই হতে পারে না। অথচ আমরা এ ব্যাপারে তাই দেখে আসছি।

সকল সমাজেই কম বেশি অপরাধপ্রবণ লোক থাকে। এ জন্যেই অপরাধ দণ্ডবিধিও প্রত্যেক দেশের আইনে রয়েছে। যেসব কাজে জনগণের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায় সে সকল কাজ থেকে জনগণকে বিরত রাখাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনে যে দেশের সরকার ব্যর্থ হবে, সেখানে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। এ জন্য ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধের প্রসার দানসহ নানানভাবে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা সরকারের কর্তব্য, যেন জনগণ সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজে হচ্ছে তার উল্টো। নানান কারণে

www.pathagar.com

আমাদের সরকারি-বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোর অধিকাংশই কারণে-অকারণে ধর্মীয় মূল্যবোধকে আঘাত হানার নীতি অনুসরণ করে চলেছে। যে সমস্ত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও আচার-অনুষ্ঠান থেকে মানুষ নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা পেত, সেসব ব্যক্তিত্ব ও নিয়ম-রীতিকে ঐ সকল প্রচার মাধ্যম দর্শক-শ্রোতা ও পাঠকদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে চলেছে। অপরদিকে এ সকল প্রচার মাদ্যমে দেশী-বিদেশী চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠানসমূহে কিংবা গল্প উপন্যাস বা কোন সংবাদ ভাষ্যে এমনসব বিষয় দেদার প্রচার করছে, যেগুলো মানুষকে বিশেষ করে যুব-কিশোর চরিত্রকে অপরাধপ্রবণ করে তুলছে। এসব অপসংস্কৃতি ধ্বংস করে দিচ্ছে তাদের সাধারণ নৈতিক চরিত্রকে। সমাজের সর্বত্র নারী-পুরুষ-শিশু সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, মদাসক্ততা ও অশ্লীলতাকে। এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সমাসীন কোনো দল সমাজের নাগরিক চরিত্রকে নিজের অনুসৃত নীতির দ্বারা ধ্বংস করলে, এ জন্যে অবশ্যই তাকে একদিন ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। নিজেরাও শিকার হতে হবে এসবের সুদূরপ্রসারী কুপ্রভাবের । আজ আমাদের সমাজে নারী নির্যাতন এমনকি শিশু নির্যাতনসহ যেসব লজ্জাকর অমানবিক ঘটনা ঘটে চলেছে, এ জন্যে শতকরা ৯০ভাগই দায়ী হচ্ছে প্রচার মাধ্যমসমূহের দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ড।

"শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড"–এ প্রবাদটির যে যুগে সৃষ্টি, সেটি ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রভাবিত শিক্ষার যুগ। তাই দেখা গেছে, যে কোনো শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করলেই এক সময় মানুষের মধ্যে চারিত্রিক পরিবর্তন আসতো। কারণ, শিক্ষা মানবীয় সদগুণাবলীর বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধনের অমোঘ মাধ্যম হিসাবে কাজ করতো। পক্ষান্তরে আজকের ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী শিক্ষা এমনিতেই মানুষকে ব্যক্তিস্বার্থপর করে সৃষ্টি করছে, তদুপরি এর সাথে জড়িত আছে ধর্মীয় মূল্যবোধ বিরোধী চিন্তা-উপকরণ। ফলে এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের সামনে যখনই অপরাধপ্রবণতা কিংবা অশ্লীলতা মিশ্রিত কোনো কিছুর দৃশ্য আসে কিংবা তাকে কেন্দ্র করে কোনো কিছুর আলোচনা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সকলের চিন্তা-চেতনায় এর একটি মস্তবড় কুপ্রভাব পড়ে। তারপরও যদি ধরে নেয়া যায় যে, কথাটি ঠিক নয় ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষায়ও চরিত্রবান নাগরিক গড়ে উঠতে পারে, সেদিক থেকে চিন্তা করলেও আমাদের দেশে এ শিক্ষা বিরোধী মস্তবড় সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চলছে। অন্য দেশের তুলনায় শিক্ষা ও অর্থনীতিতে অনুন্নত এদেশে এমনিতেই শিক্ষার মান অতি নিচে। অধিকন্তু রাজনৈতিক প্রবণতা ও মাত্রাতিরিক্ত খেলাধূলার প্রবণতায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান নেই বললেই চলে। সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এদিকে কারো দৃষ্টি নেই যে, কি করে এ অবস্থার অবসান ঘটানো যায়। বরং দুঃখের সাথে বলতে হয়, টিভিতে যেখানে অতীতে সপ্তাহে একটি নাটক দেখানো হতো এখন প্রায় প্রতিদিন দেশী-বিদেশী ছায়াছবি বা আনন্দ অনুষ্ঠান দেখানো হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানের সময় হলে ছেলেমেয়েদের কিছুতেই পড়ার টেবিলে বসানো যায় না। ফলে এগুলো দেখে একদিকে আমাদের ছেলেমেয়েরা অপরিহার্য পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অমনোযোগী হচ্ছে। ডুবে থাকছে

www.pathagar.com

এসব অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর আলোচনায় অপরদিকে এসব অবাঞ্ছিত বিষয় তাদেরকে অশ্লীলতা ও অপরাধপ্রবণ করে তুলছে।

সুতরাং সমাজে আজকাল ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস এবং অপরাধপ্রবণতা জোরদার হয়ে উঠেছে। এ জনগণ জিম্মী হয়ে পড়েছে থেকে সৃষ্ট পরিণতির কাছে । এই অভিশাপের হাত থেকে দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে হলে অপরাধপ্রবণতার মূল শেকড় ধরেই টান দিতে হবে। অন্যথায় অপরাধ দমনের কোনো গতানুগতিক আইন দ্বারা সমাজকে সন্ত্রাস ও অপরাধের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গভীরভাবে বিবেচনায় থাকা কর্তব্য বলে আমরা মনে করি।

"মাদ্রাসা শিক্ষায়ও নকল" এবং কিছু কথা

[প্রকাশ ঃ ১২. ৬. '৯৮]

দেশের সাধারণ শিক্ষার কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসমূহে এবার নকলের ছড়াছড়ি, সংঘাত সংঘর্ষ, গ্রেফতারি, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি ঘটনা শিক্ষার ভাবমর্যাদা বহুলাংশে ক্ষুণ্ন করেছে। আমাদের জাতীয় শিক্ষা হেয় হয়েছে দেশ ও দেশের জনগণের কাছে। ঠিক একইভাবে সাথে সাথেই দেশের অপর কোনো পরীক্ষায় নকলের মহোৎসবের খবর জাতির হতাশাব্যঞ্জক অবস্থারই ইঙ্গিত দেয়। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরীক্ষা চলছে। পরিতাপের বিষয় যে, এসব পরীক্ষায়ও নকলের ছড়াছড়ি চলছে বলে সংবাদপত্রে সমালোচনামূলক খবর প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষার শেষ ক্লাসের পরীক্ষা, যেখানকার পাঠ্যসূচীর অধিকাংশই হচ্ছে হাদীস-তাফসীর, সেই কামিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও নাকি এবার হাদীস শিক্ষার নকলের কপি লুকিয়ে পরীক্ষার হলে নিয়ে নকল করেছে। পবিত্র কিতাবপত্রের ঐসব নকলের টুকরা তারা অমর্যাদাকর অবস্থায় যেখানে সেখানে কাজ শেষে ফেলে দিয়েছে। বিভিন্ন হলে নাকি ফ্রী স্টাইলে নকল চলছে। একজন অন্য জনের খাতা দেখছে, শিক্ষক-কর্মকর্তারা দেখেও দেখছেন না। বরং পরিদর্শকদের আগমনের খবর পেলে পরীক্ষার্থীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। ঢাকার ৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শকরা আকস্মিক উপস্থিত হয়ে দেখতে পেয়েছেন যে, শতকরা ৮০/৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রীই নকল করছে।

ইতোপূর্বের পরীক্ষাসমূহে নকলের মহোৎসবে যেমন আমরাও দুঃখিত ও হতাশ না হয়ে পারিনি এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষীয়দের ব্যর্থতাকে তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছি, তেমনি মাদ্রাসার পরীক্ষাকেন্দ্রসমূহে নকলের ছড়াছড়ির কথা শুনেও সত্যি আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও লজ্জিত না হয়েও পারছি না। বরং মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে নকলের আধিক্যের খবরে আমরা সঙ্গতকারণেই অধিক দুঃখিত ও হতাশা অনুভব করছি। কারণ, মাদ্রাসা শিক্ষা নামে আমাদের দেশে যেই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে, এই শিক্ষা আর আমাদের দেশের প্রচলিত অন্যান্য শিক্ষাকে এদেশের সকল শ্রেণীর মানুষই সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

আলাদা দৃষ্টিতেই বিচার করে থাকে। তারা উভয় শিক্ষার উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে কখনও এক করে দেখেন না বরং সকলেই মনের করেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষা একটি মহৎ ধর্মীয় শিক্ষা। বরং এ শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শবান আলেম-ওলামাই আমাদের সমাজকে তার স্বকীয় ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম। তারাই পারে সমাজকে নৈতিকি অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে। কেননা নানা কারণে আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতার শিক্ষা উপেক্ষিত। যদ্দরুন এই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার কুফলসমূহ ইতোমধ্যেই জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে তীব্রভাবে অনুভূত হতে শুরু করেছে। ফলে আজ সমাজে অপরাধ-প্রবণতার দৌরাত্ম্য অতীব জোরে শোরেই বাড়ছে। এমতাবস্থায় সমাজ সচেতন দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গ গভীরভাবে চিন্তা করছেন যে, জাতিকে শিক্ষাদর্শজনিত এ চরম বিভ্রান্তিকর অবস্থা থেকে রক্ষা করা এবং তাদেরকে নৈতিকতার প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে, পবিত্র ধর্মীয় শিক্ষাই এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে। বলাবাহূল্য মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের এই ভক্তি ও সুধারণা থেকেই সকল শ্রেণীর মানুষই নামায, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি ধর্মীয় কাজকর্মের ইমামত ও নেতৃত্ব এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের দ্বারাই সম্পাদন করিয়ে থাকেন। কিন্তু শরিষাতেই যদি ভূতের প্রভাব থেকে যায় তাহলে সেই শরিষা দ্বারা যেমন ভূত তাড়ানো সম্ভব নয় তেমনি যেই মাদ্রাসার পড়াসমূহের সিংহভাগই মানুষের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত, সেই শিক্ষার শিক্ষিতরাই তার বিপরীত কাজ করলে এবং অন্যদের মতোই পরীক্ষায় অবৈধ পন্থার অনুসারী হলে দেশবাসী যাবে কোথায়? সমাজকে কারাই বা সঠিক পথে পরিচালিত করবে? তাই মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরকে নকল বা যে কোনো গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে দেখলে, ধার্মিক অধার্মিক নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষই আন্তরিকভাবে ব্যথা উপলব্ধি করে এবং অধিক হতাশাবোধ করতে থাকে।

স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা তথা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় নকলের ছড়াছড়ির কথা শুনলে প্রথমে নকলকারী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি খারাপ ধারণার সৃষ্টি হলেও পরক্ষণেই সমস্যার অপর চিত্রও এ সমাজের যে কোনো মানুষের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। সেটি হলো, অন্যান্য দেশের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে যেখানে নকল করার এই অভিযোগ উঠে না কিংবা তাদের দেশের শিক্ষাঙ্গন সাংবছর সন্ত্রাস কবলিত থাকে না, সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে কেন এই অবস্থা বিরাজমান? এখানে এসেই নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো জাগে, যেমন দেশের গণমাধ্যমসমূহের চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠানাদির প্রতি অভিভাবক মহল, শিক্ষক মহল এমনকি সরকারি প্রশাসনিক মহল আজকাল যেই পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে, ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার বিষয়টি সে অনুপাতে তাদের কাছে গুরুত্ব পায় কিনা? পেলেও লেখাপড়ার ন্যায় জীবনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি আগ্রহের মাত্রা, খেলাধুলা, নাটক ,হাসি-কৌতুক ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়াদির আকর্ষণের উপর অধিক প্রবল কিনা? ক্লাসের পাঠ তৈরি ও পরীক্ষার প্রশ্নের জোৎসই জবাব অনুশীলনের আগ্রহের চাইতে নাটক, খেলাধুলা ও বিশ্বখেলার দৃশ্য দেখার ঝোঁক মনে কিরূপ? পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা যেসব

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত, সেগুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক আছেন কিনা, আছে কি সেখানে পড়ালেখার পরিবেশ? মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজসমূহের ছাত্রদের প্রয়োজনীয় লেখাপড়ার পরিবেশ স্ব স্ব স্থানে কতদূর অনুকূল? এসব প্রশ্নের জবাব সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্বশীলদের সামনে থাকতে হবে। আমরা যদ্দুর জানি, অধিকাংশ অভিভাবক এবং শিক্ষকবৃন্দ লেখাপড়ায় ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ বিনষ্টকারী উল্লেখিত চিত্তবিনোদনমূলক বিষয়গুলোর ব্যাপারে উদাসীন, আর এই ছিদ্র পথেই তারা পাঠ্যবইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে দূরে সরে যায়। জ্ঞান গভীরতায় পৌঁছার নির্মল আনন্দ থেকে এভাবে ছাত্রছাত্রীদের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্নকারী সস্তা ও স্থূল বিষয়সমূহ প্রাধান্য পায়। অপরদিকে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথার্থ শিক্ষা না হওয়া, যোগ্য শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব থাকা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি এবং দক্ষ ও সুযোগ্য শিক্ষকের ঘাটতি থাকা ইত্যাদি সমস্যা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এছাড়া বয়স বৃদ্ধির পর আরও উপরের ক্লাসে উত্তীর্ণ হলে রাজনৈতিক তৎপরতা তো তাদের শিক্ষাবিমুখ করার কাজে আছেই। নকল করার এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার যাবতীয় পথ বন্ধ করে এসব সমস্যার সমাধান করা হলে নকল প্রবণতা থাকার কথা নয়। ছাত্রছাত্রীদের রীতিমতো অধ্যয়ন কাজে অখণ্ড মনযোগ বজায় রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকলে মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজ কোনো ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরাই পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের প্রতি আগ্রহী হবার কথা নয়। পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশে নকল বন্ধের জন্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশ নিয়োগ করা হয়। এ দ্বারা কিছুতেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এ জন্যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে যেসব গলদ রয়েছে, সেই গলদ আগে দূর করতে হবে। সেই গলদ রয়েছে সিলেবাসে, সেই গলদ রয়েছে ছাত্রছাত্রী ভর্তিতে, গলদ রয়েছে শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে ও তাদের শিক্ষক সুলভ মানসিকতার অভাবে। গলদ রয়েছে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে। মোটকথা, জাতীয় শিক্ষাঙ্গনকে নকলসহ যাবতীয় অবাঞ্ছিত বিষয়মুক্ত যথার্থ শিক্ষা পরিবেশে পরিণত করতে হলে, শিক্ষাদর্শন, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গলদের যেসব শিকড় এ শিক্ষাকে আষ্টে-পৃষ্টে ঘিরে ধরেছে, সেই গলদসমূহ আগে বিদূরিত করতে হবে। তা না করে শিক্ষা উন্নয়নে যত ব্যবস্থা এবং অর্থ ব্যয়ই করা হোক তাতে যেমন ছাত্রছাত্রীরা যথার্থ আগ্রহ নিয়ে পড়ার প্রতি মনোযোগী হবে না, তেমনি পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে নকল পরিহারের প্রেরণাও তারা অনুভব করবে না। আর এভাবে পুলিশও থাকবে নকল ও সাপ্লাইচলবে। পরিদর্শক অধ্যক্ষরাও থাকবেন কিন্তু তাদেরকে নীরব দর্শক হয়েই থাকতে হবে।

মেধার প্রতি যথার্থ সম্মান না দেয়াও নকলের অন্যতম কারণ। সমাজের নীতিনৈতিকতা মূল্যবোধ, আদর্শ, মেধাবীদের মেধা ইত্যাদির লালন ও বিকাশ যাদের দ্বারা ঘটবে, খোদ তারাই এসবকে এখন উচ্ছেদ করার জন্যে আদাপানি খেয়ে লেগেছেন। উদ্ভাবনি জ্ঞান ও মেধার মূল্যায়ন আজকাল খুব কমই হয়ে থাকে। উপযুক্তভাবে লেখাপড়া করে, সততার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করার পরও

www.pathagar.com

স্বজনপ্রীতি আঞ্চলিকতা, অর্থজোর ইত্যাদির কারণে চাকরির ক্ষেত্রে সযোগ পাওয়া যায় না। ফলে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই লেখাপড়ার কষ্টটা অনেকের ক্ষেত্রে সময় নষ্টের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানবীয় সদগুণাবলির বিকাশ সাধনের বিষয়টি গৌণ হয়ে শিক্ষা এখন নিছক বস্তুবাদিতার মানদণ্ডে বিবেচিত হচ্ছে। অনেকে জ্ঞান গভীরতায় যাবার পরিশ্রম না করে পাঠ্য বিষয়াবলিকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখে থাকে। অবশেষে একদিন পরীক্ষা এসে মাথার উপর চেপে বসলে নকলবাজির সাহায্যে এ 'ঝামেলা'টি অতিক্রম করার চেষ্টা চলে। শিক্ষকদের মধ্যে অতীতের সেই আদর্শবাদিতা নেই, তাদের দেখে জ্ঞানসাধনার প্রেরণা উজ্জীবিত হয় না। ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের মধ্যে যেমন নেই জ্ঞানভিত্তিক সেই যোগসূত্রতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা, তেমনি ছাত্রের মধ্যে নেই শিক্ষকের উপদেশবাণী গোগ্রাসে গেলার সেই পুরাতন আগ্রহ। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যকার সম্পর্কে এখন নেই কোনো মূল্যবোধ, সবকিছু পরিমাপ করা হয় অর্থের মানদণ্ডে। ছাত্রদের চিত্তজগতকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করার মূল লক্ষ্য ও আগ্রহ এখন শিক্ষকদের মধ্যে অনুপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে উপযুক্ততা, দক্ষতার প্রশ্ন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ ও চাকরি প্রাপ্তিতে মেধার চাইতে অন্য কিছুরই কদর বেশি। এসব কারণে মৌলিক গুণাবলীর শূন্যতা দ্রুত বেড়ে চলেছে।

রাজনৈতিক সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃত্বের চরিত্রহীনতাও ছাত্র সমাজকে নকলসহ যাবতীয় অসাধু প্রবণতায় উৎসাহিত করছে। পরন্তু যারা অনৈতিকতার এই বেগবান সয়লাবকে প্রতিরোধ করতে মাঝে মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকা নেন, তাদেরকে শেষে নিরাপত্তাহীন উৎকণ্ঠা বা চরম গ্লানিকর জীবন যাপন করতে হয়। বস্তুত এমন করেই আমাদের দেশের কি স্কুল-কলেজ, কি মাদ্রাসা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নকলের মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সমাজের উপর স্তর থেকেই আদর্শ স্থাপন করতে হবে। কোনো সমাজের মানুষ বিশেষ করে তারুণ্য দীপ্ত শ্রেণী লক্ষ্যে অলক্ষ্যে তাদের সমাজ নেতৃত্বের আচার-আচরণ ও চিন্তামননেরই অনুকরণ করে। জ্ঞান বিনিময়ের পবিত্র অঙ্গন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই চলতে দিতে হবে। আইনকে চলতে দিতে হবে তার যথাযথ গতিপথ ধরে। ন্যায়বিচারকে সবল দুর্বল সকলের জন্যে করতে হবে অবারিত। ক্ষমতার দাপট আয়ত্তে আনার সিঁড়ি হিসাবে আজ জনসাধারণ ও ছাত্র সমাজকে ব্যবহারের বাতিক পেয়ে বসেছে রাজনীতিকদেরকে। এটা না করে সত্যিকারের যোগ্যতা অর্জন করেই জনগণকে নেতৃত্ব দিতে আসতে হবে। তা না করে বাজেটে শিক্ষাখাতে জাতির বিপুল অর্থ ব্যয় করেও এ শিক্ষা দ্বারা অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মূর্খ জাতি ছাড়া কাঙ্ক্ষিত শিক্ষিত সমাজ গঠন কঠিনই হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ছাত্রদেরকে নেতাদের ক্ষমতা আরোহণের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহারের প্রবণতাও পরীক্ষায় নকল প্রবণতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তা বন্ধ না হলে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত কাঙ্ক্ষিত জনশক্তিতে পরিণত করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাই হচ্ছে দেশের ধর্মীয় শিক্ষা, আর পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ধর্মের অন্যতম মৌল শিক্ষা -তা হলো ভাল কথা-কাজের সূচনা ও অনুশীলন

www.pathagar.com

আগে নিজের থেকে শুরু করতে হবে। তানা করে অপরকে ধর্মের উপদেশ বাণী শুনানোকে আল্লাহ বড় অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতেই দেখেন। সুতরাং মাদ্রাসা তথা ধর্মশিক্ষার যেই ছাত্রছাত্রীদেরকে নবীরাসূলদের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হিসেবে মহৎ চরিত্রের অধিকারীরূপে গড়ে ওঠার কথা, তাদেরকে কখনও এ দায়িত্ব বিস্মৃত হলে চলবে না। যারা গোটা জাতিকে সৎ নাগরিক ও জীবনের সকল ক্ষেত্রের নেতৃত্ব দানের উপযোগী করে গড়ে তুলবেন, তারা শিক্ষা জীবনে গোমরাহির পথে পরিচালিত হলে সংশ্লিষ্ট জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেবার আর কেউ থাকবে কি?

ইসলামী শিক্ষার সাথে যারা জড়িত কর্মজীবনে তাদের তো আগমন ঘটবে সেই বিপ্লবী মহাপুরুষদের মতোই, যারা স্রোতের গতিকে ভিন্নদিকে ফিরাবার জন্যে দুনিয়াতে আবির্ভূত হন। সেক্ষেত্রে তারা নিজেরাই যদি স্রোতের খড়কুটার মতো ভেসে যেতে থাকেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট জাতির কি উপায় থাকবে? একশ্রেণীর মাদ্রাসা শিক্ষিত সম্ভবতঃ নানান কারণে নিজেদের উচ্চমর্যাদার কথা নিজেরা ভুলে যাওয়াতেই তাদের এই পদস্খলন। আমাদের মতো দ্রুত নৈতিক অবক্ষয়ের এই সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরাই যেখানে একমাত্র ভবিষ্যত, তারা এই ডুবন্ত জাতিরূপ তরীটির কাণ্ডারি হয়ে একে রক্ষা করার মতো যোগ্যতা নিয়ে এগিয়ে আসবে, প্রকৃত সমাজকল্যাণকামীরা এটাই বুকভরা আশা নিয়ে আছেন। সে ক্ষেত্রে মাদ্রাসার কুরআন-হাদিস পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরাই পরীক্ষায় নকলের ন্যায় গর্হিত কাজে নিজেদের পূত চরিত্রকে কলুষিত করে জাতির সকল আশা-ভরসাকে ধূলিস্যাৎ করে দিক-এটা কারও কাম্য নয়।

মাদ্রাসা-শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সুস্পষ্ট থাকা কর্তব্য। যুগে যুগে নবী-রাসূলদের জীবনের যেই উদ্দেশ্য ছিল মাদ্রাসা শিক্ষিতদেরও থাকতে হবে সেই অভিন্ন লক্ষ্য উদ্দেশ্য। আর এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা দেয়ার দায়িত্ব হচ্ছে একমাত্র তাদের সম্মানিত শিক্ষকদেরই। এই লক্ষ্য কোনো মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীর কাছে অস্পষ্ট থাকলে তার পক্ষে কিছুতেই মানোন্নীত আলেম -তথা খাঁটি ধর্মীয় শিক্ষিত ও যথার্থ জ্ঞানী হয়ে গড়ে উঠা সম্ভব নয়। আমরা মনে করি, বরং এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মাদ্রাসা শিক্ষায় পরীক্ষা ক্ষেত্রে যেসব ছাত্র-ছাত্রী অন্য ধারার শিক্ষার্থীদের অনুরূপ অবৈধ পন্থায় পরীক্ষা পাস করতে চায়, তারা মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য থেকে বহুদূরে অবস্থান করাতেই এই অন্যায় করতে পারছে। তেমনি যেসব শিক্ষক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নকল সরবরাহ করা কিংবা তাদেরকে নকলের সুযোগ দানের অভিযোগ উঠেছে, তারাও এই মহান শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তার শিক্ষাদানের মর্যাদার ব্যাপারে চরম বিভ্রান্ত বলেই আমরা মনে করি। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ অন্যান্য অর্থকরী শিক্ষার মতো যারা মনে করে, তারাই শুধু নির্লজ্জের মতো পরীক্ষায় এহেন অনৈতিকতার আশ্রয় নিতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য বিরোধী ভাবধারা নিয়ে যেমন সঠিকভাবে এ শিক্ষা আয়ত্তে আনা যায় না, তেমনি একই কারণে সংশ্লিষ্টদের চরিত্রও এ শিক্ষার দাবী মোতাবেক গড়ে উঠে না। আদর্শবান, আল্লাহভক্ত, যোগ্য শিক্ষকই এই মানদণ্ডে মাদ্রাসায় যথার্থ আলেম গড়ে তুলতে সক্ষম। এই মাপের শিক্ষকবৃন্দের দ্বারাই যেমন এ শিক্ষার মান বাড়তে পারে তেমনি তাদের হাতেই গড়ে

www.pathagar.com

উঠতে পারে আদর্শ ছাত্র, যারা কর্মজীবনে সমাজ অঙ্গনের সকল স্তরে "আল্লাহ'র খলীফা" হিসেবে যথার্থ নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম। বলাবাহুল্য, মাদ্রাসার পরীক্ষায় যেসব শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নকল সরবরাহ করেন কিংবা এজন্যে সুযোগ দিয়ে থাকেন, তারা প্রকৃতপক্ষে কোনো যথার্থ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের আসনে বসার যোগ্য নন। তাদের দ্বারা যেমন মাদ্রাসা শিক্ষারও মান বাড়তে পারে না, তেমনি তাদের হাতে এ শিক্ষার সুউচ্চ লক্ষ্যাভিসারী যোগ্য আদর্শ ছাত্রছাত্রী গড়ে ওঠাও অসম্ভব।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য একটাই, আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা যেহেতু আমাদের একমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা, যার ভিত্তিতে আমরা দেশের সকল অধিবাসীকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই এবং আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ, যোগ্য ও আল্লাহভক্ত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, তাই এই শিক্ষা ও এর পরীক্ষাকেও যে কোনো অনৈতিকতাপূর্ণ কাজ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক সকলকেই হতে হবে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তেমনি এ শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও তা দ্বারা সকল আধুনিক জাহিলিয়াতের মোকাবিলার জন্যে সকলকে হতে হবে ইস্পাতকঠিন মনোবলের অধিকারী। এদেশের জাতীয় ও সাধারণ শিক্ষাঙ্গনে আজ শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিরোধী যেই অশুভ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেই প্রবণতার অভিশাপ থেকে আমাদের জাতীয় শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত ও পবিত্র করতে হলে জাতির সামনে আজ শিক্ষা সম্পর্কীয় যেই আদর্শ স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, সমাজ নেতৃত্বকে সেই মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে। গোটা জাতিকে তার মনযিলে মাকসুদের দিকে নিয়ে যেতে হলে যেই যোগ্য ও আদর্শ শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তোলা জরুরী হয়ে পড়েছে, সেই কাঙ্ক্ষিত শ্রেণীটি এ দেশের মাদ্রাসা থেকেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এটি তখনই সম্ভব যদি মাদ্রাসা শিক্ষা, এ শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদেরকে আমরা তার যথার্থ লক্ষ্যাভিসারী করে গড়ে তুলতে পারি। দেশের মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয় এই লক্ষ্য পূরণের উপযোগী করে গড়ে তুলতে আগ্রহী ছাত্র-শিক্ষকরা দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে এলে এ শিক্ষায় সকলের ন্যায় অবাঞ্ছিত কোনো কিছুই স্থান পাবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

সূর্যসেন যা, তাকে তাই বলা উচিত

[প্রকাশ ঃ ৫. ৫. '৯৯]

"সূর্যসেনকে হিন্দু হিংসাবাদী ডাকাত" বলে উল্লেখ করার নিন্দা জানিয়ে সূর্যসেন পরিষদের সভাপতি ফয়েজ আহমদ এবং সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন। বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মাস্টার দা সূর্যসেনের নামে অসত্য অবাস্তব ও বিকৃত তথ্য প্রকাশ করায় স্বাধীনতা বিরোধী চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করার এবং অপশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক ছাত্র, যুব ও নারী সংগঠনগুলোর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

জনাব ফয়েজ আহমদ ঠিক এমন একদিন বিবৃতিটি প্রেসে দিয়েছেন, যেদিন বর্তমান ভারতঘেঁষা সরকারের অনুসৃত নীতি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে একশ্রেণীর বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ঢাকার রাজপথ ও আকাশ-বাতাস হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতার সংগ্রামী বজ্রনিনাদে প্রকম্পিত। পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত আহ্বানটি এবং রাজধানীতে আগের দিনের গণমিছিলের ছবি ও বিভিন্ন গণসমাবেশে বক্তাদের প্রদত্ত ভাষণ ও তার ধরন দেখে জনাব ফয়েজ আহমদ তাঁর আহ্বানের সাড়া যে কিরূপ হবে তিনি তা কতদূর আঁচ করেছেন জানি না, তবে বস্তাপচা মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা দেশবাসীকে প্রতারিত করা যে সম্ভব নয় এটা তাঁর উপলব্ধি করতে আর দেরী করা উচিত নয়। এটা তাঁর জানা উচিত ছিল যে, কোনো ঐতিহাসিক তথ্য খন্ডন করতে হলে আরেকটি প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারাই তা সম্ভব। তা না করে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার মতো কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক গলাবাজি দ্বারা তা খন্ডন করা যায় না। জনাব ফয়েজ আহমদ গং নানান বোধগম্য কারণে সূর্যসেনকে বাংলাদেশের বার কোটি তওহীদী জনতার জাতীয় বীর হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে কোনোরূপ মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়া এবং এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুসলিম বীর সেনানীদের হেয় করা কিংবা তাদের নামকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার অধিকার তাঁদের নেই। বিশেষ স্বার্থে অপর কোনো সম্প্রদায় বা কোনো দেশকে খুশি করার মতলবে হয়তো তিনি এটি করে থাকবেন। কিন্তু তাঁর উচিত ছিল সূর্যসেন সম্পর্কিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত যেসব লেখা বই পুস্তক ও পত্রপত্রিকায় বহু আগে থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে সেগুলোর জবাব দেয়া। বিশেষ করে গত ১ মে (৯৯) এই পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠায় সত্যবাদী লিখিত প্রবন্ধটিতে সূর্যসেন সম্পর্কিত যেসব ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, (সম্ভবতঃ যার প্রতিবাদে তিনি বিবৃতি দিয়েছেন) সেগুলো খন্ডন করা। ঐসব তথ্যের কোনো একটিরও তিনি জবাব না দিয়েই গতানুগতিক মিথ্যা প্রচারণার আশ্রয় নিয়ে তিনি প্রতিহত করার আহ্বানটি জানিয়েছেন। সত্য প্রকাশ হয়ে যাবার আশংকায় তিনি ঐ লেখাটির উদ্ধৃতি না দিলেও আমরা এখানে তার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আসলে সূর্যসেন এদেশবাসী মুসলমানদের জন্যে নয় বরং তাদেরকে উপেক্ষা করে ভারতীয় কংগ্রেসের স্বার্থেই তিনি কাজ করেছেন, যেই কংগ্রেস উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল এবং তাদের ইতিহাস, স্বাধীনতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থনীতি সকল কিছুকে ব্রাহ্মণ্যবাদের পদতলে বিলীন করে দিতে চেয়েছিল। সেদিন মুসলিম জাতীয় নেতৃবৃন্দ সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাস ভূমি সৃষ্টি না করলে আজ ফয়েজ আহমদের ঠাট কোথায় যেতো তা ভাবা উচিত।

সূর্যসেনের স্বরূপ উদঘাটনকারী উক্ত প্রামান্য প্রবন্ধটির অংশবিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হলো। "ডাকাতের ডাকটিকিট-বিশ্বের কোন দেশে কোন সরকার চালু করেছে বলে

www.pathagar.com

শোনা যায়নি। বাংলাদেশে সরকার এক্ষেত্রে পথিকৃৎ। চার টাকা মুল্যের সূর্যসেনের ডাকটিকিট বাজারে ছাড়া হয়েছে। সূর্যসেনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এ কাজ করা হয়েছে। তাই সূর্যসেনের পরিচয় সবার জানা দরকার।"

সূর্যসেন প্রথমে মাস্টারি করেই দিনাতিপাত করতেন। সন্ত্রাসী ক্রিয়াকলাপের কারণে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাওয়ার পর মাস্টারি বন্ধ হয়ে যায়। প্রকাশ্যে চলাফেরাই তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে ডাকাতির পথ বেছে নেন। শ্রী সুপ্রকাশ রায় রচিত "ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থে 'অনুশীলন' দলের প্রতিজ্ঞাপত্রের ঙ-র ১ ধারায় লেখা ছিল।

"স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই অসৎকর্ম জানিয়াও আমরা অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসাবে ডাকাতির পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাকাতির লব্ধ অর্থের এক কপর্দকও আমরা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া সমুদয় অর্থ আমাদের পরিচালকের হস্তে অর্পণ করিবো। আমাদের প্রত্যেকের পারিবারিক অভাব বুঝিয়া তিনি যাহা আমাদের দিবেন, আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবো।"

সূর্যসেন নিজেই ডাকাতি অভিযানে নেতৃত্ব দিতেন এবং তাদের দুষ্কর্মের ফলে চট্টগ্রামের আনোয়ারা, পটিয়া, পারকোড়া ও হাটহাজারির বিস্তীর্ণ এলাকার গৃহস্থগণ (প্রায় সবাই মুসলমান) আতঙ্কের মধ্যে থাকতেন। সরকারি অর্থও তারা লুট করতো। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একদিন পাহাড়তলীর টাইগার পাসে রেলগাড়ির ট্রেজারি ভ্যান লুট করে নগদ সতর হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় নগরখানা পাহাড়ের জঙ্গলে পৌঁছালে গ্রামবাসী ও পুলিশ তাদের ঘেরাও করে। সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী তাদের কাছে থাকা বিষ খেয়ে ফেলে। তাদের মৃত মনে করে উপেন ভট্টাচার্য, অনন্ত সিংহ, রাজেন দাস ও অন্যরা টাকা নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু বিষে ভেজাল থাকায় তাতে কাজ হয়নি। ফলে সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। মামলায় অবশ্য তারা শেষ পর্যন্ত খালাস পান।

ডাকাতি করতে করতে ডাকাতি এমন মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল যে, স্বাধীন দেশেও তারা আর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেননি।

"শ্রী সেনের অন্তরঙ্গ সহকর্মী অনন্ত সিংহ ১৯৪৭ সালের পর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নস্থানে ডজনখানেক ডাকাতি ও রাহাজানির মামলায় দণ্ডিত হয়ে এখনও জেলবাসী। তার অপর সহকর্মী শ্রী অম্বিকা চক্রবর্তী (যিনি ১৯৩০ সালে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন) ১৯৪৭ সালের পার্টিশনের পর দমদমে বাস্তুহারাদের জন্য ভারত সরকারের বরাদ্দকৃত তহবিল থেকে মোটা অংকের টাকা তসরুফ করে আদালতে দণ্ডিত হয়ে জেলে গিয়েছিলেন।"

-ব্যারিস্টার সায়েফউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী ঃ শিবাজী-বংকিমের উত্তরসূরী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী সূর্যসেন ঃ দৈনিক আজাদ, ২৫ চৈত্র ১৩৮৩

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় এই দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। সূর্যসেনের ফাঁসি হয়েছিল। বেঁচে থাকলে তিনিও অনুরূপ ডাকাতিই করতেন। ডাকাতির চেয়ে বড় কথা হিন্দু হিংসাবাদীরা। সহিংস হিন্দুবাদী সূর্যসেন কালীপূজার

www.pathagar.com

মাধ্যমে দেশপ্রেমের দীক্ষা দিতেন। সূর্যসেনের বিপ্লবী পার্টির এক সদস্যা শ্রীমতি কুন্দ্রনভা সেন গুপ্তা 'কারাস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"আমি পিছু পিছু চললাম। কিছুদূরে গিয়ে একটি মন্দিরের কাছে দু'জন পৌছলাম। দরজা খোলাই ছিল। মাস্টারদা আর আমি ভিতরে ঢুকলাম। তারপর তিনি টর্চ জ্বালালেন। দেখলাম ভীষণামনা এক কালী মূর্তি। মাস্টারদা এক হাত লম্বা একখানা ডেগার বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, মায়ের সামনে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা কর। ওখানে বেলপাতা আছে। আমি বুকের মাঝখানে চামড়া টেনে ধরে একটুখানি কাটার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক ফোঁটা রক্ত বের হলো। তা বেলপাতায় করে মাস্টারদার কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন মায়ের চরণে দিয়ে বল জীবনে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না, দেশের কাজ ছাড়বো না। আমি অসংকোচে মায়ের বদনে রক্ত আর মাথা রেখে ঐ প্রতিজ্ঞা করলাম।"

কোন মুসলমান ছেলের পক্ষে কালীমূর্তির চরণে বুকের রক্ত ও মাথা রেখে ঐ প্রতিজ্ঞা করা সম্ভব নয়। এই হিন্দুবাদী তার দলে একমাত্র হিন্দুদেরই নিতেন। সূর্যসেনের সহযোগী শ্রী পূর্ণেন্দ দস্তিদার "স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামে" গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন।

"তাছাড়া তখন ধর্মভাব বিশেষ প্রবল ছিল। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রধানত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রদেরই তখন দলে আনা হতো।....ছাত্র ও যুবকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য নিয়মিত ব্যয়াম, গীতা পাঠ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বই ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ইত্যাদি পড়ার ব্যবস্থা করা হতো"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' হিন্দুদের আনন্দদান করলেও মুসলমানের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। শ্রী যোগেশ বাগল সংকলিত 'বঙ্কিম রচনাবলী' (তৃতীয় প্রকাশ ১৩৬১) এর ৭৭৬ পৃষ্ঠা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলোঃ

"সেই এক রাতের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, 'মুসলমান পরাভূত হইয়াছে। দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল'। গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল 'মুই হেঁদু।'

বিপ্লবীরা এ কারণেই মুসলমানদের প্রতি মারমুখো হয়ে উঠেছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রফিকুল ইসলাম লিখেছেন ঃ

"১৯০৭ সাল থেকে সন্ত্রাসবাদীরা 'অনুশীলন' সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক হত্যা, লুণ্ঠন শুরু করে আর এই সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ইংরেজ বিরোধী ছিল না, তারা মুসলিম বিরোধীও ছিল।"

-অধ্যাপক ডঃ রফিকুল ইসলাম ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ বাংলাদেশ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৃঃ ৩৪৫। ১৯ ও ২০ এপ্রিল ১৯৩০-এই দুইদিন চট্টগ্রামে মুসলিম

www.pathagar.com

কনফারেন্সের দিন ধার্য করা হয়েছিল বহুপূর্ব থেকে। এই কনফারেন্সে বাংলার বাইরে থেকেও বড় বড় পন্ডিতরা যোগ দেয়ার কথা। মুসলমানদের এই কনফারেন্স যাতে হতে না পারে সেজন্য সূর্যসেন ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিন ধার্য করেছিলেন।

"কি কারণে বলা যায় না অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য বিপ্লবীরা ১৮ এপ্রিল দিনটি বাছিয়া লইয়াছিল। পরবর্তী দুই দিন চট্টগ্রামে মুসলমানদের কয়েকটি সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ছিল। তন্মধ্যে প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ স্যার শাফায়াৎ আহমদ খান। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। পুলিশকে অত্যাসন্ন অভিযান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ও অসতর্ক রাখার জন্য নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের কয়েকজন ১৮ই এপ্রিল অপরাহ্নে পূর্বোক্ত সম্মেলনের সভামন্ডপ পরিদর্শনে যাইয়া বহুক্ষণ তথায় অতিবাহিত করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে তাহাদের কয়েকজন কলেজ হোস্টেলের গ্রন্থকারের প্রকোষ্ঠে বসিয়া অপরিপক্ক তরমুজ ও লিচু ভক্ষণ করেন।

..... এদিকে উপেন্দ্র ভট্টাচার্যের দল ধুম স্টেশনের নিকট রেললাইনের ফিস প্লেট অপসারিত করিয়া একখানি মালগাড়ি লাইনচ্যুত করে। কিন্তু ইহাতে ট্রেনখানির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। তবু ডঃ সাফায়াৎ আহমদ, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু বহুসংখ্যক প্রতিনিধি ও দর্শক লইয়া কলকাতা হইতে আগত মেল ট্রেনখানি কয়েকঘণ্টা দেরিতে পরদিন চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌঁছে।....

-মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ ঃ আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ঃ পৃঃ ২৫৭-২৫৮।

ট্রেন দুর্ঘটনায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু ঘটলে আজকের আওয়ামী লীগ হতো কিনা সন্দেহ। কী আশ্চর্য আওয়ামী লীগ সরকার এই মুসলিম বিদ্বেষী সূর্যসেনের ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন। জাতীয় দৈনিকসমূহে সূর্যসেনকে মহীয়ান করে চিত্রিত করা হচ্ছে। ইতিহাস বিকৃত করে লেখা হচ্ছে ঃ

"তারপর যথাযথ প্রস্তুতির পর ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল শুক্রবার রাত ১০টার সময় পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিপূর্ণ সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে অনন্ত সিংহ ও গনেশ ঘোষের নেতৃত্বে ৬ বিপ্লবী যুবক অকস্মাৎ পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণ করে দখল করে নেন। পুলিশ অস্ত্রাগারের সমস্ত অস্ত্রই তাঁদের হস্তগত হয় এবং ঐ অস্ত্রাগার ব্যারাকে অবস্থিত ৫শ' পুলিশ জোয়ান প্রাণভয়ে দ্রুত পলায়ন করে দূরে চলে যায়। আক্রমণকারীগণের নিখুঁত সামরিক পোশাক দেখে প্রতিটি কেন্দ্রেই প্রহরারত সিপাহীরা বিভ্রান্ত হয় এবং অকস্মাৎ আক্রমণে হয় গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায় অথবা ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে নানাদিকে ছুটে চলে যায়।"

-গনেশ ঘোষ ঃ চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহ ও জালালাবাদ যুদ্ধঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, রবিবার, ১৮ এপ্রিল ১৯৯৯

বর্তমান প্রজন্ম বিশ্বাস করবেঃ 'আক্রমণকারীগণের নিখুঁত সামরিক পোশাক দেখে প্রতিটি কেন্দ্রেই প্রহরারত সিপাহীরা বিভ্রান্ত হয়।" তৎকালীন প্রশাসনও বিভ্রান্ত

www.pathagar.com

হয়েছিলো তবে 'নিখুঁত সামরিক পোশাক দেখে নয় মুসলিম কনফারেন্স কমিদের পোশাক দেখে। ইতিহাসে দেখা যায় ঃ

"মুসলিম কনফারেন্স কর্মীদের মাথায় ছিল তুর্কী টুপি গায়ে বিশেষ রকমের ব্যাজ। সম্মেলনের পর পরই আরম্ভ হলো বিপ্লবীদের অভিযান। আর অভিযান শেষে বিপ্লবীদের পালাবার পথে দেখা গেল, সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুসলিম কনফারেন্স কর্মীদের ব্যবহৃত অনুরূপ তুর্কী টুপি ও বিশেষ রকমের ব্যাজ। তাতে আপাতদৃষ্টিতে সহজেই মনে হতে পারে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি বেআইনী কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ঐ কনফারেন্স কর্মীরা। সরকারের কাছেও তাই মনে হয়েছিল।"

-এস এ, সিদ্দিকী ঃ ভুলে যাওয়া ইতিহাস ঃ চট্টগ্রাম ১৯৭৫ পৃ. ১১১-১১২

এই কনফারেন্সের যৌথ সম্মেলন কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল তরুণ উকিল, এ, এস, এম মোফাখখার (সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলীর শ্বশুর ও অধ্যাপিকা চামন আরার পিতা) তাঁর "স্মৃতির মিনার" (মুন্সী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯১) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় বিদ্রোহীগণ যে ইউনিফরম পরেছিল তা আমাদের স্বেচ্ছা সেবকদের ইউনিফরমেরই অনুরূপ ছিল। তাদের পালিয়ে যাওয়ার রাস্তাতেও কয়েকটি ইউনিফরম পাওয়া গিয়েছিল। ফলে আমার ও অপর কয়েকজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ উইলকিনসনের সঙ্গে করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে অভিযোগ খন্ডন করতে সক্ষম হই।"

বিপ্লবী যারা, তাদের সৎসাহস থাকে ঘটনার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করার। সন্ত্রাসী যারা তাঁদের সে সৎসাহস থাকে না। মুসলিম কনফারেন্স কর্মীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠণের সঙ্গে জড়িত-এই অপচেষ্টা প্রমাণ করে সূর্যসেনের দলবল বিপ্লবী ছিল না, ছিল সন্ত্রাসী। এই প্রসঙ্গে খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ হত্যার জন্য এক নাবালককে ঠেলে দেয়ার কথা বলা যেতে পারে। ধূম স্টেশনে রেল লাইনের ফিস প্লেট সরিয়ে ট্রেন উল্টিয়ে কলকাতা থেকে আগত মুসলিম নেতৃবৃন্দকে হত্যার ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। তবে এবার সফল হলো শ্রী বিশ্ব বিশ্বাস রচিত বিপ্লবী সূর্যসেন (মাস্টারদা) গ্রন্থের ৯৭-৯৯ পৃষ্ঠা রয়েছে ঃ

"আহসানুল্লাহ হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, সূর্যসেন। এরজন্য তিনি নবদীক্ষিত বিপ্লবী চৌদ্দ বৎসরের কিশোর বালক হরিপদ ভট্টাচার্যকে নির্বাচন করলেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান হরিপদ টোলের ছাত্র, মাত্র চৌদ্দ বৎসরের বালক। সূর্যসেন এই বালকের সহিত স্বল্প পরিচয়ে এর ভিতরে এক অতলস্পর্শী হৃদয়ের সন্ধান পান। তিনি বুঝলেন এই ব্রাহ্মণ বালক তুলনাহীন আত্মিক শক্তিবলে বলীয়ান। গৌরকান্তি এই সরল শিশু সকল সন্দেহের অতীত। ১৯৩১ সাল-৩০ অক্টোবর।

নিজাম পল্টন খেলার মাঠে ফাইনাল খেলায় বিজয়ী দলকে পুরস্কার দানের অনুষ্ঠান। আজ এই সভায় উপস্থিত জেলা জজ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার এবং গোয়েন্দা পুলিশের বড় কর্তা খান বাহাদুর আসানুল্লা।

সভা শেষ। গোয়েন্দাকর্তা আসানুল্লাহ ফটকে কতিপয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করেন। অস্ত্রধারী দেহরক্ষী পার্শ্বে দন্ডায়মান। এমন সময় 'গুড়ম' গুড়ম চারটি গুলীর

www.pathagar.com

শব্দ। মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো আসানুল্লার রক্তাপ্লুত প্রাণহীন দেহ। ভীড়ের মধ্যে ধরা পড়লেন চৌদ্দ বছরের সুদর্শন কিশোর হরিপদ ভট্টাচার্য-হাতে টোটা ভরা রিভলবার।......

বিচারকের অবশ্য দয়া হলো। হরিপদ নাবালক- তাই তার মৃত্যুদণ্ড হলো না। হলো যাবজ্জীন কারাদণ্ড।"

মুসলমান বিচারক পারতপক্ষে মৃত্যুদণ্ড এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু হিন্দু বা ইংরেজ বিচারকের মধ্যে দয়া দেখা যায়নি। তারা মৃত্যুদণ্ডের পক্ষপাতি।

"অম্বিকা চক্রবর্তীর দণ্ড লইয়া বিচারকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। জনাব এ, এফ, এম রহমান তাঁহার প্রতি মৃত্যু দণ্ডাদেশ দানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু বিচারক মিঃ উইলিয়ামস ও শ্রী নৃসিংহ মুখার্জি চরম দন্ডদানের অনুকূলে মত প্রকাশ করায় তদনুসারে তাঁহার মৃত্যুদন্ডের আদেশ হয়।"

—মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ ঃ আমাদের মুক্তি সংগ্রাম পৃ ২৭২

গোয়েন্দা বিভাগের কৃতী অফিসার খান বাহাদুর আহসান উল্লাহর হত্যার পর মুসলমান বিচারকের হিন্দু বিদ্বেষ জাগ্রত হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। মুসলমানের এই মহানুভবতা হিন্দুদের নিকট স্বীকৃতি পায়নি।

১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের (সিপাহী বিদ্রোহ) নায়ক চট্টগ্রামের গৌরব হাবিলদার রজব আলীর বাহিনীতে হিন্দু- মুসলমান উভয় সিপাহী ছিল। তার মনের উদারতা কিংবদন্তী হয়ে আছে। নিজে না খেয়ে হিন্দু সিপাহীকে খাইয়েছেন। সূর্যসেনের 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি'তে কোন মুসলমান ঠাঁই পায়নি সব হিন্দু। কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতে রামরাজ্য স্থাপন। এই কট্টর হিন্দুবাদীর স্মরণে বাংলাদেশ সরকার ডাকটিকিট বের করলেন। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ রজব আলীর স্মরণে কিছুই করলেন না। মুসলমানের দেশে (বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জন মুসলমান) মুসলমান বীর পাত্তা পায় না, পাত্তা পায় সহিংস হিন্দুবাদী এক খুনী ডাকাত কট্টর হিন্দু। যে হিন্দুর স্বপ্ন ছিল স্বাধীন অখন্ড ভারত। তার সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের উদ্দেশেই কি সরকার তার স্মরণে ডাকটিকিট চালু করেছে। মৌলবাদ বিরোধী পত্র-পত্রিকা পর্যন্ত এই মৌলবাদ ধ্বজাধারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, শুক্রবার, ২৩ এপ্রিল ১৯৯৯ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদের অংশবিশেষ ঃ

"মৌলবাদী অপশক্তিকে উৎখাতের জন্য নির্মূল কমিটির ১১ দফা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নর্বনির্বাচিত কমিটি মৌলবাদী অপশক্তিকে উৎখাতের জন্য ১১ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচীর লক্ষ্য মৌলবাদ বিরোধী চেতনা সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া এবং দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধীদের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলা। ১১ দফা কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আগামী অক্টোবর বা নবেম্বরে দক্ষিণ এশীয় মৌলবাদবিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করা। বৃহস্পতিবার নবনির্বাচিত কমিটির পরিচিতি উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্মূল কমিটির সদ্য নির্বাচিত সভাপতি কবি শামসুর রহমান এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি

www.pathagar.com

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলনে নবনির্বাচিত কমিটির নাম ঘোষণা করেন। ১৯ ও ২০ এপ্রিল ৫ম জাতীয় সম্মেলনে ঐ কমিটি গঠন করা হয়।"

মৌলবাদী অপশক্তিকে উৎখাতের ব্যাপারে সোচ্চার হলেও দৈনিক জনকণ্ঠ ১৮ এপ্রিল ৯৯ সংখ্যা সূর্যসেনের বীরত্বগাথা তুলে ধরেছে। পত্রিকাটির স্মৃতি-বিস্মৃতি বিভাগে গনেশ ঘোষ রচিত 'চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিদ্রোহ ও জালালাবাদ যুদ্ধ' শীর্ষক এক সুদীর্ঘ সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সূর্যসেনের ছবি ও জালালাবাদ যুদ্ধের নিহতদের ছবি তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনটি কিছু কিছু অংশ পূর্ব সংখ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনটির ওপর পত্রিকার নিজস্ব মন্তব্যটি তুলে ধরা হয়নি। দৈনিক জনকণ্ঠের মন্তব্য হলো ঃ

"১৯৩০ সালের ১৮ থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহরে যুব বিদ্রোহের মাধ্যমে চারদিন চট্টগ্রামে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন থাকে। ২২ এপ্রিল বৃটিশ সেনাদের সঙ্গে জালালাবাদের পাহাড়ে এক সম্মুখযুদ্ধে শহীদী আত্মদানের মধ্য দিয়ে এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে। মাস্টারদা সূর্যসেন ফাঁসির রজ্জুতে জীবন উৎসর্গ করেন। এই আত্মদান পরবর্তীতে আমাদের বৃটিশ ও পাকিস্তান বিরোধী-সকল আন্দোলন ও অবশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছেন।"

কোথায় সূর্যসেন আর কোথায় মুক্তিযুদ্ধ। সূর্যসেনের "ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি" একমাত্র হিন্দু হিংসাবাদউদের দ্বারা গঠিত আর মুক্তিযুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক হিন্দু মুসলমান দ্বারা গঠিত। সূর্যসেনের স্বপ্ন ছিল স্বাধীন অখন্ড ভারত, স্বাধীন বাংলা বা পূর্ব বাংলা নয়। ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ হয়েছিল কিন্তু তৎকালীন সন্ত্রাসীদের সংগ্রামের কারণে ইংরেজ পূর্ববঙ্গকে পৃথক রাখতে আর সাহস পায়নি। পাকিস্তান হয়েছিল বলেই পূর্ব পাকিস্তান, বাংলাদেশ হতে পেরেছে। সূর্যসেনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে হলে বাংলাদেশকে অখণ্ড ভারতের অঙ্গরাজ্য করে রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সরকার ও সরকার সমর্থক জাতীয় দৈনিকসমূহ সূর্যসেনকে দিয়ে আমাদের মগজ ধোলাই করতে প্রয়াস পাচ্ছেন কি অখণ্ড ভারতের রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য? সূর্যসেনের ভারতে কোন মুসলমানের স্থান হতো না, কারণ তিনি চরম মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন। অথচ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় সবাই মুসলমান। বীরশ্রেষ্ঠ সাতজনই মুসলমান। শহীদ সবাই মুসলমান, হিন্দুও কিছু ছিল। সূর্যসেনের আত্মদান মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যোগাতে পারে না। এ দাবী করে পত্রিকাটি মুক্তিযুদ্ধের মানহানি করেছে। অখণ্ড ভারতের স্বাপ্নিক সূর্যসেনের ডাকটিকিট প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশকেই অস্বীকার করেছেন।

সুতরাং এটা উপলব্ধি করতে আর অসুবিধা হয় না যে, জনাব ফয়েজ আহমদদের গাত্রদাহের আসল কারণ কোথায়? এবং এই সাথে এটাও স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের প্রায় হাফ ডজন নাগরিককে প্রতিবেশী দেশের সীমান্ত প্রহরীরা অন্যায়ভাবে হত্যা করার প্রতিবাদে যখন দেশপ্রেমিক জনগণ প্রতিবাদ মিছিল বের করেন, তখন সেদিক থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্ন দিকে ফেরাবার জন্যে কেন ঘাদানিকরা মৌলবাদ বিরোধী মিছিল বের করে। আসলে ফয়েজ সাহেবদের এটি ব্যর্থ কান্না।

www.pathagar.com

তালিবান সরকারের কতিপয় ঘোষণা

[প্রকাশ ঃ ১৭. ৭. '৯৮]

আফগানিস্তানের তালিবান সরকার তাদের "রেডিও শরীয়ত" মারফত ৯ জুলাই ঘোষণা করেছেন যে, এখন থেকে আফগানিস্তানে টেলিভিশন, ভিসিআর এবং স্যাটেলাইট ডিশ নিষিদ্ধ। তালিবান সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান মুহাম্মদ কালামুদ্দিন বলেন, ভিডিও ও টেলিভিশন মালিকদের টেলিভিশন সেট ধ্বংস করার জন্য ১৫ দিন সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে 'দাঁড়িওয়ালা' তালিবান পুলিশরা বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালিয়ে টেলিভিশন সেট পেলেই ভেঙ্গে ফেলবে বলে হুশিয়রি দেয়া হয়েছে। টিভি, ভিসিআর ও স্যাটেলাইট ডিশের ওপর নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের ইসলামী বিধান মোতাবেক শাস্তি দেয়া হবে বলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান মুহাম্মদ কালামুদ্দিন ঘোষণা দিয়েছেন। তবে শাস্তির স্বরূপ সম্পর্কে তিনি কোনো ধারণা দেননি। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে তালিবান সরকার প্রথমে মহিলাদেরকে সহ কর্মস্থলে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সকল বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয় এবং কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করে দেন। মেয়েদের বোরকা পরা বাধ্যতামূলক করা হয়। বাসাবাড়ির নীচের তলার জানালায় পর্দা লাগাতে বলা হয়। যেসব সাদা কাঁচ বিশিষ্ট জানালা দিয়ে ঘরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ বাইরের লোকের নজরে পড়ে, সেসব কাঁচ কালো করে দেয়ার নির্দেশ জারি করা হয়। মেয়েদের একা একা ঘরের বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়। দাড়ি রাখা বাধ্যতামূলক করা হয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়। চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে কিছু কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ইসলামী সংগীত ছাড়া অসদ্ভাববর্ধক সংগীত নিষিদ্ধ করা হয়।

তালিবান সরকার ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখলের পর দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ এলাকার নিয়ন্ত্রণ লাভের পর থেকে তারাই দেশটি শাসন করে আসছেন। এরই মধ্যে তারা নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রেসিডেন্ট বুরহানুদ্দিন সমর্থক বাহিনী এবং আবদুর রশিদ দোস্তাম বাহিনী যারা উত্তর আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে এসে মাঝে মধ্যে উপদ্রব করে, তাদের সাথেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকেন। তালিবান সরকার শুরু থেকেই ঘোষণা করে আসছেন যে, তারা ইসলামী আদের্শর ভিত্তিতেই আফগানিস্তানকে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। সাবেক বুরহানুদ্দিন সরকারও ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের কথা বলতেন এবং তাদের মুজাহিদ দল ইসলামের কথা বলেই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইকে ইসলামী জেহাদ আখ্যা দিয়ে তার সূচনা করেছিল। কিন্তু রব্বানী সরকারের আমলে দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতা

www.pathagar.com

এবং সেই সরকার বাহিনী ও তাদের সমর্থকদের কারও কারও প্রতি শরীয়ত বিরোধী নানান আপত্তিকর কার্যকলাপে জনগণের বিশেষ অসন্তুষ্টি ও বিরক্তির পটভুমিতেই আফগানিস্তানে তালিবানদের প্রভাব বাড়তে থাকে। জনগণও তালিবানের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। এমনকি তাদেরকে মুক্তিদূত বলেও মনে করতে থাকে। মূলত তালিবান সরকারের প্রতি এই জনসমর্থনই তাদের ক্ষমতায় এতদিন টিকে থাকার ব্যাপারে প্রধান পুঁজি হিসেবে কাজ করে আসছে। অন্যথায় তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যুদ্ধ বিদ্যায় অভ্যস্ত জনগণের মধ্যে শক্ত কোনো জনশক্তি তালিবানের বিরুদ্ধে থাকলে পরন্তু প্রতিবেশী একাধিক দেশের সমর্থনপুষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্রোহী রাব্বানী-দোস্তাম বাহিনীর মাঝে মধ্যে হামলায় তালিবান সরকারের অনেক আগেই উৎখাত হবার কথা ছিল। কিন্তু তা না হওয়াতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তালিবান সরকারের দেশ পরিচালনা ও তাদের নীতি আদর্শের প্রতি জনসমর্থন রয়েছে, আর সেই সমর্থনের ভিত্তিতেই তারা নিজ দেশ-জাতিকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকে নিজেদের ধারণা মতে নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত তালিবান সরকারের সেই চেষ্টার অংশ হিসেবেই তাদের সরকার পরিচালিত "রেডিও শরীয়ত"-এ আফগানিস্তানে টেলিভিশন, ভিসিআর এবং স্যাটেলাইট ডিশ নিষিদ্ধের ঘোষণাটি এসেছে।

সমাজ চরিত্রে ক্ষতিকর প্রভাবের প্রেক্ষিতে স্যাটেলাইট ডিশ নিষিদ্ধের ব্যাপারটি নতুন ব্যাবহার নয়। উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট সরকার, ভুটান সরকার, মালয়েশিয়া এবং সৌদী সরকারও তাদের দেশে স্যাটেলাইট নিষিদ্ধ করেছেন। কোনো মুসলিম দেশের সরকার যদি তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা ইসলামী অনুশাসনের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চায়, তারা যদি ইচ্ছা করে গোটা জাতিকে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও খোলাফা-ই-রাশেদীনের সোনালী যুগের আদর্শে গড়ে তুলতে এবং দেশে শোষণমুক্ত জনকল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে চায় , তাতে তো ন্যায়, সুন্দর ও শান্তিকামী কোনো মুসলমানের আপত্তি থাকার কথাই নয়, এমনকি অন্যায়, অবিচার, শোষণ-বঞ্চনা ও যৌন অনাচারমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ সমাজ প্রত্যাশী কোনো শান্তিকামী অমুসলিম জাতিরও তাতে আপত্তি করাটা হবে অন্যায়। কারণ নিজ জাতিসত্তার পরিচিতি, স্বকীয়তা, জাতীয় ধর্ম-আদর্শ, সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার সকল জাতিরই রয়েছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখন, যদি কোনো জাতি বা সরকার আপন স্বকীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে অযৌক্তিক কোনো কিছু করতে শুরু করে, যাতে সে যেই স্বকীয়তা ও আদর্শ রক্ষার জন্যে সদিচ্ছা নিয়ে কাজ করছে, তা যৌক্তিক বা সঠিক না হয় বা সংশ্লিষ্ট জাতি ও অন্যের ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ব্যাপারটি যদি কোনো মুসলিম সরকারের হয়, তাহলে তাতে ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়ে এ ধর্ম এবং অন্য দেশের মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাহত করতে পারে তা ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বময় সৃষ্ট নতুন আগ্রহকে। পরন্তু উক্ত সরকার যেসব শরীয়তী বিধান চালু করবে,

www.pathagar.com

সেগুলো শরীয়তের প্রধান প্রবর্তক নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর আদর্শের বরখেলাফ হলে তো প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই বাধ্য।

প্রশ্ন হচ্ছে, তালিবান সরকার শরীয়ত রক্ষায় এ পর্যন্ত আফগানিস্তানে যেসব বিধান জারি করে আসছেন, এ সকল বিধান এই মানদণ্ডে কতটুকু সঙ্গত আর কতটুকু অসঙ্গত? বিষয়টি নানান কারণে দেশে বিদেশে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে এ সরকার যখন সম্প্রতি টেলিভিশন, ভিসিআর এবং স্যাটেলাইট ডিশ নিষিদ্ধ করেন এবং এগুলো ভেঙ্গে ফেলার সরকারি হুমকি আসে, তখনই এ নিয়ে কোনো কোনো মহলে জল্পনা-কল্পনা হতে থাকে।

টেলিভিশন, ভিসিআর এবং স্যাটেলাইট ডিশ মানবজ্ঞান উদ্ভাবিত অতি প্রভাবশালী প্রচার মাধ্যম। এর মাধ্যমে ভালো-মন্দ যা প্রচার করা হবে, সেটাই প্রচারিত হবে। ভালো কিছুর প্রচাঁর হলে সমাজ চরিত্রে তার ভালো প্রভাব পড়বে। মন্দ বিষয় প্রচারিত হলে মন্দ প্রভাব পড়বে।

তাই তালিবান সরকার কর্তৃক এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি অনেকের কাছেই অযৌক্তিক বিবেচিত হয়েছে। যাতে আধুনিকমনা কোনো কোনো মুসলমানও বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

এদিক থেকে স্বভাবতই বলতে হয়, ইসলামে হালাল-হালাম স্পষ্ট। তেমনি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে খোদ মহানবী (সঃ) ও তাঁর সাহবা-এ-কেরাম কিভাবে সমাজ থেকে ইসলাম বিরোধী রীতি নিয়ম উচ্ছেদ করেছেন কিংবা ইসলামী শরীয়ত বিরোধী কাজের শাস্তি দিয়েছেন, তার উজ্জ্বল নিয়ম ও দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যে কোনো মুসলমান তারই অনুসরণ করবে। তারপরও কোনো কিছুর প্রশ্নে হালাল-হারাম এদুয়ের কোনো একটি নির্ণয়ে সংশয় দেখা দিলে, সে ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবা-এ-কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্থিরিকৃত নীতির আদর্শে তার বৈধতা, অবৈধতা নির্ধারণের ব্যবস্থা রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, শত যুগবিবর্তনের পরও ইসলামী আইন-কানুন ও নিয়ম-বিধির কার্যকারিতা যেখানে যুগ, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল নির্বিশেষে যথাযথভাবে প্রযোজ্য, সে ক্ষেত্রে আফগানিস্তান হোক কি অপর মুসলিম সমাজে তারই যেমন অনুসরণ করা উচিত, তেমনি শরীয়তের যৌক্তিক এসব আইনের বিরুদ্ধাচরণকারীদের শাস্তিদানের বিষয়টিও একই মানদণ্ডের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য। কোনো অবস্থায়ই ইসলামী শরীয়তের মৌল বিধানের তা পরিপন্থী হওয়া সঙ্গত নয়। ইসলাম একটি যৌক্তিক জীবনব্যবস্থা, যারা সজাগ থেকে ঘুমের ভান করে, তারা এর অনুসরণে বিরুদ্ধাচরণ ও সমালোচনা করবেই, কিন্তু যারা এই শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী এবং এর মৌল বিধান কুরআন-সুন্নাহ, তথা নবী জীবনের আদর্শ ও সাহাবায়ে কেরামের নীতি বিরুদ্ধ কোনো কিছুই মানতে রাজি নয়, ঐ সকল মৌল নীতিমালা ও এ সমস্ত নিষ্ঠাবানদের দৃষ্টিতে কোনো কিছু অযৌক্তিক বলে চিহ্নিত হলে, আফগানিস্তানের তালিবান সরকার হোক বা অপর কোনো দেশের মুসলিম সরকার, সে সময় তাদের এটি পুনর্বিবেচনা করে দেখা উচিত। যাতে ইসলামের দুশমনরা এসবকে উদাহরণ

www.pathagar.com

হিসেবে পেশ করে ইসলামের বিরুদ্ধে আধুনিক মন-মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের বিভ্রান্ত করতে না পারে।

তালিবান সরকারের শরীয়তী অনুশাসন চালু করতে গিয়ে কোথাও ভুলভ্রান্তি করা যেমন অসম্ভব নয় তেমনি স্যাটেলাইট ডিশচালিত টিভিতে প্রচারিত দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কি কি বিরূপ প্রভাব মানব চরিত্রের উপর পড়ছে এবং আমাদের সমাজসহ অন্যান্য সমাজে নারী ধর্ষণ, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, ছিনতাই, খুন, রাহাজানি, নির্লজ্জতা ইত্যাদি অপরাধ প্রবণতা ও অশ্লীলতার প্রসার দানে ডিশ ব্যবস্থা কি ঘৃণ্য জঘন্য ভূমিকা রাখছে, তাও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকদের ভেবে দেখতে হবে। সম্প্রতি সমাপ্ত বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চিত্তবিনোদনের নামে নারী নামের একশ্রেণীর জীবের যেসব অশ্লীল ছবি প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখা গেছে, মানব সভ্যতা বিরোধী এসবের প্রতি লক্ষ্য করে তালিবানের জারিকৃত অনুশাসনের মূল্যায়ন করাই ন্যায়নীতির দাবী। তেমনি এই বাস্তবতাও অস্বীকারের উপায় নেই যে, কোনো দেশে কোনো জাতির বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে যখন কোনো বিপ্লব সংঘটিত হয়, তা ইঞ্চির মাপে আসে না। সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীরা তাদের বিপ্লবকে সুসংহত করার আগ পর্যন্ত সেখানে সংস্কারমূলক কাজে বেশ কিছু সময় ব্যয় হয়। তখন কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে সর্বত্রই দেখা গেছে। এভাবে কাংখিত সমাজের অবকাঠামোগত দিক মজবুত করার পর তারা নিজস্ব আদর্শের মানদণ্ডে যখন সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনার কাজ চালায়, তখনই তাদের উক্ত আদর্শের সুফল-কুফল সামনে আসে। তালিবানরা সেই সুযোগটি পেলো কোথায়? তারপরও তারা এক প্রকার বলতে গেলে সকল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের এ যাবত যেটুকুন প্রতিষ্ঠা করেছে, তার সুফলই আফগানদেরকে এখনও তাদের সমর্থনে অটল রেখেছে বলে জানা যায়। তালিবান সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী তারা যদি নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বীয় আদর্শের ভিত্তিতে সাজাবার লক্ষ্যে বেসরকারি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নির্ধারিত সময়ের জন্যে বন্ধ রাখে কিংবা নারী পুরুষের সাবেক কর্মস্থলগুলো আলাদা করে নারীদের জন্যে আলাদা কর্মস্থলের ব্যবস্থা করা পর্যন্ত এরূপ প্রতিষ্ঠানে তালা লাগান, সেটাকে গতানুগতিক পশ্চিমা মানদণ্ডে বিচার করাই বা কতদূর সঙ্গত? মিসর পশ্চিমা সভ্যতা কালচার ও জীবনবোধকে গ্রহণ করে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রই আধুনিক হয়েছে, কিন্তু সেখানকার সামাজিক অবস্থা কি অধিক শান্তিময় হয়েছে? নামায মানুষকে গর্হিত অবাঞ্ছিত কাজ এবং যাবতীয় অন্যায় প্রবণতা থেকে বিরত রাখে বলে খোদ্ আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন। সেক্ষেত্রে সমাজ নাগরিকদের চারিত্রিক অবক্ষয়জনিত অপরাধপ্রবণতা থেকে জাতিকে রক্ষাকল্পে নাগরিক চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব পালন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দায় পরিণত করার জন্যে যদি তালিবান সরকার নামায বাধ্যতামূলক করেন, তাতে কি তারা বড় রকমের অপরাধ করে ফেললেন? কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে রক্তক্ষয়ি হামলায় কতো লাখ মানুষ হত্যা করা হয়েছিল? অতঃপর সেই সরকারের আমলে ঐ দেশ কাউকে

www.pathagar.com

কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলার অনুমতি ছিল কি? তদ্রূপ আপগানিস্তানের অভ্যন্তরে বর্তমান অবস্থায় কেউ সেবামূলক কাজ কিংবা অপর ছুতানাতায় ঢুকে আফগান মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করবে আর তালিবান তাতে বাধা দেবে না, এটা কি করে হয়?

তারপরও আমরা মনে করি, আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের পক্ষ থেকে ইসলামের কাজ করতে গিয়ে এমন কিছু করা সঙ্গত নয়, যা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিকর এবং ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। মুখে দাড়ি রাখার জন্যে অন্তরে দাড়ি গজানোর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তা না করে দাড়ি রাখা এখনই বাধ্যতামূলক করা, খেলাধূলার কোনো কোনোটির ব্যাপারে আপত্তি, নারীদের ঘর থেকে বের হতে না দেয়া-এ শ্রেণীর বিষয় ও অন্য ছোটখাটো বিষয়ে ইসলামী বিপ্লব সংহত করার আগে হাত দিলে মুসলমানদের মধ্যেই ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। ঐ এলাকাতেই সাইয়েদ আহমদ শহীদ ব্রেলভীর ইসলামী আন্দোলনের শেষ দিকে ব্যর্থতা ঘটেছিল, মূল বিষয় মজবুত না করে ছোটখাটো বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়ায় জনগণ বিভ্রান্ত হবার দরুন তা হয়েছিল। সে কথাও সংশ্লিষ্টদের স্মরণ রাখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ইসলাম যেখানে যতটুকু যা করতে বলেছে তার বাইরে যাওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। কোন বিষয়ে দ্বিমত বা বিতর্কের অবকাশ থাকলে, তাকে ঐ পর্যায়েই রাখা দরকার, এ ধরনের কোন মত কারও উপর চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়।

নতুন বসনিয়া কসোভো সমস্যা কোন পথে

[প্রকাশ ঃ ২. ৮. '৯৮ ইং]

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বসনিয়ার মতো যুগোশ্লাভিয়ার অন্যতম প্রদেশ কসোভোতে সার্বদের দমন নীতি চলছে। কসোভোবাসী এবং সার্ব সৈন্যদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। তবে গতকালকের সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী কসোভোর স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষে যুগোশ্লাভ সেনাবাহিনীর দু'জন অফিসারসহ ৪ জন সৈন্য নিহত হয়েছে। সেনাবাহিনীর এক বিবৃতির বরাত দিয়ে তানজুগ বার্তা সংস্থা জানায়, নিহতদের মধ্যে একজন মেজর এবং একজন ক্যাপ্টেন রয়েছেন। অপর এক খবরে প্রকাশ, যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসিভিচ ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনীতিকদেরকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তার সরকার কসোভোয় আক্রমণ বন্ধ করবে। এই কূটনীতিকরা বলেন, শুক্রবার রাতের হামলায় কসোভোর বিশাল এলাকা পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

১৯৮৯ সালে যখন সার্বীয়রা কসোভোর স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে প্রদেশটিতে মার্শাল'ল জারি করে তখনই তার প্রতিবাদে সেখানে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। দখলদার সার্ব প্রশাসনের কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৯১ সালে কসোভোতে গণভোট

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হয়। জনগণ সেই গণভোটে স্বাধীন কসোভোর স্বপক্ষে নিজেদের রায় প্রদান করে এবং কসোভো প্রজাতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন মুহাম্মদ ইবরাহীম রগূদা। ৯৮ সালের ২২শে মার্চ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবার কথা ছিল। এই নির্বাচনকে বানচাল করার জন্যই কসোভোয় সার্ব সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী বেসামরিক জনপদে সামরিক অভিযান চালায়। কসোভো প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ইবরাহীম রগূদা কঠোর নীতি অবলম্বনের বিরোধী। বিনা রক্তপাতে তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা লাভে প্রত্যাশী। সুতরাং তিনি দখলদার যুগোশ্লাভীয় সরকারের সাথে সন্ধি করতে চান। ১৯৯৬ সালে তাঁর এবং স্লোবোদান মেলোসিভিচ-এর মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে আলবেনীয় বংশোদ্ভুত মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারি বিদ্যালয়ে ফিরে এসে নিজেদের শিক্ষা চর্চা অব্যাহত রাখতে পারবে।

এই চুক্তিতে যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মেলোসিভিচও স্বাক্ষর করেন। যদিও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। এই ঘটনার পরই ৯০ সালে কসোভোর শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধিবাসী যুগোশ্লাভীয় সরকারের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ে। তাতে ইবরাহীম রগূদার ভাব মর্যাদাও স্বভাবতই ক্ষুণ্ন হয়। তার সবচাইতে বড় ক্ষতি হয়েছে এই যে, জনগণ আর এখন তাঁর শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে কসোভো সমস্যার সমাধানে বিশ্বাস করছে না। কেননা, মেলোসিভিচের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়ন এখন অনিশ্চিত। এ কারণেই কসোভো পণতান্ত্রিক লীগ LKD- এর সহ-সভাপতি ফেহ্মী আগানী প্রদেশটির পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন। এভাবে এই সংগঠনের সেক্রেটারী এবং সাবেক নির্বাসিত প্রধানমন্ত্রী বুয়ার বকৌষীও বলেন যে, এখন স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। উল্লেখ্য, যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষ থেকে কসোভোর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বাতিলের পর কসোভোর পার্লামেন্টের আলবেনীয় এবং তুর্কী বংশোদ্ভুত মুসলিম সদস্যরা ১৯৯০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর "স্বাধীন কসোভো প্রজাতন্ত্রে'র সংবিধান ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর ৬ জন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয় এবং অবশিষ্ট নির্বাসিত হন। বুয়ার কৌসী'কেও নির্বাসন দেয়া হয়। তখন থেকেই তিনি ইউরোপী দেশসমূহে স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকেন। তাঁর ধারণা, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ এই মুহূর্তে কাজে লাগতে পারে। কসোভোর অধিবাসীরা বর্তমানে নিজেদের অধিকারসমূহের ব্যাপারে সোচ্চার। তারা চায়, কসোভোর পূর্ণ স্বাধীনতা। তাদের ধারণা এই মুহূর্তে দেশটিকে স্বাধীন করা না হলে সার্বীয়রাও বসনিয়ার মুসলমানদের মতই কসোভোর মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান শুরু করবে এবং বসনিয়ার মতই মুসলমানদের জমি-জিরাত, ভিটে-মাটিতে সার্ববংশীয় লোকদের এনে বসাবে। যেমন, ইসরাইল জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে আল কুদ্সসহ অধিকৃত অন্যান্য এলাকায় ইহুদী বসতি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

এল কে ডি'র অপর নেতার নাম হলো আদম দেমাচী। তিনি আন্দ্রে চাখারভ পুরস্কারে ভুষিত। যুগোশ্লাভিয়া কারাগার থেকে ২৮ বছর কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তি পেয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর মত হলো তিনি শধু কসোভোতে মানবাধিকার লংঘনেরই

www.pathagar.com

প্রতিবাদের পক্ষপাতি। স্বাধীনতার বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্য তাঁর নেই। তাঁর মতে আমেরিকা ইউরোপ বরং গোটা পাশ্চাত্যমহল এবং রাশিয়া কসোভোর স্বাধীনতার বিরোধিতা করবে। সুতরাং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার বদলে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ফরমূলা নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। তাঁর মত অনুযায়ী যদি সার্বিয়ার নতুন নিগ্রো এবং কসোভোর মধ্যে কনফেডারেশন গঠন করা হয়, তাহলে এ ব্যাপারে হয়তো সার্ব বংশীয়রা রাজি হবে। বর্তমানে আদম দেমাচী হচ্ছেন কসোভোর মানবাধিকার রক্ষা কমিটির সভাপতি।

পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হচ্ছে কসোভোর শতকরা ৯৫ ভাগ অধিবাসীর মতই হলো দেশটির পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা। কারণ যুগোশ্লাভীয় সরকার এখানে মূলত কনফেডারেশনের বদলে একক সরকারই গঠন করতে আগ্রহী। যেমন ১৯৮৯ সালে তাদের কসোভোর স্বায়ত্তশাসন বাতিল করা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, যুগোশ্লাভিয়া কসোভোকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ করতেও প্রস্তুত নয়। এমতাবস্থায় সে কিভাবে কনফেডারেশন পদ্ধতি মেনে নেবে, যেখানে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রই থাকবে স্বাধীন? এছাড়া কনফেডারেশন পদ্ধতিতে মাত্র কয়েকটা ব্যাপারেই কেন্দ্রের ক্ষমতা থাকবে। যুগোশ্লাভিয়ার পার্লামেন্ট ১৯৯০ সালের জুন মাসে কসোভো পার্লামেন্ট এবং বিচার বিভাগকে ভেঙ্গে দিয়ে এগুলো সরাসরি কেন্দ্রের হাতে নিয়ে যায়। অতঃপর ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে কসোভোর স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে। তারা প্রদেশটির জন্য নির্বাচিত নেতাকে বরখাস্ত করে। তারপর থেকেই কসোভোর সরকার এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে এক হাজার মুসলিম কর্মচারীকে বহিষ্কার করে আর তাদের স্থলে সার্বদেরকে নিয়োগ দান করে। ক্ষেত-খামার এবং সকল চাষাবাদযোগ্য জমি-জিরাত থেকে মুসলমানদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের সম্পদ-সম্পত্তি বসনিয়া এবং ক্রোশিয়া থেকে আগত সার্বদেরকে দিয়ে দেয়। বসনিয়ায় যুদ্ধকালে ক্রোশিয়া থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার সার্ব বাসিন্দা কসোভোতে আসে এবং এখানে বসবাস করছে। স্থানীয় জনগণের (মুসলমান) পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ আসলে তাদের বাড়ি-ঘরের উপর হামলা করা হয় এবং তাদের প্রতি চরম কারানির্যাতন চালানো হয়।

একটি চক্রান্তের ভিত্তিতেই কসোভো থেকে মুসলিম উচ্ছেদের সূচনা করা হয়। মূলতঃ তারই অংশ হিসেবেই কসোভোর মুসলমানদের উপরে আজ নির্যাতন চলছে। তাদেরকে পানি পর্যন্তও সরবরাহ করা হচ্ছে না। হাসপাতালসমূহ থেকে মুসলমান কর্মচারীদের বহিষ্কার করে দেয়া হচ্ছে। কসোভোর উপদ্রুত এলাকায় মুসলিম শিশুদের মৃত্যুহার ক্রমবৃদ্ধি পেতে চলেছে। বর্তমানে কসোভোতে অর্ধেকেরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যেন মুসলিম শিশুরা শিক্ষা লাভ করতে না পারে। অবশিষ্ট বিদ্যালয়সমূহে সার্ব জাতিগোষ্ঠীর লোকদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে। স্থানীয় মুসলিম অধিবাসীদের মাত্র ছাত্র-ছাত্রীকে ২০ জন শিশুকে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়সমূহে ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়েছে। অপরদিকে শতকরা হিসেবে ১১৭ জন সর্ব শিশুকে ঐ সকল বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। কসোভোর পাঠ্যসূচীতে আলবেনীয়

www.pathagar.com

ভাষা ও ইতিহাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার স্থলে চালু করা হয়েছে সার্ব ভাষা। রেডিও টেলিভিশন থেকে আলবেনীয় ভাষায় সকল প্রকার প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আলবেনীয় ভাষায় যে একটি সংবাদপত্র ছিল তাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ মানবাধিকার বিরোধী এই দমন নীতির সামনে অতিষ্ঠ হয়েই কসোভোর জনগণ মুক্তির লড়াই শুরু করেছে। প্রতি মুহূর্তেই সেখানে কসোভো মুক্তিযোদ্ধা তৈরি হচ্ছে। সম্পূর্ণ গোপনীয়তা ও সতর্কতার সাথে এ সংগঠনের কাজ চলছে, যাতে বৈরী শক্তির কেউ এর ভিতর ঢুকে পড়তে না পারে।

কসোভোর আলবেনীয় বংশোদ্ভুত জনগণের উপর যে নির্যাতন নিপীড়ন চলছে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বসনিয়ার মতো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে জাতিসংঘ ও তার ঠিকাদার আমেরিকা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। বরং তারা কসোভোর মুক্তি ফৌজকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে প্রকারান্তরে সার্বদেরকেই উস্কানি দিয়েছে। অবশ্য তা নতুন কোন ব্যাপার নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য যে, ঔপনিবেশিক শক্তি পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে সকল সময় সন্ত্রাসী বলেই আখ্যা দিয়ে আসছে অথচ কোনো দেশ-জনপদে খোদ বৈদেশিক দখলই একটি সন্ত্রাসী কাজ।

যেহেতু এখন কসোভোর মজলুম জনতা মরণপণ সংগ্রামের মাধ্যমে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে বদ্ধপরিকর, তাই ইউরোপীয় সম্প্রদায়, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘ উঠে পড়ে লেগেছ, যাতে কসোভো যুগোশ্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না পারে। এতে বলকান অঞ্চল নাকি অস্থিতিশীলতার শিকার হয়ে পড়বে। আসলে তাদের আশংকা হলো, কসোভোর দক্ষিণে অবস্থিত মেকডোনিয়াতে অনুমান যেই ৪ লাখ আলবেনীয় বংশোদ্ভূত লোকের বাস তারা সীমান্ত পার হয়ে তাদের গোত্রীয় ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। সেখান থেকে যুদ্ধ উপকরণ ও রসদাদিও পৌঁছুতে পারে। তেমনি আলবেনিয়ার সীমান্তও কসোভো সীমান্তের সাথে সংযুক্ত। ঐ সীমান্ত পথে এই উভয় দেশের জনগণ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে।

সার্বরা সম্পূর্ণ ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার ভিত্তিতেই প্রথমে বসনিয়ার মুসলমান এবং বর্তমানে কসোভোর মুসলমানদের বংশ নিধনের কাজ শুরু করেছে। তাতে আলবেনীয়দের মধ্যে স্বগোত্রীয় সমবেদনা এবং অত্যাচারী সার্বদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। কসোভো মেসোডোনিয়ার আলবেনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভূখণ্ডের সাথে কনফেডারেশন করলে একটি বড় ধরনের কনফেডারেশন হতে পারে। তাদের ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি সকল কিছুই অভিন্ন অথচ ইউরোপী সম্প্রদায়ের ১৫টি দেশের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মীয় যোগসূত্র ছাড়া একটি অপরটি থেকে নানান দিক থেকে স্বতন্ত্র। ক্রুসেডধারী ইউরোপীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো এক হতে চাইলে তাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হলে মুসলমানরা এক হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও সেখানে আঞ্চলিক অস্থিরতার প্রশ্ন এসে দেখা দেয়। মুসলিম উম্মাহ বিরোধী এই চক্রান্ত ঔপনিবেশিক শাসকদের বহু পুরাতন। ১৬শ' শতক থেকেই তাদের এই চক্রান্ত শুরু হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এর একমাত্র সমাধানই হচ্ছে

www.pathagar.com

জেহাদ। আর কসোভোর জনগণ আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে ন্যায়বিচারের প্রতিক্ষার পর নিরুপায় হয়ে সেই লক্ষ্যেই জেহাদ শুরু করে দিয়েছে।

গত ১৫ জুন ৯৮ ইউরোপীয় মিত্র গোষ্ঠী কসোভোর জন্যে ৪ দফা সম্বলিত এক ঘোষণা প্রদান করে। তাতে যুগোশ্লাভিয়াকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, (১) কসোভো থেকে অবিলম্বে সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে, (২) জাতিসংঘ পর্যবেক্ষককে কসোভো যাবার অনুমতি দিতে হবে, (৩) সার্ব নির্যাতনের শিকার মজলুম কসোভোবাসী যারা অন্য দেশে চলে গেছে, তাদের শান্তিপূর্ণ পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা দিতে হবে, (৪) বিবদমান পক্ষদ্বয়ের আলোচনা বৈঠকে বসতে হবে। ইউরোপী ইউনিয়ন যুগোশ্লভিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচকে গোটা পরিস্থিতির জন্যে দায়ী করে সতর্ক করে দিয়েছে যে, রক্তপাত অব্যাহত থাকলে সামরিক ব্যবস্থাও গৃহীত হতে পারে। কিন্তু ব্রিটেন এ ব্যাপারে আপত্তি তুলেছে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, ন্যাটো কর্তৃক কোনো সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। ইউরোপী সম্প্রদায় বলেছে যে, কসোভোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন বহাল করা দরকার, তবে স্বাধীনতার কথা মানা যায় না। অথচ এটি সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। বরং অবাস্তবও। ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেই নির্দেশ দিয়েছে, তাও এক মাস হয়ে গেছে কিন্তু এখনও কসোভো থেকে সাব সৈন্য প্রত্যাহারের নামগন্ধ নেই। তারা স্থানীয় বাড়ি ঘরসমূহ বেষ্টন করে সেখানে ধরপাকড়, লুট অব্যাহত রেখেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার অভিযোগ অনুযায়ী সার্ব সৈন্যরা নাগরিকদের বাড়িঘরের উপর হামলা চালাচ্ছে এবং অন্যায়ভাবে তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রতি জুলুম নিপীড়ন চালাচ্ছে। সার্বদের অত্যাচার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অবশ্য এই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রমী গেরিলাদের আক্রমণও চলছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো কসোভোর চার হাজার দু'শ তিন বর্গমাইল এবং এর বিশ লাখ অধিবাসীর বিরুদ্ধে তারা কত লড়াই করবে এবং কত ঘেরাও দেবে? কসোভোবাসীদের সকলেই এখন গেরিলা। এ কারণেই মার্কিন কুটনীতিক রিচার্ড হলব্রুক কর্তৃক বিবদমান দু'গ্রুপকে আলোচনার টেবিলে বসাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। কারণ, তারা জানে না, লীগ অব কসোভো ডেমেক্রেটিক সংগঠন কসোভোবাসীর প্রতিনিধিত্ব করছে না কেএলএ অর্থাৎ 'কসোভো লিবারেশন আর্মি'। তারা এও অনুমান করতে পারছে না যে, কসোভো কি স্বায়ত্তশাসনে সন্তুষ্ট না স্বাধীনতায়। এসব প্রশ্নের জবাব জানতে হলে সালিসকারী আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কসোভো মুক্তিসেনাদের সাথেই কথা বলতে হবে। এ ব্যাপারে প্রথমোক্ত ৬ সদস্যবিশিষ্ট যোগাযোগ কমিটিই উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে বলে মনে হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ৮ই জুলাই ৯৮ জেনেভায় অবস্থিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের জাতিসংঘ হেড কোয়ার্টারে কসোভোর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সাংবাদিকদের জানিয়েছে, কসোভো সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের সময় অতীত হয়ে গেছে। প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা ছাড়া কসোভোবাসীর সামনে আর কোন বিকল্প পথ নেই। আমরা এখন মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত। এই যুদ্ধ সেদিনই শেষ হবে যেদিন কসোভোর স্বাধীনতা সূর্যের

www.pathagar.com

উদয় ঘটবে। দখলদার সার্ব আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি কসোভো থেকে বিদায় হবার আগ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধবিরতি করবো না। কসোভো মুক্তিযোদ্ধাদের এই গ্রুপের নেতা হলেন মাহমুদী বরদাল। তিনি কসোভো গণমুক্তি আন্দোলনের মুখপাত্র বলে নিজের পরিচয় দেন। এই নতুন সংগঠনটির বিস্তারিত বিবরণ এখনও সামনে না আসলেও এটিকে কসোভো মুক্তিফৌজ (Kosovo Liberation Army) এর রাজনৈতিক অঙ্গ মনে করা হয়। মাহমুদী বরদাল বলেন, সুইজারল্যান্ড হচ্ছে তাদের একটি কেন্দ্র। আলবেনীয় বংশোদ্ভূত বহু লোক সুইজারল্যান্ডে অবস্থান করে। তারা কসোভোর মুক্তিফৌজদের অর্থবিত্ত দিয়ে সাহায্য করে। জনাব বরদাল ১৯৯১ সালে সুইজারল্যান্ডে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় আইনের অনুগত থাকেন।

পরিস্থিতি সার্বিক পর্যালোচনায় মনে হয়, কসোভো সমস্যার সমাধানে বিশ্বসংস্থা যদি বাস্তবতার আলোকে পদক্ষেপ নিয়ে স্বাধীন কসোভোর বিষয়টিকে প্রাধান্য না দিয়ে শুধু স্বায়ত্তশাসনের কথা বলে, তাহলে যেমন এটি বাস্তবধর্মী হবেনা। তেমনি কসোভো সমস্যারও সমাধান হবে না। সুতরাং বিশ্বসংস্থা কসোভোতে যদি বসনিয়ার মতো রক্তপাত দেখতে না চায় তাহলে নিষ্ঠাসহকারে বাস্তবতাকে স্বীকার করে স্বাধীন কসোভোর চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েই এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োসী হওয়া উচিত।

আত্মরক্ষা, স্বাধিকারের সংগ্রাম ও সন্ত্রাস

[প্রকাশ ঃ ৩১. ৮. '৯৮ ইং]

বিপুল অর্থবিত্ত, জনবল, অস্ত্রবলের অধিকারী পরাক্রমশালী স্বেচ্ছাচারী দাম্ভিক শাসকদের বর্ননা ইতিহাসে কম নেই। এসব শাসকের অনেকেরই চরিত্র ছিল নদীর উজানে অবস্থানকারী হিংস্র ব্যাঘ্রের অনুরূপ। নদীর ভাটিতে অবস্থানকারী মেঘ শাবকের উষ্ণ রক্তের লোভে ব্যাঘ্রটি মেষ শাবকের বিরুদ্ধে 'পানি ঘোলা করার' অভিযোগ এনেছিল। তখন ব্যাঘ্রের দাম্ভিকতাপূর্ণ স্বার্থান্ধ চিন্তা তাকে অভিযোগটির যৌক্তিক অযৌক্তিক দিক খেয়াল করতে দেয়নি। ঠিক তেমনি অপর দেশের বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় পদক্ষেপের মুহূর্তে ঐ শ্রেণীর শাসকদেরকেও তাদের দাম্ভিকতাপূর্ণ স্বার্থান্ধ চিন্তা তাদেরকে যৌক্তিক ও ন্যায়ের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ গঠিত হলে মানবাধিকার, স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্র, মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা সনদ পাস হয়। তাতে বিশ্ববাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ভাবলো অতীত শাসকদের সেই স্বেচ্ছাচারী যুগের বোধহয় অবসান ঘটলো। এবার স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের স্বাদ উপভোগ করা যাবে। যখন-তখন যার-তার অন্যায়-অযৌক্তিক আক্রমণের শিকার হয়ে দুর্বিষহ জীবনের গ্লানি বহন করতে হবে না। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, জাতিসংঘের ঐ সনদ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেই মোতাবেক এর সুফল প্রাপ্তি বিশ্বের অনেক দেশের জনগণের ভাগ্যেই জোটেনি। জাতিসংঘের ছত্রচ্ছায়ায় কিংবা তার নাম

www.pathagar.com

ভাঙ্গিয়ে অথবা নিজেদের বলিষ্ঠ প্রচার মাধ্যমের সুবাদে বিশেষ বিশেষ দু'একটি শক্তি পুরোপুরি নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের কাজ করে গেলেও পৃথিবীর কিছু কিছু ভূখণ্ডের মানুষ এখনও সবল-দাম্ভিক শাকদের চক্রান্ত ও স্বেচ্ছাচারের নির্মম শিকার হয়ে আছে।

এর বহু উদাহরণসহ স্বাধীন সার্বভৌম দু'টি দেশ সুদান ও আফগানিস্তানের উপর মার্কিন ক্রুজ মিসাইলের সাম্প্রতিক হামলা নতুন করে আরেকটি উদাহরণ আমাদের সামনে তুলে ধরলো। স্মরণ করিয়ে দিল, নদীর ভাটিতে অবস্থানকারী মেষ, শাবকের বিরুদ্ধে নদীর উজানে অবস্থানকারী হিংস্র ব্যাঘ্র কর্তৃক পানি ঘোলা করার সেই বিখ্যাত অযৌক্তিক অভিযোগটির কথা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন যেই সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে আফগানিস্তান ও সুদানের উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে শক্তি, মদমত্ততা ও দাম্ভিকতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, সেই অভিযোগ কতদূর সত্য, না তাদের বড়ত্বের দাপট ও সর্বাধুনিক প্রচার মাধ্যমের জোরে একটি অন্যায় ও অসত্যকে সত্যের অলংকার পরানো হলো তার স্বরূপ ধীরে ধীরে উদঘাটিত হতে শুরু করেছে।

তার আগে বলে রাখতে হয়, সন্ত্রাস, একটি অমানবিক কাজ। কোনো যুক্তিতেই সন্ত্রাসকে সমর্থন করা যায় না। সন্ত্রাস দ্বারা ইসলামের ন্যায় সুমহান খোদায়ী আদর্শ তো প্রতিষ্ঠা সম্ভবই নয়, অপর কোন আদর্শও প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। জোরপূর্বক কেউ সেটাকে সম্বাবনার মধ্যে আনতে চাইলেও সন্ত্রাসের চাইতেও তাকে আরও বড় অপরাধে লিপ্ত হতে হবে। তারপরও সেই আদর্শের স্থায়িত্ব আসে না। নিকট অতীতে সন্ত্রাসী কায়দায় প্রতিষ্ঠিত কোনো কোনো মতবাদের নির্মম পরিণতি তারই প্রমাণ। ইসলাম সন্ত্রাসের মাধ্যমে আসেনি বলেই মুসলমানরা নিজেদের অযোগ্যতার মাঝখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে দীর্ঘদিন বিচ্যুত থাকা সত্ত্বেও গোটা মুসলিম জাতির জীবনের বিভিন্ন দিককে অবলম্বন করে এটি টিকে ছিল, এখনও আছে এবং আরও ভালভাবে থাকার প্রয়াস চালাচ্ছে। এই প্রয়াসই মার্কিনী শাসক ক্লিনটনদের চক্ষুশূল হয়েছে। তারা এই প্রয়াসকে কখনও সন্ত্রাস, কখনও মৌলবাদ আখ্যায়িত করছে। এই সামান্য প্রয়াসও বিল ক্লিনটনদের সহ্য হচ্ছে না। সুদান এবং আফগানিস্তান তাদের জাতীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাচ্ছে। তাই এ দু'টি দেশের উপর অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ক্রুজ মিসাইল হামলা চালাতে দ্বিধা করেনি। এই হামলার দ্বারা ক্লিনটন এক গুলীতে দুই শিকার করতে চেয়েছে-নিজের বিশ্বময় ছি ছি করা যৌন কেলেংকারী থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিকে ভিন্নদিকে ফিরাতে চেয়েছে। অপরদিকে রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী দু'টি দেশকে সন্ত্রাসের মিথ্যা অভিযোগ এনে এগুলোর উপর হামলা করেছে। অথচ ক্লিনটনের এই অভিযোগ যে ছিল সর্বৈব মিথ্যা, তারই সাক্ষ্য আপন মিত্র দেশ বৃটেনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্র ২০ আগস্ট রাতে আফগানিস্তানে ও সুদানে ক্রুজ মিসাইল হামলা চালাবার পর 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান' চালানো হয় বলে ঘোষণা করেছিল। বৃটেন তাৎক্ষণিকভাবে মার্কিন মিসাইল হামলাকে সমর্থন জানায়। কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই বিভিন্ন তথ্য নিয়ে বৃটেনের পররাষ্ট্র দফতর গত ২৮ আগস্ট এর বিরুদ্ধে তার সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করে। বৃটেনের পররাষ্ট্র দফতর মনে করে, যুক্তরাষ্ট্র খার্তুমে নিরপরাধ লক্ষ্যবস্তুতে মিসাইল হামলা করেছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মার্কিন প্রেসিডেন্টের যে হৃদয় আছে, সেটা পাষাণ-বধির, যে হৃদয় হাজার হাজার শিশু হত্যা করতে পারে, তা পাষাণ-বধির না হয়ে যায় না।... মার্কিন সৈন্যদের মায়েদের উদ্দেশ্যে তারা বলছে, "মুসলিম শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কারাগারে নিক্ষেপ ও তাদের ওপর অন্যায় বোমা হামলা করে যুক্তরাষ্ট্র ১২৫ কোটি মুসলমানকে প্রতিশোধ গ্রহণে উসকিয়ে দিচ্ছে"।

এ কথাগুলো মার্কিনীদের এককালের সমর্থনপুষ্ট উসামা বিন লাদিনের। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এসব কথার বক্তাটি কে বা কারা, সেটা বড় কথা নয়, তার চাইতে এ কথাগুলোর বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করাই সময়ের দাবী। নাইরোবি এবং তাঞ্জানিয়ায় সন্ত্রাসী বোমা হামলার জন্য মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এর নিন্দা প্রতিবাদ করেছে। উসামাও যদি আদালতে সুবিচারে দোষী প্রমাণিত হন, তিনিও মুসলমানের কাছে নিন্দিত হবেন। সন্ত্রাসকে কেউ সমর্থন করে না। সন্ত্রাসকে ইসলামী কাজ বলেও কেউ বক্তব্য দেয়নি। কাঁরণ সন্ত্রাসের দ্বারা যাদের প্রাণহানি ঘটে, তারা হয়তো জানেও না যে, কেন তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। আর এভাবে শুধু নিরপরাধ মানুষই নয় অপর কোনো প্রাণী হত্যা, এমনকি নিষ্প্রয়োজনে একটি গাছের তাজা পাতা ছেঁড়া ইসলাম সমর্থন করে না। অনুরূপভাবে কোনো অপরাধের জন্যে কোনো ব্যক্তিকে সন্দেহবশত সাজা দেয়াও ইসলাম অনুমোদন করে না। কাউকে শাস্তি দিতে হলে সুবিচারের মাধ্যমে তাকে প্রথমে অপরাধী হিসেবে প্রমাণ করতে হবে তা না করে সন্দেহবশতঃ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা ইসলামসহ পৃথিবীর সকল দেশের আইনেই অন্যায় বলে বিবেচিত।

অনেক সময় কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিচারে যা 'অপরাধ' বলে বিবেচিত, অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে সেটা 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য নাও হতে পারে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ইস্যুর প্রশ্নে এমনটির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যেমন, এক শক্তিশালী দেশ তার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা আধিপত্যবাদ কিংবা সম্প্রসারণবাদের দৃষ্টিতে একটি কাজকে অপরাধ বলে মনে করে অথচ আরও দশটি দেশের নিরপেক্ষ বিচারে সেটি অপরাধ নয় বরং তার ন্যায্য অধিকার আদায় কিংবা আত্মরক্ষার সংগ্রাম। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে কোনো ব্যক্তি বা দেশবিশেষের শাস্তি দেয়ার অধিকার থাকতে পারে না, আর পারে না বলেই এরূপ ক্ষেত্রে অন্যায় প্রাণহানি বা সম্পদহানির ঘটনা থেকে রক্ষাকল্পে বিশ্ব জাতিগোষ্ঠীসমূহের সংস্থা জাতিসংঘে ও আন্তর্জাতিক আদালতে এরূপ মোকদ্দমার অভিযুক্তদের বিচার হবার কথা। কিন্তু আফগানিস্তান ও সুদানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা করেছে, তা উল্লেখিত কোনো নিয়ম-নীতিরই আওতার পড়ে না। যেই উসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট সন্ত্রাসী তৎপরতার নায়ক বলে আখ্যায়িত করে জগৎজোড়া প্রচার করছে এবং জাহির করছে তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করার কাজকে মহৎ কাজ বলে প্রশ্ন জাগে, জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক কোন আদালতে তার বিচার হলো, যার ভিত্তিতে তার প্রাণনাশের এই বিরাট অভিযান চালানো হলো? এবং হত্যা করা হলো আফগানিস্তানের বহু নিরপরাধ যুবককে ক্রুজ মিসাইল হামলা করে? এসব প্রশ্নের জবাব বিশ্ববাসীর কাছে যুক্তরাষ্ট্রের

www.pathagar.com

দিতে হবে। আর যদি তারা শক্তি মদমত্ততা ও দাম্ভিকতাবশতঃ এসব প্রশ্নের জবাবদানের কোনো পরোয়া না করেন, তাহলে তাদের এটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, এসব হামলার মধ্যদিয়ে তারা নদীর উজানে অবস্থানকারী ব্যাঘ্রের চরিত্র ও মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন, যেখানে নদীর ভাটিতে অবস্থানকারী মেষ শাবকের রক্ত খাবার জন্যে তার বিরুদ্ধে হিংস্র ব্যাঘ্রটি পানি ঘোলা করার অযৌক্তিক অভিযোগ এনেছিল, যদিও ভাটির ঘোলা পানি কোনদিনই উজানে যায় না। এদিক থেকে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আফগানিস্তান ও সুদানে কোনো যুক্তিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করতে পারে না। পারে না এ দু'টি দেশের কোনো সম্পদ ও প্রাণহানি ঘটাতে। সুতরাং উসামা সুদানে গেছেন এ জন্যে সেখানে হামলা অন্যায়। ৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের চাপে উসামা সুদান থেকে বহিষ্কৃত হন এবং পাঁচ বছরে একাধিক দেশ সফর করেন। তাই বলে কি এসব দেশেও যুক্তরাষ্ট্র গিয়ে হামলা চালাবে? বলাবাহুল্য, জাতিসংঘ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার তোয়াক্কা না করে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন মুসলিম দেশের উপর যথাক্রমে '৭৯, '৮৩, '৮৬ ও '৯১ সালে হামলা করেছে আর গত ২০ আগস্ট আফগানিস্তান ও সুদানের উপর সে হামলা চালায়। এসব হামলার প্রতিবাদে সারাবিশ্বে যেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, তা এখনও অব্যাহত রয়েছে। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে শান্তিকামী প্রায় সকল দেশ ও সংস্থা-সংগঠনই যুক্তরাষ্ট্রের এই মিসাইল হামলাকে বড় সন্ত্রাসী কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। মুসলিম দুনিয়ার আনাচে-কানাচে এই মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা-ক্ষোভ ও বিরোধিতার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠেছে। তাদের এই ক্ষোভ উপেক্ষা করার মতো নয়। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার যে দু'টি দূতাবাসে সন্ত্রাসী হামলা ও প্রাণহানিতে ক্ষুব্ধ হয়েছে আজকের কসোভোতে ঠিক একই সন্ত্রাসী, নির্মমতার যাঁতাকলে সেখানে মানবতা ত্রাহি ত্রাহি করছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে। কিন্তু কৈ! সেসব মানব সন্তানের রক্ষায় ও তাদের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তো যুক্তরাষ্ট্রের মানব দরদের তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বসনিয়াতে লাখো মুসলিমের রক্তের দরিয়া প্রবাহিত এবং শত নারী পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধের বহু গণকবর সৃষ্টি হবার পরেও তারা মুখ রক্ষার জন্যে সমস্যা সমাধানে তৎপর হলেন, আজ পর্যন্ত গণখুনের খুনী নায়কদের বিচারে তো তাদের মিসাইল ছুটে যেতে দেখা যায় না? কাশ্মীরেই বা তারা মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় মানবতাবোধের কি পরিচয় দিয়েছেন? ফিলিস্তিনীদের রক্ত ঝরার উৎস তো তারাই টিকিয়ে রাখছেন। এসব মুসলিম ভূখণ্ডের মানুষদের রক্ত আর আফ্রিকায় মার্কিন দূতাবাসে নিহত লোকদের রক্ত সারা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ লাল বলেই জানে। তারপর মার্কিনীদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের রক্ত কেন অন্য রকম দেখায়, বিল ক্লিনটন নয়—খোদ আমেরিকাবাসীদের কাছেই আমরা এ প্রশ্নের জবাব চাই, যারা ক্লিনটনকে ভোট দিয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট বানিয়েছেন এবং যাদেরকে সে দেশের বিল ক্লিনটন সকল সময় ইসলামপন্থীদেরকে সন্ত্রাসী রূপে ধারণা দিয়ে আসছেন।

www.pathagar.com

সামূদ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের পরও কি ইরাক বিরোধী যুদ্ধোন্মাদনা থামবে?

[প্রকাশ ঃ ৫. ৩. ২০০৩ ইং]

আরও দশটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতোই ইরাক তার প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আল-সামূদ ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করেছে। সামূদ ক্ষেপণাস্ত্র মাত্র একশ পঞ্চাশ কিলোমিটার অভ্যন্তরে লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানতেই সক্ষম। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী ইরাকের নিজস্ব প্রতিরক্ষার অধিকার স্বীকৃত পরিষদ ইরাকের এই রেইঞ্জের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ এবং তা রাখার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদল মনে করে, এর রেইঞ্জ ১৫০ কিলোমিটার নয় বরং ১৬০ কিলোমিটার। তাই তারা অতিরিক্ত দশ কিলোমিটারকে অস্ত্র আইনের পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করে ইরাকের উপর তার কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ১০০ ক্ষেপণাস্ত্র সামূদ ধ্বংসের জন্যে চাপ দেয়। এগুলো ধ্বংসের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। শোনা যায় এর পরবর্তী পর্যায়ে কথিত জীবাণু অস্ত্র ও তা ধ্বংস করা নিয়ে আলোচনা শুরু হবে।

ইরাকের এসব অস্ত্রের রেইঞ্জের প্রতি লক্ষ্য করলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাতে যদি আশঙ্কা থাকে তো ইরাকের প্রতিবেশী দেশগুলোরই থাকার কথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্লেয়ারদের এত মাথাব্যথা ও বিচলিত হবার হেতু কোথায়? তারা তো ইরাক থেকে বহুদূরে! অপরদিকে ইরাকের প্রতিবেশীরা এ জন্যে বিচলিত না হয়ে বরং ইরাকের উপর হামলার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সেদিন আরব লীগের সকল নেতা একবাক্যে সম্ভাব্য এ যুদ্ধের বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, তারা এতে কিছুতেই অংশ নিবেন না এবং কেউ কেউ বলেছেন, জাতিসংঘের অনুমোদন ব্যাতিরেকে ইরাকের উপর এই হামলা মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন হিসাবেই চিহ্নিত হবে, যা কিছুতেই কারও অভিপ্রেত নয়। তারপরও ইরাকী মিসাইল সামূদের অতিরিক্ত ১০ কিলোমিটারকে এত বড় করে দেখাতে প্রশ্ন না জেগে পারে না যে, এর আসল রহস্য কোথায়?

এ প্রশ্ন জাগতো না যদি এক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতার অভিব্যক্তি না ঘটতো। কারণ, এটা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও জাতিসংঘ বরং প্রায় সকলেরই পরিজ্ঞাত যে, ইরাকের মাত্র ১৫০ বা ১৬০ কিলোমিটার রেইঞ্জের ক্ষেপণাস্ত্রকে তারা এত ভয়াবহ মনে করলেও এর চাইতে কয়েক হাজার গুণ অধিক কিলোমিটার দূরত্বে গিয়ে আঘাত হানাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে ইসরাইল তাদের চোখের সামনেই বসে আছে। পরন্ত তার হাতে রয়েছে ডজন হাই পাওয়ারের এটম বোম। অথচ কোনো পক্ষই ইসরাইলের এসব ব্যাপক গণবিধ্বংসী বেআইনী অস্ত্র সম্পর্কে কোনো কথা বলছে না। যুক্তরাষ্ট ও বৃটেন কেবল তোতো পাখীর মতো একই মতলবি কথা উচ্চারণ করে যাচ্ছে যে,-ইরাক নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব লজ্ঘন করেছে। তারা আরো বলেন, ইরাক তার সম্পর্কিত

www.pathagar.com

জাতিসংঘের ১৬টি প্রস্তাব লঙ্ঘন করেছে। এই অভিযোগের দিকটিই তারা বার বার উচ্চারণ করছে। অথচ ইসরাইল এই পর্যন্ত জাতিসংঘের ৭২টি প্রস্তাবের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে, তারপরও এটা ইসরাইলের অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়নি। এদিক থেকে ইরাকের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করার অভিযোগটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, উদ্দেশ্যমূলক ও অর্থহীন। যুক্তরাষ্ট্র ইরক ও তার প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে অনেক অসৌজন্যমূলক উক্তি করতেও দ্বিধা করে না। যুক্তরাষ্ট্র বলে থাকে, ইরাক হচ্ছে একটি সহজাত অপরাধী রাষ্ট্র। অথচ যে সব অভিযোগের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে এসব অভিধায় আখ্যায়িত করছে, তার সূত্র অনুযায়ী দেখা যায়, এসব শব্দ যুক্তরাষ্ট্রের বেলাই অধিক প্রযোজ্য। কারণ তাদের কৃত অপরাধসমূহের ফিরিস্তি এবং বিপুল পরমাণু অস্ত্র গোটা বিশ্বের জন্যেই এক মস্তবড় হুমকি। ছাড়া যেহেতু সে প্রথমে দু'বার এই ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, তাই মানবতাকে রক্ষার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের এসব ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্রই আগে ধ্বংস করা কর্তব্য যা তাদের এক সাবেক প্রেসিডেন্টও বলেছেন।

আসলে সামূদ ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপারে কি যুক্তরাষ্ট্র, কি বৃটেন বা জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দল এ ব্যাপারে সকলেরই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা হলো ইসরাইলকে নিয়ে। কারণ, যেহেতু ইসরাইল হচ্ছে সামূদের আঘাত হানার রেইঞ্জের মধ্যে আর ইসরাইলের ব্যাপারে তাদের অনুসৃত নীতিই হলো, তাদের হাতে ফিলিস্তিনী আরবদের যত রক্তই ঝরুক তাতে তেমন 'দোষ' নেই। মন্তব্যটিতে অতিরঞ্জন নেই এই কারণে যে,- ইসরাইল কর্তৃক চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং জাতিসংঘের এত অধিক প্রস্তাবের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন সত্ত্বেও তাকে আজ পর্যন্ত ইরাকের মতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। বরং সে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যেন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন মর্মান্তিক ঘটনার জন্যে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃতই হয়ে আসছে। যেখানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত নিয়মবিধির প্রশ্নে আন্তর্জাতিক ফোরামের শীর্ষ স্থানীয়দের কোনো বিরোধ বা সমস্যার প্রশ্নে এরূপ বৈষম্যবোধ কাজ করে, সেখানে এই সবকিছুই আজ নাটক-অভিনয়ের মতোই মনে হচ্ছে। এই নাটক মঞ্চস্থ করা আর প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে নিজেদের ইরাক কেন্দ্রিক অভিপ্রায় কার্যকর করার দিকে দ্রুত অগ্রসর হবার মধ্যে পার্থক্যই থাকলো কোথায়? অবস্থা ও বিভিন্ন সূত্রের ভাষা তো এটাই বলছে যে, যুক্তরাষ্ট্র শুধু ইরাকের উপর হামলার সকল প্রস্তুতিই শেষ করেনি, তারা এই সিদ্ধান্তও নিয়ে নিয়েছে যে, সবকিছুর আগে সাদ্দামের প্রাসাদে বোমা নিক্ষেপ করা হবে। একই সাথে ইরাকী প্রেসিডেন্টের পৈত্রিক শহর তাকরীত, গুরুত্বপূর্ণ-মন্ত্রণালয়সমূহের ভবনাদি, সাদ্দাম পরিবার এবং সিনিয়ার অফিসারদেরকে খতম করা হবে। এছাড়া আরও সিদ্ধন্ত নেয়া হয়েছে যে, রিপাবলিকান গার্ড এবং ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসসমূহের স্থাপনাগুলোও ধ্বংসের আওতায় থাকবে।

মোটকথা, সম্ভাব্য যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট যেই দৃশ্যের মধ্যদিয়ে ইরাককে সামনের দিনগুলো অতিবাহিত করতে হতে পারে, তা কল্পনা করতে স্নায়ুর চাপ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায়। দু'হাজার এক শতকের এই সভ্য যুগে কোনো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে এরূপ নগ্ন আগ্রাসনের কথা কেউ কল্পনা করেছিল কিনা জানি না। মানবাধিকার, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধের পশ্চিমী বড় বড় প্রবক্তারা যখন আন্তর্জাতিক ফোরামে এসব নীতিকথা আওড়াতে থাকেন, তখন আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতারা বিশেষ করে মুসলিম শাসকবৃন্দ ও ধর্মনিরপেক্ষ, পশ্চিমী ভোগবাদী জীবনচিন্তার শিক্ষিতরা তো একেবারে বিগলিত হয়ে যেতাম। তাদের সকল নীতিকথা গোগ্রাসে গিলে সেগুলো নিজ নিজ দেশ-জাতির উপর চাপিয়ে দিতে অস্থির হয়ে উঠতাম।

এ ব্যাপারে সবচাইতে ঘটনার যেই দিক ও যেই স্মৃতিটি বেদনা ভারাক্রান্ত করে, তোলে, সেটা হলো ধ্বংসলীলার এই ধারাবাহিকতা শুধু ইরাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং গোটা মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করার, ষড়যন্ত্র এতে নিহিত। বিশ্বের সর্বশক্তিশালী রাষ্ট্রে গৌরববোধকারী আমেরিকার রক্তলিপ্সা এতোই যে, তার নিকট মানুষের জীবনের কোনো মর্যাদা নেই। মানব সমাজে ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠ শান্তিপূর্ণ বিশ্বসমাজ গঠনকল্পে তার নীতিকথা সবকিছুই এখন পুরাতন কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে জাতিসংঘ একটি দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কামনা-বাসনার অনুকূলে সবকিছু নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে এখন জাতিসংঘের কাজ। সন্ত্রাস দমনের নামে আমেরিকা প্রথমে আফগানিস্তানকে ছাইভস্ম স্তুপে পরিণত করেছে। এখন ইরাকের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। অতঃপর মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রতি তার হাত সম্প্রসারিত হবার সকল লক্ষণ স্পষ্ট। এমনকি এ ব্যাপারে একাধিকবার ইশারা-ইঙ্গিতও করা হয়েছে। তারপরও দীর্ঘদিন থেকে মুসলিম শাসকরা আগ্রাসী বিড়ালের কবলে পতিত সেই ভীতসন্ত্রস্ত কবুতরের মতোই ভূমিকা অবলম্বন করে এসেছেন, যেই কবুতর বিড়ালের মারমুখী চেহারা প্রত্যক্ষ করে হঠাৎ চোখ মুছে ফেললো আর মনে করলো যে, হয়তো বিপদ কেটে গেল। অথচ এই অবস্থার মধ্যদিয়েই সে তার তাৎক্ষণিক গ্রাসে পরিণত হয়ে গেল। তার মস্তকটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় আগ্রাসীর উদরে চলে গেল। মুসলিম বিশ্বের শাসকদের অবস্থাও হচ্ছে তাই। সুপরিকল্পিতভাবে তাদেরকে প্রথমে প্রতারিত করা হয়, অতঃপর তারা সেই আক্রান্ত কবুতরের পরিণতি ভোগ করে। আফগানিস্তান অঢেল রক্তের বিনিময়ে নিজেদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করলো। রুশ বাহিনী সে দেশ থেকে চলে গেলো। নিজেদের হাতে নিজেদের দেশ পুনর্গঠন করার তারা সুযোগ পেলো। কিন্তু মুজাহিদ নেতারা দীর্ঘ পাঁচ বছর অনৈক্য ও আত্মকলহে পারস্পরিক রক্তারক্তিতেই সময় ক্ষেপণ করলো। এর মধ্যে কেউ কেউ বাইরের শক্তির ক্রীড়নক হয়ে পড়লো। এখন ক্রীড়নক অক্রীড়নক উভয়ই নিজেদের অনৈক্যের ফল ভোগ করছে। যাদের দ্বারা এই ধ্বংস পথ পেলো এবং এই পরিস্থিতির জন্যে ক্ষেত্র তৈরি হলো, কেউ ঘুণাক্ষরেও তাদের স্মরণ করছে না বরং তাদের স্মৃতিও সকলের বিরক্তির উদ্রেক করে। ইরাকের বর্তমান পরিস্থির পটভূমিও তাই। ইরাকের পর অন্যান্য মুসলিম দেশকেও একই অবস্থার দিকেই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যেতে হবে বলে মনে হচ্ছে। যেসব দেশ এই অযৌক্তিক যুদ্ধের শিকার হতে পারে তন্মধ্যে ইরান তার শীর্ষে বলে জানা যায়। কারণ যুক্তরাষ্ট্র তাকে নিজের পুরাতন দুশমন

www.pathagar.com

মনে করে। পারমাণবিক প্রসেসিং-এ ইরানের অগ্রগতি ইতিমধ্যেই মার্কিনীদের মাথাব্যথার সৃষ্টি করেছে। এই "বিপদ" থেকে রক্ষাকল্পে আমেরিকা ইরানকে শিক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আরব দেশগুলোকে টুকরো টুকরো করে তাদের বর্তমান ভৌগোলিক পরিচিতির পরিবর্তনও আসন্ন যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য বলে শোনা যাচ্ছে। কারণ তাদের "বিচ্ছিন্ন করো আর শাসন করো"-সেই পুরাতন নীতিটিই আবার তারা মধ্যপ্রাচ্যে প্রয়োগ করতে প্রয়াসী। এর দ্বারা প্রত্যেককে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে তাদের উপর কর্তৃত্ব করা সহজ হবে যা এ যাবত চলে আসছে। পাকিস্তান তথাকথিত সন্ত্রাস দমনে যতো সহযোগিতাই করুক না কেন তার যখন পালা আসবে তখন অন্য কথাসহ বলা হবে তুমি কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারী পাঠাচ্ছো। তোমার সাথে রয়েছে উত্তর কোরিয়ার সম্পর্ক তোমার দেশে আল-কায়েদা সদস্যরা এসে এমনভাবে আড্ডা মারছে যে এ জন্যে তাদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নিতেই হবে। তাতে যতো অস্বীকৃতিই প্রকাশ করা হোক তখন ইরাকের অনুরূপ ভূমিকাই ওদের পক্ষ থেকে প্রদর্শিত হবে।

মোটকথা মুসলিম বিশ্ব, এর সম্পদ, এর রাজনৈতিক প্রভাব, মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার ইসলামী পুনর্জাগরণের ভাব সবকিছু নস্যাৎ করার লক্ষ্যেই যে ইহুদী মস্তিষ্কপ্রসূত মুসলিম বিশ্ববিরোধী এই মার্কিনী অভিযান, তা'ই বাস্তব অবস্থা বলে দিচ্ছে। ইহুদী তাত্ত্বিকরাই আমেরিকাকে দিয়ে মুসলিম বিশ্বকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র করেছে। এই অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে সকল শান্তিকামী মানুষ বিশেষ করে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় সকল দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসই এই মুহূর্তে বড় প্রয়োজন। নিরস্ত্র হলেও বহুজনের ঐক্যবদ্ধ আওয়াজের অবশ্যই একটি মূল্য থাকে বৈ কি। এমনটি যাতে মুসলমানরা করতে না পারে, সে জন্যে তাদের জন্যে আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও সাহায্যের এমাউন্টও ঘোষিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কি তুরস্ক, কি পাকিস্তান বা অন্যকোনো দেশ-নিজেদের ভবিষ্যত সার্বিক কল্যাণ চিন্তা করবে, না আপন দেশ ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক চিন্তা নিয়ে অন্যায় অযৌক্তিক কাজের সহযোগী হবে, এই সিদ্ধান্ত প্রতিটি মুসলিম দেশের নিতে হবে।

জাতীয় ঐক্যে ফাটল ও তার সুফল ভণ্ডুলের অপচেষ্টা চলছে

[প্রকাশ ঃ ১৩. ৩. ২০০৩ ইং]

জাতির ঐতিহাসিক সফলতাগুলো জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমেই আসে আর সেই ঐক্য সকল সময়ই নিষ্ঠাপূর্ণ থাকে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট জাতির অভ্যুত্থান সহ তার বীরত্ব, উন্নতি, সমৃদ্ধি, স্থিতি ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাফল্যের ধারা ততো দিনই ব্যাহত থাকে, যতদিন সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের মধ্যে বহাল থাকে তাদের জাতীয় ঐক্যের সেই চেতনা। বলাবাহুল্য গোটা দেশবাসীর যৌথ স্বার্থকে কেন্দ্র করে একটি অভিন্ন লক্ষ্য অর্জন দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ হলেই জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়। ঐক্যের এই শক্তি হয়

www.pathagar.com

অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু কোনো জাতির উন্নতি অগ্রগতির এই অপ্রতিরোধ্য শক্তিটি তখনই দুর্বল হয়ে পড়ে, যখন এর উল্লেখিত অভিন্ন লক্ষ্য থেকে কোনো নেতা বা শ্রেণীর বিচ্যুতি ঘটে এবং সেখানে কোনো প্রকার ব্যক্তিগত দলীয় ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ এসে বাসা বাঁধে। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা এরূপ খণ্ডিত স্বার্থচিন্তাই জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরায়। তাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে। ঐক্য শক্তির এই বিভক্তিতে এর কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়, যার পরিনাম হিসাবে ব্যাহত হতে থাকে জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি সকল কর্মপ্রয়াস।

মুসলিম সোনালী যুগের সৃষ্টি হয়েছিলো "তওহীদ রেসালত ও আখেরাত" এর জীবনবোধ কেন্দ্রিক। যখন তার শিক্ষাবিরোধী মানসিকতা কিছু লোকের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করলো আর ছদ্মবেশী ইহুদী আবদুল্লা বিন সাবার প্ররোচণায় কারবালা ঘটনার পটভূমি হিসবে কুফা-দামেস্কের কর্মকর্তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিলো, ইতিহাসের সেই অনক্যই মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য শক্তিতে ফাটলের সূচনা করে। তারই বিয়োগান্ত অভিব্যক্তি ঘটে কারবালা প্রান্তরে, যার স্মৃতি এই মাসে সকল মুসলমানকে ব্যথায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। গোটা ভারত উপমহাদেশ মুসলমানরা ৮শ' বছর শাসন করেছে। তাতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ ছিলো বলেই ভারত বিভক্ত হয়নি। অতঃপর ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা প্রবল হয়ে ওঠার সাথে সাথে তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় প্রতিটি খণ্ডই ঔপনিবেশিক ইংরেজ শক্তির গোলামীর জিঞ্জিরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়ে। পৌনে দু'শ বছর পরাধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকার পর স্বাধীনতার যেই সৌভাগ্য সকলে লাভ করে, তাও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শক্তির জোরেই তা সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে যখন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কোনো কোনো অংশে তথা হিন্দু নেতাদের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করার সংকীর্ণ চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, তখন দ্বিজাতিত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভুমিকে দ্বিখণ্ডিত করতে হলো, যা পরবর্তীতে মুসলিম নেতাদের অদূরর্শিতা ও বৈষম্যজনিত অনৈক্য ও সংকীর্ণ চিন্তার দরুণ এখন এটি ত্রিখণ্ডে বিভক্ত। সাবেক পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলা হলেও পাকিস্তানী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে এ অবজ্ঞা এবং অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদিতে বৈষম্য চিন্তা ও অন্যায় দৃষ্টিভঙ্গি এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ভাষা ও অন্যান্য ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার বিরুদ্ধে তখন যে সকল আন্দোলন হয়েছিলো, সেই সফলতাও এই এলাকার জনগণের সার্বিক ঐক্যশক্তি বলেই হয়েছিলো। রচিত হয়েছিল দেশের স্বাধীনতার পথ। এখন বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। সাবেক পাকিস্তানের সৃষ্টিতে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অবদান অধিক থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানী নেতৃত্বের সংকীর্ণ চিন্তা ও তাদের জুলুম-নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষার যে রক্তাক্ত সংগ্রামের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে, তাও একমাত্র জাতীয় এক্যের সুবাদেই সম্ভব হয়েছিলো। তারপর স্বাধীনতা উত্তরকালে এদেশে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায়

www.pathagar.com

সমাসীনরা গোষ্ঠীস্বার্থে জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। তারা জনগণের মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে একদলীয় শাসন কায়েম করে। দেশকে চরম অরাজকতা, লুটপাট, দুর্নীতি ও দারিদ্র্যের অক্টোপাশে ঠেলে দেয়। দুর্ভিক্ষে মারা যায় হাজার হাজার মানুষ। জানাজার কাপড়ের বদলে কোথাও চট পর্যন্ত ব্যবহার হয়। এমনকি শেষে প্রতিবেশী দেশের কাছে দেশ বন্ধক দেয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে তখন এখানে ঐক্যবদ্ধ জন-অসন্তোষ লক্ষ্য করে তাদের সমর্থনে দেশ রক্ষায় সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। ১৫ই আগস্টের পট পরিবর্তনের পর জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় হয়। কিন্তু আগস্ট বিপ্লবের পর ৩ মাসের মাথায় স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ ও শোষণ নিপীড়নের হোতা আওয়ামী লীগের অনুকূলে ৩ নবেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফের নেতৃত্বে এক অভ্যুত্থান ঘটে, সেটাও দল-মত নির্বিশেষে দেশের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ইসলামী ঐক্য ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী সিপাহী-জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধেই ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জাতীয় স্বার্থের সার্বিক চিন্তাই দল-মত নির্বিশেষে গোটা দেশবাসীকে সেই দুর্দিনে ঐক্যের একই প্লাটফরমে নিয়ে এসেছিলো। দেশ গড়ার কাজে সকলকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একদিকে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করার কাজ, অপরদিকে দেশের ইসলামপন্থী সকল দলের উপর থেকে আওয়ামী আমলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করা, শাসনতন্ত্রে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্মান দেখিয়ে তা সংশোধন, তাতে ইসলামী ধারার সংযোজন জাতীয় ঐক্যেরই সুফল বৈকি। কিন্তু আমাদের এই জাতীয় ঐক্যের যিনি মধ্যমণি অর্থাৎ শহীদ জিয়াউর রহমান, দেশ-জাতির শত্রুরা ভাবলো, তার বর্তমানে এদেশের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র সফল করা সম্ভব নয়। তিনিই দল-মত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে বাংলাদেশকে সামরিক, গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকে দ্রুত উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, সুতরাং এই জনপ্রিয় নেতৃত্বকে চিরতরে দুনিয়া থেকে সরাতে পারলেই নিজেদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করা সহজ হবে। পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশ ও তার স্বাধীনতার দুশমনরা নিজ ক্রীড়নকদের দ্বারা এ কাজটিই করালো। কিন্তু কার্যত দেখা গেলো, এ দেশ ও জাতির ঐক্যশক্তিকে ধ্বংস করে এর ক্ষতির পরিকল্পনা করা যেই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিলো, জীবিত জিয়ার চাইতে মৃত জিয়া ও তাঁর অনুসৃত নীতি শহীদের সহধর্মিনী বেগম খালেদা জিয়ার প্রজ্ঞাপূর্ণ রাজনৈতিক নেতৃত্বে সেই জাতীয় ঐক্যকে আরও বহুগুণ শক্তিশালী করে তুললো। আওয়ামী লীগের জুলুম-নিপীড়ন, প্যাসিবাদী, গণবিরোধী ও শোষণ-লুটপাটের রাজনীতিকে নস্যাত করে দিয়ে তিনি বাংলাদেশের ক্ষমতায় সমাসীন হলেন এবং দেশ শাসন করলেন। কিন্তু ভিন্ন মানসিকতার কিছু সহকর্মী এবং আওয়ামী ঘরানার একশ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষ তথাকথিত বুদ্ধিজীবী লেখক, রাজনীতিক বিভিন্ন লেখা-উস্কানি দ্বারা সুকৌশলে তাকে জিয়ার অনুসৃত নীতি থেকে সরিয়ে নিলে তখন দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তি ও ইসলামী

www.pathagar.com

শক্তি তার পেছন থেকে সরে যায়। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে গতবার বেগম জিয়ার সরকারের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী নির্বাচনে তাঁর দলের পরাজয়ের ফলে সেই কুখ্যাত আওয়ামী শাসন আবার দেশবাসীর ঘাড়ে চেপে বসে যার দুর্বিসহ্ যন্ত্রণা ৫ বছর ধরে দেশবাসীকে সহ্য করতে হয়েছিল।

আওয়ামী আমলের সেই দুর্বিষহ পাঁচশালা শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি আন্দোলনের সময়ই বেগম জিয়া রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে নিজের পুরাতন ভুল সুধরিয়ে শহীদ জিয়ার অনুসৃত নীতি দলে ফিরিয়ে আনেন। তারই ফলশ্রুতিতে ৪ দলীয় জাতীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। গোটা জাতি দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতার প্রকৃত দরদী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোর এই কাঙ্খিত ঐক্য দেখে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং দলটিকে গত সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করে। তারা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশের ক্ষমতায় আনে তাদের কাঙ্ক্ষিত ঐক্যজোটকে। ঐক্যজোট সরকার আওয়ামী শাসনে লুণ্ঠিত ও শোষিত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন ও একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার যেসব সংস্কারধর্মী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, তা দেখে প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। নির্বাচনের পর থেকেই তারা ও তাদের লেখক-তাত্ত্বিকরা জামায়াত তথা ইসলামী সংগঠনগুলোকে ঐক্যজোট থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এমন কোনো ষড়যন্ত্র বাদ দিচ্ছে না, যা তারা করছে না। তাদের লেখকদের এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের একমাত্র চিন্তাই হলো ইসলামী শক্তিকে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ঐক্যজোট থেকে আলাদা করা এবং জাতীয়তাবাদী দলকে নিসঙ্গ করে সাবেক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া। সেই ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ অংশ হিসাবে অতীতের মতোই তাদের লোকদেরকে জাতীয়তাবাদী দল বা এর অঙ্গসংগঠনগুলোতে ঢুকিয়ে দিয়ে জোটের ইসলামী দল অঙ্গদলসমূহের নেতা-কর্মীদের চরিত্র হনন, তাদের কাজে বাধা দান ও তাদের সভা অনুষ্ঠানে গোলমালের চেষ্টা করছে বলে জানা যায়। এই অনুপ্রবেশ দ্বারা ফ্যাসিবাদী কাজ করে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী দল বা তার কোনো অঙ্গসংগঠনের সাথে জামায়াত বা অন্য ইসলামী দলের দ্বন্দ্বের কথা প্রচার করে ঐক্যজোটে ভাঙ্গন ধরাবার ষড়যন্ত্র সফল করতে চাচ্ছে। সেদিন সিদ্ধেশ্বরী কলেজের ইসলামী ছাত্র শিবিরের উপর বহিরাগত কিছু লোকের হামলাটি জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের বলে প্রচার করার পেছনে সে ধরনের কোনো ষড়যন্ত্র কিনা যাতে আওয়ামী বেশ বদলিয়ে কেউ ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে অনুপ্রবেশ করেছে, জোট নেতৃবৃন্দের এদিকে বিশেষ দৃষ্টিদান অপরিহার্য। কারণ, এর পূর্বে জাতীয়তাবাদী দলের সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি করে এভাবেই বেগম জিয়াকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরানোর নিমিত্ত সৃষ্টি করা হয়েছিল। মোটকথা, বেগম জিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বর্তমান ঐক্যজোটে আওয়ামী হোক কি বাইরের অপর কোনো অপশক্তির দ্বারা ফাটল সৃষ্টি হোক আর পরিণতিতে জাতি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হোক এটা কেউ চায় না। নেতৃবৃন্দের এ ব্যাপারে সবচাইতে অধিক সচেতন থাকা এ মুহূর্তের অন্যতম কর্তব্য।

www.pathagar.com

গাফ্ফার চৌধুরীগং গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছেন?

[প্রকাশ ঃ ২৮. ১. ২০০৪ ইং]

বয়োবৃদ্ধ লোকদের থাকে বহুমুখী অভিজ্ঞতা। জীবনের বহু উতার-চড়াওয়ের মধ্য দিয়ে সেসব অভিজ্ঞতানিঃসৃত জ্ঞান সমকালীন ও উত্তরকালীনদের চলার পথে বিরাট কাজে লাগে। জীবন গড়া, দেশ গড়া, সমাজ গড়ার কাজে সে জ্ঞান সহায়ক হয়। মানুষ সে জ্ঞানকে নিজের ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য নানানভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করে। তেমনি প্রবীণদের মধ্যে এমন অনেক লোকও দেখা যায়, যার মধ্যে প্রবীণত্ব ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অহংবোধ থাকলেও নিজের দৃষ্টিভঙ্গি. বিকৃতি, স্বার্থপরতা, বিভ্রান্তি ও ভয়াবহ উদ্দেশ্য প্রণোদিত একপেশে চিন্তার দরুন তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্যতা পায় না। কারণ তা দেশ-জাতির জন্য কল্যাণের বদলে অকল্যাণই ডেকে আনে। এদিক থেকে বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রবীণ সাংবাদিক বিখ্যাত কলামিস্ট জনাব আবদুল গফ্ফার চৌধুরীর কাছ থেকেও দল-মত নির্বিশেষে দেশের সকল শ্রেণীর পাঠক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে এমন পথনির্দেশনামূলক বাস্তবধর্মী মতামতই প্রত্যাশা করে, যা বিশ্বের অন্যতম জনবহুল ও সমস্যাবহুল জনগোষ্ঠীর দেশ বাংলাদেশের মানুষের জন্য আশার বাণী শোনায়। এদিক থেকে বৃদ্ধ বয়সেও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে চৌধুরী যেসব তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন, সেগুলোর অধিকাংশই বেশ প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে যে সমস্ত বিষয়ের ওপর বিশাল প্রবন্ধাদি লিখে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন এবং মুরব্বীসুলভ যেসব প্রস্তাব পরামর্শ ও পথনির্দেশনা দিয়ে থাকেন, এগুলোতে যতো আত্মপ্রত্যয় নিয়েই কথা বলুন না কেন, বিদেশে থাকার কারণে হোক কিংবা অন্য হেতু সেগুলোর কোন কোনটিতে তাঁর মতো অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিসুলভ ভারসাম্য বজায় রাখতে তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন বলেই মনে হয়। কারণ, বাংলাদেশের বিভিন্ন ইস্যু বিশেষত রাজনৈতিক ইস্যুতে লিখতে গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ সংকীর্ণতা ও পক্ষপাতদুষ্টতারই পরিচয় দেন না, বরং যেই আওয়ামী লীগের তিনি অন্ধ সমর্থক, সেই দলের অনুসৃত প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই তার লেখার প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠে। সত্যিই এটি স্বাধীন, গণতান্ত্রিক বহুদলীয় সংসদীয় রাজনীতির বর্তমান বাংলাদেশে সম্পূর্ণ বেমানানই নয় দেশের জন্য চরম ক্ষতিকর। অথচ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিনের সংগ্রামক্লান্ত শান্তিকামী দেশবাসী এখন এ ধরনের কথাবার্তা পছন্দ করে না। তারা চায়, এখানে নিজেদের চির কাঙ্খিত গণতন্ত্রের বিকাশ, উৎকর্ষ ও গণতান্ত্রিক সহনশীলতাসমৃদ্ধ স্বকীয় জীবনাদর্শ ও জীবনবোধভিত্তিক সন্ত্রাসমুক্ত সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ, যেখানে রাজনৈতিক সংকীর্ণতা এবং প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসামূলক দৃষ্টিভঙ্গীবর্জিত রাজনীতিকরা পারস্পরিক সহযোগিতায় দেশের স্বার্থে 'গিভ এন্ড ট্যাক' -এর ভিত্তিতে রাজনীতি করবেন এবং নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের বদলে একমাত্র

www.pathagar.com

জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেবেন। নিজেদের সার্বিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্যের ধারক আজকের জাগ্রত প্রতিটি বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশী কোন আধিপত্যবাদী, সম্প্রসারণবাদী শক্তির মদদপুষ্ট ও বিজাতীয় জীবনবোধে প্রভাবিত কোন প্রবীণ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকদের কাছে এমন কোন অযাচিত উপদেশ ও উস্কানিমূলক পরামর্শ আদৌ শুনতে রাজি নয়, যাতে দেশে খুনাখুনি ও আত্মকলহের আগুন প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, সাম্প্রতিক একাধিক লেখায় জনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ও তাঁর স্বমতের কিছু কিছু সাংবাদিক ও কলামিস্টের লেখায় এমন সব উস্কানিমূলক কথাবার্তা উচ্চারিত হচ্ছে, যেসবের অর্থ দাঁড়ায়, বিরোধী দল এখনও কেনো চুপ করে বসে আছে? তারা এখনও কেন স্বাধীনতা যুদ্ধের ন্যায় জবরদখলদার ক্ষমতাসীন আগ্রাসী কোন সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ন্যায় খালেদা জিয়ার জোট সরকারের বিরুদ্ধেও অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছে না এবং সরকারের সমর্থকদেরকে যেখানে পায় সেখানে শেষ করে দিচ্ছে না? এখনও কেন স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বাবস্থার ন্যায় তারা অসহযোগ আন্দোলন শুরু করছে না এবং গোটা দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে তছনছ করে দিয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির দ্বারা খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের পতন ঘটিয়ে বিরোধী দলকে ক্ষমতায় বসাবার ব্যবস্থা করছে না? জনাব গাফ্ফার চৌধুরী এবং তাঁর দোসরদের অসত্য তথ্য ভারাক্রান্ত অনেক উস্কানিমূলক কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এমন ভাবধারাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বিরোধী দল ক্ষমতা দখলের জন্য এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের দ্বারা দেশে হট্টগোল বাধিয়ে দিলে তাদের সমর্থনে বাইরের সহায়তা যে দ্রুত এগিয়ে আসবে এবং অপর সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে একমাত্র তাদেরকেই ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে, এই সুযোগের কথাটি তারা এখনো কেন উপলব্ধি করতে পারছে না? বিরোধী দল শুধু সরকারকে ১৫ দফার চরমপত্রই কেন দিচ্ছে, বিরোধী নেত্রী ১৫ দফাকে অতীতের ৬ দফাকে ১ দফায় এনে যেভাবে রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে লাখো মানুষের শাহাদাতের বিনিময়ে স্বাধীনতা আনা হয়েছিল, ঠিক অনুরূপ কায়দায় ১৫ দফাকেও কেন এক দফায় এনে দেশে রক্তাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে না, যেখানে দরকার হলে বাইরের সাহায্য নিয়ে হলেও খালেদা সরকারকে ধরাশায়ী করে বিরোধী নেত্রীকে বাংলার মসনদে আলা'তে বসানোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না? প্রবীণ সাংবাদিক, বহুমুখী জ্ঞান অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ প্রবাসী জনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর বাংলাদেশের রাজনীতির উপর লিখিত এ জাতীয় ভাবধারার প্রবন্ধাবলীর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে পরোক্ষ নয় সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন ও প্রত্যক্ষভাবেই উপরোক্ত হিংসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাত হয়ে ওঠে, যেগুলোর অপর কোন ব্যাখ্যার আদৌ অবকাশ নেই।

"আওয়ামী লীগের নতুন রণনীতি প্রয়োজন" শিরোনামের এক লেখায় জনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মতো প্রবীণ সাংবাদিক লিখেছেন, ... "সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা যে, আওয়ামী লীগ নেতাদের ধীরে চলার নীতি নিরাপদ মধ্যপন্থা অনুকরণ কোনো কাজ করে না। দেশ পরিচালনায় প্রত্যেকটি ইস্যুতে খালেদা-নিজামী সরকারকে সরাসরি মোকাবিলা করার কাজে না এগুলে, ১৫ দফা কর্মসূচী দ্বারা দলের

www.pathagar.com

সমর্থক বা দেশের মানুষের মধ্যে মিলিট্যান্সি (Militancy) যুদ্ধংদেহী ভাব) তৈরি করা যাবে না। সুতরাং ১৫ দফা কর্মসূচীর পাশাপাশি আওয়ামী লীগের নতুন রণনীতি নির্ধারণ করা দরকার। কিন্তু সেই রণনীতি কি হওয়া উচিত?" পরবর্তী লেখায় তিনি বিশিষ্ট কলামিস্ট এবিএম মূসার এ জন্য মৃদু সমালোচনা করেন যে, তিনি কেন "আরমানিটোলা থেকে পল্টন্" শীর্ষক তার লেখায় আলোচ্য বিষয়কে পল্টন পর্যন্ত সীমিত রাখলেন এবং আগ্রাসী শত্রু পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধের ঘোষণা স্থল রেসকোর্স বা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পর্যন্ত "ঔপনিবেশিক আমলের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়" পৌছেননি। .... অতঃপর জনাব চৌধুরী বলেন, "পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগ দল যখন সমাবেশ করত, তখন তা থেকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের কাছে নরম কণ্ঠে বিভিন্ন দাবী পেশ করা হতো। আরমানিটোলা থেকে পল্টনের মাঠে পৌঁছুতে পৌঁছুতে আওয়ামী লীগের শক্তিবৃদ্ধি পায় এবং দাবী পেশ করার বদলে তার কণ্ঠে আন্দোলনের ভাষা তৈরি হয়। রেসকোর্সে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যখন আওয়ামী লীগের সমাবেশ শুরু হয়, তখন দলটির কণ্ঠে আর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ভাষা ছিল না, ছিল সংগ্রাম ও জঙ্গি অভ্যুত্থানের ডাক। আজ দীর্ঘ তিন দশক পর আওয়ামী লীগ রেসকোর্স থেকে পল্টনে শুধু পিছু হটে আসেনি, আন্দোলন ও সংগ্রামের ঐতিহাসিক পর্যায়গুলোর কথা ভুলে গিয়ে দাবী-দাওয়া পেশের দূর অতীতে পশ্চাদপসারণ করেছে। বন্ধুবর মূসা ১০ই জানুয়ারী ১৫ দফা কর্মসূচীতে বলেছেন, "অস্পষ্ট আল্টিমেটাম" কিন্তু এই কর্মসূচীর মধ্যে আল্টিমেটাম কোথায়? ক্ষমতাসীন দলের এক নেতা তাই তাচ্ছিল্যভরে বলতে পেরেছেন -এ রকম আল্টিমেটাম বহু শোনা আছে। অতঃপর তিনি বলেন,

"আমার পাঠকরা যেন না ভাবেন, আমি আওয়ামী লীগকে এখনই চরমপন্থা গ্রহণের কথা বলছি। একাত্তর সালের ৭ মার্চের রেসকোর্সের সভাতেও বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেয়ার পাশাপাশি কয়েকটি আশু দাবি উচ্চারণ করেছিলেন। সেগুলোকে দাবি-দাওয়া বলা হলে ভুল করা হবে। সেগুলোই ছিল পাকিস্তানের সামরিক জান্তার কাছে বাংলার জনগণের পক্ষ থেকে দেয়া আল্টিমেটাম। অবিলম্বে রাজপথ থেকে সেনা প্রত্যাহার, জনগণের বুকে গুলী চালনা বন্ধ করা, অবিলম্বে সংসদ ডেকে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, নইলে তাৎক্ষণিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, তার কোন সময়সীমা বেধে দেয়া হয়নি। বরং চলমান আন্দোলনকে সংগ্রামে রূপান্তর করা হয়।"

"৭ মার্চের মহাসাবেশের পরই বঙ্গবন্ধু সামরিক জান্তার সঙ্গে কনফ্রন্টেশনে যাননি। তিনি জনগণের সমগ্র শক্তিকে একত্রিত করে শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছেন এবং সরকারের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সর্বাত্মক অসহযোগের ডাক দিয়েছেন। সেই ডাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অফিস, আদালত, ব্যাংক এমনকি উচ্চ আদালত পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (জাস্টিস বি এ সিদ্দিকী) জেনারেল টিক্কা খানকে তৎকালীন প্রদেশের গবর্নর হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করাতে অস্বীকৃতি

www.pathagar.com

জানিয়েছিলেন। ফলে কনফ্রন্টেশনে নামতে হয়েছিল সামরিক জান্তাকেই। ২৫ মার্চ রাতের বর্বর গণহত্যার মধ্য দিয়ে এই কনফ্রন্টেশন শুরু হয়।"

"স্বাধীন বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াত জোট প্রধান বিরোধী দলের বৃহত্তর অর্থে জনগণের সঙ্গে এই কনফ্রন্টেশন শুরু করেছে ২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই। '৭১ সালের সঙ্গে ২০০১ সালের পার্থক্যটা এই যে, এ সময় আওয়ামী লীগ সদ্য ক্ষমতা থেকে অপসারিত এবং তার কোন প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না এবং প্রতিরোধ করার কর্মসূচিও ছিল না। ক্ষমতাসীনদের হামলাটও ছিল পূর্বপরিকল্পিত এবং ব্রুটাল। ('৭১ সালের লেগাসি অনুসরণ করে)। গত দু'বছরে আওয়ামী লীগ প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জন করেছে। এই অর্জনের কৃতিত্বটা যতটা না আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের, তার চেয়ে বেশী জনগণের। '৭১ সালেও বাংলাদেশের মানুষ নিয়মতান্ত্রিকতার পন্থা ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় অস্ত্র ধারণ করেনি। পাকিস্তানের সামরিক জান্তার হঠকারিতা, ক্ষমতার দর্প এবং নির্যাতন চালিয়ে গণদাবি রোখার অদূরদর্শিতা বাংলার মানুষকে বাধ্য করেছিল অস্ত্র ধারণে। ১০ জানুয়ারি দাবিগুলোর সারকথাটিকে আর আলটিমেটাম বা চরমপত্র বলা যায় না। চরমপত্র হবে সেটি, যাতে বলা হবে, এই ব্যর্থ সরকারকে অবিলম্বে ক্ষমতা ছাড়তে হবে, নইলে আন্দোলনের দ্বারা সরকারের পতন ঘটিয়ে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার ১৫ দফায় ব্যক্ত কর্মসূচি কার্যকর করবে।"

জনাব গাফ্‌ফার চৌধুরী দেশে কি পরিস্থিতি সৃষ্টিতে আগ্রহী, তাঁর এসব কথাই বড় প্রমাণ। কোথায় একটি আগ্রাসী শক্তির সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধ পূর্বকালীন মারমুখী সংগ্রামী আন্দোলন ও স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধ আর কোথায় একটি স্বাধীন বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরোধী দলীয় রাজনীতিকদের বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন? অথচ জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর ন্যায় প্রবীণ সাংবাদিকের বক্তব্যে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনকে সশস্ত্র রক্তাক্ত আন্দোলনের দিকে নিয়ে যাবারই একটি ভয়াবহ উস্কানি তিনি দিয়েছেন, যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাঁর কাছ থেকে এরূপ অসংলগ্ন দায়িত্বহীন উক্তি অপ্রত্যাশিত।

জনাব চৌধুরী বর্তমানে বার্ধক্যে পৌঁছেছেন, আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার ব্যাপারে তার গঠনমূলক পরামর্শ ও পথ-নির্দেশনাই সকলের কাম্য ছিল, সে ক্ষেত্রে দেশের যুব সমাজ ও অন্যান্য বাম রাজনৈতিক নেতা কর্মীদেরকে সঠিক পরামর্শ না দিয়ে তিনি গোটা জাতিকে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়ার এই উস্কানিদানমূলক নীতি কেন গ্রহণ করলেন, তা একটি বিরাট জিজ্ঞাসা, যা হালকাভাবে দেখার বিষয় নয়। এটা কি চৌধুরীর বার্ধক্যজনিত ভিমরতি, না নিজের প্রবীণত্বের অহংবোধজনিত দম্ভভরা অসংলগ্ন বক্তব্য, সেটা যেমন পরীক্ষা করে দেখা দরকার তেমনি এসব কথা দ্বারা তিনি কি কারও বাংলাদেশ বিরোধী নীলনকশা বা অশুভ পরিকল্পনার মুখবন্ধের সূত্রপাত ঘটিয়ে ইতিহাসের কোন গভীর ষড়যন্ত্রের প্রকাশ ঘটালেন, তা গভীরভাবে লক্ষ্য করা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

হত্যা পাল্টা হত্যার এই ধারাবাহিকতা কি থামবে না?

[প্রকাশ ঃ ১২. ২. ২০০৪ ইং]

একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সমাজের অপরাধ প্রবণতা সাধারণ ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ও মামুলি হত্যাকাণ্ডের স্তর অতিক্রম করে ধীরে ধীরে এক বিশেষ অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অতীতে কালে-ভদ্রে এক আধটি হত্যাকাণ্ড ঘটলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে এখন এক খুনের রক্ত শুকাতে না শুকাতে আরেকটি তরতাজা খুনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে। ভোরে সংবাদপত্র খুললেই সকল পাঠকের সামনে ভেসে উঠছে কোন রক্তাক্ত লাশ আর তার পাশে আপনজনদের আকাশ-বাতাস কাঁপানো আহাজারির করুণ দৃশ্য। কোথাও খুন হচ্ছে ব্যবসায়ী, কোথাও স্থানীয় কোন রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের কোনো কর্মকর্তা, সদস্য। কোথাও ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী। কোথাও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপারে প্রতিবন্ধক কোন ব্যক্তি। সংঘটিত এসব ঘটনার যেই চরিত্র, পটভূমি ও কার্যকারণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে থাকে, ঐগুলো লক্ষ্য করলে যেই বাস্তবতাটি সামনে আসে, সেটাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ অপরাধ প্রবণতা বলা যায় না। বরং হিংসা, প্রতিহিংসা, সহজ পন্থায় অর্থলোভ, পরশ্রীকাতরতা, প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থকরণ, নিজের ভবিষ্যত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং এক অছিলায় উন্নতির পথের কাটা সরিয়ে ফেলা। সহজ উপায়ে রাতারাতি বিত্তবৈভরের অধিকারী হয়ে সমাজের "কেউ কেটা"য় পরিণত হওয়া। বলা বাহুল্য, মানবচরিত্রের এই প্রবণতা সকল সময়, সকল যুগে থাকলেও তা তখনই অধিক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পায় যখন অপরাধীরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও নৈতিক সকল দিক থেকে কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন না হয়। অপরাধ করার অবাধ সুযোগ পায়। সংগঠিত অপরাধের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার ছিদ্রপথসমূহ তার সামনে উন্মুক্ত থাকে। যেমন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নৈতিকভাবে দুর্বল ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্তৃত্ব। আইনের কষানি থেকে অপরাধীর মুক্তির জন্যে রাজনৈতিক অবৈধ পৃষ্ঠপোষকতা, সমাজ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের এমন সব দায়িত্বহীন উস্কানিমূলক বক্তব্য, যাতে অপরাধীচক্র সহজেই অনুপ্রাণিত হয়। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের শায়েস্তা করে নিজের ক্ষমতা দখল বা পুনর্দখল কিংবা আপন কায়েমী স্বার্থ বহাল রাখার জন্যে সমাজবিরোধী সন্ত্রাসীদের হাতে রাখার প্রবণতা। সামাজিক ও রাজনৈতিক অবৈধ প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্যে বৈধ-অবৈধ যে কোন পন্থায় অর্থের পাহাড় গড়ে তোলার জন্যে পাগল হয়ে ওঠা। মোটকথা, আমাদের সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আজকাল এই মারাত্মক ব্যাধিতে এতই আক্রান্ত যে, এই ব্যাধি এইডস রোগের মতো দুরারোগ্য ও মরণঘাতী ব্যাধিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এর প্রতিকার

www.pathagar.com

কোথায়? এ রোগের উৎস তালাশ করার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব দেশের সরকারের ওপর বর্তালেও, দেশের লেখক-সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও অন্য সাধারণ নাগরিকের কি এ ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই? এই বাস্তবতা অস্বীকার করার কোন উপায় আছে কি, যে কোন দেশের সরকার যত সুন্দর ও সুষ্ঠু কর্মসূচী নিয়েই দেশ পরিচালনার চেষ্টা করুক না কেন, প্রশাসনযন্ত্রের দুর্নীতিমুক্ত নিষ্ঠাপূর্ণ কর্তব্য পালনের সাথে সাথে সরকারের বাইরে যাদের অবস্থান তাদের সহযোগিতা ছাড়া সমাজে কাঙ্খিত মানের উন্নতি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কি? অথচ বাস্তবে আমাদের সমাজে বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা ছাড়া আর কি দেখা যায়? অবশ্য এ জন্যে প্রথম শর্ত আগে সরকারি প্রশাসনের দুর্নীতিমুক্ত ও নিষ্ঠাপূর্ণ কর্তব্য পালন। অথচ এ নিয়েই বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত থাকায় এ ব্যাপারে অগণিত উদাহরণ আমাদের রেকর্ডে সংরক্ষিত থাকলেও এক্ষেত্রে আমি ছোট্টা একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই, সেটা হলো যেমন, গতকালকের কোন কোন দৈনিকের ব্যানার হেডিংয়ে প্রকাশিত একটি খুনের ঘটনার খবরে প্রকাশিত একটি তথ্য। "ভিআইপি রোডে চাঁদাবাজের গুলীতে ব্যবসায়ী খুন" শীর্ষক এই খবরে বলা হয়, গত সোমবার রাজধানীর কাওরান বাজারের অদূরে ভিআইপি রোডে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউয়ে দিনে-দুপুরে বেলা ২টায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঢুকে সন্ত্রাসীরা সালদা ট্রেভেলস এজেন্সির মালিক মোস্তফা কামালকে (৩৫) গুলি করে হত্যা করেছে। দোকান কর্মচারী মোক্তার হোসেন (২২), কম্পিউটার অপারেটরে বিধান রায় (৩০) ও বিদেশ গমনেচ্ছু বজলুর রহমান (৪০) গুলীবিদ্ধ হন। সন্ত্রাসীরা চাঁদাবাজ। ট্যাক্সি ক্যাব থেকে নেমে সরাসরি সালদা ট্রাভেলসে ঢুকে পড়ে। মোস্তফা কামালকে হত্যা করে বীর দর্পে হেটে গিয়ে গাড়িতে উঠে ফার্মগেইটের দিকে চলে যায়। সেখানকার একাধিক ব্যবসায়ী সূত্রে পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, কিছুদিন ধরে পিচ্চি হান্নানের সহযোগীরা সালদা ট্রাভেল এজেন্সিতে মোস্তফা কামালের কাছে চাঁদা দাবী করে আসছিল। এছাড়া গত ২৭শে ডিসেম্বর চাঁদা না পেয়ে নগরীর উক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীর সহযোগিরা কাওরান বাজার পূর্নিমা সিনেমা হল সংলগ্ন ৪০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউয়ে বেঙ্গল রিফ্রেজারেটর অ্যান্ড কোম্পানি নামক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের শো রুমে প্রবেশ করে বিক্রয়কারী নারায়ন বোসকে উরু ও তলপেটে গুলী করে আহত করে। শুধু তাই নয়, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারীও এই এলাকায় একজন ব্যবসায়ী তেজগাঁও থানার ওসির কাছে গিয়ে চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যের কথা জানিয়েছেন বলে প্রকাশ। নিহত মোস্তফা কামালের ছোট ভাই বলেন, দু'মাস ধরেই সন্ত্রাসীরা তার ভাই (নিহত) মোস্তফা কামালের কাছে ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবী করে আসছে। এমনকি চাঁদা না পেয়ে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এসে তাকে নানান ধরনের ভয়ভীতিও প্রদর্শন করে। তখন বিষয়টি তেজগাঁও থানায় জানিয়েও কোন সুফল পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। থানা সেই অভিযোগে তো কান দেয়ইনি, পরন্তু ঘটনার দিন রহস্যজনকভাবে পুলিশ তার প্রাত্যাহিক ডিউটি থেকে অনুপস্থিত ছিল।

www.pathagar.com

তাহলে এটা বুঝতে কারও অসুবিধা হচ্ছে না যে, তেজগাঁও, কাওরান বাজার ও ফার্মগেইট এলাকায় যেসব সশস্ত্র চাঁদাবাজ প্রকাশ্যে লাখ লাখ টাকা চাঁদাবাজি করে ঘুরে বেড়ায়, তাদের পরিচয় সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃপক্ষের কাছে অজানা নয়। এমনকি এই এলাকার ব্যাপার এমন অভিযোগ রয়েছে যে, ২ বছর আগে অত্র এলাকায় যেই পকেটমার চক্রটি সক্রিয়, তাদের একটি গ্রুপ কারও পকেট বা হাতব্যাগ কেটে হাজার হাজার টাকা নিয়ে গেলেও থানায় কর্মরত তখনকার কোন কোন লোক ঐ অপরাধী চক্রটি থেকে পকেট বা ব্যাগ কেটে নেওয়া হাজার হাজার টাকার অংশ বিশেষ মালিকের কাছে ফেরত দেয়ার যোগ্যতা রাখতেন। সেসব অপরাধীই যে প্রশাসনের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে এখন সশস্ত্র ডাকাত ও চাঁদাবাজরূপে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যবসায় কেন্দ্রে ঢুকে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করার 'সাহস', 'যোগ্যতা' ও 'দক্ষতা' অর্জন করেনি, তারইবা কি নিশ্চয়তা রয়েছে? যারা শুধু সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃপক্ষের অতীব পরিচিতই নয় -তারা কোন তরকারী দিয়ে খাবার খায়, কোথায় অবস্থান করে, কোন পথে কিভাবে কোথায় তাদের গমনাগমন সবকিছুই তাদের জানা? অবস্থা যখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের এত অধিক জানাজানির মধ্য দিয়েই এগিয়ে আসে, তখন সমাজে উপর্যুপরি সংঘটিত এত হত্যাকাণ্ডের মূল কার্যকারণের সিংহভাগ কোথায়, তা বোধ হয় ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে না। গত প্রায় ২০ দিনে রাজধানীতে ৬ জন ব্যবসায়ী হত্যা বিশেষ করে এই সেদিন নাটোরে ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদারের ভাতিজা সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত সাব্বির আহমদ গামার রক্ত শুকাতে না শুকাতেই রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ত্রাসীদের হাতে সালমা ট্রাভেল এজেন্সীর মালিক মোস্তফা কামালের হত্যাকাণ্ডের চরিত্রগত দিকেও এই ঘটনার আনুপূর্বিক অবস্থা চিন্তা করলে সহজেই আঁচ করা চলে যে, সারাদেশে যেসব হত্যাকাণ্ড, ডাকাতি ও সন্ত্রাসী তৎপরতার ঘটনাবলী ঘটে চলেছে, তার মূল কার্যকারণ হিসাবে কি কি বিষয়াদি কাজ করছে। প্রশাসনের নিরাপত্তা বেষ্টনির বাইরে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ব্যাহত হবার কারণগুলো যথাযথ চিহ্নিত করা ও সেগুলো যেটা যেভাবে দূরীকরণ সম্ভব, সেভাবে সুনিপুণতার সাথে এ ব্যাপারে সরকারিভাবে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গৃহীত না হলে, শুধু অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দ্বারা যেমন সমস্যাবলীর সমাধান হয় না, তেমনি এ দ্বারা কোন সরকারের পক্ষে দীর্ঘদিন নিজের সমর্থক জনমনে আপন ইমেজ ধরে রাখাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় বৈ কি।

শোনা গিয়েছিল, সরকার এ জন্যে সংস্কারমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ও করছেন, কিন্তু তার সুফল যতক্ষণ পর্যন্ত জনমনকে স্পর্শ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হবে না।

সরকারি কর্তৃপক্ষের করণীয়ের ব্যাপারে যেমন এ ব্যাপারে আরও তৎপর হওয়া জরুরী এবং দলীয় লোকদের কর্মতৎপরতাকেও সঠিকভাবে দেশ গড়ার অনুকূলে নিয়োজিত করা কর্তব্য, তেমনি সরকারের বাইরে অবস্থানকারী রাজনৈতিক ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বকেও দেশোন্নয়নের পূর্বশর্ত সামাজিক আইন-শৃঙ্খলা উন্নত রাখার কাজে সহযোগিতা দান অত্যাবশ্যক। কেবল প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ

www.pathagar.com

করার লক্ষ্যে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে উস্কানিমূলক বক্তব্য ও ধ্বংসাত্মক ভূমিকা দ্বারা কোনদিনই সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। এ কথা সরকারি-বেসরকারি উভয় পর্যায়ের নেতৃত্ব ও কর্মীদের বেলায়ই প্রযোজ্য। বিশেষ করে আমাদের দেশের জনগণ যারা দীর্ঘদিন থেকে এ জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী, তারা এখন আর পূর্ববর্তী ঐ অবস্থার রাজনীতি দেখতে চায় না। কেননা, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গঠনমূলক কাজ ও সেগুলোর বাস্তবায়নে কর্তব্যবোধ ও নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মতৎপরতা ছাড়া যেকোন রাজনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা দেশ ও জনগণের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না।এমনকি সামাজিক জীবনে যে শান্তিতে কোন নাগরিক ঘুমও যেতে পারে না, ইতিপূর্বে সে ব্যাপারে জনগণের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে।

কাজেই দেশে বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি রোধে ক্ষমতাসীন সরকারের অনুসৃত নীতি বাস্তবায়নে যেমন সংশ্লিষ্ট প্রয়োগকর্তাদের বৈষম্যমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত ও অধিক কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে কাজ করতে হবে, তেমনি সরকারের বাইরে অবস্থানকারী নেতৃত্বকেও ক্ষমতাপ্রাপ্তির যাবতীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ থেকে সকল প্রকার সন্ত্রাস ও অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণে জনকল্যাণে সক্রিয় হতে হবে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হিংসা হিংসা ডেকে আনে। প্রতিহিংসাকে জাগ্রত করে। এই অবস্থা দেশবাসী আর সইতে পারছে না। তারা চায় শান্তি ও উন্নতি। তাদের এ লক্ষ্য অর্জনের অনুকূল কর্মসূচীই যেকোন দলকে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও যেমনি জনপ্রিয় করে তুলতে বাধ্য, তেমনি তার ব্যতিক্রম শত জনপ্রিয় থাকলেও কোন দল জনসমর্থন হারিয়ে গণঅসন্তোষের শিকার হতে বাধ্য। এদেশের এই তিক্ত অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই সকল নেতৃত্বের উচিত রাজনীতি ও অপর সকল কাজের মধ্য দিয়ে জনকল্যাণমূলক কাজে জনমনে নিজেদের অবস্থান তৈরি করা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে হত্যা-পাল্টা হত্যার এই ধারাবাহিকতা রোধ করা।

মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র

[প্রকাশ ঃ ২০০৪ ইং]

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরি শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্র এর জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছে। দুশমনের জন্য যেই যুগের উপযোগী যেই অস্ত্র ব্যবহার করা দরকার, তারা সে যুগে সেই অস্ত্রই ব্যবহার করে আসছে। কখনও মিথ্যা প্রচারণা, কখনও প্রত্যক্ষ লড়াই, কখনও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে যেখানে দেখেছে আশানুরূপ লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না, সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক মাধ্যমকে সুকৌশলে ব্যবহার করেছে। এজন্যে আধুনিক যুগে তারা নিজেদের প্রভাব বলয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষা নীতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের চিন্তাচেতনাকে নিজেদের অনুকূলে গড়ে তোলার ষড়যন্ত্রটিকে সফলভাবে কাজে লাগাতে

www.pathagar.com

সক্ষম হয়েছে। এর বড় প্রমাণ হলো ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর ঐ দর্শন ও দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা নীতি গড়ে তোলা। তখন যেমন তারা মনে করেছিল যে, দীর্ঘ ১শ' বছরের শাসনেও যখন মুসলমানদেরকে তাদের জীবনাদর্শ মূল্যবোধ ও স্বকীয় চেতনা থেকে বিচ্যুত করা যায়নি, তাই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামের প্রাণসত্তাকে সংকোচিত করতে হবে। তাই এখানে পশ্চিমের জড়বাদী ধ্যান-ধারণা সম্বলিত শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা নীতি গোটা ভারতে চালু করেছিল। বর্তমানেও তারা ইসলাম বিরোধী শত চক্রান্ত সত্ত্বেও বিশ্বময় ইসলামী জাগরণ দেখে সেই অভিন্ন কারণ ও অভিন্ন লক্ষ্যে সারা মুসলিম দুনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেদের আদলে গড়ে তোলার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে।

ইংরেজ শাসিত অবিভক্ত ভারতে তাদের শাসনের একশ' বছরের মাথায় ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার সশস্ত্র বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা ছিল মুসলিম সিপাহীদের যার নেপথ্যে ও প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে অনেক মুজাহিদসহ দেশের আলেম সমাজই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। '৫৭'র বিপ্লবকে চরম জুলুম-নিপীড়নের মাধ্যমে ইংরেজরা দমনে সফলকাম হবার পরম চিন্তা করলো যে, দীর্ঘ ১শ' বছর শাসন করার পরও ভারতের এককালের শাসকজাতি মুসলমান ও তাদের সহযোগীদের ইংরেজ বিরোধী দমন করা যায়নি। সুতরাং এখানে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে ভারতের জনগণ বিশেষ করে মুসলমানরা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও জীবনধারার অনুসারী হয়ে গড়ে উঠে এবং নিজেদের ইসলামী স্বকীয় চেতনা ও মূল্যবোধ থেকে সরে আসে। এই লক্ষ্যে তাদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রমূলক যেই শিক্ষা দর্শনটি চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, লর্ড ম্যাকলের ভাষায় তা ছিল We must do our beat to foram a class of people those who will be Indians in blood and colour, but ultimately they will be Britishers in moral and intelligence.

"আমাদের শিক্ষা দর্শন হবে এখানে এমন একশ্রেণীর লোক তৈরি করা, যারা গায়ের রংয়ের দিক থেকে ভারতীয় থাকলেও চিন্তা-মনন ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে বিলাতী হয়ে গড়ে উঠবে।" বাস্তবেও তাই হয়েছে। তখন সেই বিপর্যয়ের দিনে বৈষয়িক যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত মুসলিম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ইসলাম, ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে মাদ্রাসাসমূহ চালু করেন, উপমহাদেশের দেশসমূহে যেগুলোর অবদান চিরকাল প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে এবং থাকবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু হালে সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমের পুঁজিবাদী আধিপত্যবাদের যেই ধূর্তামিপূর্ণ আগ্রাসন শুরু হয়েছে, এই আগ্রাসী শক্তি আফগানিস্তান-ইরাক ধ্বংস ও দখল করেই শুধু ক্ষান্ত হচ্ছে না, অতীতের মতোই তারা মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বস্তুবাদী ও ইসলামী প্রভাবমুক্ত করার ষড়যন্ত্র নিয়ে এবার মাঠে নেমেছে। তবে এবারের ষড়যন্ত্র হচ্ছে গোটা মুসলিম বিশ্বকেন্দ্রিক। তাদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বিভিন্ন মুসলিম দেশের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানতো বটেই

www.pathagar.com

এমনকি জনগণের চাঁদা ও যাকাত-সাদকার অর্থে পরিচালিত বেসরকারি কওমী মাদ্রাসা-মক্তবও ছাড়া পাচ্ছে না। শুধু মুসলিম দেশগুলোই নয়, অমুসলিম দেশগুলোর সংখ্যালঘু মুসলমানদের মাদ্রাসাসমূহও এ ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাদ যাচ্ছে না। যে ব্যাপারে এক দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধে আমি বছরখানিক আগে ভারতসহ বিভিন্ন মুসলিম-অমুসলিম দেশের মাদ্রাসা বিরোধী ষড়যন্ত্র তুলে ধরেছিলাম। বলাবাহুল্য, ঐ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই তাদের অনুসারী রাষ্ট্র, গ্রামসহ বাংলাদেশের বড় বড় মাদ্রাসাসমূহে তালেবানী অস্ত্র ও অস্ত্র ট্রেনিং কেন্দ্র আবিষ্কারে লিপ্ত হয়। এ ব্যাপারে তারা পত্র-পত্রিকায় মাদ্রাসাগুলোতে দীর্ঘদিন যাবত লাদেনের অনুসারী আল কায়েদাও কম আবিষ্কার করেনি, যেই অপকর্মে এখনও তারা সক্রিয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এখন ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তিগুলো এ বিষয়টিকে শক্তহাতেই ধরেছে এবং প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের অনুগত শাসক ও নিজেদের তল্পীবাহক এজেন্টদের দ্বারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বস্তুবাদী এবং মাদ্রাসাগুলোকে এর প্রাণসত্তা থেকে বিচ্যুত করার চক্রান্ত জোরদার করে তুলেছে। তারই উদাহরণ স্বরূপ, এখানে ইসলামী দুনিয়ার কয়েকটি দেশের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি, যেমন আগ্রাসী শক্তির চাপে কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সে দেশের পাঠ্যপুস্তকসমূহ নতুন করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রস্তুত করে নিয়েছে। কুয়েত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এই আমূল পরিবর্তনের মূলে বিদেশী বিশেষ করে মার্কিনী চাপ কাজ করছে বলে জানা যায়। প্রকাশ, নতুন এই শিক্ষা কারিকুলাম তৈরিতে সতর্কতার সাথে এদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যেন কোন পাঠে তথাকথিত "চরমপন্থী" অর্থাৎ ইসলামপন্থীদের নাম নেশানাও না থাকে এবং মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হবার শিক্ষা না পায়। এ ব্যাপারে উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিল এই আত্মঘাতী কাজে যথারীতি ভূমিকা পালন করছে। পাঠ্যক্রমে এই নতুন পরিবর্তন শুধু কুয়েতেই নয় বরং গোটা আরব দুনিয়ার প্রত্যেক দেশেই কমবেশ চলছে। প্রকাশিত এক তথ্য অনুযায়ী, পাশ্চাত্য ভাবধারা বিরোধী ইমেজ পোষণকারী মাহাথির মুহাম্মদের মালয়েশিয়াতে পাঠ্যপুস্তকে অনেক কিছু পরিবর্তন সাধন করা হচ্ছে। অপরদিকে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্য নিয়ে পুনর্বিবেচনা চলছে। পাকিস্তানের পাঠ্য তালিকায়ও পরিবর্তন সাধনের এই ধারা জোরেশোরে চলছে। সেখানকার ফেডারেল সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জোবায়দা জামালপুরী পেন্টাগণে গিয়ে বুক ফুলিয়ে বলে এসেছেন, বর্তমান মুসলিম বংশধরদের মধ্যে তেমন পরিবর্তন এখনও আসেনি, তবে আগামী ১৫/২০ বছরের মধ্যে আমরা নতুন প্রজন্মে নতুন মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারবো।

মুসলিম বিশ্বে সামরিক, আধাসামরিক, একনায়কদের শাসন বিদ্যমান। এছাড়া মুসলিম শাসকদের প্রায় ক্ষেত্রে চেহারা দেখা যায় দু'রকম। একটি জনগণকে দেখাবার জন্য, অপরটি পশ্চিমাদের দেখাবার জন্য। প্রথমোক্ত চেহারাটা অনেকেরই ভীতিপ্রদ এবং কঠোর। শেষোক্ত চেহারাটি হচ্ছে নতজানুর চেহারা। পিছে হটার চেহারা, যাকে তারা কর্মকুশলতা নামে আখ্যায়িত করতে অভ্যস্ত। ১১ই সেপ্টেম্বরের টু-ইন টাওয়ার

www.pathagar.com

ঘটনার পর বলা হয়েছিল, এ সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাটি হলো উসামা বিন লাদেন এবং মোল্লা ওমরের। এরা চরমপন্থী এবং পশ্চিমাদের জানের দুশমন। কিন্তু এখন এটা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আসলে সমস্যাটি হলো ইসলাম, মুসলমান এবং তাদের ধর্মীয় চেতনা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বিরোধিতার সমস্যা। এসব লোকের কথা অনুযায়ী বাস্তবিকই যদি এটি উসামা বিন লাদেন এবং মোল্লা ওমরেরই সৃষ্ট সমস্যা হতো, তাহলে প্রশ্ন জাগে সারা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যতালিকায় এ পরিবর্তনের অর্থ কি? ইসলামে চরমপন্থার কোন অবকাশ নেই। ইসলামী নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের প্রভাবাধীন মুসলমানরা না কখনও অপর ধর্মমতকে ঘৃণার চোখে দেখে, না তারা অপরাপর সভ্যতা ও জাতি-গোষ্ঠীর অস্তিত্ববিরোধী চিন্তা পোষণ করে। মুসলমানদের দীর্ঘ শাসন আধিপত্যের ইতিহাস তারই প্রমাণ, যেখানে অপরাপর জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মের লোকেরা শুধু নিজেদের মর্যাদা ও পূর্ণ মানবাধিকার নিয়ে বসবাসই করতো না, সরকারি প্রশাসনেও দায়িত্ব পালন করতো। বিশেষ করে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের গোটা অবিভক্ত বিশাল এলাকায় মুসলমানদের প্রায় এক হাজার বছর যাবত- শাসন কর্তৃত্বে থাকা কালেতো প্রশাসনের সামরিক বাহিনীতে ও অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অন্য ধর্মের বহু লোক দায়িত্ব পালন করেছে। ঐ সময় ইসলাম এবং মুসলিম শাসকবৃন্দ চরমপন্থী ভূমিকা পালন করলে, আজ দক্ষিণ এশিয়ায় একজন হিন্দুও খুঁজে পাওয়া যেতো না। বিশ্বে কোন সভ্যতা এরূপ কোন দৃষ্টান্ত আজও স্থাপন করতে পারেনি। তবে এটা ঠিক যে, ইসলাম তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনবোধের উপর এর অনুসারীদের অটল রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই মৌলিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ইসলাম কারও কোন সওদাবাজিকে সমর্থন করে না। এ দীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে যেসব পরাক্রমশালী মুসলিম শাসক দিল্লীকে রাজধানী বানিয়ে এই উপমহাদেশ শাসন করেছেন, তারা পরধর্ম ও পরধর্মাবলম্বী সহিষ্ণু না হলে দিল্লী কিছুতেই মুসলিম সংখ্যালঘু থাকতো না বরং এটি মুসলিম সংখ্যাগুরুই থাকতো। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, গোটা হিমালয়ান উপমহাদেশ পরাধীনতার অক্টোপাসে আবদ্ধ হবার বহুবিধ কারণের মধ্যে মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত কোন কোন অমুসলিম ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতাও দায়ী ছিলো। বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্তা নবাব সিরাজুদ্দৌলার অর্থ দফতর যেই জগৎশেঠের অধীন ছিল, নবাবের যেই প্রশাসনে ছিলেন উর্মিচাঁদ, রায়দুর্লভদের মতো ব্যক্তিরা, উপমহাদেশের স্বাধীনতা হরণের মূল নায়ক ইংরেজ ষড়যন্ত্রকারী লর্ড ক্লাইভের সাথে ষড়যন্ত্রে তাদের ভূমিকা কি প্রধান ছিল না? বরং রাষ্ট্রীয় সকল কিছুর মূল চাবিকাঠি অর্থ দফতরের প্রধান কর্মকর্তা জগৎশেঠই এই ষড়যন্ত্রে শক্ত ভূমিকা পালন করেছেন, যদিও ইতিহাসে এ জন্যে শুধু অদূরদর্শী লোভী সেনাপতি মীর জাফর আলীই অধিক ধিকৃত হয়েছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে কারও প্রতি জুলুম করা অপরাধ। তেমিন তাদের প্রতি কোন জালিম অত্যাচারী জুলুমের খড়গহস্ত নিয়ে এগিয়ে আসলে

www.pathagar.com

তখন ভীরু কাপুরুষের ন্যায় মুসলমানরা সেই অত্যাচার সহ্য করে উক্ত অত্যাচারীকে মানবতার উপর অধিক জুলুম করার সুযোগদানেরও বিরোধী।

আসলে একমাত্র পশ্চিমের বস্তুবাদী সভ্যতাই গোটা পৃথিবীকে তাদের অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে পদানত রাখতে চায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধজাধারীরাই স্বাধীনতা, মানবাধিকার ইত্যাদি মুখরোচক শ্লোগান দিয়ে মানবগোষ্ঠীকে নিজেদের দাসে পরিণত করে রাখতে চায়। তারা গণতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে সারাবিশ্বের উপর একনায়কত্ব চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট। তারা ন্যায়-নীতির বুলি কপচিয়ে মানুষকে অন্যায়ের যাঁতাকলে পিষ্ট করার মূলনীতি তৈরি করেন। সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যের কথা বললেও মুসলিম নারীদের ধর্মীয় বিধান পর্দা পালনকল্পে ব্যবহৃত কয়েক বিঘত কাপড়ে তৈরি ঘোমটা ও স্কার্ফকে পর্যন্ত তাদের সিক্যুলারিজমের জন্যে হুমকি মনে করেন। এর চাইতে পরধর্ম অসিহষ্ণুতা ও জাতিসংঘ স্বীকৃত সনদ পরিপন্থী কাজ আর কি হতে পারে? অথচ চালনি কর্তৃক সূচের পাছার ছিদ্রের সমালোচনা করার মতো তারা এবং তাদের বিভিন্ন দেশস্থ এজেন্টরা মুসলমানদেরকে 'সাম্প্রদায়িক' ও 'চরমপন্থী' বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

ইসলাম বিশ্বজনীন সভ্যতার ধারক এবং মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে সকল দেশ ও সমাজের সংস্কৃতির প্রতি সহনশীল। এ কারণেই ইসলামী দুনিয়ার স্থাপত্য রীতি নানান বৈচিত্র্যের ধারক। মুসলিম বিশ্বের পোশাক-পরিচ্ছদ জীবনধারায় এত বিদ্যমান যে, অপর কারও মধ্যে এ ব্যাপারে নমনীয়তার নজির পাওয়াটা বিরল। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিকেই বিশ্ববাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়। পাশ্চাত্য তাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং চার্চগুলোতে কি কি পড়িয়ে থাকে, মুসলমানরা এ ব্যাপারে জানতে আদৌ আগ্রহী নয়, অথচ তারা মুসলমানদের শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্য বিষয় নিয়েও নাক গলায়। মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনার মূল উৎস তাদের ধর্মীয় শিক্ষাকে নস্যাৎ করতে তারা উদগ্রীব, যেই শিক্ষায় মানুষের মানবীয় সদগুণাবলীর বিকাশ সাধনপূর্বক তাকে অপরাধমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, সৎ ও আদর্শবাদী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। কোন কোন পাঠ্যে জেহাদের কথা থাকলেও সেটা ইসলামের বাস্তব মৌলিক শিক্ষারই অংশ। তা কারও উদ্ভাবিত নয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল শাসকই পাশ্চাত্যের ভাষাতেই কথা বলে থাকেন। হঠাৎ তারা নিজ নিজ দেশের পাঠ্যে পরিবর্তন আনয়নের কথা ভাবতে শুরু করেন। অথচ প্রত্যেক দেশের সরকারই নিজ নিজ দেশের পাঠ্য কারিকুলাম আপন স্বাকীয়তার দর্পণে তৈরি করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে তাদের বর্তমান অবস্থা বিচার করলে মুসলিম শাসকদের ইসলামও যথাস্থানে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

সঙ্গত কারণেই বলতে হয় যে, যারা আজ আমেরিকার চাপে নিজ দেশের পাঠ্য পুস্তককে ইসলামের প্রভাবমুক্ত রাখার জন্যে নতুন করে তাতে পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়েছে, আল্লাহ না করুন, তারাই আগামীতে গিয়ে আমেরিকার চাপের মুখে কুরআন-হাদীসের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন। কোন এক সময় এই বিষয়টিও

www.pathagar.com

চিন্তা করা হতো বৈকি, কিন্তু আজকাল যা ঘটছে, তা সকলেরই সমান। মুসলিম বিদ্বেষী বৈরি শক্তিগুলো এ ব্যাপারে আগে থেকেই হৈ-চৈ শুরু করে আসছিল। ভারতের বিজেপির বিশিষ্ট নেতা একাধিকবার বলেছেন যে, কুরআনের বেশকিছু আয়াত বাদ দিতে পারলেই মুসলমান-হিন্দু, মুসলিম-বৌদ্ধ সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আমেরিকা ইউরোপে এই দৃষ্টিভঙ্গির লেখা অব্যাহতভাবে প্রকাশ পেয়ে আসছে। ঐ সব লেখায় মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমূহের উপরও হামলার পরমার্শ দেয়া হয়ে থাকে। বলা হয়, সম্পর্কের পথে মুসলমানদের আসল সমস্যাতো হলো একমাত্র কুরআন। এই কুরআনই মানুষকে (নাউযুবিল্লাহ) চরমপন্থী হতে উদ্বুদ্ধ করে।

মুসলমান এবং পাশ্চাত্যের সম্পর্কের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মুসলমানরা কখনও তাদেরকে এ ব্যাপারে কোন যুক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারেনি। মুসলমান তাদের ৪টি বিষয় পরিষ্কার করলে আবার তারা অন্য চারটি দাবী এনে হাজির করে। কিন্তু এ সত্ত্বেও মুসলমান পশ্চিম থেকে কিছুই পায়নি, যেমন তুরস্ক তাদের অনুসারী হয়ে আগাগোড়াই সিক্যুলার। কিন্তু তারা ২৫ বছর ধরে চেষ্টা করেও ইউরোপীয় মৈত্রী জোটে ঢুকতে পারেনি অথচ এ জন্যে তাদের কাছে নতজানু হয়ে কতই না এ জন্য ভিক্ষা চেয়ে আসছে। তেমনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ আমেরিকার জন্যে যে কত কিছুই না করলেন, কিন্তু আজও আমেরিকা পাকিস্তানের প্রতি আস্থা আনতে পারছে না। আরব দুনিয়ার শাসকদের পাশ্চাত্য প্রীতির দরুন তাদেরকে পাশ্চাত্যের এজেন্ট মনে করা হয়। কিন্তু পশ্চিমারা তাদের ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে পারছে না। অথচ সেসবের অধিকাংশই সিক্যুলার শাসক।

মুসলিম বিশ্বে পাঠ্য তালিকার পরিবর্তন একটি সাধারণ বিষয় নয়। এটা রীতিমতো সরাসরি মুসলমানদের ঈমান আকীদা ও ধর্মীয় চিন্তাধারা উপর এক আগ্রাসী হামলা। বর্তমানে এক রকম সারা মুসলিম দুনিয়াই রক্তরঞ্জিত। কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, ভারত সর্বত্র মুসলমানের রক্তে লালে লাল। আফগানিস্তান, ইরাক আমেরিকার দখলে। তবে আমাদের দৃষ্টিতে আমেরিকার অভিপ্রায়ে মুসলমানদের পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্তনটি এই ধরনের দেশ দখলের চাইতেও ভয়াবহ ও মারাত্মক। কারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মানুষ তৈরির কারখানা। পাশ্চাত্য গত দু'শ বছর ধরে মুসলমানদেরকে সিক্যুলার অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরী মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষ ও লিভারেল করে গড়ে তোলার যেই শিক্ষা দিয়ে আসছিল, সেই শিক্ষাও লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট মনে করছেনা। তাই এই জন্যে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে সরিয়ে এনে নিজেদের অনুগত করে তুলতে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসকে আরও গভীর থেকে ধ্বংস করতে হবে। সুতরাং ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনার বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই ঈমানী দুর্বলতার শিকার মুসলিম শাসকদের দ্বারা এখন তারা প্রতিটি মুসলিম দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্য তালিকা সংশোধনের চেষ্টা চালাচ্ছে। এদিক থেকে যেই কোন মুসলমানের মধ্যে ধূলিকণা পরিমাণ ঈমান থাকলেও এটাকে তার জন্যে এক চ্যালেঞ্জ মনে করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে শুধু বক্তৃতা-বিবৃতিতে কাজ হবে না এ জন্যে বাস্তব কাজ প্রয়োজন।

www.pathagar.com

আগুনের গ্রাস থেকে দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ ও প্রাণ রক্ষার কি ব্যবস্থা হবে না?

[প্রকাশ ঃ ১২. ১. ২০০৫ ইং]

একজন নয়, দু'জন নয় ২২ জন আদম সন্তান পুড়ে কয়লা অঙ্গার হয়ে গেছে। আরও ৬ জনের লাশের সন্ধানই পাওয়া যায়নি। আহত হয়েছে শতাধিক। কী বীভৎস, কি লোমহর্ষক এ ঘটনা! গত ৬ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাজধানীর অনতিদূরে সিদ্ধিরগঞ্জে একটি গার্মেন্টিস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ঘটেছে এই নির্মম গণপ্রানহানি। তাতে কোটি টাকার সম্পদ পুড়ে গেছে বলে জানা যায়। প্রাণ ও সম্পদহানির এসব নির্মম ঘটনা কেবল এবারই নয়, প্রতি বছরই যেন একটা রুটিন ওয়ার্কের মতো ঘটে চলেছে। কিন্তু প্রতিরোধের নেই কোন কার্যকর ব্যবস্থা। কোন দূর্ঘটনার কারও মৃত্যু আর দূর্ঘটনার নামে কারও অবহেলা, খামখেয়ালি, ক্ষেত্রবিশেষে অসাধুতা, অদক্ষতা ও কার্পণ্যজনিত মর্মস্পর্শী ঘটনার মৃত্যু এক হতে পারে না। যদ্দুর জানা যায়, কারখানার দোতলায় যখন আগুন লাগে তখন গেট খোলা ছিলো। কিছুক্ষণ পরই এক মালিক কর্মকর্তার নির্দেশে গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। ঘটনাটির সত্যাসত্য গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকেই জানা যাবে। সত্য হলে এর চাইতে দুঃখ, হতাশাব্যঞ্জক ও বড় অপরাধের ঘটনা আর কিছুই হতে পারে না। গত ৫ মাস ধরে এ কারখানার শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছে না। ঘটনার দিন ৭ই জানুয়ারী বেতন দেয়ার কথা ছিলো। এজন্য সকলে বেতন পাবে আশায় প্রতিক্ষায় ছিলো। কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা ঐদিন বেতন তো পায়ইনি বরং এমন নির্মমভাবে প্রাণ হারিয়েছে যে, নিজেদের রক্ত-মাংসের দেহগুলো কয়লা-অংগারে পরিণত হলো। হায়! ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! পুরো ঘটনাটিই যে কিরূপ ভয়াবহ এবং কি পরিমাণ হৃদয়বিদারক ছিলো, এর ছিঁটেফোঁটা দু'একটি উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট। দুই ভাই ইয়াকুব ও আজিজুল হক আয়রন বিভাগে কাজ করতেন। অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহতদের মতো তারাও ৩ তলায় তালাবদ্ধ ১টি রুমে আটকা পড়েছিলেন। ইয়াকুব জানান, দীর্ঘ এক ঘণ্টা আমরা আল্লাহকে ডাকি। দুই ভাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করি এবং পরকালের যাত্রীরূপে শেষ বিদায় নিয়ে নেই। আগুনের তাপে সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছিলো। ভাইকে বলি, ভাই! আমি আর পারছি না। ভাই আমাকে তার আড়ালে নিয়ে নিজের শরীরে উপরই সব তাপ নিচ্ছিল। এ মুহূর্তে দেখি অলৌকিকভাবে জানালা ভেঙ্গে পড়েছে। না, অলৌকিকভাবে নয়, বাইরে থেকে লোকজন জানালা ভেঙ্গে আমাদের উদ্ধার করেছে। নিহতদের মধ্যে কোন পরিবারের ৩জনও রয়েছে। বিধবা নূরুন্নেসা নিজ পুত্র মামুন, কন্যা নার্গিস ও তার জামাতাকে হারিয়েছেন। গার্মেন্টিস এর হেলপার রানী বেগম বলছেন, "মাকে আনতে উপরের তলায় গেলে আমিও আসতে পারতাম না। এখন মা ছাড়া আমিও বাঁচতে চাই না। আমাকে মার কাছে নিয়ে যাও।" এভাবে কেউ আপনজনের মৃত্যু, কেউ

www.pathagar.com

আপনজনের নিখোঁজ হওয়া, কেউ তাদের পুড়ে যাওয়া কয়লা আকৃতির লাশ দেখে গগনবিদারী বিলাপ-আর্তনাদে গোটা পরিবেশকে ভারি করে তুলেছে।

প্রশ্ন হলো, গার্মেন্টিসের ক্ষুধাক্লিষ্ট, দারিদ্র্যপীড়ায় জর্জরিত বকেয়া বেতন প্রাপ্তির চিন্তায় প্রতীক্ষমান গরিব শ্রমজীবী মানুষদের এই লাশের কাফেলা আমাদেরকে আর কতদিন দেখতে হবে? অগ্নিকাণ্ডে কয়লায় পরিণত সন্তান ও স্বামী হারা, স্ত্রী-বোন-ভাই ও মা হারাদের করুণ কান্না ও বিলাপ ধ্বনি আর কতকাল শুনতে হবে? এই মহাবিপদের হাত থেকে আহত অবস্থায় রক্ষা পাওয়া জনৈক গার্মেন্টস কর্মচারী বলেছেন, 'মাটি কেটে জীবনযাপন করতে হলেও জীবনে বেঁচে থাকতে আর কোন দিন গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করবো না।' এর অর্থ হলো- গার্মেন্টস কারখানাসমূহ গরিব শ্রমজীবী মানুষদের শ্রমলব্ধ কর্ম দ্বারা লাভবান হলেও তাদের ন্যায্য পাওনা দানে এমনকি শ্রমিকদেরকে অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষায় কার্যকর কোনো পদক্ষেশ এ পর্যন্ত তারা গ্রহণ করেনি। নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের বেলায় একই অবস্থা। গার্মেন্টস শিল্পের মালিকরা দূর্ঘটনার কারণে বীমা থেকে ক্ষতিপূরণ পেলেও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনা ও ক্ষতিপূরণ পায় না। শিল্প-কারখানা ও এর পরিবেশ সম্পর্কিত সরকারের কারখানা নীতি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে এভাবে প্রতিবছর নির্মমভাবে না এত লোকের প্রাণহানি ঘটতো, না এভাবে দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ পুড়ে ছাই হতো। বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে অগ্নিকাণ্ডে পদদলিত এবং হুড়োহুড়িতেই মৃত্যুর ঘটনা বেশি ঘটে। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে এক সঙ্গে এত লোকের প্রাণহানির ঘটনা এবারই প্রথম বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা। কারখানা থেকে বের হবার গেটগুলো তালাবদ্ধ থাকায় বের হতে পারেনি বলেই হতভাগ্য শ্রমিকদের আগুনে পোড়া অধিকাংশ বিকৃত দেহ গেটের কাছেই পাওয়া গেছে। দেহগুলো পুড়ে এত অধিক বিকৃত হয়েছে যে, নারী-পুরুষদের চিনে পৃথক করাও সম্ভব হয়নি। এই অগ্নিকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়।

আমাদের দেশে এমনকি খোদ রাজধানী ঢাকা এবং দেশের সর্ববৃহৎ বন্দরনগরী চট্টগ্রামে প্রতিবছর শুষ্ক মওসুমে কত কোটি কোটি টাকার সম্পদ পুড়ে ছাই হয় এবং অগ্নিকাণ্ডে কত শ্রমিকের নির্মমভাবে প্রাণহানি ঘটে, তা দেখলে মাথায় হাত দিতে হয়। নিম্নের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান থেকে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কিত ক্ষয়ক্ষতির অনুমান করা হয়। ৪/২/০৪ রাজধানীর তেজগাঁওয়ের লালমাঠ বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে তিন শিশু নিহত, অর্ধশত আহত। ২৪/৩/০৪ পল্লবীতে হোটেলের অগ্নিকাণ্ডে ৪ কর্মচারী পুড়ে ছাই। ১০/৪/০৪ স্বর্ণ দোকানে অগ্নিকাণ্ড। ৯/৪/০৪ ফতুল্লায় ৬০ বাড়ি ভস্মীভূত। ৪/৫/০৪ মীরপুর দারুস সালাম এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ৭ গার্মেন্টস শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু। ২৯/৪/০৪ কেরানীগঞ্জে ৪ শিশু জীবন্ত দগ্ধ, ৩৫২ বাড়ি ভস্মীভূত। ৬/৫/০৪ বিহারী ক্যাম্পে তিন শতাধিক ঘর ভষ্মীভূত। ২৮/১০/০৪ মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর বাজারে অগ্নিকাণ্ডে কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি। ৯/৫/০৪ পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ ১ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি। রাজবাড়ি ২টি অগ্নিকাণ্ডে ১৩ লাখ টাকার ক্ষতি। ৩/১১/০৪ রাজধানী সদরঘাটে, মীরপুর ও

www.pathagar.com

রামপুরায় ৩টি অগ্নিকাণ্ডে ৪ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি। ২১/১১/০৪ নিউ বঙ্গবাজার হকার্স মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৭টি দোকান পুড়ে ছাই। শতাধিক কোটি টাকার ক্ষতি। ৯/১২/০৪ খুলনায় অগ্নিকাণ্ডে সাড়ে ৩ কোটি টাকার ক্ষতি। ২৩/১১/০৪ শ্যামপুরে ৪ জন জীবন্ত দগ্ধ এবং অর্ধকোটি টাকার ক্ষতি। ২৫/১২/০৪ চট্টগ্রামে আবুল খায়ের গ্রুপের ৬ ফ্যাক্টরীতে অগ্নিকাণ্ড ৭০ কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি। ৩০/১২/০৪ মীরপুর বিহারী ক্যাম্পের দেড়শ বেনারশী কারখানা ভস্মীভূত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অগ্নিকাণ্ডে এই গরীব দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস ছাড়াও ২০০ লোকের মর্মান্তিক প্রাণহানি ঘটেছে। রাজধানীতে মার্কেট নির্মাণে এবং গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলোতে আধুনিক ও কার্যকর অগ্নি প্রতিরোধক ব্যবস্থার প্রতি মালিক-সরকার কারুরই যে ভ্রুক্ষেপ নেই, বিভিন্ন মর্মান্তিক ঘটনা তারই প্রমাণ। অগ্নি প্রতিরোধক আইনের কেউই তোয়াক্কা করে না। প্রচলিত কারখানা আইনের প্রয়োগ এবং বিজিএমইর নির্দেশনা বাস্তবায়ন না হওয়াতেই বিশেষ করে গার্মেন্টসগুলোতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকে। বিকল্প সিঁড়ি, সুরক্ষিত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীসহ প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকা কারখানা আইনে বাধ্যতামূলক হলেও অধিকাংশ গার্মেন্টিসে তার কোন ব্যবস্থা করা হয় না। ঘটনা ঘটে গেলে তা নিয়ে কয়েক দিন হৈ চৈ হয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, কিন্তু পরে না সরকার, না মালিক কারও পক্ষ থেকেই কোন কার্যকর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয় না। বিশেষ করে কারখানায় অগ্নিকান্ডে শ্রমিকদের মৃত্যুর ঘটনা অধিকাংশই দরজা বন্ধ থাকার কারণেই হয়ে থাকে। কারখানা আইন অনুসারে জরুরী বহির্গমন সিঁড়ি থাকা আবশ্যক হলেও তা নেই। সুরক্ষিত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার রয়েছে অনুপস্থিতি।

সবচাইতে বড় কথা হলো অধিকাংশ গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরীতে অগ্নিনির্বাবক সরঞ্জাম আদৌ নেই। তেমনি প্রতিবছর বহু মর্মান্তিক ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও যেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অগ্নিনির্বাপক কর্মী বা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকার কথা, তাও নেই কোথাও। ফলে ফীবছরই আমাদের দেশের এসব পোশাক শিল্পকারখানা কিংবা গুলিস্তানের মতো দেশের বড় বড় বিপণী কেন্দ্রগুলোতে অগ্নিকাণ্ড ঘটেই চলেছে তেমনি শ্রমিকদের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাও বেড়েই চলেছে। যেমন, নরসিংদীর নিটওয়্যার গার্মেন্টিসে অগ্নিকাণ্ডে মারা যায় ৪৮ জন শ্রমিক, যাদের ২৫ জনই মহিলা। পদদলিত হয়ে মারা যায় ৭ শ্রমিক মহিলা। ৯০ সালের ২৭শে ডিসেম্বর মীরপুর ১০- এ সারাকা গার্মেন্টিসে ২৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে। ৯৫ -এর ৫ই আগস্টে ইব্রাহীমপুরের এক গার্মেন্টিসে অগ্নিকাণ্ডে ৯ শ্রমিক নিহত হয়। মীরপুরে ১৪ নং ইউরোপা গার্মেন্টিসে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ জন মহিলা শ্রমিকসহ ২১ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। পল্লবীর সানটেক্স গার্মেন্টিসে ১৯৯৬ সালের ২৪শে জুন ৯ মহিলা শ্রমিকসহ ১২ জন শ্রমিক মারা যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সেখানে এ জাতীয় বিপদের আশঙ্কা হেতু সব সময় গার্মেন্টিস কারখানার গেট যেখানে খোলা থাকার কথা, সেখানে সব সময় তারা ঝুলতে থাকে। কোথাও কোথাও গেটে তালা দিয়ে দারোয়ানরা অন্য কাজে চলে গেলেও কর্তৃপক্ষের সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ থাকে না।

www.pathagar.com

মোটকথা, গার্মেন্টস কারখানায় একের পর এক অগ্নিকাণ্ডে বহু শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও ঘটনার পরপর মালিক এবং সরকার পক্ষের কিছুটা চেতনা দেখা গেলেও সারা বছর প্রতিবাৎসরিক এ ভয়াবহ সমস্যার সমাধানকল্পে কোনই উদ্যোগ দেখা যায় না। এটা এক চরম দায়িত্বহীনতা ও অমানবিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। বারংবার এমনটি ঘটার পরও একই পৈশাচিকতা ও বর্বরতাপূর্ণ এরূপ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে দেয়া এবং তার প্রতিকার কোন তরফের কার্যকর উদ্যোগ না থাকা চরম নিষ্ঠুরতারই পরিচায়ক নয়, যাদের দায়িত্বহীনতায় এই নির্মম গণপ্রাণহানি রোধ হচ্ছে না, তারাও এই মৃত্যুর জন্যে এদিক থেকে আপন দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না।

যেহেতু মালিকপক্ষ দূর্ঘটনায় বীমা থেকে ক্ষতিপূরণ পায়, এ জন্যে তাদের ক্ষয়-ক্ষতির জ্বালা তেমন তীব্র না হতে পারে কিন্তু এসব কারখানায় কর্মরত সমাজের দারিদ্র্যক্লিষ্ট নারী ও পুরুষ শ্রমিকরা একদিকে এই শ্রমের ন্যায্য পাওনা থেকে হয় বঞ্চিত, অপরদিকে বাঁচার জন্যে কাজ করতে এসে নির্মমভাবে হারায় নিজেদের অমূল্য প্রাণ। আবার আহত এবং নিহতদের উত্তরাধিকারী পোষ্যরাও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায় না। সুতরাং গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিপণী কেন্দ্রে অগ্নিনির্বাপণের আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী ভিত্তিতে প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট মালিক ও প্রতিষ্ঠানের জন্যে অপরিহার্য করা কর্তব্য। অন্যথায় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক। তেমনি মালিকদের পক্ষ থেকেই ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য। বর্তমান জোট সরকার রাষ্ট্রীয় অন্যান্য সেক্টরে দেশের উন্নয়নকল্পে যেভাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে, তেমনি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারী পোশাক শিল্পে রক্ত পানি করা শ্রম দিয়ে যেসব নারী-পুরুষ কাজ করছেন, তাদের এ কাজে যথার্থ পারিশ্রমিক প্রাপ্তি ও সংশ্লিষ্টদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানেও সরকারে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেশবাসী প্রত্যাশা করে, যা ভবিষ্যতের জন্যে একটি স্মরণীয় অনুসরণীয় ঘটনা হয়ে থাকতে পারে।

এক অপরাধের প্রতিবাদে অন্য অপরাধ

[প্রকাশ ঃ ২৩. ৮. ২০০৩ ইং]

গত শনিবার গুলিস্তান এলাকায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক জনসমাবেশে ভয়াবহ বোমা হামলার পরপরই গোটা এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। রাজধানীতে ব্যাপক ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ শুরু হয়। বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা সিটি ভবনে হামলা চালায়। এ ভবন থেকেই হামলা হয় বলে কথা রটে গেলে একে লক্ষ্য করেই ভাংচুর শুরু হয়। সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যে এর রেশ ছড়িয়ে পড়ে মতিঝিল থেকে মৎসভবন, জিরোপয়েন্ট থেকে কাকরালইসহ গোটা গুলিস্তান এলাকায়। শুরু হয় একের পর এক গাড়ি ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ। বিক্ষুব্ধ নেতা কর্মীরা শতাধিক গাড়ি ভাংচুর করে। জিপি'ওর সামনে দুটি

www.pathagar.com

দোতলা বাস, দুটি প্রাইভেট কার, ১টি মিনিবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্টে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করা হয় কমপক্ষে ২০টি মিনিবাস। এ অবস্থায় রাজধানী জুড়ে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। অভিন্ন কারণে পরদিনও গাড়ি ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। যেই মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে এসব ভাংচুর হয়েছে সেই ঘটনার জন্যে দেশের আপামর জনতা সকলেই দুঃখিত ও বেদনা ভারাক্রান্ত। এ জন্য সকলে প্রকৃত অপরাধীর গ্রেফতার ও দ্রুত বিচার শাস্তি দাবী করছে। কিন্তু আরেকটি অন্যায়ের দ্বারা প্রথমোক্ত ঘটনার গুরুত্বকেই খাটো করা হয় না, উল্টো ভুল বুঝাবুঝিরও সৃষ্টি করা হয়। সরকারি বেসরকারি কোটি কোটি টাকার সম্পদ মূলতঃ এ দেশেরই সম্পদ। এ সম্পদ বিনষ্ট করার অর্থ দেশেরই ক্ষতি সাধন করা। সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণে নির্মম হতাহতের ঘটনা এবং তারই বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভাংচুর, লুট ইত্যাদির মাধ্যমে এসব ক্ষয়-ক্ষতির জন্যে গাড়ি, যানবাহন ও এগুলোর মালিকদের কোনই সম্পর্ক নেই। এ সবের সাথে সংঘটিত ঘটনার সামান্যতম সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলেও এ জাতীয় কাজের কিছুটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতো। কাজেই একটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আরেকটি অন্যায় কাজ করা কিংবা অন্যায়ের দুয়ার খুলে দিয়ে জনসম্পদ ধ্বংসের বিষয়টিকে তো মানাই যায় না বরং এটিও যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংশ্লিষ্ট সকলেরই তা উপলব্ধি করা উচিত।

গত শনিবারে বহুলোকের প্রাণহানির বেদনাদায়ক ঘটনাটি ঘটায় শুধু ঐ দিন প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে, ব্যাপারটি তাও নয়। বরং আমাদের দেশের কোন কোন রাজনৈতিক সংগঠনের এটা রুটীন ওয়ার্কে পরিণত হয়েছে যে, যেদিন হরতাল ডাকা হবে, হরতালকে জোরদার করার লক্ষ্যে তার আগের দিন বিকেলে গাড়ি পুড়িয়ে সরকারি-বেসরকারি সম্পদ নষ্ট ও তাতে অগ্নিসংযোগ করতে হবে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের এই অপসংস্কৃতি যে কোন মূল্যে উচ্ছেদ করতে হবে। কারণ, এতে দেশে আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্টের ও স্বেচ্ছাচারীতার প্রবণতাই কর্মী সমর্থকদের মধ্যে গড়ে ওঠে। ফলে সংশ্লিষ্ট দল কোনদিন ক্ষমতায় গেলেও নিজ দলের ঐ কর্মী-সমর্থকদের সামাল দিতেই সংশ্লিষ্ট দলীয় সরকার হিমশিম খেতে হয়। এ জন্য দুর্নামের অধিকারী হতে হয় অনেক।

রাজনৈতিক আন্দোলন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধন করা, অন্যায়-অবিচার ও বিভিন্ন সমস্যার হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা। তাদের জন্য শান্তি নিরাপত্তা বিধান করা। কিন্তু সেই রাজনীতি ও রাজনৈতিক তৎপরতা মানুষের জীবনে দুঃখ-দুর্গতি ডেকে আনে, সেই রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা ক্ষমতায় গেলে যে জনগণের কিরূপ কল্যাণ সাধিত হবে, তার নজির আমাদের দেশে বিরল নয়।

এটা সত্যিই অতীব পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশে অপরাধের বেলায় বৈষম্যমূলক দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। একটি অপরাধ কোন অরাজনৈতিক ব্যক্তি অরাজনৈতিক ভাবে করলে সেটির বিচার ও শাস্তি একরকম আর একই অপরাধ কেউ

www.pathagar.com

রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে করলে তার বিচার অন্যরম। বরং তাও নয়, কোন বিচারই হয় না অথচ অপরাধের বিচারে রাজনৈতিক অরাজনৈতিক এই বৈষম্য ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বলাবাহুল্য বিচারে এই বৈষম্য বিদ্যমান থাকায় একশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের দ্বারা আন্দোলন-হরতালের নামে জাতির কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়ে আসছে। মূলত আগে থেকে দেশে রাজনৈতিক অপরাধের বিচার না হওয়াতেই এ অপরাধ পৌনঃপুনিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েই চলেছে। যদি রাজনৈতিক অপরাধের জন্য শাস্তির কোন আইন আমাদের দেশে না থাকে তাহলে বর্তমান জোট সরকারের উচিত এ জন্য নতুন করে আইন রচনা করা হলেও ফ্যাসিবাদী উগ্র রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হাত থেকে সরকারি-বেসরকারি জাতীয় সম্পদ রক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

সুধী-বুদ্ধিজীবীদের একটি হুঁশিয়ারি

[প্রকাশ ঃ ১৮. ৯. ২০০৪ ইং]

"দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের বিকল্প নেই। দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় সুশীল সমাজসহ দলমত নির্বিশেষে সবাইকে দেশের সংকট উত্তরণে এগিয়ে আসতে হবে।"

গত সোমবার ঢাকায় এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবি বক্তারা উপরোল্লিখিত আহ্বানটি জানান। ঐদিন সিরডাপ মিলনায়তনে কাউন্সিল ফর ন্যাশনাল এজেন্ডা (সিএনএ) আয়োজিত "জাতীয় নিরাপত্তা ঃ এই মুহূর্তে করণীয়" শীর্ষক আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয় এর সভাপতি বিচারপতি আবদুর রউফের সভাপতিত্বে। সভায় বক্তারা আরও বলেন, জাতীয় ও গোষ্ঠীগতভাবে ঐকমত্য থাকলে কোন অপশক্তি আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করতে পারবে না। স্বাধীনতা পরবর্তী নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে সকলকে একই প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারায় আজকের জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে দাড়িয়েছে। এজন্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। তাঁরা বলেন, গণতন্ত্রের চর্চার কথা বলবো, আবার দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবো- তা হতে পারে না। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ যেই মুহূর্তে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সর্বত্র উন্নয়ন ও অগ্রগতি লাভ করছে, ঠিক সে সময় কি করে বাংলাদেশ 'অকার্যকর রাষ্ট্রে' পরিণত হতে পারে? বরং দেশে পরিকল্পিতভাবে বোমা হামলাসহ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড, ভীতি ও সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। এর সাথে দেশীয় ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রও রয়েছে। বক্তারা বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের ভেতর থেকে গৃহযুদ্ধ এবং বাইর থেকে ১৪ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে এক অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে। দেশের অস্তিত্ব হুমকির

www.pathagar.com

সম্মুখীন। দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা রক্ষায় জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই।

সভাপতির বক্তব্যে বিচারপতি আবদুর রউফ বলেন, জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের অভাবেই আজকে দেশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। জাতীয় নিরাপত্তার সাথে দেশের অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সকল কিছুই জড়িত। তিনি বলেন, অত্যন্ত কৌশলে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে। হরতাল করার অধিকারের সাথে সাথে স্বাধীনভাবে চলার অধিকারও রয়েছে। যারা হরতালের ডাক দিবে তাদেরকে হরতালে ক্ষতি সাধিত হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। স্বাধীন দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকার সংসদে আইন পাস করতে পারে।

জাতীয় জীবনের সকল বিষয় দেশের শীর্ষ স্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে যেই দৃষ্টিতে দেখেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেক সময় সে দৃষ্টিতে দেখা বা তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। এজন্যে দেশপ্রেমিক দায়িত্বশীল জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যেমন জাতীয় ভাল-মন্দ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন রাখা কর্তব্য, তেমনি জাতির জ্ঞানী-গুণী বুদ্ধিজীবীদেরও কর্তব্য জাতিকে যথাসময় সতর্ক করা। গত সোমবার কাউন্সিল ফর ন্যাশনাল এজেন্ডা (সিএনএ)-র আলোচনা সভায় জাতির সচেতন বুদ্ধিজীবী বক্তাগণ মূলত সেই দায়িত্বটিই পালন করেছেন। তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যেমন দেশের বর্তমান বিরাজমান পরিস্থিতি সৃষ্টিতে এর নেপথ্য নায়কদের আসল মতলবটি ফুটে উঠেছে, তেমনি এই পরিস্থিতিতে কি করণীয়, সে ব্যাপারেও সঠিক পথনির্দেশনা তাঁরা দিয়েছেন। সভায় বক্তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গোটা জাতির মনোভাবেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে। কারণ, একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত ৩০ এপ্রিলের আল্টিমেটাম সরকারের পূর্ণ সতর্কতার কারণে ব্যর্থ হবার পর থেকে ২১শে আগস্টের মর্মান্তিক গ্রেনেড হামলার ঘটনাসহ বিভিন্ন বোমাবাজিকে দেশবাসী সন্দেহজনক দৃষ্টিতেই দেখে আসছিল। বিশেষ করে দেশের এক নেত্রীসহ ২১ জন মানুষের প্রাণ সংহারক ২১শে আগস্টের ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার ঘটনার সাথে জড়িত নরপিশাচদের খুঁজে বের করার লক্ষ্যে গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি এবং বিদেশ থেকে আগত তদন্তকারীদের সাথে আক্রান্ত দলের সহযোগিতায় অস্বীকৃতি জনগণকে আরও অধিক সন্দেহে ফেলে দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশী-বিদেশী কিছু লোকের মন্তব্যে এখন বাংলাদেশের দলমত নির্বিশেষে প্রায় সকলের মনেই সেই সন্দেহ অধিক ঘনীভূত হয়ে উঠছে যে, এই সবকিছু অপতৎপরতা এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টের চেষ্টায় মূলে তবে কি এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র চলছে? একদিকে বোমা হামলার মূল অপরাধীদের আড়াল রাখার চেষ্টা এবং অযৌক্তিভাবে জোট সরকারের পদত্যাগ দাবীর উপর অটল থাকা, অপরদিকে বাইরের লোক দিয়ে বাংলাদেশকে 'অকার্যকর রাষ্ট্র' বলে প্রমাণে আদা পানি খেয়ে লাগা, এই সবকিছুই দেশের ভিতরে বাইরে অভ্যন্তরীণ কিছু ইঁদুর

www.pathagar.com

স্বভাবের লোকের সাহায্যে এ দেশের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র। দেশবাসীর সামনে এখন তা অনেকটাই স্পষ্ট। সেই চিহ্নিত হাসান ইমাম, শাহরিয়ার কবির গং উদীচীসহ আওয়ামী পন্থী একাধিক সংগঠন গত রোবার নিউইয়র্কে সমাবেশ করে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ চেয়েছে। ভারত-ইহুদী যোপসাজসে তা করা হচ্ছে। এছাড়া দেশে কোন খুনী চক্রের ষড়যন্ত্রমূলক কোন বোমা হামলার ঘটনা ঘটালেই যদি সংশ্লিষ্ট সরকারের পদত্যাগ করা জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে আওয়ামী শাসনামলে যখন গোটা দেশের মানুষ এক দুর্বিষহ অবস্থার শিকার হয়েছিল, সে সময় সংঘটিত একাধিক বোমা হামলার ঘটনার পর আওয়ামী সরকার পদত্যাগ না করে কি অন্যায় করেনি? সে সময়কার একেক বোমা হামলায় বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। কৈ তখনতো পদত্যাগ দূরের কথা সে জন্যে কোন অপরাধীকেই ধরে তাদের বিচার করতে দেখা যায়নি? বরং উল্টো উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবার লক্ষ্যে ঘটনা ঘটার সাথে সাথে ঐসব বোমা হামলার জন্যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিভাবে মৌলবাদী বলে দেশের নিরীহ ধর্মীয় নেতাদের ওপর দোষ চাপানো হয়েছে, যা শুনে জনগণ অবাক হয়েছে। কিন্তু আসলে এসব মিথ্যা অভিযোগের মতলব হলো বাংলাদেশে জঙ্গীবাদী, মৌলবাদী, উসামাপন্থী, আল কায়েদা, তালেবানী গ্রুপ

আছে বলে প্রভুদেরকে বুঝানো। এ প্রয়োজনেই এসব অবাস্তব প্রচারণা চালানো হয়েছে। এসব ঘটনায় ঐ রহস্যই এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অতি সম্প্রতি বোমা হামলা হয়েছে। মানুষ মারা গেছে। যেমন ইন্দোনেশিয়াতে, আর রাশিয়াতে তো আরও বড় ধরনের মর্মান্তিক ঘটনাই ঘটে গেছে, তাই বলে কি সেখানকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার পদত্যাগ করেছে?

বাংলাদেশে এই মুহূর্তের বড় কাজ হলো ২১শে অগাষ্ট সংঘটিত গ্রেনেড হামলার খুনী আসামীদের খুঁজে বের করা। সেই প্রসঙ্গকে ধামাচাপা দিয়ে কেবল সরকারের পদত্যাগের দাবী থেকে তো পরোক্ষভাবে এটাই অনুমিত হয় যে, এ জন্যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টিকল্পেই গ্রেনেড হামলার এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

এছাড়া এই হামলা ও এর তদন্তকে উপলক্ষ করে ভারতের ভূমিকাও একটি প্রতিবেশী স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সাথে সম্মানজনক তো নয়ই বরং সম্পূর্ণ বৈরীতামূলক। অতি সম্প্রতি ভারতের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও 'র' -এর কর্মকর্তা বিভূতিভূষণ নন্দী 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় লেখেন, "রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকসহ সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই তৎপরতা স্তব্ধ করার জন্যে ভারতকে কার্যকর ও সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ভূখন্ডকে ইসলামপন্থীদের কবল থেকে বাঁচানো যাবে না।" প্রায় কাছাকাছি সময়, ২৬শে আগস্ট 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এখানকারই ইসলাম বিদ্বেষীদের সুরে সুর মিলিয়ে লিখেছে, "বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দলগুলোর ওপর যেই নিগ্রহ চলছে , সেই ব্যাপারে দিল্লী উদাসীন বলেই খালেদা জিয়ার জোট সরকারের বাড় এতো বেড়েছে। দিল্লীর উচিত, এখনই (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে) কঠোর

পদক্ষেপ গ্রহণ করা।" ঠিক একইভাবে ২৯শে আগষ্ট পত্রিকাটি তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছে যে, "বাংলাদেশ এশিয়ার একটি অকার্যকর বেহায়া দেশ ঃ নিষ্ক্রিয় প্রশাসন ব্যাপক দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ। দিল্লীর কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার এখনই সময়।"

এই সবকিছু বিষয়কে সামনে রাখলে উল্লেখিত আলোচনা সভার বুদ্ধিজীবিদের হুঁশিয়ারিমূলক বক্তব্য গোটা দেশবাসীর জন্যে একটি জাতীয় সময়োপযোগী এবং বাস্তব হুঁশিয়ারি।

এজন্যে তাঁরা গোটা জাতির উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হবার যেই আহ্বান জানিয়েছেন, দেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী। বিভিন্ন আলামত ও ঘটনার প্রেক্ষিতে তাকে একটি ঐতিহাসিক আহ্বানই বলতে হয়। বুদ্ধিজীবীরা যথার্থই বলেছেন যে, "দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতীয় ঐক্য সংহতির বিকল্প নেই। আমরাও এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ১৪ কোটি মানুষের আবাস ভূমি বাংলাদেশকে নিয়ে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র নানান ছুতা-নাতায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শুরু হয়েছে এখানে স্বাধীনতার অতি দরদী সেজে নানান বিভ্রান্তিকর অসত্য প্রচারণার মাধ্যমে এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। সুতরাং ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার আলোকে আজ দেশবাসীকে শত্রুমিত্র চিনে নিতে হবে, যেই নামেই যত ষড়যন্ত্র হোক ইস্পাত কঠিন মনোবল ও দৃঢ় ঐক্য নিয়ে সকল কিছুর মোকাবিলার জন্যে দলমত নির্বিশেষে দেশদরদী সকলকেই প্রস্তুত থাকতে হবে।

সমাজ ধ্বংসে বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্বহীনতা

[প্রকাশ ঃ ২০. ৭. '৯৮ ইং]

সেদিন একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে লেখকের কয়েকটি মন্তব্য খুব ভালো লাগলো। তিনি মূল বক্তব্য শুরু করার আগে ভূমিকার একাংশে লিখেছেন, "লেখক মানে বিবেকের সন্তান। লেখকের লেখনি সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যম। সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে লেখকদের থাকে বিশাল ভূমিকা। স্বাধীনতা অর্জনের দূর লক্ষ্যকে করে তারা সহজ ও নিষ্কন্টক- তাদের গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, সঙ্গীত রচনার মধ্যদিয়ে। সাধারণ মানুষ জাতির লক্ষ্যকে যেখানে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ, সেখানে লেখকের শ্যেন দৃষ্টি গোটা জাতিকে স্বপ্ন দেখায় মর্যাদাকর জীবনের।"

বুদ্ধিবৃত্তিক সূক্ষ্ম বিষয়াদি নিয়ে সমাজের যেসব জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক অনুশীলন করেন, তাদের কাছে স্বাভাবিকভাবে জাতির যেসব প্রত্যাশা থাকে একথা কয়টির মধ্য দিয়ে সেসব প্রত্যাশারই প্রতিধ্বনি হয়েছে। মূলত একটি সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক চিন্তা-মনন, বিনির্মাণের কাজটি সমাজ সচেতন এই শ্রেণীটির দ্বারাই হয়ে থাকে। তাদের লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত স্বপ্ন কল্পনা, আকাঙ্খাগুলোই এক সময় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব

www.pathagar.com

বাস্তবতার রূপ দেন। এদিক থেকে একটি দেশ ও জাতির জন্যে এ শ্রেণীর নাগরিকরা যেমন মূল চালিকা শক্তি, তেমনি তাদের থাকে বিরাট দায়িত্ব কমিটমেন্ট। তারা কোন কারণে নিজেদের সেই দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে গেলে এবং স্বকীয়তা হারিয়ে ফেললে তখন সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতির মূল দুর্দিন দেখা দেয়। তখন তারা যার যেভাবে খুশী সেভাবেই কথা বলতে থাকেন, সেভাবেই নিজেদের কলম ধরেন। কারণ, সমাজের উল্লেখিত যেই অংশটি চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করার কথা, তারা আপন স্বকীয়তা হারিয়ে ফেললে, তখন জাতির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথাও ভুলে বসেন এবং ডোরকাটা ঘুড়ির ন্যায় অসহায়ের মতো বায়ু প্রবাহের অনুকূলে ঘুরপাক খাওয়া ছাড়া তাদের আর উপায় থাকে না। ঐ অবস্থায় বায়ুমন্ডলে একাধিক ঘুড়ির অস্তিত্ব থাকলে যেমন পরস্পরের ঠোকাঠুকি লাগা ও একের ডোর দিয়ে অপরের ডোরে প্যাঁচ খেয়ে অজানা-অখ্যাত স্থানে গিয়ে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না, তেমনি আমাদের সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দানকারীদের অবস্থাও যেন কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আজ একই দূরাবস্থার শিকার। যার ফলে তাদের অনুসৃত ভূমিকা থেকে এটা উপলব্ধি করার উপায় নেই যে, তারা কে কোন দিকের যাত্রী, তেমনি যারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পথ নির্দেশনা দ্বারা দেশ-জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে তারাও যেন এক মস্তবড় অস্পষ্টতা ও লক্ষ্যহীনতা নিয়েই কাজ করছেন। যেই লক্ষ্যের সাথে দেশবাসী নিজেদের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও চিরায়ত মূল্যবোধের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছে না। পরন্তু সমাজে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, সর্বত্র দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, লুট, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং, নারী ধর্ষন, নারী নির্যাতন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দারিদ্র্যের চরম কষাঘাত, অপরাধপ্রবণদের আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন ইত্যাদি দেখে তারা এক দিশেহারা অবস্থায়। চতুর্দিকই তারা দেখে অসুস্থতার চিত্র। অসুস্থ সমাজ, অসুস্থ রাজনীতি, অসুস্থ শিক্ষাঙ্গন। আইনের শাসনের বদলে যেন চলছে এখানে এক নৈরাজ্য, গণতন্ত্রের নামে চলছে স্বৈরতন্ত্র, সন্ত্রাসের বিষবাষ্পে জনজীবন সর্বত্র বিপন্ন। শহর-গ্রাম-গঞ্জ কোত্থাও যেন কোন স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলার স্থান নেই। সরকার প্রধান বলেছিলেন, সন্ত্রাস নিমূর্ল করবেন, সন্ত্রাসীর কোন দলীয় পরিচয় থাকবে না। কিন্তু বাস্তব তার সম্পূর্ণ বিপরীত বলে প্রমাণিত। কোথাও কোন সন্ত্রাসী ধরা পড়লে সাথে সাথে তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে দলীয় নেতাদের শুরু হয়ে যায় দেনদরবার ও ছুটাছুটি। সন্ত্রাসীরা বের হয়ে আসে আইনের ফাঁক দিয়ে। অতঃপর আরও বহুগুণে শুরু হয় তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা। কি সন্ত্রাস নির্মূল, কি দুর্নীতি দমন ও চোরাচালানি দূরীকরণে বাহ্যত সরকারের আন্তরিকতার ভাব দেখা গেলেও এসবের দৌরাত্ম্যে জনজীবন আজ অতিষ্ঠ।

সবচাইতে হতাশার বড় দিক হলো, কি রাজনীতিতে কি সামাজিক কায়কারবারে সর্বত্র আজ দেখা দিয়েছে চরম রুচিবিকৃতি। সংসদ হতে গ্রামীণ পর্যায় পর্যন্ত জোয়ার বয়ে চলেছে রুচিবিকৃতির। কি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কি লেখক বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব, কি সাংবাদিক সাহিত্যিক সর্বত্রই যেন শালীনতা, রুচিশীলতা বিদায় নিচ্ছে। ন্যায়নীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ বলে যে কথাটি ছিল, তা যেন চির বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু

www.pathagar.com

মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, আমাদের দেশ ও সমাজ যেন একটি ধ্বংসের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও একশ্রেণীর লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী প্রতিটি সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করে ন্যায় ও সত্য কথা বলে সৎসাহসের পরিচয় দিতে অনীহা প্রকাশ করে চলেছেন। এটা করতে গেলে কোথায় যেন তাদের কোন বিশেষ স্বার্থে আঘাত এসে যায়। মাঝে-মধ্যে কেউ ন্যায়-সত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেও শেষের দিকে কথার মোড় ফিরিয়ে মূল কার্যকারণ থেকে তা অন্যদিকে ফিরিয়ে নেন।

সমাজের মূল পথনির্দেশকদের এই ভূমিকা আজ সচেতন সমাজ নাগরিকদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছে যে, দেশের রাজনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি সীমান্তকেন্দ্রিক অরাজকতাসহ সকল ক্ষেত্রের অরাজকতার সাথে তাহলে কি কোথাও তাদের কোন মৈত্রী রয়েছে?

প্রশ্নটি জাগতো না যদি দেশ, জাতি, ধর্ম, স্বাধীনতার জন্য চ্যালেঞ্জ বর্ণিত প্রতিটি বিষয়ের মূল কার্যকারণ নিয়ে সকলের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা লক্ষ্য করা যেতো। সেটি হলো এদেশবাসী বার কোটি মানুষের জীবনাদর্শ ও স্বকীয়তা। এই মূল বিষয়টিই যে আমাদের জাতীয় পরিচিতি এবং স্বাধীন অস্তিত্বের রক্ষাকবজ, একথাটিই যেন এক শ্রেণীর লেখক বুদ্ধিজীবী স্বীকার করতে রাজি নন। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই বর্তমানে এক শ্রেণীর রাজনীতিক, লেখক, কলামিস্ট, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী সর্বত্র মৌলবাদের ভূত দেখতে পান। অথচ দেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক সকল স্তরে আজ এইডস -এর ন্যায় যেই দুর্নীতি অসাধুতা দুরারোগ্য ব্যাধির আলামত দেখা দিয়েছে যদ্দরুন কেউ কারও কথা শুনছে না, আইনের শাসন সর্বত্র অচল হয়ে পড়ছে, সন্ত্রাস-দুর্নীতির দৌরাত্ম বেড়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার চলছে, সরকারি অর্থের অপচয় ঘটছে, প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, কোন কোন ব্যাংক থেকে ৬০ কোটি টাকা পর্যন্ত বেহাত হয়েছে, যৌন অনাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তিতে জাতীয় স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, সর্বত্র মূল্যবোধহীনতা ও রুচি বিকৃতি ঘটছে- এই প্রত্যেকটি রোগের প্রতিকার একই দলমত নির্বিশেষে আমাদের ফিরে যাওয়া নিজস্ব আদর্শ এবং স্বকীয়তার দিকে। অথচ এই আদর্শ এবং স্বকীয়তাকেই নানাভাবে এদেশে সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমের সাহায্যে বেশি ধ্বংস করা হচ্ছে এই সরকারের আমলে।

এদেশের বার কোটি মানুষের জীবনাদর্শ ইসলাম, ইসলামী মূল্যবোধকে ধ্বংস করে জাতিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা এবং সমাজকে রসাতলে নেয়ার ষড়যন্ত্র বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে সুকৌশলে নানানভাবেই চলছে। সিনেমা, টিভি'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানই তার প্রমাণ। এমনকি জাতির কণ্ঠস্বর বলে খ্যাত যেই সাংবাদিক মহল জাতিকে সঠিক পথ-নির্দেশনা দিয়ে তাদেরকে ভাল-মন্দের ব্যাপারে সচেতন করবে, মূল্যবোধহীনতা ও রুচি বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করবে, সেই সাংবাদিকদের মহলবিশেষ এ ব্যাপারে এত নীচে চলে গেছে, যা দেখে গোটা জাতি হতভম্ব হয়েছে। এবারকার বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা প্রতিযোগিতা সারা দুনিয়ার মানুষ উপভোগ করেছে। ইউরোপের ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত এই খেলার দর্শকদের মধ্যে পাশ্চাত্য সমাজের এক শ্রেণীর

www.pathagar.com

যুবতী নগ্নতা ও অশালীনতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, যা হয়তো টেলিভিশনের পর্দায় কেউ দেখেছে, কেউ দেখেনি। কিন্তু বাংলাদেশের কোন কোন সংবাদপত্র সেসব বিভস্র সভ্যতা বিবর্জিত কুরুচিপূর্ণ ছবি বাংলাদেশের সংবাদপত্রে ছেপে সমাজের প্রতি কোন দায়িত্বটি পালন করেছে? বাংলাদেশের ন্যায় সমাজে এসব নগ্ন ছবি ছাপানোর পেছনে তাদের যেই মানসিকতা কাজ করেছে..তার সাথে এদেশের এ সমাজের মূল্যবোধ ও জনগণের কি সম্পর্ক রয়েছে? তাদের নিজেদেরেও তো ভাইবোন, মা-খালা রয়েছে। তাদের এই ঘৃণ্য কাজ আমাদের পরিবার ও সমাজ মানসে কি সব কু-প্রভাব ফেলতে পারে, তারা একটু ভাবেনি বরং এ শ্রেণীর একাধিক পত্রিকা যেন যুবতীদের এই নগ্ন ছবি ছাপানোর জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অনেকে তো সেই প্রতিযোগিতায় প্রায় ডজন খানেক বিশ্ব সুন্দরীর সম্পূর্ণ নগ্ন ছবি ছেপে দেশ ও সমাজের প্রতি নিজেদের 'মহান' দায়িত্ব পালন করেছে। শুধু এ সময়ই নয়- এ শ্রেণীর সংবাদপত্র প্রায় সময়ই এ কুকাজটি করে থাকে। এভাবে এবং অন্যান্য গণ মাধ্যমের সাহায্যে সমাজে যৌন অনাচার বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক ও মারামারির ছবি অনুষ্ঠান প্রচার করে সমাজমানসকে সন্ত্রাসী, অপরাধী ও যৌনঅনাচারী বানিয়ে একদিকে সমাজে আইনের শাসনকে দুর্বল করা হচ্ছে, অপরদিকে সুকৌশলে ইসলামী মূল্যবোধকে ধ্বংস করা হচ্ছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে নিয়োজিত দায়িত্বশীলদেরকে এসব কাজে সমাজ ও জাতিধর্মের ক্ষতি নির্দেশ করে কোন বক্তব্য দিতে আদৌ দেখা যায় না। তাদের এই স্ববিরোধিতা এবং সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী ভূমিকার দরুনই আজ সামাজিক অপরাধ প্রবণতার জন্যে দায়ী বলে আমরা মনে করি। সুতরাং এই ব্যাধির হাত থেকে জাতিকে রক্ষা এবং একটি উন্নতম সুখী-সমৃদ্ধ ও পবিত্র সমাজ বিনির্মাণের জন্যেই সকলের কর্তব্য এ জাতির আদর্শ ও স্বকীয়তার দিকে ফিরে যাওয়া এবং হীন স্বার্থে বাইরের যাবতীয় গর্হিত চিন্তা কর্ম থেকে ফিরে আসা। স্মর্তব্য, এ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

কসোভোর মানবাধিকার ও অন্যদের নীরবতা

[প্রকাশ ঃ ৯. ৮. '৯৮ ইং]

কসোভোর রক্তক্ষয়ী সংঘাত বর্তমানে চরমে। সার্বিয়ার সেনাবাহিনী কসোভোর স্বাধীনতাকামী জনগণের বিরুদ্ধে নৃশংস হামলা অব্যাহত রেখেছে। সার্বীয় বাহিনীর হামলায় কসোভো জনশূন্য হয়ে পড়ছে। প্রায় এক লাখ লোক ইতিমধ্যে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত কসোভোয় গ্রামের পর গ্রাম জ্বলছে। সার্ব সৈন্যরা ১৮ ঘণ্টা ধরে গোলা বর্ষণ করে উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তবর্তী এলাকার নিকট ও দূরবর্তী পশ্চিম এলাকায় নির্মূল অভিযান চালিয়েছে।

এককালে "জোর যার মুল্লুক তার" নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিশ্বের বিবেকমান লোকেরা মজলুম শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়। তারা

www.pathagar.com

মানবাধিকার, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদি শ্লোগানের ব্যানারে বিশ্ববাসীকে সমবেত করতে সক্ষম হয়। আজকের আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা বিশেষ করে জাতিসংঘ, তার নিরাপত্তা পরিষদ এবং ন্যাটো ও মুসলিম দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ওআইসি ইত্যাদি সংস্থা সংগঠনের মূল লক্ষ্যই হলো অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চনা, আগ্রাসন, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা রোধ করে বিশ্বে-শান্তি নিরাপত্তামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং পারস্পরিক বিভিন্ন সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষের জীবন মানকে উন্নত করা। কিন্তু কসোভোতে যুগোশ্লাভিয়ার সার্ববাহিনী সেখানে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবেই যেই পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করেছে, তাই কেবল বিশ্বসংস্থার সনদ ও নীতিমালা বিরোধীই নয় বরং চরম অসামাজিক এক অভিযান। পরিতাপের বিষয় হলো, কসোভোতে যা কিছু ঘটে চলেছে, এটা কারও অগোচরে হচ্ছে না। জাতিসংঘ-ন্যাটো এবং জাতিসংঘের প্রভাবশালী বৃহৎ শক্তিবর্গের চোখের সামনেই ঘটছে। এমনকি মুসলিম প্রধান কসোভোতে এরূপ কিছু ঘটার আশংকাটিও নতুন কিছু ছিল না। বসনিয়ায় সে সময় সার্ববাহিনী একের পর এক মানবাধিকার লংঘন করে সেখানে চরম নির্মমতা ও পাশবিকতায় লিপ্ত হয়ে মানব রক্ত নিয়ে হোলি খেলছিল, চালাচ্ছিল ইতিহাসের মস্তবড় গণহত্যা, সে সময়ই পর্যবেক্ষক মহল কসোভোর ব্যাপারে সার্বদোর এহেন হিংস্রতাপূর্ণ নির্মমতার বিষয়টি আশংকা করেছিল। সেই হিসাবে যেখানে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক দায়িত্বশীলদের আগেভাগেই এই জঘন্য দমননীতি রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল, তাঁরা সেটা করেন নি। পরন্তু যখন সার্ববাহিনী কসোবোতে পূর্ণ সাম্প্রদায়িকতাদৃষ্ট হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখনও তাদের নীরবতা দুনিয়াবাসীকে বিস্মিতই করছে। তাদের ভাবখানা এই- "দেখি চোরা কি করে?" অথবা তাদের ভূমিকাটি হলো এমন, "সার্বরা একবার কসোভোকে মসুলিমশূন্য করে নিক, তাদের স্বাধীনতা দাবীর স্বাদ মিটিয়ে দিক, তারপরই আমরা গিয়ে সালিসীতে বসবো এবং যা করার তাই করবো।" যেখানে প্রয়োজন প্রাণ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হবার আগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সেখানে তারা শুধু হুমকি-ধমকির মধ্যেই তাদের কর্তব্য সীমিত রেখেছেন আর এদিকে গোটা কসোভোতে মুসলিম নির্মূল অভিযান বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে চলছে। ন্যাটো বা বিশ্বসংস্থার কর্মকর্তাদের কসোভো সংক্রান্ত এ কয়েকদিনের কথাবার্তা থেকে তাই অনুমিত হচ্ছে। আমরা মনেকরি, পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডের মজলুম জনতার প্রতি কোন স্বৈরাচারী শক্তির চরম জুলুম-নিপীড়নের এহেন দুরবস্থায় বিশ্বসংস্থার এরূপ ভূমিকা উক্ত সংস্থার প্রতি বিশ্ববাসীর আস্থাহীনতাকেই বাড়িয়ে তুলবে। শুধু তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে ফিলিস্তীন ও কাশ্মীরের ন্যায় মানবাধিকার লংঘনকারী আগ্রাসী শক্তির প্রতি তাদের পরোক্ষ মৌন সম্মতিই যেন প্রকাশ পাচ্ছে যাকে বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা তোষণও বলা যেতে পারে। কসোভো প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের এই ভূমিকার দরুনই বসনিয়ায় চরম মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে। সে সময় তাদের এই টিমে তেতালা ভাব না থাকলে এবং সেখানকার গণহত্যার আসল হোতাদেরকে যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হলে, কসোভোয় আজ আরেকটি বসনিয়ার দৃশ্য বিশ্ববাসীকে দেখতে হতো না।

www.pathagar.com

কসোভো সংকটে বিশ্ব নেতৃত্বের এই রহস্যপূর্ণ মন্থরগতি ও তাদের অনুসৃত নীতির পাশাপাশি পৃথিবীর অর্ধশতাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের ভূমিকাটিও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ পরিপন্থী বলেই আমাদের কাছে মনে হচ্ছে। মহানবীর সঃ হাদীস মাফিক যেখানে মুসলিম উম্মাহ হচ্ছেন একটি একক দেহসত্তার মতো, যেই দেহের এক অঙ্গে কোন যন্ত্রণা দেখা দিলে গোটা দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই সেই যন্ত্রণা অনুভূত হবার কথা। কিন্তু ওআইসি কসোভোর শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধিবাসীর এমন একটি বিপদ মুহূর্তেও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিচায়ক তেমন কোনই ভূমিকা পালন করতে পারছে না। একমাত্র মিসর সরকার সেদিন একটু মুখ খুলেছেন এবং কসোভোর রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসানে সহায়তা চেয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। প্রশ্ন জাগে পশ্চিমা সকল মোড়ল শক্তির জানাজানির মধ্য দিয়ে যদি সার্বরা এতবড় জঘন্য অপরাধ করতে পারে, সেক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের ঈমানদীপ্ত মুসলিম যুবকরা কেন এই অপশক্তির নির্মম পাশবিকতা রোধে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখার সুযোগ পাবে না। মুসলিম বিরোধী আন্তর্জাতিক অন্যান্য শক্তির দু'মুখো নীতি যা ওআই'সির কাছে অস্পষ্ট নয়, তারপরও এ সংস্থাটি কসোভো মুসলমানদের রক্ষায় নির্বিকার ভূমিকা কি করে পালন করতে পারে? আমরা সত্যিই তা দেখে উদ্বিগ্ন। এ ব্যাপারে অন্তত বিশ্বসংস্থাকে এগিয়ে আসার চেষ্টাটিও তো ওআইসি করতে পারে? মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য সমস্যার ক্ষেত্রে প্রদর্শিত এ সংস্থাটির ব্যর্থ ভূমিকার দিকটি অন্যায়-অসত্য ও ষড়যন্ত্রের কাছে এটির পরাভূত হবারই ঘোষণা দিচ্ছে। এর পেছনে যেসব কারণ নিহিত মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের উচিত তা চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া। অন্যথায় মুসলমানরা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শঠতা, ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বর্তমানের ন্যায় মার খেতেই থাকবে।

কসোভোর ভয়াবহ পরিস্থিতি এখন যেই পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে, তাতে যদি সার্বদের জুলুম এবং চরম অপরাধপ্রবণতা ও ষড়যন্ত্রেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা রাজনৈতিক এ সমস্যার সমাধানের বদলে সামরিক অন্যায় পদক্ষেপ দ্বারা এর সমাধান চিন্তায় জয়ী হয়, তাহলে পৃথিবীর অনেক ভূখণ্ডই কসোভোতে পরিণত হওয়া বিচিত্র নয়। তখন আন্তর্জাতিক সংস্থার যেমন কিছুই করণীয় থাকবে না, তেমনি ঐ সকল সংস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

কসোভোর সংকটের পটভূমি ও সার্বদের সাম্প্রদায়িক হিংস্রতাদুষ্ট মানসিকতার প্রতি তাকালে সেখানে এই সংকট নিরসনে স্বাধীনতার প্রশ্নটিই বাস্তব হয়ে সামনে আসে। এছাড়া অপর কোন সমাধান সেখানে সংঘাত-সংঘর্ষকে স্থায়ী করারই নামান্তর হবে বলে আমাদের ধারণা। বিশ্বসংস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সত্যিই কসোভো সংকটের অবসানে এবং এজন্যে সেখানকার অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার আন্তরিক অভিপ্রায় থাকলে এ ব্যাপারে বিলম্ব করার আর সময় নেই। তেমনি এ সমস্যার সমাধানে কসোভোর জন্যে স্বাধীনতাই যে একমাত্র বাস্তব সমাধান তাও তাঁদের অস্বীকারের উপায় আছে বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

কাশ্মীর প্রশ্নে অবৈধ মার্কিনী চাপ

[প্রকাশ ঃ ২৭. ৭. '৯৮ ইং]

দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা এবং পারমাণবিক পরীক্ষার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যকার আলোচনা গত বুধবার ইসলামাবাদে সমাপ্ত হয়েছে। ভারতের ন্যায় পাকিস্তানও সম্প্রতি পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (সিটিবিটি) স্বাক্ষরে সম্মত হয়নি। ইসলামাবাদের সাংবাদিকদের রিপোর্ট মতে, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলে সিটিবিটি বা অন্য যেকোন চুক্তি স্বাক্ষরে কোন ফলোদয় হবে না।

পাকিস্তানের ভূমিকা এ ব্যাপারে নানান দিক থেকে মূল্যায়নের দাবী রাখে। আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রচণ্ড চাপ এবং প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ না ঘটাবার পৌনপুনিক টেলিফোন সত্ত্বেও পাকিস্তান কর্তৃক বিস্ফোরণের ঘটনা বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তিকে বিস্মিত করেছে। উল্লেখ্য, পাক-ভারতের বৈরী সম্পর্কের মূল কারণ কাশ্মীর সমস্যা। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ গণভোটের মাধ্যমে প্রায় অর্ধশত বছর আগেই এ ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এ নিয়ে একাধিক যুদ্ধও হয়ে যায়। কিন্তু না জাতিসংঘ না বৃহৎ শক্তিবর্গ আন্তর্জাতিক অন্য সমস্যা সমাধান করলেও ফিলিস্তীনের ন্যায় কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে কোন গরজ দেখায়নি। তাকে কেন্দ্র করে এই গরীব দুই দেশের শাসকরা পারমাণবিক শক্তি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু তাও বৃহৎ শক্তির হিতে বিপরীত হতে চলেছে। মার্কিনীদের নীতিনির্ধারকরা চিন্তা করেছেন, এই দুই দেশ বিশেষ করে পাকিস্তানের উপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হলে দেশটি হয়তো আমেরিকার প্রভাব বলয়ের বাইরে চলে যেতে পারে। তাতে মার্কিনীদের আঞ্চলিক স্বার্থের ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

এ কারণে মার্কিণ সিনেট সদস্যরা পাকিস্তানের উপর থেকে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পদক্ষেপ নেন। ওয়াশিংটন পোস্টের ভাষ্য অনুযায়ী মার্কিন সিনেটর ও বিশেষজ্ঞদের মত হলো, বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হলে পাকিস্তান অন্য দেশের কাছে পারমাণবিক প্রযুক্তি বিক্রি করে আর্থিক উপকরণাদি সংগ্রহ করতে পারবে। এ ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ বৃদ্ধির এটাও একটা কারণ যে, এই সুযোগে না জানি ইরান এবং লিবিয়া পাকিস্তান থেকে পারমাণবিক প্রযুক্তি ক্রয়ের সুযোগ পেয়ে যায়। পাকিস্তান কর্তৃক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর অব্যবহিত পরেই ইরানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ইসলামাবাদ সফরে এমন একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, ইরান পারমাণবিক প্রযুক্তি ক্রয়ের জন্য পাকিস্তানের সাথে আলাপ-আলোচনা করছে। তাই পাকিস্তানের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়কে তড়িঘড়ি করে উক্ত গুজবের প্রতিবাদ করতে হয়েছে। পাকিস্তান

www.pathagar.com

জানিয়েছে, পারমাণবিক প্রযুক্তি বিক্রির কোন ইচ্ছা তার নেই। শুধু নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্যেই সে এই যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং এ খাতেই সে এটি কাজে লাগবে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমসমূহের প্রচারিত "ইসলামী বোম" -এর প্রচারণারও প্রতিবাদ জানিয়েছে। কারণ এরূপ প্রচারণার মাধ্যমে এ ধারণা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য যে, পাকিস্তানের পারমাণবিক যোগ্যতা লাভ গোটা মুসলিম বিশ্বের প্রতিরক্ষার কাজে আসবে। এখন থেকে পৃথিবীর যেই ভূখণ্ডেই মুসলমানদের উপর কোন দুঃসময় ও বিপদ আসলে পাকিস্তানের পারমাণবিক যোগ্যতা তাদের সাহায্যে গিয়ে হাজির হবে।

মহান আল্লাহ্ পাকিস্তানের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলে বাহ্যত এটা অন্যায় নয়। সারা দুনিয়ার মুসলমানও তাতে আনন্দিত। তারপরও পাকিস্তানী শাসক মহল নিজেদের রাজনৈতিক সুবিধার্থে এটা অস্বীকার করেছেন।

মোটকথা, আমেরিকা নানান দ্বিধা-সংশয়ে ও প্ররোচনার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের পুনর্বহালের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছে। মানবিক কারণে মার্কিন খাদ্য সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন প্রকাশ্যে বলেছেন, মার্কিন কংগ্রেস যদি আইনে এ ব্যাপারে নমনীয়তার নীতি অবলম্বন না করে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য উৎপাদক চাষীকুল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সম্প্রতি একটি মার্কিন কোম্পানীর সাথে সমুদ্রের মৎস্য আহরণ ও তা পার্শেলের জন্যে এবং মৎস্য সংগ্রহকল্পে বন্দর নির্মাণ ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন স্থাপনকল্পে ৪৬ কোটি ডলারের একটি পুঁজিবিনিয়োগ চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। অথচ যেই আইনের অধীন পাকিস্তানের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তা মার্কিন পুঁজিবিনিয়োগের বেলায়ও প্রযোজ্য এবং কোন মার্কিন কোম্পানী উক্ত আইনের অধীন পাকিস্তানে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে না।

এই হলো পাকিস্তানের ব্যাপারে মার্কিন নীতির একটি দিক। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের উপর নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বহাল রাখা এবং তার চার পাশে নিজের বেষ্টনীকে সংকোচিত করার আরও সম্ভাব্য পন্থা নিয়েও চিন্তা করছে বলে মনে হয়। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সাম্প্রতিক চীন সফরটি যদিও তার 'গ্লোবাল পলিসি'রই একটি অংশ ছিল, কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর পর এর গুরুত্ব এ জন্যে বেড়ে গিয়েছিল যে, আমেরিকা চীনকে যে কোন মূল্যে তার সামরিক উপকরণ প্রযুক্তি, মিসাইল নির্মাণ এবং সামরিক অন্যান্য বিভাগে পাকিস্তানকে সহায়তা দান থেকে বিরত রাখতে চায়। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তার ৯ দিনের চীন সফরে ঐ দেশের সাথে এরূপ চুক্তি সম্পাদনে সফলকাম হয়েছে বলে জানা যায়, যার বিরূপ প্রভাব পাকিস্তানের উপর পড়তে পারে এবং পাকিস্তান চীনের পক্ষ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রেক্ষিতে মার্কিনীদের আস্থাভাজন কোন পাকিস্তানী নেতাকে এ ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপনে অভিপ্রায় ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেছিল। সাহেবজাদা ইয়াকুব খাঁকে পাকিস্তানে এরূপ ব্যক্তি মনে করা হয়ে থাকে, যাঁর দ্বারা পাকিস্তানে মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষিত থাকতে পারে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর মার্কিন প্রভাব মুক্ত হবার প্রশ্নে পাকিস্তানী নেতৃত্বের একটি সুযোগ এসেছিল। কিন্তু সাহেবজাদা ইয়াকুব খাঁকে যুক্তরাষ্ট্র প্রেরণের মধ্য দিয়ে মূলত পূর্ব বন্ধনই বহাল রাখা হলো।

এটাও পাক-মার্কিন সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ আরেক দিক যে, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভারতের সাথে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে পুনরায় আলোচনায় বসতে চায়, যদিও জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিস্টার কাফি আনানও এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, উভয় দেশের উচিত কাশ্মীর সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনায় বসা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগী হয়ে এ ব্যাপারে 'হোম ওয়ার্ক' শুরু করে। কারণ তার সন্দেহ, কাশ্মীরে যদি মুক্তি জিহাদ অব্যাহত থাকে, তাহলে রাশিয়ার মতো ভারতের স্নায়ু শক্তিও বিকল হয়ে আসবে আর এভাবে সে নিজের থেকেই কাশ্মীর থেকে সরে দাঁড়াবে। তাতে ভারতের কিছু থাকবে না, আমেরিকারও না। আমেরিকার পরিকল্পনা হলো, পাকিস্তানকে আলোচনার ফাঁদে ফেলে কাশ্মীর নিয়ে ফিলিস্তিনের ন্যায় বখরাবাজি করা। জম্মু এবং লাদাখ ভারতকে দিয়ে দেয়া, ভূখণ্ডটিকে স্বায়ত্তশাসিত কাশ্মীর রাজ্যে পরিণত করা আর আজাদ কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে নেয়া। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আরও যেসব পরিকল্পনা বানচাল হয়েছে, মনে হয় এই পরিকল্পনাও বানচাল হতে বাধ্য। কাশ্মীরীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না।

ভারতের চরমপন্থী নেতৃত্ব এখনও তার স্বপ্নে বিভোর। মিঃ বাজপেয়ী সম্প্রতি এক বিবৃতিতে এ ব্যাপারে তার দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেছেন যে, ভারত আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে সফলকাম হবে। এর নির্গলিত হলো, ভারত আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কাশ্মীরে মুক্তিযোদ্ধা-মুজাহিদদের সকল তৎপরতা নির্মূলে সক্ষম হবে কাশ্মীরীদের রাজনৈতিক নেতৃত্বও বিকল হয়ে পড়বে। অপরদিকে আজাদ কাশ্মীরকে সামরিক শক্তি বলে দখলে নিতে সফলকাম হবে। এভাবেই তাদের দৃষ্টিতে কাশ্মীর সমস্যা "সমাধানের একটি স্থায়ী ভিত্তি" পাবে। নতুন করে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে নতুন সেনাবাহিনী প্রেরণের রহস্য এটাই। মনে হয় ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদভানীর নেতৃত্বে একটি নতুন টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে কাশ্মীরীদের স্বাধীনতার সংগ্রাম নস্যাৎ করার জন্য। এটি বিভিন্ন অপশক্স -এ কাজ করার এর মধ্যে আছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা। হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা মুসলমানদেরকে তাদের বিশ্বাসে বিভ্রান্ত করা। জেহাদী সংগঠনসমূহ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বে স্থবিরতা সৃষ্টি এবং নিরপরাধ হিন্দু নাগরিকদের হত্যা করে কাশ্মীরী মুজাহিদদের উপর তার অপবাদ চাপিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো ইত্যাদি। কিছুকাল আগে অধিকৃত কাশ্মীর বিশ কি ত্রিশটি হিন্দু পরিবারকে গণহত্যার শিকারে পরিণত করা হয়। কাশ্মীর মুক্তি সম্মেলনের নেতারা তার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এই বেদনাদায়ক ঘটনায় তারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করলেও এই

www.pathagar.com

দাবীর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করা এবং বিষয়টিকে বিনা প্রতিকারে ছেড়ে দেয়া উল্লেখিত অভিযোগেরই পোষকতা বৈ কি। অধিকৃত কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে, ভারতীয় কিরূপ চিন্তা-ভাবনা কাজ করে এ থেকে অনেকটা আঁচ করা যায়। এসব বাস্তবতার আলোকে পাকিস্তানের ভূমিকাকে অযৌক্তিক বলার উপায় নেই।

মোটকথা সকল দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও এটা বলা চলে যে, পাকিস্তানী নেতৃত্ব যদি নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং মার্কিনী অন্যায় প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সুযোগ যদি পাকিস্তানে পুনরায় তারা না দেয় এবং কাশ্মীরীদের মুক্তি সংগ্রামে যদি সহায়তা অব্যাহত রাখে, বর্তমানের ন্যায় নিজেদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য-সংহতি উপর জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয় তাহলে কাশ্মীরের স্বাধীনতা কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। জাতিসংঘের প্রস্তাবের ভিত্তিতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হলে দক্ষিণ এশিয়ার উত্তেজনা এমনিতেই তিরোহিত হবার কথা। কেউ জ্ঞানপাপীর ও স্বার্থান্ধের ভূমিকা গ্রহণ না করলে এ ব্যাপারে কোন বাধাই থাকার কথা নয়।

মনুষ্যত্বের বিকাশবর্জিত জাগতিক উন্নতি নিছক পাশবশক্তি বৃদ্ধিরই সহায়ক

[প্রকাশ ঃ ২৬. ৩. ২০০৩ ইং]

ইরাকের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধোন্মাদনা এখন তার মূল ধারায় আত্মপ্রকাশিত। রেডিও-টিভিতে প্রতিদিনই বিশ্ববাসী এই উন্মাদনার কুৎসিৎ চেহারা প্রত্যক্ষ করে চলেছে।

ইঙ্গ মার্কিন শক্তি এযাবত বিশ্বশান্তি, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার, স্বাধীনতা, মানসিক মূল্যবোধ, গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি যেসব আপ্ত বাক্য দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে আসছিলো, এর মধ্যদিয়ে মূলত তারা মানবতার কল্যাণবিরোধী আপন গোষ্ঠী স্বার্থকেই নিশ্চিত ও নিষ্কণ্টক করার উদ্দেশ্যে তা করে আসছে। এসবের প্রবক্তারা, ঐ সমস্ত বুলি কপচিয়ে এযাবত তারা বিশ্ববাসীর সম্মান, সমর্থন যা লাভ করে এসেছিলো জাতিসংঘ ও বিশ্ববাসীর তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অযৌক্তিভাবে ইরাকের উপর হামলা দীর্ঘদিন পর নিজেদের থলের বিড়ালটিই বের করে দিলো।

জাতিসংঘের প্রভাবশালী সদস্য হিসাবে এ শক্তি বিশ্বসংস্থাকে নিজের স্বার্থেই এযাবত পুরোপুরি ব্যবহার করে আসছে। জাতিসংঘকে পৃথিবীর অনেক পুরাতন বিরোধ নিষ্পত্তিতে কখনও তার পশ্চাৎ আঁচল টেনে ধরেছে, কখনও অন্যায় ভেটো প্রয়োগে একে নিষ্ক্রিয় রেখে সংশ্লিষ্ট মজলুম জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্গতিকে প্রলম্বিত করেছে। কিন্তু ইরাক হামলার প্রশ্নে জাতিসংঘকে বাগে এনে তাকে দিয়ে নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হয়ে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজরা অন্যায় ও বেআইনী যুদ্ধের শীর্ষ সন্ত্রাসে

www.pathagar.com

অবতীর্ণ হয়েছে। ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া ও চীন যুদ্ধবাজ বুশ-ব্লেয়ারের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের দণ্ডহাতে দৃঢ় অবস্থান নেয়াতে খোদ জাতিসংঘকে তারা খতম করার হুমকি দিয়ে বসেছে। ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসী ভূমিকায় অতীতের ন্যায় জাতিসংঘ আর সায় দেবে না-এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাওয়াতেই পরাশক্তিদ্বয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধউত্তর গঠিত এ বিশ্বসংস্থা ও বিশ্ব সভ্যতার সকল অর্জনের বিরুদ্ধে আজ নগ্ন হয়ে মাঠে নেমেছে। তারা হয়ে উঠেছে মানবতার রক্তপিপাসু। উল্লেখ্য, ইসরাইল তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে গৃহীত জাতিসংঘের ৭২টি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও আমেরিকা তাতে আপত্তিকর কিছু দেখেনি। বরং ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হোতা ইসরাইলের অনুকূলে যুক্তরাষ্ট্র বহুবার নিজের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। কাশ্মীরীদের ন্যায্য দাবীর সপক্ষে '৪৮ সাল থেকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবাবলী মাথা কুটে মরছে। অর্ধশতাধিক বছর পার হয়ে যাবার পরও প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের পথে এই সন্ত্রাসী ও পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতাই অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকা তার অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে জাতিসংঘকে নিজেদের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। ফলে এ সংস্থাটির অস্তিত্বের আর প্রয়োজন আছে কিনা-এরূপ জল্পনা-কল্পনার প্রেক্ষাপটেই ইরাক প্রশ্নে এবার নিরাপত্তা পরিষদ যথার্থ ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়, আর আগ্রাসী মার্কিনী শক্তির রোষানলে পড়ে। বলাবাহুল্য, নিরাপত্তা পরিষদের পূর্ণ সদস্যপদধারী ৫টি রাষ্ট্রই জাতিসংঘে অতীব প্রভাবশালী। সারাবিশ্বই এবার সংস্থাটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছা ও স্বার্থের অনুসারী। ঠিক এমতাবস্থায়, নিরাপত্তা পরিষদের মতামতকে ডিঙ্গিয়ে ইরাকের উপর এই সর্বগ্রাসী ভয়াবহ ইঙ্গ-মার্কিন হামলা শুধু মধ্যপ্রাচ্যবাসীর উপরই হামলা নয়, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের অধিকাংশ মানুষসহ গোটা বিশ্বজনমতের বিরুদ্ধেও এটি হামলা হিসাবে বিবেচিত। এর পরিণতি শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধউত্তর বিশ্বসভ্যতার সকল অর্জনকেই তছনছ করবে না, বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল মূল্যবোধ ও স্বীকৃত সার্বজনীন নিয়মবিধিসমূহের প্রতিও এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই যুদ্ধ জাতিসংঘ ও গোটা বিশ্বনেতাদের অবমানিত করেছে। এটি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে পারে এক অরাজকতা ও আধুনিক মারাত্মক জাহিলিয়াত। এর ফলে দেশে দেশে, অঞ্চলে অঞ্চলে বাড়বে তিক্ততা, হানাহানি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত। অপরদিকে এই ঘোলা পানিতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী শক্তিগুলো নিজেদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চারিতার্থ করতে তৎপর হয়ে উঠতে পারে। তারা নিজ নিজ অঞ্চলের স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও মানবাধিকার বাদীদের নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করবে।

ইরাকের উপর বুশ-ব্লেয়ারের অন্যায় আগ্রাসন বিশ্বশান্তি বজায় রাখার স্বার্থে গঠিত জাতিসংঘ ও তার রচিত সনদসমূহকেই শুধু বিকল করেনি, তাতে ছোট ছোট দেশগুলোর আত্মরক্ষার আশ্রয়স্থলও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ দ্বারা আরেকটি বড় বাস্তবতাও প্রমাণিত হলো। সেটি হলো, মনুষ্যত্বের বিকাশ বর্জিত জাগতিক-উন্নতি

www.pathagar.com

মূলত মানবতার কল্যাণের চাইতে তার পাশবশক্তি বৃদ্ধিতেই সহায়ক। রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ ধরনের পাশবশক্তির উত্থান যুগে যুগে মানবজাতির জন্যে চরম দুঃখ-দুর্ভোগই ডেকে এনেছে। অবশ্য এই সাথে আরেকটি বাস্তবতাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এসব অপশক্তির হাত থেকে মহাস্রষ্টার সৃষ্টির সেরা মানবজাতিকে রক্ষাকল্পে তিনি বিশ্বমানবের মুক্তিদিশারী নবী মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর যেই অনুসারীদেরকে পাঠিয়েছিলেন সেই উম্মতে মুহাম্মদিয়ার এখন দায়িত্ব পালনের সময় এসেছে। তিনি তাদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করেছেন, মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত "আগামী দিনের বিশ্বমানবকে যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় সঠিক পথে পরিচালনার জন্যই পাঠানো হয়েছে তোমাদের।" মানুষকে মানুষের প্রভুত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একমাত্র তার প্রকৃত স্রষ্টার পথে, "শান্তি কল্যাণের দিকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব দিয়েই তোমাদের পাঠানো হয়েছে।" সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের দ্বারা কিভাবে আত্মা ও জড়দেহের উন্নতিতে মানুষের শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা যায়, শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তার বিনির্মিত আদর্শ সমাজ ও এর প্রয়োজনীয় সকল নিয়ম-বিধির মাধ্যমে তিনি তা দেখিয়ে গেছেন, যা বিশ্ব সভ্যতায় এক মস্তবড় অবদান হিসাবে শত প্রতিকূলতার মাঝেও এখন পর্যন্ত বিরাজমান। সেই দৃষ্টান্ত তার পূর্ণ অবয়বে না থাকলেও মানবতার দুশমনদের জন্যে তবুও আতঙ্কের কারণ হয়ে আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, পরবর্তী পর্যায়ের মুসলিম শাসকবৃন্দ বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর অবস্থায় মুসলিম শাসকদের স্বকীয়তাবোধের দুর্বলতা, নিজ ঐতিহ্য-চেতনা থেকে বিচ্যুতি ও মুসলিম হিসাবে আপন দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীনতা তাদেরকে বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ও নেতৃত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। যেখানে মুসলিম নেতাদের দেখে শুধু নিজ জাতির আবালবৃদ্ধ-বনিতারাই আদর্শ হিসেবে গড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত হতো না পরন্তু অন্যদেশ জাতিও তাদের মুক্তির দিশারী ভেবে ঐসব শাসকের নীতি-আদর্শের অনুসরণ করার কথা। কিন্তু ঐসব নেতৃবৃন্দের বিকৃত চিন্তা ও জীবনধারা মুসলিম সমাজের অনেক যুবককেও ইসলামের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে তোলে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মুসলিম দেশসমূহ এই বিভ্রান্ত শাসকবৃন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশের সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এ দেশসহ প্রায় সকল মুসলিম দেশেই তখন ইসলামের খাঁটি অনুসারী জনগণ ও পশ্চিমা ভোগবাদী জীবনবোধের অনুসারী ঐসব নেতা একটি আদর্শিক সংঘাত দেখা দেয়। গত অর্ধ শতাধিক কাল থেকে মূলত মুসলিম সমাজ ও তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উক্ত মানসিকতার নেতৃত্বের এই দ্বন্দ্ব চলে আসছে। ব্যাহত হয়ে আসছে জাতীয় সংহতি। প্রতিটি সরকারের আমলেই সেই অভিন্ন কারণে ব্যাহত হয়ে আসছে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীও। বস্তুত মুসলিম দেশসমুহের জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির কারণেই সঠিক নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম দেশগুলো সামনে অগ্রসর হতে পারছে না। তৃণমূল পর্যায় থেকে সমাজের সকল ছেলেমেয়ে অভিন্ন চিন্তা-আদর্শ এবং অভিন্ন জাতীয় আদর্শে গড়ে উঠতে পারছে না। কারণ, তারা শাসকদের কারণে

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার দরুন পরকালে জবাবদিহিতার ভাব মুক্ত। ফলে একদিকে সমাজে অপরাধপ্রবণ দুর্নীতিবাজের সংখ্যা বেড়েছে, বাড়ছে ইসলামের বিরোধী চক্র।

শুধু তাই নয়–মুসলিম শাসকবৃন্দের আপন ধর্মচিন্তা ও ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও হীনমন্যতার কারণেই যে কেবল মুসলিম দেশসমূহ নিজ শক্তির মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তা নয়, এ জাতির প্রকৃত নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব যেই আলেম সমাজের উপর ন্যস্ত ছিল, তারাও নানান বাস্তব কারণে নিজ দেশ ও জাতিকে পবিত্র কুরআনের মূল শিক্ষার সার্বিক ধারণা দিতে ব্যর্থ হন। ফলে পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে ইসলাম সম্পর্কে খণ্ডিত ও বিকৃত ধারণা এ জাতিকে বিভ্রান্তিতে ফেলে। তাই জনশক্তি, সম্পদ শক্তি, আদর্শিক শক্তি ও ভৌগোলিক সহাবস্থান শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা দুর্বলই থেকে যায়। একই কারণে যেই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের চর্চা দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টবস্তুর বহুমুখী ব্যবহারজ্ঞান আয়ত্তে এনে মানবতার সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে গবেষণা করার জন্য পবিত্র কুরআনে বারবার আল্লাহ তাকিদ দিয়েছেন, সে ব্যাপারেও মুসলমান বিশেষ করে সমাজ ও রাষ্ট্রনেতৃত্ব উদাসীন থাকে। অপরদিকে এ জাতি তার গৌরবোজ্জ্বল যুগে খোদ ইউরোপের মাটিতে কর্ডোভা ও গ্রানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমা যেসব শিষ্যকে বিজ্ঞানের তালিম দিয়ে এসেছিলো, তাদের সন্তানরাই এখন সেই বিজ্ঞান গবেষণালব্ধ আবিষ্কারের মারণাস্ত্র দিয়ে মুসলিম জাতিসহ গোটা মানবতার বিরুদ্ধে ধ্বংসের অবতার হয়ে নেমে এসেছে। আজকের ইরাককেন্দ্রিক মহাবিপর্যয়ের পটভূমি তালাশ করলে তাই লক্ষ্য করা যাবে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ বিশেষ করে মুসলমানদেরকে পুঁজিবাদী শিবির ও কম্যুনিস্ট শিবিরের স্নায়ুযুদ্ধ মাঝখানে দীর্ঘদিন এই অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ দিয়েছিলো কিন্তু তারা সেটা কাজে লাগায়নি আর বর্তমান অবস্থা তারই পরিণতি হয়ে দেখা দিয়েছে।

অতঃপর বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর চিন্তা-গবেষণার ফল হিসেবে বিশ্বময় উত্থিত ইসলামী রেনেসাঁ দেখেই মনুষ্যত্বের বিকাশচিন্তা বর্জিত ভোগবাদী জীবনদর্শনভিত্তিক অপশক্তি হিসেবে বুশ-ব্লেয়ার মার্কা পাশবশক্তি আজ মানবতার উপর চড়াও হয়ে বসেছে।

এই পরিস্থিতিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিকামী মানুষদেরকে এই পাশবশক্তির হাত থেকে রক্ষাকল্পে একমাত্র জড়দেহ ও আত্মার সম-উন্নতি বিধানকারী কোনো বিপ্লবী জীবনদর্শনের অধিকারী ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীই মানবতাকে রক্ষা করতে পারে। আর সেই দর্শন একমাত্র ইসলামেই আছে। তাই মুসলমান শাসক-নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, তাত্ত্বিকদের এই চিন্তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সক্রিয় বিশ্বসংস্থা গঠন এই মুহূর্তের দাবী। অন্যথায় এই পাশবিক শক্তির সামনে নিজেদের অবস্থা স্পেনের পতন যুগের সেই মুসলিম যুবকটির মতোই হতে বাধ্য–যাকে একা দেখে শারীরিকভাবে দুর্বল শত্রুপক্ষের এক লোক বলেছিল, "ওহে! তুমি এখানে দাঁড়াও, বাড়ী থেকে তরবারি এনে তোমাকে কতল করবো।"

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ছিটমহল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য

[প্রকাশ ঃ ১০. ৩. '৯৮ ইং]

বাংলাদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য, বাংলাদেশের শিল্প-কারখানাজনিত অর্থনৈতিক স্বার্থ সকল কিছুই কার্যত এখন বাংলাদেশের বেরুবাড়ির ন্যায় ভারত স্বার্থে নিবেদিত। পাহাড়ী বিদ্রোহীদের সাথে তথাকথিত পার্বত্য শান্তিচুক্তির দ্বারা বন্ধু ভারতের অভিপ্রায় পূরণের সরকারী নিষ্ঠাপূর্ণ সশ্রদ্ধ পদক্ষেপও দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু বর্তমান আওয়ামী সরকার মনে হয়, তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করতে পারছে না। এ জন্যে তারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ থেকে আরও ভূখণ্ড ভারতের পদতলে শ্রদ্ধার্ঘ রূপে অর্পণের আয়োজন চালাচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সমাজের যেসব পর্যবেক্ষক সদা চিন্তা-ভাবনা করে এবং এসব ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেন, তাদের ধারণা ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের কিছু কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তি কর্তৃক ভারতকে খুশী এবং ভারতের অভিপ্রায়কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের আরও ভূখণ্ড ছেড়ে দেবার আয়োজন চলছে। কথাটি শুনতে অবিশ্বাস্য এবং বিশেষ করে আওয়ামী মহলে আজগুবি বলে মনে হলেও গত রোববার জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ দলীয় জনৈক বিশিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী ব্যক্তির বক্তব্য থেকে তারই একটি আভাষ ফুটে উঠেছে। সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিএনপি'র সদস্য মোজাহার হোসেনের (পঞ্চগড়) এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম সংসদকে জানান, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী ছিটমহলগুলোর অধিবাসীদেরকে যে কোনো একটি দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হতে পারে। ছিটমহল সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই ভারতের সঙ্গে একটি সমঝোতাও হয়ে গেছে বলে মন্ত্রী জানান।

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান সমর্থনের প্রশ্নে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর যেসব এলাকার লোক পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছে, তারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকে পরিণত হয়। এখন তারা বাংলাদেশী। তাদের ভূখণ্ড স্বাধীন বাংলাদেশের অংশ। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় স্থায়ীভাবে উভয় দেশের সীমান্ত রেখা চিহ্নিত হয়। তখন উভয় পাড়ে অন্তত ১শ' ছিটমহলে বেশ কিছু অধিবাসী বসবাস করে আসছেন। তারা অতীতে পাকিস্তান এবং বর্তমানে বাংলাদেশী নাগরিক হিসাবেই যেমন এ যাবত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনগতভাবে নিজের পরিচয় বহন করে আসছেন, তেমনি তাদের আবাসভূমিও বাংলাদেশী ভূখণ্ড রূপেই স্বীকৃত। এত বছর ধরে তারা বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবেই বিভিন্ন নির্বাচনে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে আসছেন। পাকিস্তানী আমলসহ এ দীর্ঘ অর্ধশত বছর যাবত কখনও উল্লিখিত ছিটমহলসমূহের অধিবাসীদেরকে উভয় দেশের তথা ভারত-বাংলাদেশের

www.pathagar.com

কোনো একটির নাগরিকত্ব বেছে নেয়ার প্রশ্ন আসেনি। কিন্তু বর্তমানে ভারতপন্থী বলে পরিচিত আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ প্রশ্ন আসা এবং খোদ্ বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে এরূপ তথ্য প্রকাশ পাওয়া একটি বিস্ময়কর ব্যাপার বলেই মনে হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগকালে স্বীকৃত আইন অনুসারে উপমহাদেশের দেশীয় রাজ্যগুলোকে ভারত-পাকিস্তান যে কোনো দেশের স্বেচ্ছায় মিলিত হবার আইনগত অধিকার দেয়ার পরও ভারত যেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরকে নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী ভারত থেকে আলাদা হবার আশংকায় জাতিসংঘে স্বীকৃত ঐ অধিকার তাদেরকে দিচ্ছে না, সেক্ষেত্রে নিজ দেশের জনগণকে অপর দেশের নাগরিক হবার এখতিয়ার দিয়ে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী ভূমিটিও প্রতিবেশী ভারতের হাতে তুলে দেয়ার এই অধিকার আওয়ামী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোথায় পেলেন তা দেশবাসীর কাছে আজ এক বিরাট জিজ্ঞাসা হয়ে দেখা দিয়েছে। এ ধরনের বক্তব্য আর দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব ও স্বাধীনতা বিরোধী বক্তব্যে পার্থক্য কোথায় তা আমরা বুঝতে অক্ষম। যেই প্রশ্নটি এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উঠেনি এখন কাদের স্বার্থে এবং কাকে খুশী করার জন্যে এ জাতীয় বক্তব্য দেশবাসীকে শুনতে হচ্ছে, তা দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় সকল নাগরিকের চিন্তা করে দেখার সময় এসেছে।

বর্তমান ভারত পন্থী আওয়ামী সরকারের আমলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব বহাল থাকবে কিনা, এ প্রশ্নে বিরোধী দলসমূহের পক্ষ থেকে প্রায়ই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের জনমতের বিরুদ্ধে তথাকথিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরকে দেশের এক দশমাংশের স্বাধীনতা অপরের হাতে তুলে দেয়ার নামান্তর বলে বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ আখ্যায়িত করেছেন। এসব অভিযোগের যুক্তিগ্রাহ্য কোনো জবাব সরকার এখনও দিতে পারছে না। বরং সরকার বাকচাতুর্যের মাধ্যমে জাতীয় ক্ষতিমূলক এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা পাহাড়ী বিদ্রোহীদের সাথে অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তিটিকে তার একটি বড় কৃতিত্ব বলেই জনগণের কাছে জাহির করে থাকে। এমনকি এ ব্যাপারে বিরোধীদলীয় নেতৃত্বের সমালোচনা করে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, 'যারা বলে আসছেন পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলে শুধু খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবনের পার্বত্য এলাকাই বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না; বরং চট্টগ্রাম বন্দরসহ ফেনী পর্যন্ত গোটা চট্টগ্রামই পরাধীন হয়ে যাবে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, বলুন, আপনারা কি ঐ এলাকা এখন বাংলাদেশের মধ্যে না পরাধীন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন?' শুধু তাই নয়, এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি গর্ব করে বলেন যে, 'যারা রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে স্বাধীনতা এনেছে, তারা দেশ বিক্রি করে দেবে কিংবা তাদের হাতে দেশের অখন্ডত্ব বিনষ্ট হবে, এমন উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও হিংসাত্মক প্রচারণা মাত্র।' প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যের মাধ্যমে যেসব কথা বলেছেন, দেশপ্রেমিক যে কোনো নাগরিকই চায় যে, এমনটিই হোক–আমাদের দেশের একটি ইঞ্চি জমিও অপর কারো হাতে না যাক। কারণ, বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের

www.pathagar.com

জমি ও জীবন উপকরণের পরিমাণ নেহায়েতই কম। তার মধ্য থেকে আবার পার্বত্য এলাকা দিয়ে দেশের এক-দশমাংশ অপরের হাতে চলে গেলে, ধরে নিতে হবে যে, এ প্রক্রিয়ায় আমাদের গোটা স্বাধীনতা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। মূলত বাংলাদেশ থেকে বের হতে এবং বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করতে একমাত্র চট্টগ্রাম বন্দর ও তৎসংলগ্ন সমুদ্র পথই হচ্ছে একমাত্র অবলম্বন, যা বন্ধ হলে সারা দুনিয়া থেকেই বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তথাকথিত শান্তিচুক্তির শর্তাবলী এবং এর ভিত্তিতে গঠিত পরিষদের ক্ষমতার ধরন ও বিদ্রোহীদের হাব-ভাব, কথাবার্তা থেকে মনে হয় কি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, ঘোষণা ও আশাবাদ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যত এগিয়ে যাচ্ছে? বরং বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ তথাকথিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির ব্যাপারে যেসব আশংকা ব্যক্ত করে আসছেন, নানা আলামতের মধ্যদিয়ে দেশের জনগণের সামনে সেই আশংকাই যেন বাস্তবতার রূপ ধরে এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। প্রতীয়মান হচ্ছে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকারের আমলে বেরুবাড়ীর ন্যায় বাংলাদেশের বিশাল এলাকা যেভাবে প্রীতি অর্ঘ হিসেবে ভারতের পদতলে নিবেদিত হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে যেভাবে একই শ্রদ্ধা অর্ঘরূপে সবিনয়ে সশ্রদ্ধভাবে নিবেদনের প্রক্রিয়া সমাপ্ত করা হয়েছে, দেশের আরও এলাকাও একইভাবে শ্রদ্ধা অর্ঘ হিসেবে ভারতের পদতলে নিবেদনের আয়োজন চলছে বলেই আমাদের ধারণা। বাংলাদেশের ন্যায় জনবহুল একটি ছোট্ট ভৌগোলিক আয়তনবিশিষ্ট দেশকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করার এবং একে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সকল দিক থেকে পঙ্গু করে সর্বতোভাবে ভিতরে-বাইরে গ্রাস করার সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হোক এটাই আমাদের কাম্য।

নারীর সম্ভ্রম-সম্মান রক্ষার প্রশ্ন

[প্রকাশ ঃ ৬. ৩. '৯৮ ইং]

দুঃখজনক ও লজ্জাকর ব্যাপার হলেও আমাদের দেশের সংবাদপত্রে আজকাল প্রায় দিনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নারী ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হবার খবর প্রকাশিত হচ্ছে। কোনো কোনো দিনের পত্রিকায় এক সাথে একাধিক ধর্ষণ ঘটনার খবরও সংবাদপত্রে প্রকাশ পাচ্ছে। এক সময় এরূপ একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ পাওয়ার পর যেখানে এ ঘটনার সংঘটকের বিরুদ্ধে সামাজিক ঘৃণা ক্ষোভের উদ্রেক হওয়াটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে প্রাণান্তকর হয়ে দাঁড়াতো, বর্তমানে এরূপ খবর জানাজানির পরও অপরাধিরা থাকে বেপরোয়া। এসব বিষয় এমন গা সওয়া হয়ে গেছে যে, খোদ খুনের ঘটনার খবরে যেমন মানুষ আগের মতো এখন আর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে না, তেমনি নারী সম্ভ্রম বিনষ্টের বহু জঘন্য খবরাখবরেও কাউকে তেমন বিচলিত হয়ে উঠতে দেখা

www.pathagar.com

যায় না। অপরদিকে এসব অপরাধের সাথে জড়িত থেকেও অর্থ ও মাস্তানির জোরে বুক ফুলিয়ে সমাজে বিচরণ করে। কিন্তু এই অবস্থার মাঝেও এ জাতীয় দুটি খবরে গত ১লা মার্চ রোববার রাজধানীতে (হয়তো সংবাদপত্রের সাথে সম্পর্কিত কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলেও) একটি ব্যকিক্রমধর্মী অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। খবর দু'টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল। "হাওড়া রেলস্টেশনে বাংলাদেশের মহিলা এমপি লাঞ্ছিত" শীর্ষক প্রথম খবরটি দেশের জনবহুল একটি বাংলা দৈনিকের পঞ্চদশ পৃষ্ঠার শেষ কলামে ছাপা হয়। তাতে বলা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের যাত্রীদের রেস্টহাউজের এক কক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের একজন মহিলা সাংসদ শুক্রবার মধ্যরাতে ধর্ষিতা হয়েছেন। তিনি আজমীর যাবার জন্য হাওড়া রেলস্টেশনে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মহিলা সাংসদ একটি প্রভাবশালী দলের সদস্যা। ধর্ষণের ঘটনার সাথে যুক্ত ছয়জনকে শনিবার গ্রেফতার করা হয়েছে যাদের দু'জন হচ্ছে রেল পুলিশ। কলকাতার রেলপুলিশ প্রধানের বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, মহিলাকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ হতে কলকাতা প্রশাসন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অবশ্য যেই বহুল প্রচারিত দৈনিকটিতে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল পরের দিন এক ভ্রমসংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত মহিলা জাতীয় সংসদের সদস্যা নয় বলে তাতে জানানো হয়। একই দিনের অপর একটি দৈনিকে "হাওড়া স্টেশনে বাংলাদেশের এক নেত্রী ধর্ষিত" প্রধান শিরোনামে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, কুমিল্লা জেলার এক ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদ্য নির্বাচিতা এই মহিলা সদস্য একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের লোক। তিনি বৃস্পতিবার রাতে আজমীর যাবার পথে কলকাতার হাওড়া স্টেশনে কতিপয় দালাল ও ২ জন রেলকর্মী দ্বারা ধর্ষিতা হন। শ্লীলতাহানির শিকার হয়ে এই রাজনৈতিক মহিলা কর্মী এ ঘটনায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তিনি চিকিৎসাধীন তবে খাবার গ্রহণ করছেন না। মান্নত পূরণকল্পে আজমীর যাত্রী এই মহিলা একাকী হাওড়া স্টেশনে বৃহস্পতিবার বিকেলে যোধপুরগামী ট্রেনের খোঁজ করতে গিয়ে ঐ সকল অবাঞ্ছিত লোকদের খপ্পরে পড়েন। তারা তার টিকেট ওয়েটিং লিস্টে আছে বলে বিকেলের ট্রেনটি মিস করিয়ে দেয়। পরে তাকে পরদিন সকালের কনফার্ম টিকেট দেখিয়ে স্টেশন সংলগ্ন যাত্রী নিবাসের ১০২ নম্বর রুম দেখিয়ে রাতে থাকতে বলে। সরল বিশ্বাসে রাতে ঐ ১০২ নম্বর কক্ষের সামনে যাবার পর অন্ধকার অবস্থা দেখে তার সন্দেহ হওয়াতে সেখানে থাকতে তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু মূল দালাল অশোক সিংহ ও তার সঙ্গীসাথীরা তাকে জোর করে ঐ কক্ষে নিয়ে হাত বেঁধে পালাক্রমে তার শ্লীলতাহানি ঘটায়। শুধু ঘটনার এখানেই শেষ নয়, এই অবস্থায় মিয়ারাম সিং নামে আরেক লোক তাকে রক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে নিজ বাড়িতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়। তখন অসহায় ঐ মহিলা আবারও প্রতারিত হন এবং গিয়ে দেখেন সেখানে পারিবারিক কোনো পরিবেশ নেই। মিয়ারাম ও তার সঙ্গী রাম সমিরণসহ তাকে আবারও ধর্ষণ করে। .... বাংলাদেশ মিশনের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি হাই কমিশনার নাজমুল কাউনাইন এবং তথ্য কর্মকর্তা আবু তৈয়ব মানসিক ভারসাম্য হারা

উক্ত বাংলাদেশী নির্যাতিতা মহিলার সাথে শনিবার হাসপাতালে কথা বলেন বলে জানা যায়।

খবর দুটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর থেকে গত কয়দিন বিভিন্ন অফিস, আড্ডাখানা, চা দোকান রেস্তোরাঁ ইত্যাদিতে এগুলোই একমাত্র প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে শিল্প-সাংস্কৃতিক পেশার সাথে জড়িত অনেক সুন্দরী তরুণী যুবতীই প্রতিবেশী দেশ থেকে এসে সফর করে যাচ্ছেন আসছেন। কিন্তু কেউ কোনো প্রকার এরূপ পাশবিক অবস্থার শিকার হয়েছিলেন বলে জানা যায়নি। ঠিক এমন একটি প্রেক্ষাপটে খবর দু'টিতে উল্লেখিত মহিলাদ্বয় মূলতঃ একজন হোন কিংবা তিনি এমপি না হয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যাই হোন তিনি যে বাংলাদেশের একজন শিক্ষিতা মহিলা নাগরিক এবং সেখানে ধর্ষিতা হয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের ধর্মীয় সৎপ্রবণ একজন মুসলিম মহিলা ভারত সফরে গিয়ে সেখানকার একটি স্টেশনে এত বড় জুলুম অপমানের শিকার হয়ে নিজের সবকিছু খোয়াবেন, এর চাইতে বেদনা, ক্ষোভ, অপমানের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। শহরের কোনো গলিকুচি নয়–খোদ স্টেশন, যেখানে যাতায়াতকারী যাত্রী সাধারণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে নিরাপত্তা প্রহরী থাকে, যেখানে কেউ অসময় ট্রেন থেকে নেমে বিপদের ভয়ে বাইরে না গিয়ে স্টেশনে অবস্থান করলে তার নিরাপত্তা বিধানে সরকারী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা একটি সাধারণ নিয়ম, সে ক্ষেত্রে একজন বিদেশী বিশেষ করে বন্ধু প্রতিবেশী বাংলাদেশের ন্যায় শান্তিকামী প্রতিবেশী দেশের একজন মহিলার সম্ভ্রম নিয়ে খোদ রেলকর্মীদের ছিনিমিনি খেলার এ ঘটনা যেকোনো মানুষের মানবিক চেতনাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত না করে পারে না। এ ঘটনায় ভারতীয় উক্ত রেল স্টেশনের একশ্রেণীর রেলকর্মচারীর লাম্পট্য এবং সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা প্রহরীদের দায়িত্বহীনতা তথাকার স্টেশনের এক জঘন্যতম পুঁতিগন্ধময় পারিপার্শ্বিকতার চিত্রই তুলে ধরে, এই সাথে ফুটে উঠে কলকাতা রেলওয়ের এক চরম ব্যর্থতা। বাংলাদেশী মহিলাটি শিক্ষিতা, ধর্মপ্রবণ ও রাজনৈতিক দলের সদস্যা ও জনপ্রতিনিধিণী হওয়াতে তিনি নিজের পরিচয়ও দিয়ে থাকবেন। এই পরিচয় জানার পরও সে দেশের যেই কৃষ্টির নাগরিকই হোক না কেন, তার প্রতি মানবিক আচরণের প্রমাণ যারা দিতে পারেনি, তারা যে মানব নামের অনুপযোগী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের গ্রেফতার করে তাদের পাশবিক আচরণের বিচার করার জন্যে তাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের হস্তগত করার দাবী জানাচ্ছি। এই সাথে ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

কথায় বলে অনেক সময় পচা সামুকে পা কাটা যায়। পৃথিবীতে এমন অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে, যার সূচনা ঘটেছে হয়তো কোনো নারীকে কেন্দ্র করে। তার নারীসুলভ সম্ভ্রম বিনষ্টকে উপলক্ষ করে। এমনিতে প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সামাজিক পর্যায়ে নারী মর্যাদা বিরোধী অনেক ঘটনাই হয়তো ঘটে যায়, কিন্তু একই

www.pathagar.com

ঘটনা যখন অপর দেশের মাটিতে ঘটে তখন নারী সংশ্লিষ্ট দেশটির জনগণের মাঝে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধের ধরনটি ভিন্নরূপ ধারণ করে। এক সময় আরবদের উপমহাদেশের পশ্চিম ভূখন্ড রাজা দাহির শাসিত সিন্ধু দেশের উপর হামলার ঘটনাটি নারী সম্ভ্রম বিনষ্টজনিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। সেই হামলার সেনাপতি ছিলেন ইতিহাস খ্যাত মুহাম্মদ বিন কাসেম। শ্রীলংকার তৎকালীন শাসক সে দেশ থেকে ইরাকগামী একটি আরব পরিবারের মাধ্যমে ইরাক শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু রাজা দাহিরের শাসিত রাজ্যের জলসীমার মধ্যে সেই আরব পরিবার জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত ও নির্যাতিত হবার ঘটনার ব্যাপারে রাজা দাহিরের একটি নেতিবাচক জবাবকে কেন্দ্র করেই তার সাথে ইরাক শাসকের বিরোধ বাধে। এমনকি তার পরবর্তী পর্যায়ে সিন্ধু বিজয়ী জনপ্রিয় শাসক মুহাম্মদ বিন কাসেমের বিরুদ্ধে যেই ষড়যন্ত্র হয়, যদ্দরুন তাকে অকালে দুনিয়া ত্যাগ করতে হয়েছিল, সেই ষড়যন্ত্রও নারীসম্ভ্রমকে পুঁজি করেই পাকানো হয়েছিল। এমনিভাবে এদেশের নারীর অন্য দেশে সম্ভ্রম হানির ঘটনা ও ঐসবকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় ঘটনার নজির রয়েছে। ঐসব ঘটনা চিরকাল নিজ দেশে বিদেশী কোনো নারী মর্যাদার ব্যাপারে সতর্ক থাকার তাকিদই সংশ্লিষ্ট সকলকে দিচ্ছে।

এবার প্রাসঙ্গিকভাবেই আরেকটি দিক এখানে আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটি এজন্যে প্রয়োজন যে, আজকাল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংঘটিত এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে বা এমন কিছু সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, যেসব ঘটনা বা সমস্যার জন্যে প্রচলিত বাস্তব কারণ যত না দায়ী, তার চাইতে অধিক দায়ী আমরা মুসলমানদের স্বেচ্ছায় ধর্মীয় নীতিবিচ্যুতি। হাওড়া স্টেশনে বাংলাদেশী উল্লেখিত নারীঘটিত ন্যক্কারজনক ঘটনাটির সাথে জড়িতদের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ বজায় রেখেই বলতে হয় যে, এখানেও সংশ্লিষ্ট ধর্ষিতা মহিলার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ধর্মীয় নীতি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের দার্শনিক মত হলো, কোনো নারী একাকি সফরে বের হবে না–এমনকি ধর্মীয় সফরেও না। সফরকারিণী মহিলার সাথে অবশ্যই কোনো না কোনো "মুহাররাম পুরুষ" থাকতে হবে, যার সাথে শরীয়ত মোতাবেক বিবাহ হারাম। বলা বাহুল্য এ সংক্রান্ত প্রকাশিত দুটি পত্রিকার খবরেই দেখা যায়, ধর্ষিতার সাথে কোনো পুরুষ সঙ্গী ছিল না। মহিলাটির সাথে কোনো মুহাররাম পুরুষ সঙ্গী থাকলে হয়তো ঘটনাটি এতদূর গড়াতো না এবং একে নিয়ে দু'দেশের কর্তৃপক্ষের মধ্যে এত তুলকালামও হতো না। দু'দেশের জনগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও সম্পর্কের অবনতিমূলক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ার মতো অবস্থারও সৃষ্টি হতো না। স্মরণ রাখা দরকার যে, আসলে ইসলাম একটি খোদায়ী বিধান। মহাস্রষ্টা আল্লাহ যিনি মানবচিত্তের প্রতিটি মুহূর্তের খবর রাখেন এবং মানব প্রবণতা সম্পর্কে সব চাইতে বেশি অবগত, তিনি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাকে সামনে রেখেই তার নবীর সাহায্যে ইসলামী জীবন বিধানসমূহ প্রেরণ করেছেন। ইসলামী বিধানসমূহ খোদায়ী বিধান হবার কারণেই সর্বকালের, সর্বযুগের সকল প্রতিকূলতার মাঝেও এসব বিধানের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিদ্যমান এবং সর্বকালের সর্বযুগের উপযোগী শাশ্বত জীবন

www.pathagar.com

বিধান। একারণেই যুগযুগ ধরে মানব সভ্যতায় যত বিবর্তনই এসেছে, সেই বিবর্তন পরিক্রমায় ইসলামী আইন ও বিধানের আবেদন কখনও ক্ষুণ্ন হয়নি বরং মানুষ আধুনিকতা, যুগচাহিদা ও প্রগতির দাবীর অজুহাতে প্রকৃতির ধর্ম ইসলামের শাশ্বত বিধানসমূহের বিপরীত যত রীতি নিয়ম ও আইন-কানুনেরই উদ্ভব ঘটিয়েছে, সেগুলোর বিরূপ প্রতিক্রিয়া মানব সমাজে শান্তির জন্য হুমকি ও চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জীবন দর্শনভিত্তিক সমাজ জীবন ও জীবনধারা আত্মিক তৃপ্তি ও শান্তি বঞ্চিত হবার পেছনে একই কারণ নিহিত। তবে এটাও অনস্বীকার্য যে, ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থার যত বৈশিষ্ট্যই থাক না কেন এবং এর কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব যত অধিকই হোক না কেন, যারা নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়, তারা নিজেরাই যদি আপন আপন ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে এসব আইন ও বিধানের সশ্রদ্ধ অনুশীলন না করে তাহলে, এর সুফল না মুসলিম সমাজের জনগণ ভোগ করার সুযোগ পাবে, না ইসলামী বিধানের সুফল মানবগোষ্ঠীর অন্য পরিচয়ের লোকেরা ভোগ করতে পারবে। বলাবাহুল্য, মুসলিম দেশসমূহের সরকারদের উপরই আজ এই গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত যে, -তারা নিজ নিজ দেশ ও সমাজকে যথার্থ ইসলামী ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে তুলে নিজ দেশ ও বিশ্বের অপরাপর শান্তিকামী মানুষকে ইসলামের শাশ্বত চিরন্তন খোদায়ী বিধানের সুফল ভোগের সুযোগ দেবেন, না এ ব্যাপারে নিজেদের স্কন্ধে অর্পিত এই সুমহান দায়িত্বের প্রতি উপেক্ষা, অবহেলা দেখিয়ে আপন ভবিষ্যতকে বিপদ সংকুল করে তুলবেন।

মোটকথা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো মুসলমানের ঈমানের দাবী হলো, জীবনের সকল স্তরে খোদায়ী বিধানের প্রতি সম্মান দেখানো এবং যে কোনো প্রতিকূলতার মাঝেও সেই নীতির উপর অটল থাকা। পর্দাকে প্রগতির অন্তরায় মনে করা না হলে এবং নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির অবাস্তব দর্শনের অনুসারী হয়ে ইসলাম পরিপন্থী কায়দায় একাকি উক্ত মহিলা আজমীর সফরে বের না হলে হাওড়ার নারী সংঘটিত লজ্জাকর ঘটনাটি হয়তো আদৌ ঘটতো না। সুতরাং ঘটনার মূল কার্যকারণ ও পটভূমি নিয়েও সকল মুসলমানের চিন্তা করা প্রয়োজন।

"মামুন ও নিজামীর জ্ঞাতার্থে" প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে

[প্রকাশ ঃ ২২. ৬. ২০০৪ ইং]

গত ১১.৬.০৪ তারিখে "মামুন নিজামীর জ্ঞাতার্থে'" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম সাদ উল্লাহ। এই প্রবন্ধে তিনি ৩০-৫-০৪ তারিখে মওলানা মতিউর রহমান নিজামী লিখিত 'মুনতাসির মামুনের জ্ঞাতার্থে" শীর্ষক লেখাটির উপর আলোচনা করেছেন। উভয়পক্ষের বক্তব্য অনুধাবন করে লেখক (সাদুল্লাহ) তৃতীয় মন্তব্য হিসাবে যেসব কথা বলেছেন এবং আহমদিয়া তথা কাদিয়ানী ধর্ম মতের প্রবর্তক মীর্জা গোলাম আহমদের বক্তব্যের যেই উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে সম্পর্কে বক্ষমান নিবন্ধে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

www.pathagar.com

প্রথমেই বলে রাখতে চাই যে, আসলে লেখক জনাব সাদুল্লাহ 'তৃতীয় মন্তব্য' বলে যেসব কথা বলতে চেয়েছেন–সেটাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ কাদিয়ানী মতবাদেরই প্রচার বৈ কিছু নয়।যেমন, "আহমদিয়ার কেন্দ্রীয় প্রচারক আবদুল আওয়ালের বক্তব্যের সূত্র ধরে নিজামীর কাছে মামুন (অর্থাৎ মুনতাছির মানুন) যেই তথ্য চেয়েছিলেন, তাতে আবদুল আওয়াল ও তাঁর দলের মতামতে যেসব উদ্ধৃতি জনাব সাদুল্লাহ পুনরুল্লেখ করেছেন, সেগুলোতেও তিনি একই প্রসঙ্গেরই পূনঃ অবতারণা করেছেন। আমি এখানে শুধু তার প্রবন্ধের একটি স্থানই উদ্ধৃত করবো এবং দেখাতে চেষ্টা করবো যে, জনাব সাদুল্লাহ প্রমুখ এ দেশের পাঠকদের মধ্যে আহমদিয়া বা কাদিয়ানীদের যেই মত প্রচার করতে চান, তা কুরআন ও হাদীসের আলোকে কত বিভ্রান্তিকর ও ইমান সংহারক। আর এ ব্যাপারে মওলানা মতিউর রহমান নিজামী যা বলেছেন কুরআন ও হাদীসের মুল প্রতিপাদ্য বিষয়ই তুলে ধরেছেন এবং সেই আলোকেই তিনি মত ব্যক্ত করেছেন। লেখক জনাব সাদুল্লাহ, মীর্জা গোলাম আহমদের বক্তব্যের যেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেই উদ্ধৃতিতে মীর্জা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ব্যাপারে তার বক্তব্যের পরক্ষণেই লিখেছেন,

'কুরআন শরিফের আলোকে এরূপ নবুয়তের দরজা বন্ধ নহে, যা হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কল্যাণে ও অনুসরণের মাধ্যমে কোনো মানুষ খোদাতালার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁর সম্ভাষণের সম্মান লাভ করবে এবং ওহি-ইলহামের মাধ্যমে গোপন বিষয় সম্পর্কে সংবাদ পাবে। তা হলে এ উম্মতের মধ্যে এরূপ নবী কেন হবেন না? এর সম্পর্কে কী দলিল প্রমাণ আছে? ইহা আমার ধর্ম বিশ্বাস নয় যে, এরূপ নবুয়তের উপর মোহর লেগে গেছে। কেবল এই নবুয়তের দরজা বন্ধ, যা শরিয়তের নতুন আদেশ-নিষেধ সঙ্গে আনবে বা এরূপ দাবি করা হয়, যা হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা হতে পৃথক হয়ে দাবি করা হবে। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি, যাকে একদিকে খোদাতাআলা তার ওহিতে উম্মতও সাব্যস্ত করেন এবং অন্যদিকে তার নাম নবীও রাখেন এই দাবি কুরআন শরীফের নির্দেশবিরোধী নয়। কেননা, এই নবুয়ত উম্মতি হওয়ার দরুন প্রকৃতপক্ষে হযরত সাল্লাল্লাহে আলায়হে ওয়া সাল্লামের একটি প্রতিবিম্ব। ইহা কোন স্বাধীন নবুয়ত নয়।' (বারাহীনে আহমাদিয়ার পরিশিষ্ট, পঞ্চম অংশ পৃ. ১৮১, ১৮২)।

ইসলামে 'খৎমে নবুওয়াত,' পরিভাষাটি দ্বারা বুঝানো হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-ই শেষনবী এবং তাঁর মাধ্যমেই রিসালত ও নবুওয়তী ধারার পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে, এই দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। কারণ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নবুওয়ত ও রিসালত এই দুটি ব্যাপারেই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, ওয়ালাকির রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান্নাবিঈন–"রাসূলুল্লাহ শেষ নবী"। অপর আয়াতে আছে–আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ও আতমামতু আলাইকুম নি'মাতী ও রাযীতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা।-"আজকের এ দিন তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার এ নেয়ামত সম্পূর্ণ করে দিলাম

www.pathagar.com

আর তোমাদের কল্যাণার্থেই জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম। কেউ ইসলামকে বাদ দিয়ে দ্বীন বা জীবন হিসাবে অপর কিছু অন্বেষণ করলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না।"

মহানবী (সা.)-এর এক প্রামাণ্য হাদীসে আছে, তিনি ঘোষণা করেছেন যে, "লা নাবিয়্যা বা'দী"-"আমার পরে আর কোনো নবী নেই।"

শুধু তাই নয়, হযরতের এই স্পষ্ট উক্তির পরও কেউ যাতে 'খতমে নবুওয়াত'- এর ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা সৃষ্টির অবকাশ না পায়, সেজন্য তিনি নবুওয়াত ও রিসালাতকে এমন একটি সুরম্য ইমারতের সাথে তুলনা করেছেন, যার দর্শনীয় স্থানে একটি ইট পরিমাণ জায়গা খালি রয়ে গেছে। ফলে ইমারতটি অপর সকল দিক থেকে দৃষ্টিনন্দন হলেও প্রাচীর গাত্রে এক ইট পরিমাণ খালি জায়গা থাকায় সকল দর্শকই আফসোস করে বলছে, "ঐ খালি জায়গাটিও ভরাট করা হলে ইমারতটি কতই না সুন্দর দেখাতো!" এই উপমা দিয়েই মহানবী (সাঃ) অতঃপর বললেন, "আমিই প্রাচীর গাত্রের খালি জায়গার সেই ইট" অর্থাৎ নবুওয়াত বিল্ডিংয়ের পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য বিধান আমার দ্বারাই হয়েছে। "আমার পর আর কোন নবী নেই। আমিই শেষ নবী।" এই উপমা দ্বারা মহানবী (সাঃ)-এর পরে যে-কোন ধরনের নবী আগমনের পথই নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকেরা তারপরও নিজেদের নেতা মীর্জা গোলাম আহমদের জন্য নবী হবার যেই সুযোগ রাখতে চান-হযরত (সাঃ) কর্তৃক বিষয়টির ব্যাপারে উপরোক্ত উদাহরণ পেশের পর এরূপ কোন চিন্তা করাও এক চরম ধৃষ্টতা। কারণ 'খাতাম' শব্দ যা আল্লাহ তায়ালা মহানবী (সাঃ)-এর শানে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন, এর অর্থ হলো, এমন কিছু যা দ্বারা কোনকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। মূলত মোহর বা সিল হিসাবেও 'খাতাম' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করা হয়। কেননা, কোনকিছুতে মোহর বা সিল তো তখনই মারা হয়, যখন সংশ্লিষ্ট বস্তুর কাজ পুরোপুরি সমাপ্ত হয়। যেই অবস্থায় তার থেকে যেমন কোন কিছু বের করা যাবে না, তেমনি তাতে অপর কিছু ঢুকানো ও সংযোজনেরও সুযোগ থাকে না। তারপরও কেউ জোর করে 'খাতাম' শব্দের অন্য অর্থ বের করতে চাইলে, সেটা হবে তাদের সম্পূর্ণ মনগড়া এবং উদ্দেশ্যমূলক। ইসলাম ওহীভিত্তিক এক দ্বীন। এখানে মৌলিক বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় তাতে মনগড়া ব্যাখ্যার কোন স্থান নেই। তবুও এ নিয়ে কেউ হঠকারিতা দেখালে ধরে নিতে হবে যে, তার আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, এর শব্দের ব্যাপারে কোন প্রাথমিক জ্ঞান নেই অথবা এর মধ্যে ব্যক্তিগত দলীয় তথা সম্প্রদায়গত কোন স্বার্থ নিহিত রয়েছে।

'খাতাম' শব্দটির যেই বিকৃত অর্থ তারা করে, সেটা মীর্জার জন্য নবুওয়তের দরজা খোলা রাখার জন্যই করে। সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেয়ামতের দিনের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন, "আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব। সেসময় যেন কথা না বলতে পারে এ জন্যই তা করা হবে।

www.pathagar.com

'খাতামের' কাদিয়ানী অর্থ গ্রহণ করা হলে বলতে হয়, মোহর মারার পরও মানুষ কথা বলতে পারবে যা আয়াতের বিপরীত অর্থ।

সুতরাং "খাতাম" শব্দের অর্থদ্বারা তাদের নবী বানাবার সুযোগ নেই। বলাবাহুল্য মহানবী (সাঃ)-এর হাদীস এবং পবিত্র কুরআনের মানদণ্ডে মীর্জার বক্তব্য, যা দৈনিক ভোরের কাগজে গত ১১ জুন '০৪-এর সংস্করণে প্রবন্ধের লেখক জনাব সা'দ উল্লাহ উদ্ধৃত করেছেন, তার আলোচনা করতে গেলে, তাদের এই হঠকারিতার পেছনে এই উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক যেই পটভূমি রয়েছে, সেই বিষয়টি পাঠক সমীপে উপস্থাপন করতে হয়। তিক্ততা ও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় যা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা বিষয়টি নিয়ে যেসব অযৌক্তিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন এবং প্রচার মাধ্যম প্রাপ্তির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে 'খতমে নবুওয়তের' ব্যাপারে এদেশের মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার সুকৌশলে চেষ্টা চালাচ্ছেন, সে কারণে সংক্ষেপে এই হঠকারিতার মূল উদ্দেশ্য এখানে উল্লেখ না করে পারছি না।

উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত বৃটিশ-ভারতে ইংরেজদের হাত থেকে এই উপমহাদেশ পুনরুদ্ধারকল্পে যেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়, তার সূচনা করেছিলেন তৎকালীন উপমহাদেশীয় আলেমগণ। এ স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে খ্যাতনামা বহু আলেম ও মুসলমানরা ১৮৩১ সালে বালাকোটে ইংরেজের দোসর ও পরে ইংরেজদের সাথে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু কিছু স্থানীয় বিশ্বাসঘাতকের কারণে বালাকোটের লড়াইয়ে মুসলমানরা হেরে গেলেও তারা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের যেই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, তা মাঝে মধ্যে কিছুটা নিভু নিভু অবস্থার সম্মুখীন হলেও শেষ বিজয়ের আগে আর তা থামেনি। বালাকোট যুদ্ধের ২৭ বছরের মাথায় সেই যুদ্ধের শহীদানেরই শিষ্যদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নেতৃত্ব ও চেষ্টা-সাধনায় ১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা সিপাহী বিদ্রোহ বলেও খ্যাত। মোটকথা, স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামের সেই ধারা উনবিংশ শতকের শুরুতে স্বাভাবিক রাজনৈতিক আন্দোলনের আকারে সক্রিয় থাকে। ইংরেজ সরকার ভারতীয় স্বাধীনতাকামী মুসলমান যাদের হাত থেকে ইংরেজরা ছলেবলে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল, তাদের ঐক্যে ফাটল ধরাবার জন্য নানান ফন্দি ফিকির আঁটতে থাকে।

তারা ভাবলো দীর্ঘ একশ বছর পরও যখন মুসলমানদের মধ্যে চিন্তাগত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি এখানে শিক্ষা ব্যবস্থায় ঢুকাতে হবে ধর্মনিরপেক্ষতা আর এভাবে ইসলামের মূল ভিত্তির ব্যাপারে দ্বিধা-সন্দেহ সৃষ্টির জন্যে চাই ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য রাখার এমন লোক, যার মতাদর্শ এ ধর্মের ভিত্তি মূলে সুকৌশলে কুঠারাঘাত হানবে। তারা এমন লোক পেয়েও গেল। ঠিক ঐ সময় (অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর) মীর্যা গোলাম আহমদ নামক জনৈক ব্যক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৬২ ইং নবুওয়তের দাবী করে বসলো। তার জন্ম ১৮৪০সালে অবিভক্ত পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের কাদিয়ানে। তার অনুসারীদের নিয়ে কাদিয়ানী তথা

www.pathagar.com

আহমদিয়া নামে তিনি একটি নতুন ধর্মীয় দল প্রতিষ্ঠা করেন। তারা মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী হিসাবে স্বীকার করে এবং মুসলমানদের কাফির বলে মনে করে। মুসলমানদের সাথে বিবাহ ও সামাজিক সম্পর্ক রাখা, এমনকি মুসলমানদের মসজিদে নামায পড়া, তাদের নিজস্ব কবরস্তানে মসুলমানদের কবর দেয়া জায়েজ নয় বলে মনে করে। মীর্যা গোলাম আহমদ খতমে নবুয়াতকে অস্বীকার করে। এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কে বড় নবী বলে স্বীকার করলেও নিজেকেও তিনি নবী মনে করেন, তার কাছে নাকি ওহী নাযিল হতো। পূর্বে তার উদ্ধৃত বক্তব্যই বড় প্রমাণ।

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীটি বহুদিনের। কেন তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে এ ব্যাপারে ১৯৯৫ সালে সরকার কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে বিভিন্ন প্রামাণ্য উদ্ধৃতি সহকারে সুবিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি যাদের কাছে নতুন, উক্ত রিপোর্টটি তাদের পড়া কর্তব্য।

সর্বকালের সর্বযুগের দ্বীনী বিশেষজ্ঞ আলেমগণ যেমন মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনার জন্য আজীবন চেষ্টা-সাধনা করে গেছেন, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তেমনি তারা কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা, ষড়যন্ত্র দূরভিসন্ধিজনিত ইসলাম পরিপন্থী তৎপরতার বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছেন। ইসলামের নিষ্ঠাবান বিশেষজ্ঞরা সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই তা করে আসছেন। যেসব মৌলিক আকীদা বিশ্বাস মুসলিম হবার জন্য পূর্বশর্ত, তন্মধ্যে খতমে নবুওয়াত-এর প্রতি বিশ্বাস অন্যতম। কাদিয়ানী সম্প্রদায় তাদের লিখিত ও প্রচারিত বইপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে খৎমে নবুওয়াত-এর ব্যাপারে নিজেদের যেই ধারণা ব্যক্ত করেছে তার ভিত্তিতে নিজেরাই নিজেদেরকে অমুসলিম উম্মাহ থেকে খারিজ করে ফেলেছে এবং ইসলামের এই মৌলিক আকীদা অস্বীকার করে গোটা মুসলিম উম্মাহর বিশেষজ্ঞাদের কাছে অমুসলিম অভিধায় আখ্যায়িত হয়েছে। তাই বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের রিপোর্টে আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন, মুহাদ্দেছীন, ফুকাহা, উলামা, মুজাদ্দিদও, সর্বযুগের মুসলিম উম্মার সর্বসম্মত মত তুলে ধরেছেন। ইমাম আযম আবু হানিফা, হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) ইমাম গায্যালী (রঃ) কাযী বায়যাবী ইবনে কাসীর প্রমুখ মুজতাহিদ ও ফকীহ সুস্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কেউ যদি খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস না করে সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না, কাফের হয়ে যাবে। বিখ্যাত গ্রন্থ আলমগীরসহ বিভিন্ন ফতওয়াগ্রন্থেও উক্ত রূপ ফতওয়ার উল্লেখ আছে। এমনিভাবে এও সর্ববাদী সম্মত ফতওয়া রয়েছে যে, নবুওয়াতের দাবীদার কোন ব্যক্তিকে যদি কেউ মুসলিম বলে বিশ্বাস করে তবে সেও ইসলাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। এ কারণে হযরত মুহাম্মদ (সা)ও সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে নিজেদেরকে সর্বকালে যারা খতমে নবুয়াত অস্বীকার করে নবুওয়াত........ করেছে তাদেরক অমুসলিম ও কাফির বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়েছে। মূলত আহমদিয়া সম্প্রদায় তথা কাদিয়ানীরা ইসলামের এই শাশ্বত স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে আমাদের দেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে বিভ্রান্তি ও অশান্তি ছড়াচ্ছে।

www.pathagar.com

কাদিয়ানীরা 'আহমদী মুসলিম জামাত' নামে বাংলাদেশে তাদের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মুসলিম পরিচয় ও ইসলামী পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করে এবং কুরআন করীমের বিকৃত ব্যাখ্যা করে। এসব কারণে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্ত হয়ে ঈমানহারা হবার আশঙ্কা রয়েছে। কাদিয়ানীদের এই অপতৎপরতা লক্ষ্য করে অনেক আগে থেকেই অন্যান্য মুসলিম দেশ যেমন সৌদি আরব, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ মুসলিম দেশে আহমদী তথা কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী রাষ্ট্র বাংলাদেশে এখনও কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা না করাটা শুধু ঈমানী দিক থেকেই ক্ষতির আশংকা নয়–আমাদের দেশ সম্পর্কে অন্যান্য মুসলিম দেশের ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৭৪ সালে রাবেতা-এ আলমে ইসলামীর উদ্যোগে সারা বিশ্বের ১৪৪টি ইসলামী সংগঠনের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ফকীহ্ ও বিশেষজ্ঞ আলেমদের এক সভা মক্কা মুকাররারায় অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানী তথা আহমদিয়া জামায়াতকে অমুসলিম বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সুতরাং একটি দ্বীনী দায়িত্বের ব্যাপারে আশু সিদ্ধান্তই প্রয়োজন।

ইরান সিরিয়া ও সুদান পরিস্থিতি কোন দিকে

[প্রকাশ : ১১. ১০. ২০০৪ ইং]

ইরান তার সকল ধরনের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মকাণ্ড স্থগিত করা সংক্রান্ত জাতিসংঘ পারমাণবিক পর্যবেক্ষণ সংস্থার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে। ইরানের শীর্ষ পারমাণবিক কর্মকর্তা, হাসান রাওহানী গত ১৯ সেপ্টেম্বর (০৪ইং তেহরানে একথা বলেন। ইরানের বক্তব্য হলো, তার কোনো প্রকার গণবিধ্বংসী সমরাস্ত্র তৈরির কাজে ইউরেনিয়াম ব্যবহারের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি; বরং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে তা ব্যবহারের কর্মসূচী নিয়েই তারা কাজ করছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) ইরানকে অবিলম্বে ইউরেনিয়াম উন্নয়ন কর্মসূচী বন্ধে নতুন করে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করেছে–২৫ নভেম্বরের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। এই সাথে উক্ত সংস্থা ইরানে তার পরিদর্শকদেরকে প্রবেশ করতে দেয়া এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার জন্যও ইরানকে আহ্বান জানিয়েছে। ভিয়েনায় কয়েক দিনের নিবিড় আলোচনার পর যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন এবং জার্মানি একযোগে নিরাপত্তা পরিষদে কড়া ভাষার এই প্রস্তাবনা পাস করে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ))-র বোর্ড অব গভর্নর সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবনাটি গ্রহণ করে। স্মর্তব্য যে, ইরানের ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ প্রশাসন এমনিতেই ক্ষুব্ধ এবং পারমাণবিক কর্মসূচীর প্রশ্নে যে কোনো অজুহাতে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে দু'পায়ে খাড়া। ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচীর ব্যাপারে মার্কিন জ্বালানি মন্ত্রী আব্রাহামের তির্যক

www.pathagar.com

বক্তব্যও এ কথারই পোষকতা করে। ইরান পারমানবিক অস্ত্র তৈরির দ্বারপ্রান্তে বলে পাওয়েলের মন্তব্য এবং নিরাপত্তা পরিষদে এজন্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপে ধর্ণা দান থেকে দেশটির ব্যাপারে মার্কিনীদের মনোভাব স্পষ্ট। এমতাবস্থায় মার্কিন প্রভাবিত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মকাণ্ড স্থগিত করার আহ্বান ইরান কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে, তা কি পরিণতি বয়ে আনে, সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ব পরিস্থিতি-সচেতন অনেকের মনকে তা শঙ্কিত করে বৈ কি।

কারণ আজকাল যেখানে বিশ্ব সংস্থার কোনো কোনো প্রভাবশালী সদস্যের চাপে "ভুল তথ্যে"র ভিত্তিতেও জাতিসংঘে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেটা সংশ্লিষ্ট মহলের জোরালো প্রতিবাদে পুনঃতদন্তের দরকার পড়ে, সেক্ষেত্রে বলা যায় না যে, পরিস্থিতি কোত্থেকে কোন্ দিকে মোড় নেয়। বিশেষ করে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত ছাড়া ভুল তথ্য বরং অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে যেখানে বিশ্বের দায়িত্বশীল শক্তিগুলোর ইরাকে হামলা ও সেখানে গণহত্যা চালাতে বিবেকের দংশন অনুভূত হয় না, সেখানে অভিন্ন কারণের ভিত্তিতে ইরান বা অপর কোনো দেশের ওপর তথাকথিত মানবতার ধ্বজাধারীদের যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া অসম্ভব কোনো ব্যাপার বলে মনে হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দায়িত্বশীল বৃহৎ রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতামূলক এহেন আচরণ দেখেই জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বুট্রোস ঘালী বলেছেন, গোটা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির জন্যে মার্কিন প্রশাসনই দায়ী। ওয়াশিংটনের একতরফা পদক্ষেপ সারা বিশ্বের গৃহযুদ্ধগুলোতে ইন্ধন যুগিয়েছে। তিনি মধ্যপ্রাচ্য সংকট উত্তরণকল্পে আরব নেতাদের সহায়তা নিতে বুশকে পরামর্শ দেন। যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা পদক্ষেপ মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে এবং আরবসহ অন্যান্য ইসলামী দেশগুলোতে স্থান করে নেয়ার লক্ষ্যে সন্ত্রাসীদের নিয়ে খেলা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতি অধিক মাত্রায় ঝুঁকেছে। তার এই ভূমিকার পরিবর্তন ছাড়া শান্তি সুদূর পরাহতই থেকে যাবে।

মোট কথা, যত কিছুই ঘটুক, যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের সাথে এর একটি পরোক্ষ সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। তাই এ সম্পর্কিত আলোচনার স্বার্থেই এবার যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন প্রাক্কালীন দুই প্রার্থী জর্জ বুশ, জন কেরী ও সেখানকার ভোটারদের মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

বর্তমানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিও বুশ তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জন কেরীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত। এ নির্বাচনে কে হারবেন, কে জিতবেন–এ মুহূর্তে তা বলা মুশকিল। তবে বাহ্যত কেরীর সমর্থক অধিক মনে হলেও একশ্রেণীর পর্যবেক্ষকদের ধারণা, শেষ পর্যন্ত মার্কিনী অভিমত দাতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যাবে বুশের অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির সমর্থক। এছাড়া মার্কিনীরা জন কেরীর দোদুল্যমানতা ও তাঁর ডিগবাজি খাওয়া ভূমিকায় সম্ভবত এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, এরূপ বহুরূপী চরিত্রের প্রার্থী দেশকে সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। এছাড়া, জন কেরীর একটি মন্তব্য "ইরাকের উপর হামলা সঠিক হওয়া সত্ত্বেও জর্জ বুশ এই মতের অনুকূলে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করতে পারেনি, যদ্দরুন আজ আমেরিকা ইরাক প্রশ্নে

www.pathagar.com

বিশ্বে একঘরে হয়ে পড়েছে"–তাঁর এই মন্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, সাধারণ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বুশ-কেরী উভয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর নীতিই সম্পূর্ণ অভিন্ন।

এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনে মার্কিন অভিমত দাতারা জর্জ বুশকে আরও কিছু সুযোগ দিতে চায় বলে মনে হচ্ছে; যেন তিনি অধিকৃত ইরাকের শাসন ক্ষমতাটাকে তাদের পুতুল সরকারের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে সেখান থেকে মার্কিনীদের ফিরে আসার একটি পথ বের করতে পারেন। অতঃপর ইরাকী জনগণ আয়াদ আলাভীকে যা ইচ্ছে তা করুক, তা পরের ব্যাপার।

তবে এখনও পর্যন্ত মার্কিন জনগণের ব্যাপারে অনেকের এটাই ধারণা যে, তারা ইরাকের উপর অন্যায় যুদ্ধের জন্য দায়ী জর্জ বুশকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা থেকে এমনভাবে সরিয়ে দেবে, যেমন তারা সাবেক প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বাইনস জনসন (Lyndon Baines Johsson)- কে (১৯৬৩–১৯৬৯) প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থীদের কাতার থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

মার্কিন জনগণ দ্বিতীয়বার বুশকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করলে তারা নিজেরাই বুশের কৃতকর্মের জন্যে দায়ী হবেন এবং তিক্ত পরিণতি ভোগ করবেন। কারণ, জর্জ বুশ দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে গোটা মার্কিন জাতিই তখন যুদ্ধাপরাধী ও মানবতার খুনীদের সমর্থন করার অপরাধে বিশ্ববাসীর কাছে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। ঠিক একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১১/১২ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত দেশসমূহ-ইরাক-আফগানিস্তানের নিরপরাধ মানুষদের বংশ নিরোধক মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা মার্কিন বাহিনী যেভাবে হামলা করছে, গণহত্য চালিয়ে নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধসহ হাজার হাজার মানুষ খুন করে রক্তের দরিয়া বয়ে দিচ্ছে, একইভাবে আক্রান্তরাও নিজেদেরকে পাল্টা হামলার কোনো পদ্ধতি প্রয়োগের নৈতিক অধিকারী মনে করে অনুরূপ চিন্তা করতে পারে। সেই আশঙ্কাতেই তাদের দেশে মাঝে মধ্যে সরকার কর্তৃক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা শোনা যায়।

প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা সৃষ্টির মতো পরিস্থিতির জন্যে কারা দায়ী, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার রহস্য অনুদঘাটিত থাকায় এবং মিথ্যা অজুহাতে ইরাকের ওপর বেআইনী হামলার ফলে তা চাপা পড়ে যায়। তবে সেজন্যে যে বা যারাই দায়ী হোক, "পাতালের বালু গণনায় দক্ষ"–আমেরিকা–ইসরাইলও তা আবিষ্কারে ব্যর্থ হওয়াতেই পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছে। এখন বাঁচার তাগিদে অন্যায়ভাবে আক্রান্তরা অতীষ্ট হয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করলে তাদের কি করে দায়ী করা যাবে? তাদের ইতিপূর্বে তো নিরপরাধ আফগান-ইরাকী নারী-শিশু-পুরুষদের ওপর অমানুষিক হামলার দৃশ্যই ভাসমান। তাও সংশ্লিষ্টদের ভাবা দরকার।

ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে গোটা মানব জাতিকে হত্যার সমতুল্য বলে গণ্য করা হয়েছে। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র হোক বা অপর যে কোনো দেশ অন্যায়ভাবে মুসলমানদের হত্যার নিমিত্ত সৃষ্টি কিংবা তাদের স্বাধীনতা হরণ ও দেশ দখল করে সন্ত্রাসী হতে তাদের বাধ্য

www.pathagar.com

করা সম্পূর্ণ মানবতাবিরোধী কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, পবিত্র কুরআনে অন্যায় হত্যা নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে নিজেদের জান-মাল, দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় প্রতিরক্ষাকল্পে জিহাদ করারও নির্দেশ দিয়েছেন। জিহাদ গোটা উম্মাহর জন্যেই 'ফরয-এ-কেফায়াহ'। জিহাদ শুরু হয়ে গেলে ইরানী, তুরানী, ভারতী, চীনা সকল মুসলমান যে যেখানেই থাকুক, সকলের উপরই তাতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই ধর্মীয় পুণ্যের কাজে কারও কারও শরীক না হয়ে নিজের পক্ষ থেকে প্রতীকি প্রতিনিধিত্বই যথেষ্ট; যার ধরন বিভিন্ন রকম হতে পারে। মুসলমানদের জন্যে যাকাত ও নামায- রোযা যেরূপ ফরয, তেমনি জিহাদও অনুরূপ ফরয। তবে জিহাদের অর্থ এ নয় যে, কোনো মুসলমান বিনা প্ররোচনায় নিরপরাধ কোনো মানুষের উপর হামলা করবে।

যা হোক, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও তার প্রশানের উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের পর্যালোচনার সাথে প্রাপ্ত কিছু তথ্যাবলীরও পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ পেন্টাগন কমিটি–বুশ প্রশাসনকে কয়েকটি দেশের ওপর সামরিক অভিযান চালিয়ে সেগুলো দখলপূর্বক পাঁচ বছর পর্যন্ত দেশগুলো দখলে রাখার পরিকল্পনা পেশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, ৫ বছর মেয়াদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র অধিকৃত দেশগুলোর বাসিন্দাদের নিয়ে দু'লাখ ফৌজের সমন্বয়ে বাহিনী গঠন করবে। যেই বাহিনী মার্কিন সৈন্যরা চলে যাবার পরও তারা সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করতে পারে।

কথায় বলে, বন্য শেয়ালের যখন ভাগ্য বিড়ম্বনা ঘটে, তখন সে জনবসতিপূর্ণ এলাকার দিকেই ধাবিত হয়। উপরোক্ত পরিকল্পনার প্রণেতাদের সম্পর্কেও এমন একটি ধারণাই সৃষ্টি হচ্ছে যে, তারা এই মাটির পৃথিবীর চলমান বাস্তবতা থেকে নিজেদের দৃষ্টিকে সুদূর উপনিবেশ যুগের দিকে নিয়ে গেছেন, যে সময় বৃটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, হল্যান্ড, স্পেনের লুটেরাগণ হিমালয়ান উপমহাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পারস্য উপসাগর, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, আলজেরিয়া, তিউনেশিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি দেশে এবং উপকূলীয় এলাকাসমূহে দুর্গ স্থাপন শুরু করে এবং নিজেদের ব্যবসায়িক মালগুদাম সমুহের নিরপাত্তার নামে গঠিত বাহিনীতে স্থানীয় অধিবাসীদেরকে ভাড়া করে ভর্তি করতো। স্থানীয় ঐ সকল ভাড়াটিয়ে নিজ দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ঔপনিবেশিক বিভিন্ন শক্তির ক্রিড়নক সেজে ছিল। এসব মানসিকতার কারণে তখনও চীনে বিদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মূলক ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে, যেসব ঘটনাকে পাশ্চাত্যের লেখকগোষ্ঠী স্থানীয় বিদ্রোহ নামে উল্লেখ করেছেন। এটা কতইনা বিড়ম্বনাকর বিষয় যে, কোনো দেশ নিজেকে বিদেশী আগ্রাসন থেকে রক্ষায় এবং মাদকদ্রব্যের চোরাকারবার বন্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে আর তাকেই উল্টো বিদ্রোহী বলা হয়েছে। চীন সরকার এবং জনগণ তখন বৃটিশ দূতাবাস কর্মচারীদের অকূটনৈতিক সুলভ কার্যক্রমের প্রতিবাদ জানালে, সেজন্য তাদেরকে বিদ্রোহী অভিধায় আখ্যায়িত হতে হয়েছিল। অথচ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী বিদ্রোহ বলতে তো

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত সমকালীন বৈধ সরকার ও সংশ্লিষ্ট দেশের স্বার্থ বিরোধী তৎপরতাকেই কর্ম বলা হয়। কিন্তু বিদেশী অতিথি রাষ্ট্রের অপর দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ কি করে বিদ্রোহ অভিধায় আখ্যায়িত হতে পারে? এতো সজ্ঞানতাকে উন্মত্ততা আর উন্মত্ততাকে সজ্ঞানতারূপে আখ্যায়িত করারই নামান্তর? মূলত আজকাল বিদেশীদের জবর দখলের বিরুদ্ধে জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামকেই সন্ত্রাস নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এটা উপনিবেশবাদের পুরাতন ধারারই জের, যদিও তাকে কথার নতুন আবরণ পরানো হয়েছে মাত্র।

পেন্টাগন কমিটিও ইতিহাসকে পিছে ঠেলে দিয়ে উপনিবেশ যুগের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। এটা কি রক্ষণশীলতা ও চরমপন্থা নয়? না কি প্রগতিশীলতা ও মধ্যপন্থা? আসলে পেন্টাগণ কমিটি তাদের পরিকল্পনায় কার্যত নুতন কোনো কথা বলেনি, রবং মার্কিন উপনিবেশবাদের (যার মধ্যে বুশ কেরী উভয়ের নীতিই সমান) পরিকল্পনার সারসংক্ষেপই তাতে বর্ণনা করেছে, যেন তাতে মার্কিন ভোটারদের প্রতিক্রিয়া অনুমান করা যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে পররাজ্য দখলে পেন্টাগনের এই পরিকল্পনায় সাধারণ ও বিশিষ্ট কোনো শ্রেণীর মার্কিন নাগরিকেরই কোনো প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। কাজেই সামরিক অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মুসলিম দেশ দখল এবং সেগুলোকে ৫ বছর জবর দখলে রেখে পরে সেখানে মার্কিন স্বার্থরক্ষাকারী পুতুল বাহিনী বা দালাল বাহিনীর সরকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী দলেরই সমর্থনপুষ্ট। তা হবেই না বা কেন? চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে তো উভয়ই এক ও অভিন্ন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যা আছে তা কর্মপদ্ধতিগত। তাও নামকা ওয়াস্তের। যেমন জর্জ বুশ অন্যতম প্রভাবশালী মুসলিম রাষ্ট্র ইরানের পেছনে আদাপানি খেয়ে লেগেছেন এবং আন্তর্জাতিক পারমাণবিক এজেন্সি আইএইএ- কে ক্রীড়নক রূপে ব্যবহার করছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তারা মুহাম্মদ আল বারাদীর মতো মীরজাফর চরিত্রের একজনকে হাতেও পেয়ে গেছে। তিনি থানা পুলিশের মতো ইরানকে বারবার তার শান্তিপূর্ন উদ্দেশ্যে ইউরেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত পারমাণবিক কর্মসূচীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। এটি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপনের হুমকি দিচ্ছেন। উল্লেখ্য, ভিয়েনায় যেই নিবিড় বৈঠকে বিভিন্ন পরাশক্তি ইরানের ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাতে আইএই প্রধান আলবারাদীকে এই সংস্থার সাথে ইরানের সহযোগিতার উপর পর্যালোচনা রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। ইরান তাতে ব্যর্থ হলে, তেহরানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পথ খোলা রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মার্কিন জ্বালানি মন্ত্রী আব্রাহাম বলেছেন, প্রস্তাবটি মেনে পরে আণবিক অস্ত্রকর্মসূচী পরিহার কর নতুবা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে ইরানের উপর এখন ঘড়ি টিকটিক করছে। মূলত এসবে অতিষ্ঠ হয়েই ইরান, গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। "ব্যস্ আর যায় কোথায়"? এটুকন্ই ধরার জন্য যথেষ্ট যদি ধরতে চায়।

এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা প্রধান আলবারাদী ও তার নেপথ্য নায়করা যে বসে থাকবে না, তা নিশ্চিত। বলা বাহুল্য, এই আলবারাদীই

www.pathagar.com

ইসরাইলের কোনো অপরাধ সম্পর্কিত বিষয় নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপনের পরিবর্তে নিজেই ইসরাইলের অনুকূলে সাফাই গাওয়া শুরু করেন। যখন ইসলাইলের পারমাণবিক কর্মসূচী ও তাদের পারমাণবিক বোমার সংখ্যা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমালোচনা শুরু হয়, তখন বারাদী এর সাফাই গাইতে গিয়ে বলতে থাকেন যে, ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন আমাকে এ মর্মে আশ্বাস দিয়েছেন যে, যখনই ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে তাদের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে, তখন সাথে সাথে ইসরাইল নিজের থেকেই পারমাণবিক অস্ত্রাদি ধ্বংস করার কাজে সহযোগিতা করবে।

পাকিস্তানকে পারমাণবিক কর্মসূচীর প্রশ্নে এই আলবারাদীই এই বলে উত্যক্ত করছে যে, পাকিস্তানকে তার পারমাণবিক কারখানা যেন আইএই এর পরিদর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। কিন্তু জেনারেল পারভেজ মোশাররফ বারাদীর এই আবদার প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্য দিকের কথা যাই হোক, এ ব্যাপারে গোটা জাতি মোশাররফের সাথে এক মত। কাজেই এ ব্যাপারে পারভেজ মোশাররফের এবাউর্টান-এর কোনোই সুযোগ নেই। পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনী এবং পাকিস্তানী জনগণ অপরিসীম ত্যাগ ও সাহসের বিনিময়ে নিজেদের দেশকে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী করেছে। তাঁরা কি করে একে নিরস্ত্র করতে পারে? পাকিস্তান তখন পর্যন্ত নিজের পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে পারে না, যতক্ষণ না ৫টি পারমাণবিক শক্তিসহ অন্যান্য রাষ্ট্রও নিজেদের এই পরিকল্পনা বন্ধের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে। শুধু তাদের এই কর্মসূচী বন্ধের ঘোষণাই যথেষ্ট নয়, এই যুক্তিপূর্ণ কথাটি অনুধাবন ও সকল সময় স্মরণে রাখাও সংশ্লিষ্ট সকলেরই কর্তব্য। জন কেরী ইরান এবং পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রকল্পসমূহের কাজ বন্ধের ব্যাপারে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানালেও ইসরাইল ও ভারতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব। তাহলে এ থেকে কি অনুমিত হয়?

এই দ্বিমুখী নীতি ও একই ব্যাপারে দুধরনের মানদন্ড মার্কিনীদের কপট মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। মার্কিন জনগণ যদি জর্জ বুশ ও জন কেরীকে নিজেদের প্রতিনিধি বলেই মনে করেন, তাহলে এরা উভয় প্রার্থীই জনগণের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাই তাদের নেতাদের কৃত অপরাধের দায় দায়িত্বও মার্কিনী জনগণকেই বহন করতে হবে বৈ কি?

বর্তমানে সিরিয়াও যুক্তরাষ্ট্রের টার্গেট হয়ে আছে। বুশ প্রশাসন নিজেদের হুকুমবরদার নিরাপত্তা পরিষদকে দিয়ে তার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব পাস করিয়ে রেখেছে যে, সিরিয়া যেন লেবানন থেকে তার শান্তি রক্ষা বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। এই বাহিনী স্বাগতিক দেশ লেবাননের অভিপ্রায়ে আজ তিন দশক ধরে সেখানে অবস্থানরত। নিরাপত্তা পরিষদের এই প্রস্তাব সিরিয়া লেবানন উভয়ই প্রত্যাখ্যান করেছে। উল্লেখ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন এক কথায় সকলেই ইরাকের উপর মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে যেই কূটনৈতিক হালকা চাপটি দিয়েছিল, এটি আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের লক্ষ্যে ছিল না, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল অন্য। আমেরিকার ওপর

www.pathagar.com

চাপ সৃষ্টির দ্বারা সেখানে নিজ নিজ তেল স্বার্থ রক্ষা করা আর যুদ্ধোত্তরকালে ইরাকের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ঠিকাদারীতে অংশ প্রাপ্তিই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। অতপর আমেরিকা হয়তো সেখান থেকে তাদের বর্ধিত কিছু অংশ দানের প্রতিশ্রুতি দিলে সে অনুযায়ী তারা এখন বর্তমান ভূমিকা পালন করছে। তাদের কাছেও আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্বীকৃত নীতিমালাসমূহের কোনোই গুরুত্ব দেখা যাচ্ছে না। যত নিয়মবিধি সব কিছু হতভাগ্য ফিলিস্তিনী, কাশ্মীরী এবং আরবদেরই জন্য, কারণ উপনিবেশবাদতো সকল স্বীকৃত নিয়মবিধিরই উর্ধ্বে।

একইভাবে আমেরিকা সুদানের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদকে দিয়ে এ মর্মে প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে রেখেছে যে, ৩০শে আগস্ট পর্যন্ত যদি সুদান তার মিলিশিয়া বাহিনীকে নিরস্ত্র না করে, তাহলে বিশ্ব সংস্থা সুদানের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। অন্য শব্দে বলতে গেলে, এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, আমেরিকা সুদানের উপরও হামলা করতে পারে।

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল

[প্রকাশ ঃ ১৫. ১০. ২০০২ ইং]

১০ই অক্টোবর (২০০২ইং) পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো দলই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। পারভেজ মোশাররফ সমর্থক কায়েদে আজম মুসলিম লীগ ২৭২টি আসনের মধ্যে ৭৭, পিপিপি ৬২ এবং মুত্তাহিদা মজলিশে আমল (ইসলামী ঐক্যজোট) ৫০টি আসন লাভ করেছে। মুসলিম নওয়াজ ১৫টি।

তিন বছর আগে ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে নওয়াজ শরীফের নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাকসেনা প্রধান পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসেন। পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট তাকে এক নির্দেশে ৩ বছরের মধ্যে পার্লামেন্ট নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আদেশ দেন। সেই নির্দেশ পালন এবং ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত পর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ কল্পেই ছিল ১০ই অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচন। পাকিস্তানের ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে দেশটি সামরিক শাসনের অধীন ছিলো ২৭ বছর। এ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন করে আবার দেশটি সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া শুরু হলো।

পাকিস্তানে নয়া সরকার গঠন নিয়ে গত পরশু অর্থাৎ এ লেখা চলা পর্যন্ত জল্পনা-কল্পনাই চলছিল। এককভাবে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় কোন কোন দল নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবে, তা এখনো স্থির হয়ে সারেনি। এছাড়া কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলেও সেটা পারভেজ মোশাররফের কতদূর মনপুত হয় কিংবা তার অভিপ্রায় বিরোধী হলে তাতে পরিস্থিতি কি রূপ পরিগ্রহ করে, সেটা এক মস্তবড় জিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসা দেখা দিতো না যদি চরম মার্কিন বিরোধী ইসলামী জোট

www.pathagar.com

এ নির্বাচনে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন না করতো। কোনো ইসলামী রাজনৈতিক দল অতীতে কখনো এবারকার মতো জাতীয় সংসদে এত বিপুল আসন লাভ করতে পারেনি। অতীতে মুসলিম লীগ এবং পিপিপির মধ্যেই ক্ষমতার হাত বদল হতো। কিন্তু এবার তারা নিজেদের অতীত শাসনকালের দুর্নামের কারণে হোক কি অন্য হেতু নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ পায়নি। এদিকে তৃতীয় শক্তি হিসেবে ইসলামী ঐক্যজোট "মোত্তাহিদা মজলিস- এ- আমল' পাকিস্তানের রাজনীতিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে নিয়েছে। ইসলামী ঐক্যজোট অন্যান্য আসনে পাস করার মতো ভোট না পেলেও জানা যায়, নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের থেকে জোট প্রার্থীরা সামান্য ভোটের ব্যবধানেই পরাজিত হয়েছে। সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে তারা আসন বেশি পেলেও অন্যান্য প্রদেশেও জোট সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে।

পাকিস্তানে পাশ্চাত্যের নিছক ভোগবাদী জীবনদর্শন যা সকল সমস্যার উৎস, সেই প্রভাব রুখতে এবং জাতীয় জীবনে ইসলামী জীবন চেতনা, এর মূল্যবোধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিমুক্ত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছটি ইসলামপন্থী দল এই প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ধর্মীয় বিভিন্ন ছোটখাটো বিষয় কেন্দ্রিক পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া যে, ইসলাম এবং দেশ, জাতি ও খোদ নিজেদের জন্য কত বড় ক্ষতিকর, পাকিস্তানী ইসলামপন্থী দলগুলো আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনায় এবার তা ভালোভাবে উপলব্ধি করেছে। ইসলামপন্থী ঐক্যের এই সফলতায় জোট একে ভবিষ্যতে আরো শক্তিশালী ও ব্যাপকভিত্তিতে গড়ে তোলার চিন্তা করছে বলে শোনা যাচ্ছে। আফগান সীমান্ত সংলগ্ন দুটি প্রদেশে এসব দলের রয়েছে বিরাট প্রভাব।

ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় ইসলামপন্থীরা নির্বাচনে যেই ৫০টি আসন লাভ করেছে, এই ফল' ৯৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ১০ গুণ বেশি। লন্ডনে নির্বাসিত জীবন যাপনকারী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো (তার ভাষায়) সংবিধান পদদলিতকারী এক স্বৈরশাসকের সঙ্গে কাজ করা তার পক্ষে ভীষণ অসুবিধাজনক বলে মন্তব্য করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত পারভেজ মোশাররফের সাথে কোয়ালিশন করবেন বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। তিনি মোশাররফকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। অপরদিকে বর্তমান মার্কিন প্রশাসনকে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী বলে ধারণাকারী ৬ দলীয় ইসলামী ঐক্যজোট "মুত্তাহিদা মজলিস-এ আমল" এর নেতৃত্বে রয়েছেন শাহ আহমদ নূরানী। এই জোটেরই অন্যতম দলসমূহ হলো (১) জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান (২) জমিয়াতে অহিলে হাদিস (৩) মিল্লাতে জাফরিয়া (শীআ মতাদর্শী) (৪) জমিয়াতে ওলামা-এ-পাকিস্তান (৫) জেএ এইচ ও (৬) এমজে জোট ভুক্ত এই ৬ দলের মধ্যে জানা যায়, সবচেয়ে সুসংগঠিত দল হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, যারা সকল সময় ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে আসছে, কিন্তু অন্যান্য দলের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ চিন্তার ফলে এযাবত তাদের চেষ্টা সফল না হলেও এবার সকলেই ইসলামী ঐক্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছে। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নেতৃত্বে রয়েছেন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও বাগ্মী কাজী হোসাইন আহমদ (এমপি)। সাধারণত উদারপন্থী হিসেবে বিবেচিত হুসাইন আহমদ

www.pathagar.com

চেচনিয়া, ফিলিস্তীন ও ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে মুসলিম হত্যাযজ্ঞেও তাদের উপর চরম জুলুম-নিপীড়ন সম্পর্কে তার অনলবর্ষী বক্তৃতায় যুবাবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় মুহূর্তেই উজ্জীবিত করতে পারেন। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান সামাজিক ন্যায়বিচার, সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও সার্বজনীন শিক্ষায় বিশ্বাসী। এরা পর্দাসহকারে নারী সমাজের উচ্চ শিক্ষা বা মেয়েদের চাকরির বিরোধী নয়। জামায়াতের অন্যতম নেতা শহীদ শামসী বলেন, আমরা চাই ন্যায়বিচার, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রের বৈষম্য দূরীকরণ। আমরা চাই দেশের সংবিধান মোতাবেক কাজ করতে।

পাকিস্তানে নির্বাচনী ফলাফল নানান দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ধারক। তবে এর ইতিবাচক নেতিবাচক দুইও দিক রয়েছে। ইতিবাচক দিকের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে দেশটিতে যেই গণতান্ত্রিক ধারা বিলুপ্ত হয়েছিলো, এবার গণতন্ত্র উত্তরণের পথ তার সুগম হয়েছে। দেশী- বিদেশী কোনোরূপ ষড়যন্ত্র সক্রিয় না হলে এবং পাকিস্তানের উপর কোনো দিক থেকে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার চক্রান্ত জোরদার না হলে এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলেই আশা করা যায়। শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে প্রেসিডেন্টের পার্লামেন্টে হস্তক্ষেপ করার যেই ক্ষমতা রয়েছে, রাজনীতিকরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে এবং সেখানে 'জীহুযূরে' দল সৃষ্টি না হলে হস্তক্ষেপের সেই আশঙ্কাকেও বড় করে দেখার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, এই নির্বাচনে পাকিস্তানের রাজনীতিতে অতীতের তুলনায় ইসলামপন্থীদের অনেকদূর এগিয়ে আসাকে যারা বিস্ময়ের চোখে দেখছেন, তারা ও তাদের স্থানীয় ভক্তরা একে অনেকটা সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখছেন। তাদের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক ও অন্য কোনোরূপ চাপ সৃষ্টির আশঙ্কা আছে বৈ কি। কেননা, নির্বাচনী ফলাফল জনগণের দ্বিধাবিভক্ত রায় দেশটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি ঝুলন্ত পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা এবং মার্কিন বিরোধী ধর্মীয় দলগুলোর উত্থানে যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএম এফ) ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো শুধু বিস্মিতই নয়, ভীষণ উদ্বিগ্ন বলে শোনা যায়। তারা বলেছে, আসলেই অর্থনৈতিক ᐧহায্য দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের হাতে এখন "ধীরে চলো" নীতি অবলম্বন করা ছাড়া আর ᐧনো বিকল্প নেই। এদিকে ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী এলকে আদভানী রোববার এই ᐧচনী ফলাফলের সমালোচনা করে বলেছেন, এর দ্বারা গণতন্ত্র নয়-পাকিস্তানে ᐧাহিনীর হাতই শক্তিশালী হবে। সেই সঙ্গে নাকি বেড়ে যাবে (তাদের ভাষায়) ᐧীমান্ত 'সন্ত্রাস', তাই তারা বলেছে, নির্বাচনের এই ফল তারা কখনওই প্রত্যাশা ᐧ। এ ছাড়া যেমনটা বিবেচনা ও আশা করেছিলেন, এই ফল তার সঙ্গে মোটেও ᐧপূর্ণ নয়। আক্ষরিক অর্থেই তাই নির্বাচনী ফলাফলে বিস্মিত হয়ে গেছেন।"

ᐧসব বিষয় অবশ্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এ জন্যেই ᐧমর্জি লক্ষ্য করে চলতে হয়। কিন্তু তারও একটি সীমা আছে, তারা কোনো ᐧগণতান্ত্রিক রায়কে উপেক্ষা করে যখন নিজেদের ইচ্ছার মান দণ্ডেই সবকিছু ᐧযাবেন আর তাতে যখন দেশ জাতির স্বকীয় তাই উপক্রম সংশ্লিষ্ট দেশবাসী

www.pathagar.com

বিরোধী আধিপত্যবাদপুষ্ট মানসিকতায় সায় না দিয়ে নিজস্ব প্রক্রিয়ায়ই আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। পাকিস্তানী জনগণের কোনো অংশও দীর্ঘদিন থেকে এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আপন স্বকীয়তা ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এমন একটি অবস্থার দিকে মুখ করলে, করতেই পারে। এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আর গণতন্ত্রের প্রবক্তা উল্লেখিত শক্তি ও বিভিন্ন দাতা সংস্থা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে, এমন জনরায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাই সঙ্গত।

পাকিস্তানী জনগণের নির্বাচনী রায়ে নতুনত্ব এবং সেখানে ইসলাম পন্থীদের এবার কিছুটা অগ্রগতি যা ইসলামের প্রতি বৈরী শক্তিগুলোর জন্যে বিরক্তিকর, তার কারণও লক্ষ্য করার বিষয়। তাহলো, যারা মুখে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলেন আসলে এটা তাদের অন্তরের কথা নয়, আর এখানটিই হলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বৈপরীত্যদুষ্ট যাবতীয় সমস্যা সংকটের উৎস। এটা ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানা যে, পাকিস্তানের জনক মরহুম কায়েদে অজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানকে একটি ইসলামী আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং জনগণের জন্যে সুখ-সমৃদ্ধির জীবনযাপনের সুযোগ এনে দেয়ার উপযোগী রাজনৈতিক ব্যবস্থাই দেশটিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বিগত ৫৫ বছর যাবত এই প্রত্যাশার বাস্তবায়ন কল্পে পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের প্রতি সেদেশের জনগণ বুকভরা আশা নিয়ে অপেক্ষায় ছিলো। কিন্তু পাকিস্তানী জনগণের সেই আশাকে বারবার দেশটির নেতৃবৃন্দ মারাত্মকভাবে আহত করে আসছেন। ঐসব সরকারী নেতৃত্বে যেমন ছিলো সামরিক ব্যক্তিত্ব তেমনি ছিলো বেসামরিক নেতৃত্ব। কিন্তু তাদের দ্বারা জনগণের দারিদ্র্য হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধিই পেয়েছে। নীচে নেমেছে জীবনযাত্রার মান। বৃদ্ধি পেয়েছে বেকারত্ব। জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধার মান চলে গেছে নীচে। যারাই ক্ষমতায় এসেছে, নিজেদেরকে দেশের পরম সুভাকাঙ্ক্ষী বলে জাহির করেছে। অপরদিকে দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। জাতীয় সম্পদের আত্মসাতে রাষ্ট্রীয় বড় বড় রুই-কাতলাদের বিদেশী একাউন্ট স্ফীত হয়েছে। এ জন্যে দায়েরকৃত বহু মামলা মোকাদ্দমার বিবরণ হয়- হামেশাই জনগণের সামনে আসছে। ফলে এমনিতেই যেখা দেশটির জনগণ ঐসব রাজনীতিকের ব্যাপারে ছিলো বিরক্ত, ঠিক এমন স আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী দমনের নামে যখন প্রকৃত সন্ত্রাসীদের বাদ শব্দ দু'টি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবার চক্রান্ত দেখলো আর সাথে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীনদেরকে দেখলো এর সাথে সায় দিতে, পাকিস্তানী জনগণের চিন্তায় বিরাট তোলপাড় শুরু হলো। এযাবত তারা যেই শক্তিকে বন্ধু বলে ভেবে আসছিলো, তার সম্পর্কে তারা অবিশ্বাসী হয়ে উঠলো। পাকিস্তানী জনগণের বিশ্বাসগত এই পরিবর্তনেরই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সেখ নির্বাচনী ফলাফল ব্যতিক্রম ধর্মী হয়েছে।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি মুত্তাহিদা মজলিস-এ—আমল (৬ ইসলামী ঐক্যজোট) আত্মপ্রকাশ করলো। এটি একটি নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

www.pathagar.com

সংকল্প, নতুন অঙ্গীকার। জনগণের নতুন প্রেরণারূপে তারা নির্বাচনী ময়দানে আসে। ধর্মীয় দলগুলোর এই মৈত্রী জোট অতীত প্রতারক দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং দেশের অর্থ-সম্পদ লুটকারী ও বিদেশে সেসব জাতীয় সম্পদের পাহাড় সৃষ্টিকারী নেতৃত্বের হাত থেকে দেশ-জাতিকে মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েই রাজনীতিতে আসে তারা। তাদের লক্ষ্য দেশের জনগণকে দারিদ্র্য, ঋণের বোঝা এবং অস্থিতিশীলতা থেকে মুক্ত করা। দেশটিকে বিশ্ব মানচিত্রে একটি সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে পৌঁছানো। তারা চান, শাসনতন্ত্রের অনুসরণ, আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা দ্বারা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বেড়াজাল থেকে বের করে জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতো।

এদিক থেকে চিন্তা করলে যেসব কার্যকারণ থেকে পাকিস্তানে ইসলামপন্থীদের জনপ্রিয়তা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তা যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি এ নিয়ে কারো ক্ষুব্ধ, ত্যক্তবিরক্ত হওয়া অযৌক্তিক ও গণতন্ত্রবিরোধী। এই জোট নেতৃত্ব তাদের অনুসৃত নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে আগামী দিনের পাকিস্তানী নেতৃত্বে এ দলের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

একসময় ইসলামপন্থী দলসমূহকে রাজনীতিতে আদৌ কোনো ফ্যাক্টর বলে মনে করা হতো না। এমন কি কারগিল যুদ্ধের সময় যখন দু একটি ইসলামী সংগঠন কাশ্মীরে ভারতের অব্যাহত জুলুম-নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনে অতিষ্ঠ হয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুললো, তখনও তাদেরকে পাত্তা দেয়া হতো না। তারপর এক পর্যায়ে যখন সন্ত্রাসী দমনের নামে যুক্তি-প্রমাণ ও দলিল-দস্তাবেজ ছাড়াই আফগানিস্তানের উপর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে হামলা চলে এবং সেখানে তালেবান, আলকায়েদা সদস্য ইত্যাদি নাম দিয়ে হাজার হাজার সামরিক বেসামরিক মুসলমানকে হত্যা করা হয়, তখন পাকিস্তানের পারভেজ সরকার সেই হামলার সমর্থক হিসাবেই কাজ করেনি, যুদ্ধ আক্রান্ত যেসব বিপন্ন আফগান পাকিস্তানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের অনেককেও গ্রেফতার এমনকি হামলাকারীদের হাতে তুলে দিয়েছে। তখনই পাকিস্তানী জনগণ তাদের সরকারের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং আফগানিস্তানের উপর হামলার তারা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু পারভেজ সরকার তাদের আদৌ পাত্তা দেয়নি বরং প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা হামলার পথ বেছে নেয়। শুধু তাই নয়, আমেরিকার পরামর্শে দেশের বেসরকারী ব্যয়ে পরিচালিত কওমী মাদ্রাসাসমূহের উপর নানান বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। যদিও এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার ফলে তা বর্তমানে অনেকটা স্থবির অবস্থায় রয়েছে। ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে একদিকে আন্তর্জাতিক শক্তির বিরূপ নীতি এবং এর সাথে পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয় পাকিস্তানী জনমনে চিন্তার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ভবিষ্যতে যার পশ্চাৎগতির পরিবর্তে অগ্রগতির সম্ভাবনাই সকলে প্রত্যাশা করছে।

সবচাইতে অপর যেই সম্ভাবনাপূর্ণ বাস্তবতাটি এবার পাকিস্তানী নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যদিয়ে সামনে এসেছে সেটা হলো, ছোটখাটো মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে

www.pathagar.com

বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া। যেই উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের মুসলমানরা স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্যে সংগ্রাম করেছিল এবং ৪৭ সালে তা অর্জনও করলো। কিন্তু গত অর্ধশতাধিক বছর পরও যেই কারণে সেই মহান লক্ষ্য অর্জিত হলো না সেই কারণ এবার পাকিস্তানের নির্বাচনে ধরা পড়েছে। সেটা হলো, রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন দেশের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অনৈক্য। তাই পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, পাশ্চাত্যের শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও ভোগবাদী জীবন ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে মানবতাকে রক্ষাকল্পে ইসলামের ধর্মীয় নেতৃত্ব দীর্ঘদিন থেকে যেই চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে আসছেন, তার অবসানের একমাত্র পথ হলো ইসলামপন্থী দল-সংগঠনগুলোর ছোটখাটো মতভেদ ভুলে গিয়ে রাজনৈতিক ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং মুসলিম জনগণকে তওহীদের মূলমন্ত্রে যোগ্যতার সাথে ঐক্যবদ্ধ করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামী সংগঠনসমূহের যেই সামান্য সফলতা, সেটাও সংশ্লিষ্ট সকলের শুভবুদ্ধির ফসল হিসাবে ঐক্যজোটেরই ফলশ্রুতি। তাই কোনো সাধারণ কারণে ইসলামী ঐক্যে যাতে ভাঙ্গন না আসতে পারে বরং সর্বত্র এর পরিধি বিস্তৃত হয়, সকল মুসলিম দেশেই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

এটা না বললেও প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বৃহৎশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসনের অনুসৃত ভ্রান্তনীতি শুধু জাতীয় পর্যায়ে এবং শুধু মুসলমানদের মধ্যেই নয়-মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সারাবিশ্বের শান্তিকামী মানুষদের মধ্যে এক অঘোষিত ঐক্য এনে দিয়েছে। বিশ্বশান্তির স্বার্থে এই ঐক্য ভাঙ্গবে বলে মনে হয় না। ইরাকে মার্কিন হামলার উন্মাদনার সম্মিলিত বিরোধিতা তারই প্রমাণ। সুতরাং প্রসঙ্গত আমরা বলতে চাই যে, বিশ্বের শান্তিকামী মানুষদের বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের ঐকমত্যের এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের মতো গণতন্ত্রের দাবীদার একটি দেশের পক্ষে এত যুদ্ধাগ্রহী হওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়। তাতে এটাই প্রমাণিত হবে যে, যুক্তরাষ্ট্র শক্তি-দম্ভে ভারসাম্যহীন হয়ে পৃথিবীতে একক সিদ্ধান্তে চলার বৈধতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, যা শুধু অশান্তিই আনবে।

সেই সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া!

[প্রকাশ ঃ ২. ১০. ২০০২ ইং]

কথায় বলে, "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।" তেমনিভাবে বলা হয়, "অপরাধী নিজ অপরাধের কোনো না কোনো চিহ্ন রেখেই যায়।" ব্যক্তি জীবনে হোক কি সমষ্টি জীবনে, কেউ যখন অন্যায়ভাবে, পরের অধিকার হরণ করে নিজের আর্থিক, রাজনৈতিক কোনো সুযোগ লাভ করতে চায়, এ জন্যে তাকে অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়। একটি মিথ্যাকে জনসমক্ষে সত্যের মতো করে তুলে ধরতে তাকে আরও দশটি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু তাতে সাময়িকভাবে মানুষকে প্রতারিত করে সুযোগ লাভ সম্ভব হলেও একদিন না একদিন অসত্যের ভাণ্ডার ফেটেই যায়। তখন

www.pathagar.com

অসত্যের বেসাতিকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-গোষ্ঠীর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। তার উৎকট দুরগন্ধে সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ঐ সময় কৃত্রিম উপায়ে অর্জিত-অর্থসম্পদ, যশ-গৌরব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সকল কিছুই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-গোষ্ঠীর জন্যে কাল হয়ে দাঁড়ায়। অপরাধী কর্তৃক অপরাধ ধামাচাপা দেয়ার শত চেষ্টা সত্ত্বেও এভাবে তার প্রকাশ ঘটাকে অনেকে প্রকৃতিরই বিধান বলে আখ্যায়িত করেন। তা না হলে মানবসমাজ অন্যায়ের যাঁতাকলেই চিরকাল নিষ্পেষিত হতে থাকতো।

আমাদের দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্যদিয়ে এ ধরনের অবস্থার পুনরাবৃত্তি বার বার ঘটে আসছে। কিন্তু ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। বরং নিজ ক্ষমতার অপব্যবহারজনিত সেই অপরাধকে যৌক্তিক প্রমাণ করার জন্যেই সকলে সচেষ্ট থাকে। এই অবস্থা যেমন আমাদের দেশে, তেমনি অন্যান্য দেশেও একই মানসিকতার লোকদের দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের একটি ইস্যু নিয়েও মহলবিশেষ অতীতের একাধিক বারের ন্যায় রাজনৈতিক সুবিধা ভোগের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সত্য ও বাস্তবতার চপেটাঘাতে সেই দুরভিসন্ধিটি এবার মাঠে মারা গেছে। তা হলো সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতি। গত নির্বাচনের পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে কিংবা জোট সরকার তাদের যাবতীয় অপকীর্তি যাতে সামনে আনার সুযোগ না পায় সে জন্যে আওয়ামী লীগ এ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অনেকগুলো ইস্যুই দাঁড় করাতে চেয়েছে, যার ফিরিস্তি বেশ লম্বা। সেগুলোরই একটি ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধুয়া। এ জন্যে তারা নিজ দেশের চিরন্তন একটি সত্যকে বিদেশে গিয়েও বিকৃত করে দেশের দুর্নাম ছড়াতে দ্বিধা করেনি। সর্বপ্রথম শাহরিয়ার কবীর নামক একজনকে দিয়ে অতি সংগোপনে এ ব্যাপারে মিথ্যা প্রচারণার চেষ্টা চলে, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ দ্বারা এবার নতুন করে এই ইস্যুটিকে চাঙ্গা করে তোলার অপচেষ্টা চলেছে, যার প্রতিবাদে খোদ সংখ্যালঘুদের নেতারাই এগিয়ে এসেছেন। যেমন, গত ২০ / ৯/ ০২ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূজা উদযাপন পরিষদের প্রতিনিধি সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ সৃষ্টির উস্কানি দিয়ে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তার ভাষণের তীব্র সমালোচনা করে হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী বলেন,-যখনই কোনো পূজা সমাগত হয় অথবা একটি চিহ্নিত মহলের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখনই তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা শুরু করে। মিঃ গৌতম চক্রবর্তী বলেন, সি আর দত্ত, ললিত মোহন ও নিমচন্দ্র ভৌমিকদের মতো ব্যক্তি যারা অন্য দেশকে নিজের দেশ বলতে ভালবাসেন, তাদের মুখেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের উস্কানি দেয়া শোভা পায়। তিনি হিন্দু-বৌদ্ধ—খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতাদের এ সব বক্তব্যকে "রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক' বলে উল্লেখ করেন। মিঃ গৌতম চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে বলিষ্ঠ প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেন, তাঁর নির্বাচনী এলাকা টাঙ্গাইল-৬ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১ লাখ ৯৮ হাজার। এর

www.pathagar.com

মধ্যে মাত্র ১৮ হাজার হিন্দু ভোটার। অথচ তিনি নিজে একজন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে দু'বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের সবচেয়ে সচেতন ও অনগ্রসর অংশ। সাংবাদিকদের জাতীয় প্রেসক্লাবে অধিকাংশ ভোটার মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তারা দু'বার ভোট দিয়ে সংখ্যালঘু সাংবাদিক নেতাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেছেন। বাংলাদেশের মানুষকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের উস্কানি দিলেও তারা স্বভাবগতভাবেই যে অসাম্প্রদায়িক এই দু'টি উদাহরণও বড় প্রমাণ। সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে একটি রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিকারী চিহ্নিত মহল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে মূলত হিন্দুদের মনকে দুর্বল করতে চায়। তিনি এদের উস্কানিতে বিভ্রান্ত না হবার জন্যে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের পূজা উদযাপন পরিষদের প্রতিনিধি সম্মেলনে সম্পূর্ণ অসত্য বক্তব্য দিয়ে এর প্রধান অতিথি চিত্তরঞ্জন দত্ত (বীরোত্তম) বলেন, "সারাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ও আদিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। সরকারের কাছে বারবার বিষয়টি তুলে ধরা হলেও সরকার তা অস্বীকার করে আসছে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রতিহত করতে হবে।"

অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ তার বক্তব্যে বলেন, "......... গত বছর নির্বাচনের আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়েছে, সহস্রাধিক হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান, বিচারপতি বিবি রায় চৌধুরী, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, মুয়ীদ চৌধুরীদের আমরা অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছি। এমন একদিন আসবে, তারা এদেশে থাকতে পারবেন না। এদেশে সন্ত্রাস থাকবে না।" চিত্রা ভট্টাচার্য বলেন, "সংখ্যালঘু হিন্দু নারীদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে, তা নাৎসী বাহিনীর নির্যাতনকেও হার মানায়।" এডভোকেট শুধাংশু শেখর হালদার বলেন, "বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে,-এটা সরকার অস্বীকার করলেও সারাবিশ্বে তা প্রকাশিত হচ্ছে। দায়-দায়িত্ব থেকে কেউ রেহাই পাবে না।" স্বপন কুমার সাহা তার বক্তব্যে বলেন, "যারা আমাদের নির্যাতন করছে, আমাদের মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। এদেশ আমাদের। আমাদের অস্তিত্বের প্রশ্নে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।" এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, হাজার হাজার হিন্দু মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে কিন্তু বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। ধর্ষকদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে আর ধর্ষিতাদের পাশে গিয়ে যারা দাঁড়িয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ জন্যে যারা দায়ী তারা পার পাবেন না।" তিনি শত্রু সম্পত্তি আইনের বিধান পরিবর্তন করে মূল মালিকদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানান।

বাংলাদেশে সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তাদের ভ্রান্তনীতির ফলে যেই অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, জোট সরকার কর্তৃক সেই ধারাবাহিকতা

www.pathagar.com

রোধকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও এখনও সমাজে অপরাধ প্রবণতা পুরোমাত্রায় হ্রাস পায়নি। এ সব অপরাধের শিকার এদেশের অনেক নাগরিকই, যাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আছে। এক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের আলাদা করে দেখা ও তা নিয়ে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা বলা রাজনৈতিক অসাধুতা বৈ কিছু নয়। ঐক্যপরিষদের নেতারা এরূপ বিচ্ছিন্ন দু'একটি ঘটনাকে যেভাবে তুলে ধরছেন, মনে হয় অতি সুপরিকল্পিতভাবে গুজরাটের মতো এখানে সংখ্যালঘু নির্যাতন শুরু হয়েছে। আসলে ভারতের গুজরাটে নৃশংসভাবে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ মুসলিম গণহত্যা চালানো হয়। সেখানে একতরফা মুসলিম নিধনযজ্ঞের আকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। তাতে ৩ হাজার মুসলমানকে হত্যা এবং অগণিত মুসলমানকে জখম, বিকলাঙ্গ ও তাদের হাজার হাজার বাড়ী-ঘর ও দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। সে ব্যাপারে সংখ্যালঘু নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসায়ী মহলটি মানবিকবোধ থেকেও তার প্রতিবাদ করার প্রয়োজন অনুভব না করলেও বাংলাদেশে এ ব্যাপারে কেন 'শুকনা গাঙ্গে" জোয়ার তোলার মতো সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলছিল, সে কারণ স্পষ্ট। গৌতম চক্রবর্তীর ভাষায় "তারা অন্য দেশকে নিজের দেশ ভাবেন"-বলেই ঐ দেশের ভয়াবহ মুসলিম হত্যাযজ্ঞের ঘটনা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে ভিন্ন দিকে ফেরাবার মতলবে এদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধুয়াটি তোলা হয়। গুজরাটের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এখানে কারও গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি।

এই বক্তব্যের পোষকতা করে দেশ-বিদেশের এমন বহু দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন, মার্কিন বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট যা ২০/৯/০২ তারিখের জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, "বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর অতিরঞ্জিত। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুরিভুরি অভিযোগ সত্য নয়। অভিযোগকারীদের অভিযোগ অনুযায়ী কোনো কোনো ক্ষেত্রে উল্লেখিত ঘটনাবলী সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট ও অতিরঞ্জিত। রাজনৈতিক ইস্যুতে তৈরি উত্তেজনা-বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর জন্যে।" বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি গবেষণাধর্মী এই রিপোর্ট দিয়েছেন মার্কিন অপরাধ ও মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ম্যাবেল গোমেজ। নিউইয়র্কস্থ জন জে কলেজ অব ক্রিমিনাল জাস্টিস তার কর্মস্থল। সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ সরেজমিনে তদন্তের জন্য মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে গত ৫ থেকে ২৫ শে আগষ্ট একটানা ২৫ দিন তিনি কাজ করেছেন। অধ্যাপক ম্যাবেল গোমেজের মতে, "বাংলাদেশে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর মানবাধিকার লঙ্ঘন আর সংখ্যালঘু নির্যাতনের যেসব অভিযোগ দেশী-বিদেশী প্রচার মাধ্যমে এসেছে, তা রঙচঙ লাগানো। এদেশের মুসলমান, হিন্দু , বৌদ্ধ, খৃস্টান অভাবনীয় এক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ, পরস্পরের ভাই। রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্যে কেউ কেউ গ্রামের জমিজমা সংক্রান্ত সাধারণ বিরোধ কোন্দলকে সংখ্যালঘু নির্যাতন বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচনের পরপরই এ ধরনের একটি ইস্যু তৈরির চেষ্টা হয়েছে। ১৩ কোটি জনতা অধ্যুষিত বাংলাদেশ বিশ্বের সমজাতীয়

www.pathagar.com

সমাজের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ...নোয়াখালীর গোপাই গ্রামের একটি ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এ গ্রামের একজন খৃস্টান বাসিন্দা আমার কাছে অভিযোগ করেন, কয়েকজন মুসলিম বালক তার গাছের নারিকেল চুরি করেছে। তাই আমি যেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আনি যে, খৃস্টানরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কুমিল্লার একজন হিন্দু মহিলা আমার কাছে অভিযোগ করেন, স্কুলে যাবার সময় এলাকার মুসলমান ছেলেরা হিন্দু মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। কুমিল্লার দুটি খৃস্টান বালিকা অভিযোগ করে, আফগানিস্তানে বোমা বর্ষণের পর তাদেরকে বুশ বুশ বলে টিজ করা হয়। বরিশালের একটি চার্চের সামনে প্রেসিডেন্ট বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। কিছু খৃস্টান যারা অভিযোগ করে, তারা সন্ধ্যার পর রাস্তায় বের হতে ভয় পায়। খৃস্টান হবার কারণে তারা বিশেষভাবে আক্রান্ত হতে পারে। আমি তাদের খুব কাছে থেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,. এমনিতে সন্ধ্যের পর তারা চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে কি না। এর জবাবে তারা জানায়, সূর্য ডোবার পর ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে কোনো মেয়েই রাস্তায় বেরোতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। তা সে হোক মুসলমান, হিন্দু বা খৃস্টান। কয়েকজন বৌদ্ধ অভিযোগ করলেন, স্থানীয় জনগণ কোনো অনুমতি না নিয়ে জোর করে তাদের পুকুরে গোসল করে। নিষেধ করলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পুকুরটি বৌদ্ধদের জমিতে হওয়া সত্ত্বেও উন্মুক্ত হওয়ায় এটাকে সবাই গণসম্পত্তি মনে করে। তাই এই পুকুরকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে এক ধরনের শত্রুতা। "মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারে পটুয়াখালীর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ম্যাবেল গোমেজ তার রিপোর্টে লিখেছেন, "কয়েকজন বৌদ্ধ তাদের কিছু মূর্তি ভাঙ্গা এবং চুরি যাওয়ার অভিযোগ করেন আমার কাছে। অবশ্য তিন দিন পর তারা আমাকে জানায়, স্থানীয় পুলিশ এগুলো উদ্ধার করেছে। ঘটনা ছিল আন্তর্জাতিক প্রত্নসামগ্রী চোরাচালান চক্রের সাথে তারাও জড়িত। আমি যখন প্রশ্ন করি, এছাড়া অন্য কোনোভাবে মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে বাধা দেয় কিনা, তখন তারা এ ধরনের কোনো অভিযোগ নেই বলে উল্লেখ করে।"........ উপসংহারে মার্কিন বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে বলা হয়, "প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে ধর্মীয় সহিষ্ণুতাপূর্ণ সংস্কৃতি চলে আসছে। এদেশের মানুষ বরাবরই এ মূল্যবোধকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ একটি উদার সহিষ্ণু, মুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশ। আধুনিকায়ন শিল্পায়নের মধ্যদিয়ে দেশটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন।"

বাংলাদেশে ভয়াবহ সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবরাখবরের মধ্যে এক পর্যায়ে সংবাদপত্রে খবর বের হয়েছিল যে, রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দির ভাংচুর করা হয়েছে। আসবাবপত্র তছনছ লুটপাট করা হয়েছে। অথচ পরে জানা যায়, এটা ছিল পূজা কমিটির এক সাজানো ঘটনা।

রাজনৈতিক অস্বচ্ছতায় আমাদের দেশের মানুষ ইতিপূর্বে কম প্রতারিত হয়নি। তারা এখন সচেতন। যেই রাজনৈতিক মহলই জনগণকে বোকা বানাতে চাইবে, তারা যে জনগণের কাছে এর উপযুক্ত জবাব পাবে, এবারকার সাধারণ নির্বাচনই তার বড়

www.pathagar.com

প্রমাণ। তেমনি এই নির্বাচনে জয়ী সরকারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়ার জন্যে দেশে-বিদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার সহ যত ইস্যু সৃষ্টির অপচেষ্টা হয়েছে, সেগুলোর প্রতি জনগণের তেমন ভ্রূক্ষেপ না করা এবং সময় মতো সরকারের উপযুক্ত পদক্ষেপে প্রচারণাকারীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবার পর জনগণের নীরবতাও তারই প্রমাণ।

বিগত শাসনামলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলার ঘটনা ঘটতে না ঘটতেই তৎকালীন বিরোধী দলকে এ জন্যে মৌলবাদী ও জামায়াতকে দায়ী করতে সকলে দেখেছে। অনেক মাদ্রাসা ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানে হানা দিয়ে সম্মানিত আলেমদের লাঞ্ছিতও করা হয়েছে। কিন্তু তাদের শাসনামলে না এসবের কোনো তদন্ত হয়েছে, না হয়েছে আসামী ধরা বা তাদের বিচার। কিন্তু এখন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট কি বলছে? যদি তাই সত্য প্রমাণিত হয়, অসত্য অভিযোগের রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের অবস্থাটা কি হবে? কি হবে তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ের? তাই জনগণের কাঙ্ক্ষিত সচ্ছ রাজনীতিই সকলের কাম্য-মিথ্যাচার নয়।

তবে এ কথা শুনে সরকারেরও আত্মপ্রসাদ লাভ করা ঠিক নয়। কারণ কোনো নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর একশ্রেণীর সমাজ বিরোধী তার নব্যসমর্থক সেজে কিংবা রাজনৈতিক আবরণ পাল্টে এলাকায় এমন সব কাজ শুরু করে। যাতে এক গুলীতে দুই শিকারের কাজ হয়ে যায়। একদিকে তারা অবৈধ আর্থিক সুযোগেরও অধিকারী হয়, অপরদিকে এলাকায় ক্ষমতাসীন সরকারেরও ভাবমর্যাদা চরমভাবে ক্ষুণ্ন করে। যেমন, ঢাকা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় হতাশ ও ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলা হয়েছে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা নদীর তীরে হাওয়া খায়, ফুটবল খেলে। ধরা পড়ে না। রাজধানী শহর, শহরতলী ও গ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, উল্লেখিত শ্রেণীটির চাঁদাবাজির দাপটে স্থানীয় জনগণের নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। এই শহরের ভাষানটেকে তো পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে গেছে বলে শোনা যায় যে, সেখানকার মানুষ সমাজবিরোধী চাঁদাবাজদের দাপটে কেউ মুখ খুলতে সাহস করছে না। পাকা বাড়ী করা তো বড়কথা কোনো ব্যক্তি একটি টিনের ঘর উঠাতে গেলেও সেখানে মালিকের কাছে ১ লাখ ২ লাখ টাকা চাঁদা দাবী করা হয়। নয়তো, তার মিস্ত্রি-কামলাদের মেরেপিটে সেখান থেকে খেদিয়ে দেয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে না কোনো মালিকের পক্ষে সেখানে বসবাস সম্ভব, না কোনো শান্তিপ্রিয় মানুষের পক্ষে। এ ব্যাপারে সম্প্রতি কাফরুল থানার ওসি তার সহকর্মীদের নিয়ে এলাকাটিকে প্রকাশ্য ও নেপথ্য চাঁদাবাজদের হাত থেকে রক্ষাকল্পে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিলেও জনৈক শাহ্ আলম পুলিশের গুলীতে পায়ে জখমী হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করলে ওসি সহ পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হওয়াতে ভাষানটেক ও কাফরুলের চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য আরও বেড়ে যাবে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। স্থানীয় লোকদের সতর্ক বক্তব্য হলো, আলমও সন্ত্রাসের অভিযোগে অভিযুক্ত এক আসামী। পুলিশ সূত্রের খবর, সেই এলাকায় আলম বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীদের তালিকায় ১৭ নং আসামী।

www.pathagar.com

তার বিরুদ্ধে থানায় পাঁচটি মামলা রয়েছে। গত আগস্ট মাসে সে অস্ত্রসহ ধরা পড়ে জেলে যায়। ৪ মাস আগে জেল থেকে বেরিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করে। তার সহকর্মীদের অত্যাচারে কাফরুল এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ ও ভীত। জানা যায় যে, স্থানীয় শীর্ষসন্ত্রাসী আব্বাস ও ইবরাহীম 'হৃদয় গ্রুপে'র সদস্য। একইভাবে মিরপুর, লালমাটিয়াতেও নব্যসমর্থক চাঁদাবাজ ও অন্যান্যভাবে সন্ত্রাসে লিপ্ত একশ্রেণীর সমাজবিরোধীর দৌরাত্ম্যে মানুষ এক দুর্বিষহ অবস্থার শিকার। এসব দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। কোথাও প্রতিহিংসা ও রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সুযোগ নিয়ে চাঁদাবাজি বা জুলুম অন্যায় না হতে পারে। দেশে অসচ্ছতাদুষ্ট মিথ্যাচারের রাজনৈতিক তৎপরতার মোকাবেলায় যেমন সময় মতো পদক্ষেপ নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে, তেমনি গ্রামে ও শহরে রাজধানীর উপকণ্ঠে সরকারের নব্য সমর্থক সেজে যারা সরকারের সুনাম বিনষ্ট করছে, সেসব সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধেও সরকারকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে পুলিশ বিভাগ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালনকালে যেই ভূমিকা পালন করে, সেখানে যেমন রীতিনিয়ম বজায় রাখা তাদের কর্তব্য, তেমনি রাজনৈতিক কারণে বা একশ্রেণীর সংবাদপত্রের মিথ্যা ও ঘটনার অতিরঞ্জন মুখরোচক প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে কর্তৃপক্ষ পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও তাকে অনেক ভেবে চিন্তে তা করতে হবে। মোটকথা, দেশবাসী আজ এটা উপলব্ধিতে সক্ষম যে, কারা মিথ্যাকে পুঁজি করে রাজনীতি করে আর কারা সরকারের নব্যসমর্থক সেজে সরকারের জনপ্রিয়তা নষ্ট করার জন্যে চাঁদাবাজিকে জোরদার করে সাবেক আওয়ামী অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায়।

শেখ হাসিনার হুমকি প্রসঙ্গে

[প্রকাশ ঃ ২২. ৮. ২০০২ ইং]

সেদিন পল্টন ময়দানের জনসভায় বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আইন-শৃঙ্খলার প্রতি হুমকিস্বরূপ যেসব উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন এবং সরাসরি বর্তমান সরকারের হাত গুড়িয়ে দেবার এবং সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার যেই আহ্বান জানিয়েছেন, বিএনপির মহাসচিব জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া তার তীব্র সমালোচনা করে এক বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে জনাব ভূঁইয়া শেখ হাসিনার আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী উস্কানিমূলক বক্তৃতার কারণ ও পটভূমি বর্ণনা করে একে "উদ্বেগজনক ও শঙ্কাপূর্ণ' বলে মন্তব্য করেন। শেখ হাসিনার এসব দায়িত্বজ্ঞানহীন ফ্যাসিবাদী উক্তি দেশে একটি অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা বলে তিনি মনে করেন। সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অজুহাতে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটছে এগুলোর প্রায় ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কোনো কোনো সদস্য হত্যা ও সরকার দলীয় বিভিন্ন নেতাকর্মীকে হত্যার ব্যাপারটি গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনার অংশ বলে তিনি মনে করেন। তিনি এও মনে করেন যে, মূলত পরিকল্পিত এই গুপ্ত হত্যার দ্বারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি ও গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টির লক্ষ্য

www.pathagar.com

বাস্তবায়নের জন্যই ঢাকায় মারাত্মক মারণাস্ত্র আমদানি করা হয়েছে, যার সাথে একটি অরাজকতা সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতারও প্রমাণ সরকার পেয়েছে বলে জানা গেছে। এর নির্গলিত অর্থ দাঁড়ায়, অস্ত্র আমদানিকারক মহলটি গুপ্ত হত্যার দ্বারা নিজেদের পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে চায়। বিএনপি নেতা বিরোধী দলীয় নেত্রীকে 'গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতার চর্চা' ও 'গঠনমূলক ভূমিকা' পালনের অভ্যাস গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

জনাব ভূঁইয়া ক্ষমতাসীন দলের একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে সমাসীন থেকে তাঁর পদের উপযোগী শব্দেই কথা বলেছেন। তিনি বিরোধী দলীয় নেত্রী ও তাঁর অনুসারীদেরকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরোধী দলের মতো দায়িত্বপূর্ণ আচরণের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এই আহ্বান যথাস্থানে সঠিক হলেও তিনি দেশে বেআইনী অস্ত্রের আমদানি এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের হত্যা ও ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের পরিকল্পিতভাবে গুপ্ত হত্যার যে অভিযোগ এনেছেন, সেই অভিযোগের সাথে এই আহ্বান সঙ্গতিহীন বলেই মনে হয়। কারণ, সন্ত্রাস, পুলিশ হত্যা এবং অরাজকতা সৃষ্টির যেই কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, ঐসব গুরুতর অভিযোগে এই গণতান্ত্রিক আহ্বান কতদূর কল্যাণপ্রসূ, পর্যবেক্ষক মহলের কাছে এটি এক মস্তবড় জিজ্ঞাসা। সরকার যদি কাউকে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক অস্ত্র সম্ভার আমদানিকারক বলেই মনে করে, তা হলে তোদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে না কেন? অন্যথায় এহেন আচরণ কি সরকারের অভিযোগের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়না?

বর্তমান জোট সরকার দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক যেই প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায় সমাসীন হয়েছে, তা অতীব ভয়াবহ ছিল। পূর্ববর্তী সরকার দেশকে এমন অবস্থায় রেখে গিয়েছিল, যাতে নতুন কোনো সরকার দায়িত্ব নিয়ে এসে অর্থাভাবে দিশেহারা হয়ে পড়ে, অপরদিকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে অল্প দিনেই জনপ্রিয়তা হারিয়ে ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য হয়। কিন্তু জোট সরকারের অর্থমন্ত্রীর বিচক্ষণতা এবং তাঁর 'অপচয় রোধ' ও 'ব্যয় সঙ্কোচ নীতি' সেই দুরভিসন্ধিকে বানচাল করে দিয়েছে। সরকারের অনুসৃত অর্থনীতির সুফল যেখানে আরো কয়েক মাস পর দেখা দেয়ার কথা, তার আগেই সেই সুফল আঁচ করা যাচ্ছে। বাকি থাকলো সন্ত্রাস দমন। এ ব্যাপারেও বর্তমান সরকারের সফলতাকে এতো খাটো করে দেখার মতো নয়। শিশু হত্যাসহ যেসব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে চলেছে, এর মূল কার্যকারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এগুলোর বীজ সাবেক আওয়ামী শাসনামলেই রোপিত ছিল, বিস্তারিত বিবরণের অবকাশ এখানে নেই। তবুও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য কে এম ওবায়দুর রহমান এমপির একটি বক্তব্য এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেছেন, "সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বীজ বপন করে গেছে আওয়ামী লীগ। মাদকাসক্তি বৃদ্ধির কারণেই শিশু হত্যা ও শিশু পাচার বেড়েছে। মাদকাসক্ত ও মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীরা ঐ আমলে প্রশ্রয় পেয়েই এখন শিশু অভিভাবকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা বের করার জন্যে তাদের শিশু সন্তানদের পনবন্দী করছে। টাকা না পেয়ে করছে হত্যা। এজন্য

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগই দায়ী।" প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরীও এ কথারই প্রতিধ্বনি করে আওয়ামী নেতাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলেছেন, "আওয়ামী লীগ তার পাঁচ বছরের শাসনামলে দেখিয়ে দিয়ে গেছে, সন্ত্রাস কত প্রকার ও কি কি।" চৌধুরী আরো বলেন, চারদলীয় জোট হচ্ছে শেখ হাসিনার জন্য আতঙ্ক। দুই নেতাই গত রোববার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ শহর বিএনপি আয়োজিত আওয়ামী শাসনামলে গুলীতে নিহত যুবদল কর্মী ইব্রাহীমের স্মরণসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। আইন কখনো এটা দেখে না যে, অপরাধী ব্যক্তি সমাজের কোন শ্রেণীর নাগরিক? সে কি সাধারণ মানুষ, না কোনো খ্যাতিমান রাজনীতিক কিংবা বড় মাপের কোনো আমলা বা দেশের কোনো প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী অথবা টপটেঘর, যে মাঝে মাঝে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিপক্ষ দমনে কাজে লাগে। অপরের কথা যাই হোক, দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের ম্যান্ডেট নিয়ে যে সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসে, তার মতো দায়িত্বশীলের কাছে আইনই বড়। তার দ্বারা আইনের শ্রেণীবৈষম্যমুক্ত সঠিক প্রয়োগই গোটা জাতি প্রত্যাশা করে। কোনো বিশেষ বিবেচনায় এর ব্যত্যয় কিংবা এতে কোনোরূপ অদক্ষতা জাতির অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। এদিক থেকে চিন্তা করলে আমাদের দেশে গত পাঁচ বছরের অধিককাল ধরে সামাজিক যেই অশান্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করে আসছে, সামাজিক মূল্যবোধের যেই মারাত্মক অবক্ষয় ঘটেছে, এজন্য মূল দায়ী হচ্ছে সেসব লোক, যারা এ জন্যে অবকাঠামো সৃষ্টি করে গেছে। এ সরকার সেই জঞ্জালই সাফ করে শেষ করতে পারছে না। এসবের নেপথ্য নায়করা সকল সময়ই সুকৌশলে অপরাধের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে আসছে। মূলত সেই অবস্থার হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্যই জনগণ সরকার বদল করেছিল। তাই বর্তমান সরকার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সেক্টরে সংঘটিত দুর্নীতি ও বিচিত্র ধরনের অপরাধ এবং এগুলোর সংগঠকদের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ এনে মামলা রুজু করতে থাকে, জনগণ তাতে বিরাট আশ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু ঐসব অপরাধীর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতে বিলম্ব দেখে আবার এই আমলের কোনো কোনো ব্যক্তির অন্যায় প্রবণতা লক্ষ্য করে একদিকে যেমন জনগণ হতাশ হতে চলেছে, অপরদিকে অভিযুক্তরাও এসব বিচার ও শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবার লক্ষ্যে নানা ছুতায় দেশে অরাজকতা সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই তারা একবার সংখ্যালঘু নির্যাতন, একবার ছাত্রী হলের ঘটনা, একবার বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ক্যাডারদের উপর অন্যায় নির্যাতন ও তাদের গ্রেফতারীকে আন্দোলন ও বিশৃংখলা সৃষ্টির ইস্যু বানাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারপরও ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না দেখে সাম্প্রতিককালে সংঘটিত বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবীসহ অন্যান্য দাবীতে চাঙ্গা হয়ে উঠছে। মূলত বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্তদের বিচার শুরু না হওয়াতেই তারা ধীরে ধীরে বড় গলায় কথা বলতে আরম্ভ করেছে। তাদের সংবাদপত্রের ভাষায় 'তবে গণঅভ্যুত্থানের জন্যে আরও অপেক্ষা করতে হবে।' তাহলে প্রশ্ন জাগে, সরকারি কর্তৃপক্ষ যাদেরকে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের

www.pathagar.com

করলেন, তাদের গ্রেফতারী ও বিচারে বিলম্বের কারণে যদি অভিযুক্তরা অতীতের মতোই নানান মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে কোনো হট্টগোল সৃষ্টির সুযোগ পেয়ে যায়, তাহলে এজন্যে কি কর্তৃপক্ষই দায়ী হবেন না? এমনটি না হোক, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের সেই দুরভিসন্ধি কোনো কারণে সফল হলে তখন এদেশটির পরিণতি কি হবে এবং যেই সরকার অপরাধকে প্রশ্রয় দেয়ার নীতি অনুসরণ করছে, তারাই বা জাতির কাছে কি আচরণটি পাবেন, তা ভেবে দেখা দরকার বৈ কি।

তাই আমরা বলতে চাই, বিএনপি নেতা জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বিরোধী দলের একটি মহলের বিরুদ্ধে যেসব গুরুতর অভিযোগ এনেছেন, অভিযোগগুলোর চরিত্রই হলো এমন, যা এই মুহূর্তেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য অথচ তাতে চলছে মন্থরতা। পরন্তু এজন্যে তাদের প্রতি গণতান্ত্রিক আচরণ রপ্ত করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, যেই আহ্বানের সাড়া হয়তো বিএনপি নেতা তাঁর জীবদ্দশায়ও পাবেন না। জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার ভাষায় অভিযোগগুলো নিম্নরূপ ঃ বিরোধী দলীয় নেত্রীর আইন হাতে তুলে নেয়ার হুমকি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। রোববার পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায় শেখ হাসিনা সরকারের হাত গুঁড়িয়ে দেয়ার যে হুমকি দিয়েছেন, তাতে দেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা বিস্মিত না হলেও উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত। জনাব ভুঁইয়া বলেন, শেখ হাসিনার এই ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী উক্তি আমাদেরকে তাঁর শাসনামলের ভয়াবহ সেই দিনগুলোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে যেদিন তিনি তাঁর দলীয় সন্ত্রাসীদেরকে একটির বদলে দশটি লাশ ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশকে পরিণত করেছিলেন এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু উপত্যকায়। বিএনপি মহাসচিব বলেন, সাম্প্রতিককালে ঢাকায় মারাত্মক মারণাস্ত্র আমদানির সঙ্গে যখন বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের কতিপয় নেতা -কর্মীর সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তখন অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পুলিশসহ আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যদের ওপর বিভিন্নস্থানে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালাচ্ছে এবং যখন জোটের গুরুত্বপূর্ণ নেতা-কর্মীদের বিভিন্নস্থানে গুপ্ত ঘাতকরা বিভিন্ন কায়দায় হত্যা করছে, সেই সময় বিরোধী দলীয় নেত্রীর আইন হাতে তুলে নেয়ার এ হুমকিকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা মনে করা যায় না।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জাতির কল্যাণ সাধনে মহাস্রষ্টার এক বড় দান। এই দানের সদ্ব্যবহার করা না হলে এবং অদক্ষতা-অসাধুতার দরুন জাতির ক্ষতিসাধনকারী দুশমনদের প্রতিহত করার প্রদত্ত অঙ্গীকার পালন না করলে, তার পরিণতির হাত থেকে না জাতি রক্ষা পায়, না প্রশ্রয়দাতা নিজেরা রেহাই পায়। সুতরাং দীর্ঘ ৫ বছর ধরে যারা এ জাতির সম্পদ লুট করে এখন সেই লুটের অর্থ দিয়েই আবার ঐ অন্যায়ের শাস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্য দেশে হট্টগোল বাধাতে সক্রিয় এবং তথাকথিত গণঅভ্যুত্থানে'র স্বপ্ন দেখছে সত্যিই তারা সরকারের দৃষ্টিতে অপরাধী হলে, তাদের অপরাধসমূহের বিচার হওয়া উচিত। অপর দিকে রাজনৈতিক প্রতিশোধ কল্পে অবাস্তব অভিযোগ এনে কাউকে হেয় করা উদ্দেশ্য হলে তা থেকে বিরত থাকা সরকারের কর্তব্য।

www.pathagar.com

রমযানের ডাক ঃ ফযীলত ও প্রাসঙ্গিক কথা

[প্রকাশ ঃ ১৭. ১১. ২০০১ ইং]

আত্মশুদ্ধি, আল্লাহপ্রেম, সাম্য, সহমর্মিতা ও সহানুভূতির উদাত্ত আহ্বান নিয়ে প্রতি বছর মাহে রমযান আমাদের মাঝে ফিরে আসে। রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের প্রতীক স্বরূপ রমযানের হেলালী চাঁদ পশ্চিম আকাশে আত্মপ্রকাশ করে। মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, কলহ, হানাহানি দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত মানুষদের ডেকে বলে আর নয়, এবার ফিরে এসো সবাই তাকওয়ার দিকে,-আল্লাহ ভীতিপূর্ণ সাবধানী জীবনের দিকে। অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি, অসাধুতার কলুষিত অন্তরকে মাহে রমযানের কৃচ্ছ্রসাধনার দাবদাহ দ্বারা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দাও। অপরাধ প্রবণতার বাসায় আগুন ধরিয়ে তার সকল খুপড়ি-কোঠরি পুড়িয়ে ফেলো। তার জায়গায় তাকওয়ার বীজ বপণ করে নিজে সুখে থাকো-অপরকে সুখে থাকতে দাও। মুমিন জীবনের পরম কামনা-দীদার-এ-এলাহী লাভ ও তাঁর আতিথেয়তার প্রত্যাশায় সিয়াম সাধনার আদর্শে গড়ে তোলো নিজের ব্যক্তি চরিত্র, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন। এ মহৎ লক্ষ্যের অভিসারীদের নেই কোন ব্যর্থতা, নেই পরাজয়। আত্মশুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা তোমার চিত্তশক্তিকে দৃঢ়তর করো। 'সংযম মাসের' এই প্রশিক্ষণ দ্বারা অন্যায়, লোক-প্রলোভনের হাতছানিকে পদাঘাত করে দূরে নিক্ষেপ করো। তেমনি-সিয়াম সাধনালব্ধ দুর্জয় মনের প্রচণ্ডতা দিয়ে হটিয়ে দাও সত্য পথের সকল কাঁটা। আল-মুত্তাকীনের সমাজ গড়ে বিশ্বমানবতাকে তাগুতী শক্তির শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে উদ্ধার করো। দুনিয়ার 'হাসানা'কে নিশ্চিত করে প্রতিদিনের জন্যে ঈদুল ফিতর ডেকে আনো।

সত্যই মাহে রমযানের মাস যদি আল্লাহ প্রেম, সাম্য ও সহানুভূতির মাস না হতো, তাহলে সারাদিন পানাহার, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বাকশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ ও চিন্তা শক্তি ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহকে সংযত রেখে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহ নিয়ে দীর্ঘ রাত নামাযে দাঁড়ানো ইত্যাদির দ্বারা আল্লাহপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখানো সম্ভব হতো না। সম্ভব হতো না প্রাচুর্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকা মানুষের পক্ষে ক্ষুধার্ত বুভুক্ষুদের জঠর জ্বালা উপলব্ধি করা। যাদের দারিদ্র্য ও ক্ষুধাক্লিষ্ট দেহের করুণ চাহনি কোনদিন এক শ্রেণীর মানুষের অন্তরে স্নেহের উদ্রেক করতে পারেনি, মাহে রমযানের অছিলায় তাদের অন্তরও সহানুভূতির নির্মল স্পর্শে সিক্ত হয়ে ওঠে। দানের হাত সম্প্রসারিত হয়। একই কাতারে নামায আদায় করে বিত্তবান ও বিত্তহীন গরীব মিসকীন। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "আদম সন্তানদের প্রত্যেক নেক আমলের বদলে সাওয়াবের পরিমাণ দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু একমাত্র রোযাদার- যিনি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন রাখেন, পানাহার থেকে বিরত থাকেন, তাঁর সওয়াব পরিমাণ বা সংখ্যাভিত্তিক নয় বরং খোদ আল্লাহ তায়ালাই এর

www.pathagar.com

পুরস্কার"। অর্থাৎ আল্লাহ বান্দাকে ঐদিন তাদের জীবনের পরম কামনা নিজের সাক্ষাত দান করে তাদের আতিথেয়তা করবেন।

হাদীসের মর্ম অনুযায়ী রমযান মাস আগমনের পর এ ধূলির ধরায় বৃষ্টির ন্যায় ঘন হয়ে আল্লাহর রহমতের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে। মাছকে যেভাবে পুকুরের পানি ঢেকে রাখে, এ পবিত্র মাসে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে এমনিভাবে তাঁর রহমত দ্বারা ঢেকে ফেলেন। রমযানের প্রথম দশদিন এভাবে রহমত নাজিল হয়। দ্বিতীয় দশদিন নিজ অপরাধের জন্য লজ্জিত হয়ে অনুতাপ -অনুশোচনার সাথে অটুট তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করা হয়। আল্লাহর ফিরিশতারা তার পক্ষ থেকে ডাকতে থাকেন-" কে আছো অপরাধী, তওবা করে গুণাহ মাফ নিয়ে যাও।" রমযানের শেষ দশদিন সম্পূর্ণ মুক্তির দিন। হাদীসে আছে- যথানিয়মে কেউ রোযার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিয়মবিধি মেনে রোযা পালন শেষ করলে, ঈদের দিন যেন সে সদ্য জন্ম-নিষ্পাপ শিশুর মতো হয়ে যায়। রসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "এ মাসে কোনো মুমিন একটি ফরজ আদায় করলে আল্লাহ তাকে সত্তুরটি ফরজের সমান সওয়াব প্রদান করবেন।" এমনিভাবে সহজেই অনুমেয় যে, কেউ একটি নফল কাজ করলে তাকে একটি ফরজ কাজের সওয়াব প্রদান করা হবে।

রোযার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে রোযা রাখা না হলে মানব চরিত্রে তার সুফলসমূহ দেখা দেবে না। কেউ রোযা পালন করছে অপরদিকে মিথ্যাও বলছে, মানুষকে ঠকিয়ে হারামও খাচ্ছে, মাপে কম দিচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম ন্যায্য মূল্যের অধিক রাখছে, দুর্নীতি করছে, মদ ও ব্যভিচারে লিপ্ত রয়েছে, পরের হক নষ্ট করছে, পরচর্চা, পরনারী দর্শন ও অসৎ চিন্তা করছে, নামায তরক করছে, এহেন ব্যক্তির রোযা রাখা না রাখা সমান কথা। রোযার মূল লক্ষ্য তাকওয়ায় (আল্লাহ ভীতিপূর্ণ সাবধানতা, বা পরহেজগারী)। নিজ চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে সে ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্যই মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি রোযা রাখে কিন্তু অবাঞ্ছিত কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়, তার পানাহার ছেড়ে উপোষ করাতে আল্লাহর কোনো দরকার নেই।" মহানবী (সাঃ) আরও ইরশাদ করেছেনঃ "রমযানের শেষ দশদিন একনিবিষ্ট চিত্তে যদি কোনো রোযাদার মসজিদে ই'তেকাফ করে সে যেন দু'টি হজ্ব এবং দু'টি ওমরার সওয়াব অর্জন করলো।"

মাহে রমযানের গোটা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কাজই অধিক সওয়াবের। এই মাসেই একটি রাত রয়েছে, যাকে শবে কদর বলা হয়-এ রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। অর্থাৎ কেউ এ রাতে জেগে এবাদত করলে হাজার রাত জেগে এবাদত করার চাইতেও অধিক সওয়াব পাবে। অবশ্য সেটা যারা সারাবছর শয়তানের অনুগত থেকেছে এবং সওয়াবের আধিক্য দেখে মৌসুমী সওয়াব প্রার্থী সেজেছে, তাদের জন্যে না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ চাকরির বোনাস তো নিয়মিত কর্মচারীরাই পেয়ে থাকে রমযানের রোযার এত কল্যাণকারিতা সত্ত্বেও যারা এর থেকে উপকার ভোগ করতে না পারবে, তাদের চাইতে কপালপোড়া আর কেউ হতে পারে না।

www.pathagar.com

রমযানের আগমন পূর্বে মহানবীর আর একটি অতীব প্রয়োজনীয় হাদীসের প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হযরত কা'ব কর্তৃক হাদীসটি বর্ণিত। একদা রসূল (সাঃ) মসজিদে ইরশাদ করলেন ঃ

তোমরা মিম্বরের নিকটবর্তী হও। আমরা নিকটে গেলাম। হুজুর (সাঃ) মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বললেন-'আমীন' (আল্লাহ! তুমি কবুল করো। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখেও দু'বার আমীন বললেন। খুৎবা শেষে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে হযরত বললেন, এইমাত্র হযরত জিব্রাইল (আঃ) তশরীফ এনেছিলেন-

প্রথম সিঁড়িতে পা রাখতেই তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তির উপর লা'নত যে রমযান মাস পেয়েও নিজের পাপ মাফ করিয়ে নিতে পারেনি। আমি বললাম, 'আমীন ' অর্থ্যাৎ তাই হোক। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখতেই জিব্রাইল বললেন, লা'নত ঐ ব্যক্তির উপর যার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও দরুদ পড়েনি। আমি বললাম 'আমীন'। অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে আমি পা রাখতেই জিব্রাইল বললেন লা'নত ঐ ব্যক্তির উপর, যার সামনে মাতা-পিতা উভয়ই অথবা দু'জনের একজন বার্ধক্যে পৌঁছেছে কিন্তু সে তাদের সেবাকর্মের দ্বারা নিজেকে জান্নাতের যোগ্য করতে পারলো না-উত্তরে আমি বললাম 'আমীন'। বলাবাহুল্য জিব্রাইলের বদদোয়া কারুর প্রতি আল্লাহর লা'নত নাজিল হবার জন্য যথেষ্ট। তারপরও মহানবী (সাঃ) যেখানে 'আমীন' 'আমীন' বলেছেন, সেটার পরিণতি কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে যেন মাহে রমযানের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সুফল লাভের সুযোগ দেন এবং মহানবী যেসব ব্যক্তির ব্যাপারে জিব্রাইলের বদদোয়ার জবাবে 'আমীন' বলেছেন, তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহ তওফীক দিন। আমীন।

রোযাঃ আত্মশুদ্ধির অনুশীলনঃ রোযা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও আত্মশুদ্ধির এক মহান খোদায়ী ব্যবস্থা। চারিত্রিক সকল মহৎ গুণাবলি সৃষ্টির এক বিশেষ অনুশীলন। জীবনের সকল স্তরে খোদায়ী ন্যায় বিধানের উপর ধৈর্য-সহনশীলতার সাথে অটল থাকার একটি প্রশিক্ষণ। যাবতীয় কষ্ট ও প্রতিকূলতার মাঝেও আল্লাহর উপর নির্ভরশীল দৃঢ়চিত্ততার এক নিদর্শন। বল্গাহীন অসৎ প্রবণতা তাড়িত জীবনকে নিয়ন্ত্রণে আনার এ ট্রেনিং। রোযার আরবী শব্দ হলো সওম ও সিয়াম। এর আভিধানিক অর্থ চলমান কিছুর হঠাৎ থেমে যাওয়া। ইসলামের পরিভাষায় সোবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা বা সওম। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের গতি রমযান মাস আসলে থেমে যায়। এ মাসের প্রথম সোবহে সাদিক থেকে মানুষ এক নতুন কর্মসূচি ও নতুন জীবন চেতনার দ্বারা গোটা মাস পরিচালিত হয়। দেহ-মনের সকল অসৎ প্রবণতা ও কামনা- বাসনাকে কড়া নিয়ন্ত্রণে আনে। ষড়রিপুর বাড়াবাড়ি পদে পদে হয় বাধাপ্রাপ্ত। রমযানের সিয়াম সাধনা ইবাদত অনুশীলনের দ্বারা পরিশুদ্ধ আত্মাই আল্লাহর রহমত, বরকত ও মাগফেরাত পাবার যোগ্য।

মানব সমাজে বিরাজমান সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত-কলহ, বিবাদ, হানাহানি, মারামারি-ইত্যাদি অশান্তির মূলে রয়েছে জুলুম—বেইনসাফী। আর বেইনসাফী ও জুলুম-

www.pathagar.com

অন্যায়ের মূল অনুপ্রেরক হলো কলুষিত অন্তর, অপরিশোধিত আত্মা। দুর্নীতি ও পাপপ্রবণ আত্মার পরিশুদ্ধি যতদিন না ঘটবে, মানুষ যেমন তার স্রষ্টার সরল শান্তিপথ পাবে না তেমনি তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই সমাজে পাপাচার, দুর্নীতি, জুলুম—নিপীড়নমূলক কাজের প্রসার ঘটবে। অনৈতিকতা ও সামাজিক অনাচার এহেন আত্মার দ্বারাই প্রশ্রয় পায়। এ থেকেই মানব সমাজে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে। আল্লাহ সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে এ অশান্তির হাত থেকে রক্ষাকল্পেই মানুষের চরিত্রে আল্লাহভীতিপূর্ণ সংযম-সতর্ক সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করেন। সকল খোদায়ী বিধানের লক্ষ্য হচ্ছে খোদাভীতিপূর্ণ সংযমী ও ত্যাগী মনোভাব সৃষ্টি করা, পবিত্র এবং কলুষতামুক্ত আত্মাই আল্লাহর সন্তুটিও নৈকট্যলাভের যোগ্য। আত্মাকে সেভাবে যোগ্য করার জন্যেই তিনি তাঁর অন্যান্য বিধানসহ মানুষের প্রতি সিয়াম সাধনাকে ফরয করেছেন, যথার্থ রোযা পালন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের পূর্ণ অনুসরণ রমযান শেষে একজন রোযাদারকে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী করার জন্যে যথেষ্ট। বলাবাহুল্য, পরিশুদ্ধ আত্মার এসকল মানুষই আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের অনুপম আনন্দ লাভ করবে এবং তাঁর প্রদত্ত পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

রোযা এমন এক খোদায়ী অনুশীলন ব্যবস্থা যে, মানুষের জন্য ইহ-পরকালের কল্যাণবাহী এই ইবাদত সুষ্ঠুভাবে পালিত হবার উপরই এর কল্যাণকারিতা নির্ভরশীল। এ জন্যে যেমন রোযা পালনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রতিটি রোযাদারের স্পষ্ট ধারণা থাকা কর্তব্য, তেমনি এর নিয়মবিধি' সম্পর্কেও অবগতির প্রয়োজন আছে বৈ কি।

রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, "পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় তোমাদের উপরও এটি ফরয করা হলো যেন তোমরা তাকওয়া অর্থাৎ খোদাভীতিপূর্ণ সতর্ক জীবন ধারার অধিকারী হও।" বলা বাহুল্য, ন্যায়- অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতি হালাল-হারাম ইত্যাদির যে সীমারেখা আল্লাহতায়ালা মানুষকে দিয়েছেন, মানুষ আল্লাহর ভয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সেই সীমারেখা মেনে চললেই মোত্তাকী হবে অর্থাৎ সতর্ক ও সাবধানী জীবনের অধিকারী হবে আর এ মুত্তাকীদের জন্যেই বেহেশতের খোশ-খবর দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, "উয়িদ্দাৎ লিল মুত্তাকীন" বেহেশত মোত্তাকীদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে।" রমযানের সিয়াম সাধনা আমরা প্রতিবছরই করে থাকি কিন্তু আমাদের চরিত্রে এর লক্ষ্য তাকওয়া কতদূর আসে, আমরা কতদূর মোত্তাকী বা সংযমী জবিনের অধিকারী হই, না রমযান-পূর্বকালীন তাকওয়া পরিপন্থী ধ্যান-ধারণা ও কার্যধারাই আমাদের চরিত্রে প্রভাবশীল থাকে, তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

কুরআন নাযিলের মাস রমযান শরীফে অন্তত একবার সকল মুমিনের অর্থ সহকারে কুরআন খতম করা উচিত। মূলত কুরআনের শিক্ষা-আদর্শ থেকে মুসলিম সমাজের বিচ্যুতির কারণেই আজ এই জাতির এত দুর্গতি। কুরআন চর্চা ও সে অনুযায়ী জীবন ও চরিত্র গঠন করা না হলে, ইহ-পারলৌকিক জীবনে একজন মানুষের কি কি সর্বনাশ ঘটবে, সে কথা আল্লাহতায়ালা বিভিন্ন উপমা দিয়ে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা

www.pathagar.com

দিয়েছেন। সবচাইতে যেই সর্বনাশটি হবে, তা হলো, কেয়ামতের দিন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর দরবারে কুরআনের প্রতি অমনোযোগিতার অনুসারীদের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে অভিযোগ করবেন যে, ইয়া রাব্বী ! ইন্না কাওমিত্তাখাযূ হাযাল কুরআনা মাহ্জূরা অর্থাৎ "হে প্রতিপালক, আমরা উম্মতের এসব লোক কুরআনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে ছিল।"-তারা এটি শুদ্ধ করে অর্থ বুঝে পড়ার জন্যে সময়—অর্থ ব্যয় করেনি। এর শিক্ষা অনুযায়ী মানোন্নীত নেক কাজ করেনি। আপনার নির্দেশমাফিক এর বাণী অপরের কাছে পৌঁছায়নি। এর অনুশাসনমাফিক সমাজ ও দেশ শাসন করেনি। তাদের বিচার আপনি করুন।

'মৌলবাদে'র 'হুক্কা হুয়া' কারীরা কাদের স্বার্থরক্ষায় নেমেছেন?

[প্রকাশ ঃ ২২. ৩. ২০০১ ইং]

গত বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের একটি আলোচনা সভায় নারায়ণগঞ্জ জেলার ডিসি মোশতাক আহমদ প্রদত্ত একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে কয়েকটি মহল ডিসির তীব্র সমালোচনা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছে। ডিসি তার বক্তব্যে নারীর অধিকার, ফতোয়াবাজ এবং এনজিওদের ভূমিকা নিয়ে কথা বলছিলেন। এতে স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিত্ব তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এই বক্তব্যকে 'ঔদ্ধত্বপূর্ণ' সংবিধান বিরোধী ও আদালত অবমাননার শামিল বলে মন্তব্য করেছেন এবং ডিসির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করেছেন। সমালোচকরা ডিসিকে "মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে-এই ডিসির অধীনে আসন্ন নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না" বলে আশংকা ব্যক্ত করেছেন। এদের মধ্যে দেশের এনজিওদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন এডাবের পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, "নারায়ণগঞ্জের ডিসির বক্তব্য 'মানবাধিকার বিরোধী' এবং তার বক্তব্য দেখে নাকি তাকে 'মৌলবাদী' মনে হয় আর ফতোয়া দানকারী আলেমদের সম্পর্কিত ডিসির বক্তব্যটি নাকি সংবিধান বিরোধী।"

না' গঞ্জের ডিসির বক্তব্যের সমালোচনাকারীদের ব্যবহৃত 'ঔদ্ধত্বপূর্ণ' 'মৌলবাদী' 'মানবাধিকার বিরোধী' 'সংবিধান বিরোধী' ইত্যাদি শব্দাবলী অতীব গুরুগম্ভীর। একটি জেলা প্রধানের বেলায় এসব শব্দ সত্যিই প্রযোজ্য হলে এটা আপত্তিকর বৈ কি। কিন্তু ডিসি প্রকৃতপক্ষে যেসব শব্দ তার বক্তৃতায় বলেছেন, যদি সমালোচকদের ব্যবহৃত শব্দাবলি তার বক্তব্যের বিকৃতিজনিত অর্থের ভিত্তিতে হয় এবং বোধগম্য কোনো কারণে সমালোচকরা তাঁর বিরুদ্ধে অসত্য ও বিকৃত অর্থ প্রকাশ করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার মতলবে এটা করছেন বলে বিবেচিত হয়, তাহলে সেই অপরাধে তারা অপরাধী হিসাবে নিজেকে স্বীকার করে নেয়ার সৎসাহস দেখাতে পারবেন কি?

এই প্রশ্নটি দেখা দিতো না যদি বাস্তবে এমন ধরনের কিছু ব্যাপার না ঘটতো। না' গঞ্জের ডিসির সমালোচনা সম্বলিত বিবৃতির মাঝেই সমালোচকরা ডিসির বক্তব্যটিও

www.pathagar.com

উদ্ধৃত করেছেন। যাতে কিছুতেই তার বক্তব্যকে 'ঔদ্ধত্বপূর্ণ' 'সংবিধান বিরোধী' ও 'মৌলবাদী' বলে আখ্যায়িত করার কোনো উপায় নেই। ডিসির বক্তব্যটি হচ্ছে নিম্নরূপ, যেমন-

"পর্দায় থাকলেই নারীর ইজ্জত বাড়বে। এনজিওরা ফতোয়াবাজদের (ফতোয়া দানকারী আলেমদের) বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কথা বলে নারী সমাজকে বিপথগামী করতে চাইছে এবং এদেশকে থাইল্যান্ডের মতো যৌননগরী বানানোর পাঁয়তারায় লিপ্ত আছে।"

সমালোচকদের উদ্ধৃত ডিসির বক্তব্যের ভাষা ও শব্দাবলীতে এমন কোন্ শব্দটি রয়েছে যাদ্বারা তার 'ঔদ্ধত্যে'র প্রমাণ পাওয়া যায় কিংবা তিনি 'মৌলবাদী' 'মানবতা বিরোধী' কিংবা তাঁর বক্তব্য 'দেশের সংবিধান বিরোধী' বলে প্রমাণিত হয়? তার পরও তারা ধর্মীয় মহলকে কেন মৌলবাদী বলে? আসলে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের কুৎসা গাওয়ার জন্যেই তারা ইসলামে আন্তর্জাতিক বৈরি শক্তিগুলোর ব্যবহৃত এ শব্দটি ব্যবহার করে, কারণ, ওরা একশ্রেণীর খৃস্টান যাজককে এ শব্দে আখ্যায়িত করতো। এদেশে সরাসরি ইসলামের সমালোচনায় ভয় আছে বলেই তারা ঐ শব্দটির আশ্রয় নিয়েছে। ডিসির বক্তব্য বলে উদ্ধৃত বাক্যগুলোর প্রতি নজর করলে যে কোনো পাঠক একথাই বলতে বাধ্য হবেন যে, তিনি নারী জাতির ইসলামপ্রদত্ত মর্যাদার কথা বলেছেন এবং মুসলিম নারীদের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা (নামায-রোযা ইত্যাদি) আনুষ্ঠানিক ফরয ইবাদতের মতো পর্দা করাকেও যে ফরয করেছেন, সেই পর্দা পালনের উপকারিতাই তিনি বর্ণনা করেছেন। কারণ নারীরা পর্দা করার মতো ফরয ইবাদতটি ত্যাগ করে পুরুষদের সামনে নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে বেড়ালে বা অবাধ মেলামেশা করলে তাতে সমাজে নারীঘটিত অপরাধ প্রবণতা, নারী নির্যাতন ও যৌন অনাচারই বৃদ্ধি পায়। প্রসার পায় সমাজে পাশবিকতা। বৃদ্ধি পায় নারী দুর্গতি। এরই বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো পশ্চিমী বেপর্দা সমাজ, যদ্দরুন আজ সেখানে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রকোপ বেড়েছে প্রাণঘাতী ব্যাধি এইডস রোগের। বেপর্দার পরিণতি স্বরূপ সামাজিক অপরাধপ্রবণতা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, আমাদের সমাজের বাস্তব অবস্থাও তার কিছুটা প্রমাণ দেয়। প্রতিদিনকার সংবাদপত্রে দেশের কোনো না কোনো এলাকায় নারী নির্যাতন, নারী অপহরণ, যৌন কেলেংকারি, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি মানবতা বিরোধী কাজ সংঘটিত হচ্ছে। এমনকি এ থেকে অনেক বড় বড় পরিবারেও মান ও সম্ভ্রমহানির অনেক ঘটনাই প্রায়ই ঘটতে দেখা যাচ্ছে। একে তো দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মীয় ও নৈতিকতার শিক্ষা বিবর্জিত, অধিকন্তু দেশের বিভিন্ন প্রচার বাহনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলোতে যৌন সুড়সুড়ি দানমূলক অনুষ্ঠানাদি সামাজিক, নৈতিক সকল মূল্যবোধই ধ্বংস করে দিচ্ছে। বৃদ্ধি করে চলেছে যৌন ও অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা। এই পরিস্থিতিতে দেশের কোনো জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে নারীঘটিত এহেন সামাজিক অপরাধের অন্যতম মূল কারণ পর্দাহীনতা পরিহার করে সমাজের কিশোরী -যুবতীদের প্রাণ ও সম্ভ্রম রক্ষার পথনির্দেশনা দানই স্বাভাবিক। তাঁর এটা একটা অন্যতম কর্তব্য। সামাজিক পবিত্রতা বজায় রাখার উপায় এটাই। এর

www.pathagar.com

কার্যকারিতার বড় প্রমাণ হলো আজকের ইসলামী ইরান। সেখানে মরহুম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সংঘঠিত হবার আগে শাহের আমলে বেপর্দাজনিত কারণে যৌন অনাচার এতো অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, তেহরানকে একসময় দ্বিতীয় প্যারিস বলে আখ্যায়িত করা হতো। কিন্তু' ৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর সকল মহিলা পর্দা পালন শুরু করলে সেখানকার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা সেদেশে সংবাদপত্র অফিসসহ সরকারি—আধাসরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে পর্দাসহকারেই কাজ করছে। বিভিন্ন বাহিনীতেও পর্দাধারী মহিলা রয়েছে, যারা পর্দা পরেই আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার করছে। এমনকি ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানের যেসব ছায়াছবি, নাটক বিশ্বময় ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে চলেছে, সেসব ছায়াছবি, নাটকে অভিনেত্রীরাও পর্দা রক্ষা করেই তাদের পেশাগত শৈল্পিক মান বজায় রেখে সম্মান ও প্রশংসা অর্জন করছেন। তাই আমাদের কাছে এই প্রশ্ন আরও অধিক প্রকট হয়ে উঠে যে, নারায়ণগঞ্জের ডিসি 'পর্দায় নারীদের মর্যাদা বাড়ে' এই মন্তব্য করে কি অপরাধটি করলেন? যদ্দরুন দেশের এনজিওদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান এডাবের পরিচালক শামসুল হুদা গংরা মাত্রাতিরিক্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন এবং ডিসিকে 'মৌলবাদী' 'মানবতা বিরোধী', 'সংবিধান বিরোধী' আখ্যায়িত করে তাঁকে চাকরিচ্যুত ও তাঁর শাস্তি দানের পর্যন্ত দাবী করে বসেছেন। আমাদের ধারণা, এডাবের পরিচালক শামসুল হুদা গংদের রুষ্ট হবার কারণ হলো-ডিসি কেন এনজিওগুলোর সমালোচনা করে বললেন যে, "এনজিওরা ফতওয়া দানকারী আলেমদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার আহ্বান জানিয়ে নারী সমাজকে বিপথগামী করতে চাইছে এবং এ দেশকে থাইল্যান্ডের মতো যৌননগরী বানানোর পাঁয়তারায় লিপ্ত হয়েছে।" ডিসির প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার মতো কঠোর শব্দ ব্যবহারের কারণ এটিই।

ডিসি যে একথাটি অসত্য বলেননি-এজিওদের সংগঠন এডাবের পরিচালক কর্তৃক ডিসির বক্তব্যের কদর্থ করাই তার প্রমাণ।

'মৌলবাদ' ও 'মৌলবাদী'র তাত্ত্বিক আলোচনায় শব্দ দু'টির অর্থ যাই হোক, এখানকার আঙ্গুলেগণা কতিপয়-ইসলাম বিরোধী ব্যক্তি পত্র-পত্রিকার সুযোগ পেয়ে এ দুটি শব্দ তারা মূলত ইসলাম ও ইসলামপন্থী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বেলায়ই ব্যবহার করে থাকে। বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি, আইনজীবী, অধ্যাপক, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, সরকারী আমলা, রাজনীতিক, সামরিক অফিসার, পুলিশ প্রধান যে কেউ ইসলামের কথা বলবে, তাদের দৃষ্টিতে সেই মৌলবাদী। এক্ষেত্রেও একই অর্থে ডিসি মৌলবাদী। তাদের সমালোচনায় উল্লেখিত ডিসি বিরোধী বক্তব্য ও ব্যবহৃত শব্দাবলীর নির্গলিত অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এনজিও সংগঠন এডাবের পরিচালক ও তাঁর সমমনারা মৌলবাদের উল্লেখিত অর্থে নিজেরাই নিজেদেরকে ইসলাম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঘোর দুশমন ও মুসলিম নারীদের জন্যে আল্লাহর ফরযকৃত অন্যতম ইবাদত পর্দার সম্পূর্ণ বিরোধী বলে প্রমাণ দিলেন। আর যারা ইসলাম ও পর্দা করার কথা বলবে এমনকি পর্দাহীনতার দ্বারা যৌন অনাচারের ন্যায় পাপ- পঙ্কিলতার যারা সমালোচনা

www.pathagar.com

করবে, তারা 'মানবতা বিরোধী' 'অবিশ্বস্ত' ও ফতোয়াবাজ এবং দেশের 'সংবিধান বিরোধী'। অধিকন্তু তারা সরকারি দায়িত্বে থাকার অনুপযোগী। তাই পর্দার প্রশংসাকারী উক্ত ডিসিসহ এ শ্রেণীর লোককে দেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় কোনো ক্ষমতায় রাখা যায় না।

বলাবাহুল্য, যারা কথায় কথায় এভাবে পরের মুখে ঝাল খেয়ে নিজ দেশের পবিত্র ধর্ম ও খাঁটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সমালোচনা করে এবং বিদেশী প্রভুদের অনুগত দাস হিসাবেই নিজেদেরকে প্রমাণিত করে, তাদের আসল পরিচয় এখনও দেশের বৃহত্তর তওহিদী জনগোষ্ঠী টের পায়নি এবং 'মৌলবাদ' ও 'মৌলবাদী' বলে তারা যে ইসলাম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরই কুৎসা রটনা করেন, তাদের সেই পরিচয়ও দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণের কাছে এখনও অস্পষ্ট। অন্যথায় সমাজের আঙ্গুলেগণা এই চক্রটি কিছুতেই সরকার ও একশ্রেণীর সংবাদপত্রের প্রশ্রয়ে এতো উল্লম্ফনের সুযোগ পেতো না। বরং নিজেরাই মানবতা বিরোধী, সংবিধান বিরোধী এবং ইসলামী নামের আড়ালে অবস্থানকারী অবিশ্বস্ত ও 'মুরদাত' রূপে চিহ্নিত হয়ে যেতো।

এনজিওসমূহের কাজ হলো সমাজের সেবামূলক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত থাকা। কিন্তু তারা আমাদের দেশের রাজনীতিতে নাকগলানোর অনধিকার চর্চা করছে এবং ফতোয়াবাজের নামে আলেমদের ধর্মীয় ব্যাপারে বক্তব্য দানকে বেআইনী করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। মৌলবাদ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারের আড়ালে ইসলাম, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ ও আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে এদেশ থেকে আল্লাহর দ্বীন ও আলেমদের প্রভাব মুছে ফেলার জন্যে প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাচ্ছে। তাদের এসব অপকর্ম মূলত বাংলাদেশের ১৩ কোটি মুসলমানের প্রাণশক্তির বিরুদ্ধেই এক মস্তবড় ষড়যন্ত্র। তাই আমরা বলতে চাই, এনজিওদের এই জঘন্য পরিচয় দেশের ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের কাছে আরও ভালোভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ার আগেই সময় থাকতে এদেশ থেকে তাদের আপন তল্পী- তল্পা গুটিয়ে ফেলা উচিত।

তালেবানদের মূর্তি ধ্বংসের প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

[প্রকাশ ঃ ১৫. ৩. ২০০১ ইং]

এই পৃথিবীতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন জাতির বাস। প্রতিটি জাতির জীবনবোধ, জীবনাদর্শ কৃষ্টি সংস্কৃতি আলাদা। তারা নিজ সেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি নিয়েই আপন জাতিসত্তা নিয়ে বাঁচতে চায়। বিভিন্ন জাতির জীবন-চেতনা ও পরিচিতিগত এই পার্থক্যও এমন যে, অনেক ক্ষেত্রে এক জাতি যেই বিশ্বাস ও জীবন দর্শনকে নিজের জাতীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে রক্ষা কবজ বলে মনে করে, অপর জাতি সেটাকে তার অস্তিত্বের জন্যে মনে করে হুমকি। যেমন, খৃস্টান ধর্মে ত্রিত্ববাদ এবং মুসলিম ধর্মে তওহীদ বা একত্ববাদ, আবার হিন্দু ধর্মে বহুত্ববাদী পৌত্তলিকতাবাদ। তিনটিই পরস্পর বিরোধী। অন্যান্য ধর্মের বেলায়ও একই কথা

www.pathagar.com

প্রযোজ্য। তাই এক জাতির ধর্ম বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও চিন্তা-দর্শনের চশমা দিয়ে অপর জাতিকে দেখলে চলবে না, তা হলে এটা পরোক্ষে সংশ্লিষ্ট জাতিসত্তার অস্তিত্বের ব্যাপারেই প্রশ্ন তোলা হয়। যেমন, মুসলিম জাতির ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তিই হলো তওহীদ তথা মহা স্রষ্টা আল্লাহকে একক সত্তা রূপে জ্ঞান করা। সেই সত্তার সাথে অপর কাউকে শরিক করা এমনকি এই ধারণাটাই হচ্ছে ইসলামে মহাপাপ। মুসলমানদের মনে মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকার কারণ এটাই। এই ঈমান ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই যখন মুসলিম জাতির অভ্যুদয় ঘটে, তখন নিরাকার আল্লাহর পরিবর্তে সাকারের উপাস্য দেবতা মূর্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। আল্লাহর ঘর বায়তুল্লায় রক্ষিত ৩৬০ টি মূর্তি ধ্বংস করে ফেলা হয়। তবে তাই বলে অপরের অধিকারে রক্ষিত তাদের পূজ্য বস্তুকে ধ্বংস বা তার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন কিংবা সেগুলোকে কোনো গালমন্দ দেয়াকে খোদ আল্লাহ এবং তাঁর রসূল কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। মুসলিম জাতি দীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে যেখানেই তারা ক্ষমতায় ছিল ও আছে এ নীতিই মেনে চলে আসছে। তারা নিজেদের ঘরে ও মুসলিম আওতায় মূর্তি বিরোধী হলেও অপরের মন্দির বা অধিকারে রক্ষিত মূর্তি ধ্বংস না করা ও এর পূজারীদের ধর্মীয় কাজে বাধা না দেয়ার নীতিই অনুসরণ করে আসছে। আফগানিস্তানে মূর্তি ভাঙ্গার প্রশ্নে কোনো কোনো মুসলিম বিশেষজ্ঞের আপত্তির কারণ ও এটাই।

ইসলাম ধর্মে যেখানে মূর্তি সম্পর্কিত ধারণা এই, সেক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত হিন্দু ধর্মে এ সমাজের লোকেরা নিজ পৌত্তলিকতাবাদকে আপন জাতিসত্তার অস্তিত্ব বজায় রাখা, এর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বোচ্চে তুলে ধরতেই সচেষ্ট। যীশু খৃস্টের অনুসারী ত্রিত্ববাদী খৃস্টান সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই নিজেদের জাতীয় রীতিনীতি পালন করে। যীশু খৃস্টের অনুসারী এই সম্প্রদায়ের সাথে হিন্দু মুসলিম পরস্পর বিরোধী এই উভয় সম্প্রদায়ের কারুরই বিশ্বাসগত কোনো মিল নেই। ফলে এক জাতির কাছে যা পূজ্য সম্মানীয়, অপর জাতির কাছে তা বর্জনীয় ও পারিত্যাজ্য,- যদিও প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্ম, ইতিহাস - ঐতিহ্য, কৃষ্টি—সংস্কৃতি ও এর নিদর্শনসমূহ ধরে রাখতে সচেষ্ট এবং এই পরিচিতিকেই বিশ্বময় তুলে ধরতে সদা যত্নবান। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি- গোষ্ঠীর বিশ্বাসগত এই মৌলিক ভেদ-বৈষম্য যথাস্থানে বজায় রেখেই মানুষ এই পৃথিবীতে আবহমানকাল থেকে সহাবস্থান করে আসছে। পরিচিতিগত শত ভেদ-বৈষম্য ও বিভিন্নতার এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের পথ রচনা করে তারা বিশ্ব সংস্থা- জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। কিন্তু তাই বলে এসব জাতির কোনো একটি কিংবা একাধিক নিজেদের শক্তিমত্তা ও প্রভাববশত আপন মত ও পছন্দকেই অপর জাতির উপর চাপিয়ে দেয়ার এবং তার নিজস্ব বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই। সাম্প্রতিককালে এসব কিছু বিষয় নিয়ে বিশ্বময় হৈ চৈ করা হচ্ছে। যাতে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে তার স্বীকৃত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার শামিল। এক্ষেত্রে আফগানিস্তানের বর্তমান তালেবান সরকার কর্তৃক প্রাচীন ধ্বংস প্রায় একটি বুদ্ধমূর্তি ভাঙ্গার বিষয় এবং বিশ্বময় তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেই বলতে চাই। বিভিন্ন জাতি-

www.pathagar.com

গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাসের পরস্পর বিরোধী এই বাস্তবতা যা উপরে বর্ণিত হলো, তার আলোকে বিচার করলে মুসলিম প্রধান আফগান সরকারের একাজকে "জঘন্যতম, মানবতা বিরোধী" ইত্যাদি ভাষায় আখ্যায়িত করার তেমন অবকাশ থাকে বলে মনে হয় না। তার প্রথম কারণ তো হলো এই যে, মূর্তি ভাঙ্গা ও অপর ধর্মের ধর্মীয় অধিকার হরণ এক কথা নয়। উদ্দেশ্যমূলকভাবে উভয়কে গুলিয়ে ফেলা কিছুতেই সঙ্গত নয়। কোথাও কোন মুসলিম সমাজে মূর্তির মালিক বা তার পূজারীদের অস্তিত্ব না থাকলে সেখানে এ স্মৃতি নিদর্শন বজায় রেখে পুরাতন শির্ক ও জাহিলিয়াতের দিকে উক্ত সমাজের ভবিষ্যৎ মুসলিম বংশধরদেরকে মূর্তিপূজার দিকে যাবার সুযোগ করে দেয়া অন্য জাতির জন্যে সম্ভব হলেও মুসলমানদের জন্যে তা অকল্পনীয়। ধ্বংস প্রায় প্রাচীন বুদ্ধ মূর্তিটি-লা-ওয়ারিশ। সে দেশে বর্তমানে এর কোনো পূজারী বা মালিক নেই। দ্বিতীয়ত এ ব্যাপারে সবচাইতে বড় কথাটি হলো, মহান গৌতম বুদ্ধ নিজে মূর্তিপূজক ছিলেন না। তিনি পসন্দ করতেন না। মায়ের চাইতে মাসীর দরদ বেশি হওয়া তো উচিত নয়।

যারা আজ তালেবান কর্তৃক বুদ্ধমূর্তি ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন, বিশেষ করে অন্যের কথা যাইহোক বুদ্ধমূর্তির জন্যে ভারতের মায়াকান্নায় ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত যে কোনো মানুষের হাসির উদ্রেক না করে পারে না। কারণ, ইতিহাস সাক্ষী, এই দেশে দীর্ঘ বৌদ্ধ শাসনের অবসান পর্বে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অভ্যুদ্বয় ঘটে। তারাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর অমানুষিক জুলম—নিপীড়ন চালিয়ে তাদেরকে এদেশ ছাড়া করেছে। আজকের বাংলাদেশ পুরাকালে তিনটি স্বতন্ত্র নামে পরিচিতি ছিল। (১) উত্তরাঞ্চল-বরেন্দ্র (পৌন্ড্র বর্ধন ও গৌড় এলাকাকে বলা হতো)। (২) দক্ষিণে নিম্নভূমি অঞ্চল-বঙ্গ। এই নাম থেকেই পরবর্তীকালে সমগ্র ভূখণ্ডের নামকরণ করা হয়। (৩) মেঘনার পূর্ববর্তী এলাকা-কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম সমতট নামে, পরিচিত ছিল। বিখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং বরেন্দ্র, বঙ্গ এবং সমতট অঞ্চল সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন। ৩২০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে বিখ্যাত গুপ্ত বংশীয় সাম্রাজ্যের অধিকারী দেশের এই সুদূর পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে বলে জানা যায়। গুপ্ত শাসকরা বৌদ্ধ ছিলেন। তাদের আমলে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বেশি ছিল। এই সময়ই সম্রাট হর্ষবর্ধনের শাসনামলে শশাঙ্ক নামক গোড়া হিন্দু রাজার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বৌদ্ধ শাসক সম্রাট হর্ষবর্ধনের বিরোধিতায় শশাংক-উঠেপড়ে লাগে। রাজা শশাঙ্কের শাসনামলেই বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর অমানুষিক জুলুম অত্যাচার চালোনো হয়। অতঃপর ৭৭০ খৃস্টাব্দে গৌড়ের শাসন কর্তৃত্বে আসেন বৌদ্ধ ধর্মপ্রিয় রাজা ধর্মপাল। তাঁর আমলেই পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধবিহার স্তূপ ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮১০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর শাসন চলে। এই এলাকায় পালেরা ২শ' বছর পর্যন্ত রাজত্ব করার পর শশাঙ্কের ন্যায় ঘোর বৌদ্ধ ধর্মবিরোধী সেন বংশীয় হিন্দু রাজত্বের সূচনা হয়। তারা হিন্দু ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার নামে কৌলিন্য প্রথা চালু করেন। যার শিকার হয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এবং পরে মুসলমানরাও। তাই ইসলামের কট্টর অনুসারী তালেবানদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে আজ সেই শাসকদেরই উত্তরসূরীরা যখন বৌদ্ধ মূর্তির জন্য কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করেন, তখন সত্যিই হাসি পায় বৈ কি।

অপরের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করার অধিকার সকল ধর্মের লোকদেরই আছে। বিশেষ করে নিজ কর্তৃত্বের পরিমণ্ডলে। কারণ, কোনো খাঁটি একত্যবাদী মুসলিম কিছুতেই তওহীদী বিশ্বাস বিরোধী মূর্তি নিজ ঘরে নিজ স্বাধীন পরিমণ্ডলে রাখতে পারে না, এটা তার ধর্ম বিরোধী। তেমনি অপরের ঘরে অপরের স্বাধীন পরিমণ্ডল বা তার ধর্ম ঘরে রক্ষিত পূজামূর্তি ভাঙ্গাও উক্ত মুসলমানের জন্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে অপরাধ। যারা এ নিয়ে হৈ চৈ করেন, তাদের মধ্যে এই তারতম্যবোধের চাইতে সম্ভবত অন্য কিছুই কাজ করছে। নতুবা তাদের মধ্যে বাবরী মসজিদের ন্যায় ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ার চাইতে বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙ্গার প্রতিক্রিয়া তীব্র আকার ধারণ করতো না। ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাইলী বর্বরতার চাইতে পুরাতন, অর্ধভাঙ্গা মূর্তি ধ্বংস করা কি করে চরম মানবতা বিরোধী হতে পারে? সে সময় জাতিসংঘের এই তড়িত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কোনো মুসলমান নিজ ধর্মবিশ্বাস বিরোধী মূর্তি রাখলে, সেটা তার ধর্ম ত্যাগেরই নামান্তর হবে। কিন্তু একই কাজ কোনো মুসলমান মন্দিরে ও গীর্জায় গিয়ে করলে হবে অপরাধ। এই নীতির অনুসারী তালেবানদেরকে সমালোচকদের এভাবে মূল্যায়ন সঙ্গত নয়।

আফগানিস্তানের বেলায় সেখানকার নেতাদের কথা থেকে জানা যায় যে, সে দেশের হিন্দু, খৃস্টান সকলেই তাদের ধর্মীয় অধিকার পুরো মাত্রায় ভোগ করছে। তাদের উপাসনালয়সমূহ যেমন বহাল তবিয়তে রয়েছে এবং সেগুলোতে ধর্মকর্মে বাধা দেয়া হয় না। অদ্রূপ তাদের তত্ত্বাবধানে যেসব মন্দির গীর্জা আছে, সেখানেও রয়েছে বিভিন্ন মূর্তি। ধর্মীয় নিষেধ মান্য করে বলেই তালেবানদের তরফ থেকে সেগুলোতে কোনো হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। শুধু সরকারী কর্তৃত্বাধীন রক্ষিত পরিত্যক্ত মূর্তিগুলোই ধর্মীয় কারণে ভাঙ্গা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতিক ভারতের প্রভাবশালী পত্রিকা "আউট লুক"-এ যেই ইন্টারভিউ দিয়েছেন, তার বক্তব্যের মধ্য দিয়েও হুবহু মূর্তি ভাঙ্গা সংক্রান্ত এই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ ঘটেছে। মূর্তি ও তা ধ্বংস করা, আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নে তালেবান নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি যে কি, সেটা ইতিপূর্বে নানানভাবে জানা গেছে। ভারতের প্রভাবশালী সাময়িকী "আউট লুক"-এর সাথে এক সাক্ষাতকারে আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা ওয়াকিল আহমদ মুতাওয়াক্কিলকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে,— "আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের অঙ্গীকার করেও তালেবান কর্তৃপক্ষ তার বরখেলাফ করে হঠাৎ প্রাচীন নিদর্শনগুলো ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আপনার নিকট এর কি ব্যাখ্যা রয়েছে?

আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জবাবে বলেন, "আসলে আপনি যেভাবে বলছেন, সেভাবে হুট করে মূর্তি ভাঙ্গার কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। যথেষ্ট আলাপ- আলোচনার পরই এ

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আফগান সংস্কৃতি ও জাদুঘর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা আমাদের সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিলো যে, মূর্তিগুলো জাদুঘরে প্রদর্শন করা হবে কি না? কিছু মূর্তি অবশ্য ইতিমধ্যেই জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আর ও কিছু মূর্তি চোরাচালানকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তালেবান সরকারের শীর্ষনেতা মোল্লা মুহাম্মদ ওমর ওলামা কমিটি (ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের কমিটি)-এর সঙ্গে এক বৈঠকে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ওলামা মজলিসে ব্যাপক আলোচনার পরই এ মর্মে ফতওয়া জারি করা হয় যে, সকল মূর্তি অবশ্যই ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এরপরই মোল্লা ওমর জনগণকে তার ফতওয়া সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে শিগ্গির ফতওয়া কার্যকর করতে নির্দেশ দেন।

"তবে আফগানিস্তানে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে বিদেশী প্রত্নতত্ত্ববিদ বিশেষজ্ঞ এবং দাতাদের আগে যেভাবে আমরা সহযোগিতা দিয়েছি ভবিষ্যতেও সে ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাব।" আউট লুক প্রতিনিধি যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, "মুসলমানরা তো বৌদ্ধ ধর্মের পূজা করে না, কিভাবে সে ধর্মের নিদর্শনগুলো ইসলামের ক্ষতি করবে?" তার জবাবে আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "বামিয়ান প্রদেশের বুদ্ধ মূর্তিগুলোসহ দেশের অন্য মূর্তিগুলোকে এই মুহূর্তে পূজা করা হচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ভবিষ্যতে এ সম্ভাবনাকে তো উড়িয়ে দেয়া যায় না। আফগানিস্তানের মতো একটি মুসলিম দেশে এমনটি হবে সেটা কখনই আমরা চাই না। তাছাড়া সকল বিষয় বিচার-বিবেচনা করেই ইসলামী বিশেষজ্ঞরা মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার ফতওয়া জারি করেছেন।" ভারতীয় ও গ্রিক নিদর্শনসহ অন্য নিদর্শনগুলোর পরিণতি সম্পর্কে আউট লুক প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "কোন সুনির্দিষ্ট নিদর্শনের প্রশ্ন উঠে না। আমরা বলিনি যে, বুদ্ধমূর্তিগুলো ধ্বংস করা হবে আর অন্য মূর্তি ধ্বংস করা হবে না। ফতওয়ায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, মানুষের তৈরি যে কোন মূর্তি ধ্বংস করা হবে। কারণ, পৃথিবীতে আল্লাহরই ইবাদত করা যায়, অন্য কারও নয়। আমরা কোন নির্দিষ্ট ধর্ম, জাতি কিংবা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নই; আফগানিস্তানে হিন্দু এবং শিখরা স্বাধীনভাবেই তাদের ধর্ম চর্চা করছে।"

অতঃপর আউটলুক প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন আফগানিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে তালেবান কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নীতি সম্পর্কে। এর জবাবে আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা ওয়াকিল আহমদ মুতাওয়াক্কিল বলেন,-"আফগানিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আগে যেমন নিজ ধর্ম চর্চা করেছে, ঠিক তেমনিভাবে এখনও করছে। যেসব হিন্দু ও শিখ আফগানিস্তানে বসবাস করছে, তাদের জিজ্ঞাসা করলেই তারা জানাবে যে, তালেবান শাসনের অধীনে তাদের জীবন কেমন যাচ্ছে। আমরা হিন্দু ও শিখ ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। ইসলামী আইন অনুযায়ীই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।"

সর্বশেষ প্রশ্নে আউটলুকের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, "আপনারা এখন যা করছেন, সেভাবে অন্যান্য দেশে যদি আপনাদের মসজিদ এবং মাজার ধ্বংস করা হয় তাহলে কেমন হবে?" এ প্রশ্নের জবাবে আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোল্লা ওয়াকিল আহমদ

www.pathagar.com

মুতাওয়াক্কিল বলেন,-"আমরা তো কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা করিনি। অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে হিন্দু উগ্রবাদীরা একই স্থানে মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। আমরা তো কোন উপাসনালয় ধ্বংস করার মতো কোন কাজ করিনি। মূর্তি রাখা ও পূজা করা অনৈসলামিক বলেই একটি সার্বভৌম মুসলিম দেশ হিসাবে এগুলো ধ্বংস করার অধিকার আমাদের রয়েছে।"

আসল কথা এটাই। আফগানিস্তানে যে মূর্তিগুলো ধ্বংস করা হয়েছে, সেগুলো কোন বৌদ্ধ উপসনালয়ের নয় কিংবা তাদের অধিকারভুক্ত বা নিয়ন্ত্রিত কোন মূর্তি নয়। আর পুরাকীর্তি হিসাবে সংরক্ষণযোগ্য কিনা তা বলার ও বুঝাবার দায়িত্ব ছিল জাতিসংঘের, কিন্তু যথাসময়ে তা তারা করেনি।

তবে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারে মূর্তি ধ্বংসের এ কার্যক্রম হাতে নেবার বিষয়টি নিয়ে আরও ভাবা উচিত ছিল। দেশীয় আলেমদের মতামতের ভিত্তিতে তারা এটা করেছেন, ইসলাম-বিশেষজ্ঞদের আরও মতামত তারা নিতে পারতেন। ও আইসি'র ইসলামী বিশেষজ্ঞেরা সেখানে গেছেন। তারা এভাবে বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংস করতে না করছেন। তাদের এই মতামত শুরুতেও নেয়া যেত।

একটা কথা তালেবান সরকারসহ সকলের ভালোভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, আজ সময়টা ইতিবাচক কাজের, নেতিবাচক কাজের নয়। মুসলিম শাসনের দেড় হাজার বছর ধরে বৌদ্ধ মূর্তি সেখানে আছে, এখন তা ধ্বংসের প্রয়োজন কি একবারেই অপরিহার্য ছিল?

নমরূদী স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ইব্রাহিমী ত্যাগ, চেতনা সৃষ্টিই কুরবানীর লক্ষ্য

[প্রকাশ ঃ ১৭. ১২. ২০০৩ ইং]

আল্লাহর ইচ্ছার সামনে ত্যাগ ও নিবেদিত প্রাণের স্মৃতি বিজড়িত কুরবানীর ঈদ উদযাপিত হয় বিশ্ব মুসলিমের ঘরে ঘরে। কুরবত শব্দ থেকে কুরবানী। কুরবত অর্থ নৈকট্য। পশু যবেহর মধ্যদিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা হয় বলেই একে কুরবানী বলা হয়। আল্লাহর নির্দেশকে ইব্রাহীম (আঃ) অধিক গুরুত্ব দেন, নাকি তাঁর কাছে নিজের সন্তানের মমতাই বড়; এ পরীক্ষা নেয়ার জন্যে আল্লাহতায়ালা তাঁর (ইব্রাহীম) প্রিয় পুত্রকে আল্লাহর নামে যবেহ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) সেই ঈমানী পরীক্ষায় যথাযথ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি পুত্রের গলায় চালিয়েছিলেন ধারালো ছুরি।

আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিলো অন্যত্র। ইব্রাহীমের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে বধ করা আল্লাহর ইচ্ছা নয়-তিনি ইব্রাহীম (আঃ) থেকে যা চেয়েছিলেন তা পেয়ে গেছেন। তাই ধারালো ছুরির কর্তন-শক্তি তিনি রহিত করে দিলেন। ছুরি ইসমাইলের একটি পশমও

www.pathagar.com

কাটলো না। হযরত ইব্রাহীমকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বললেন, তোমার ঈমানের পরীক্ষা হয়ে গেছে তুমি সফল। তুমি ঈমানী দাবীর সত্যতার প্রমাণ দিয়েছো।

তবে মানব ইতিহাসে আল্লাহর এহেন একটি কঠোর নির্দেশ পালনের এতো বড় ত্যাগের ঘটনা এভাবে কালের স্রোতে ভেসে যাবে এটা আল্লাহ চাননি। তিনি এ ঘটনাকে পরবর্তীদের জন্যে আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে ত্যাগের প্রেরণা হিসাবে চিরস্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। যুগে যুগে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালন করে যাতে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সে ব্যাপারে তিনি তাঁর জন্যে ত্যাগের এ ঘটনাকে অনুপ্রেরক করে রাখলেন। এর বিকল্প হিসেবে প্রতীকী ব্যবস্থাস্বরূপ পশু কুরবানীর নির্দেশ দিলেন। এখন পুত্র নয় পশু কুরবানীর মধ্য দিয়ে হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের ত্যাগের শিক্ষাকে স্মরণ করে কেউ নিজ জীবন ও চরিত্রকে আল্লাহর অনুগত করে গড়ে তুলতে পারলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের দ্বার তার জন্যে উন্মুক্ত। তা না করে শুধু গোশত খাবার ইচ্ছা কিংবা আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা সেটা অর্জন সম্ভব হবে না।

কুরবানীর মূল ইতিহাস সৃষ্টিকারী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঈমানী দৃঢ়তা ও সংগ্রামী ভূমিকা যেনো কুরবানীদাতা ভুলে না যায় সে জন্য পবিত্র কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে, "তোমরা ইব্রাহীমের আদর্শের অনুসরণ করো।" যার নির্গলিত অর্থ দাঁড়ায়, কুরবানী অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ইব্রাহীমের গোটা সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিমন্থন করো। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে তিনি যেই ইস্পাত কঠিন মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও ন্যায়ের ওপর অটল থেকেছেন, তোমাদেরও একই ভূমিকা নিতে হবে।

কুরবানীর পশু মোটা-তাজা ও সুদর্শন হওয়া উচিত। হাদীসে এর মাধ্যমে পুলসিরাত পার হবার যে কথাটি বলা হয়েছে, সেটি আসলে রূপক অর্থে অর্থাৎ কুরবানীর অনুষ্ঠান থেকে লব্ধ শিক্ষা ও সে অনুযায়ী নিজের জীবন ও চরিত্র গঠনের দ্বারা সহজ পন্থায় পুলসিরাত পার হবার ব্যবস্থা হবে। কুরবানীর ক্ষেত্রে অধিক মূল্যের পশু হওয়া ইত্যাদি কিছুর মধ্যদিয়ে আসলে বিষয়টির প্রতি কুরবানীদাতার হৃদয়ের গুরুত্বের প্রতিই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অন্যথায় যাদের কুরবানীর পশু ছোট যেমন কেউ খাসি কুরবানী দিয়েছে, তাহলে কি তার ওপর গরু কুরবানীদাতারা অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়ে গেল? আর যদি ঐ পশুই পুলসিরাত পার হবার বাহন হবে, তাহলে একটির উপর সাত শরীকদার সওয়ার হবার স্থান কোথায়? এছাড়া যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, তাহলে তাদের পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে যাবার উপায় কি? তাই ঐ মর্মে যে হাদীস রয়েছে সেটিকে রূপক অর্থে ধরতে হবে। আসল কথা হচ্ছে তাই যা ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হলো। আল্লাহতায়ালার কাছে পশুটিই যে বড় কথা নয়, তার বড় প্রমাণ হলো তিনি ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহর কাছে কুরবানীর গোশত, রক্ত কিছুই পৌছুবে না- পৌছুবে শুধু কুরবানী থেকে লব্ধ তাকওয়া।" অর্থাৎ তাকওয়ামন্ডিত চরিত্রের চিন্তা কর্ম। (সূরা হাজ্ব)

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্তার ফলেই ইব্রাহীম (আঃ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় গায়রুল্লাহর সাহায্য গ্রহণ করেননি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা হিসেবে সর্বশক্তিমান। কাজেই স্রষ্টার ইচ্ছা না হলে সম্রাট নমরূদের অগ্নিকুণ্ডের আগুনও দাহন শক্তিহীন হতে বাধ্য। বস্তুত নমরুদের অগ্নিকুণ্ড নাতিশীতোষ্ণ পরিণত হবার মধ্যদিয়ে তাঁর সেই বিশ্বাসেরই বাস্তব ফলশ্রুতি মিলেছে। আজ এ দিনেও ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে এবং দ্বীনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে হলে একজন মুমিনকে যেমন অনুরূপ ঈমানী দৃঢ়তায় শক্তিশালী হতে হবে, তেমনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মতো বাতিল ও তাগূতি শক্তির বিরুদ্ধে হতে হবে আপোসহীন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মানব মনের দুর্বলতার উৎস শির্‌ক তথা গায়রুল্লাহর শক্তিমত্তার উপর মানুষের আস্থার মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিলেন এবং এই শক্তির মূল আধার আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন নিজ সমাজে। কারণ, আল্লাহর ওয়াহ্‌দানিয়াতেন উপর আস্থাই মানুষকে দুর্জয় শক্তির অধিকারী করতে পারে এবং মানব সমাজে তওহিদী ঐক্যই আনতে পারে শান্তি, সাম্য, সহমর্মিতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। বস্তুতঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এভাবেই চেয়েছিলেন ইরাককে কেন্দ্র করে আল্লাহর জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার দ্বারা একটি সুখী-সুন্দর, শোষণমুক্ত আল্লাহভক্ত সমাজ গঠন করতে, আর তৎকালীন ইরাক অধিপতি নমরুদ তারই বিরোধিতায় খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। তাই মহাত্যাগী নবীর স্মৃতিবিজড়িত কুরবানি হযরত ইব্রাহীমের আদর্শের যথার্থ অনুসরণ ছাড়া কিছুতেই সফলতা বয়ে আনতে পারে না। প্রতিবছর কুরবানি উপলক্ষে কোটি কোটি মানুষ পশু কুরবানি করা সত্ত্বেও কুরবানির সেই ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জিত না হবার মূল কারণ এখানেই নিহিত।

যুগ-বিবর্তনের মধ্যদিয়ে এ জগতে মানব সমাজে আল্লাহর বহু প্রেরিত পুরুষ অতীত হয়ে গেছেন। তাদের কারুর উপরই মানবজাতির পরিপূর্ণ বিধান অবতীর্ণ হয়নি। শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-ই এ সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লাহ্‌র এই পরিপূর্ণ বিধান মানব সমাজে কার্যকর ও প্রয়োগ একটি কষ্ট ও সংগ্রামসাধ্য কাজ। এ কাজে রয়েছে অনেক বাধা-বিপত্তি, জুলুম নিপীড়ন। এজন্যে প্রয়োজন রয়েছে মস্তবড় ত্যাগের। বস্তুত ঃ এ কারণেই অপর কোনো নবীর বিশেষ কোনো আদর্শকে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার উপর পালনীয় না করে হযরত ইব্রাহীমের মহাত্যাগের আদর্শ অনুসরণকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ জানেন, আল্লাহর পরিপূর্ণ জীবন বিধান মানব সমাজে প্রতিষ্ঠার দুরূহ ও কষ্টসাধ্য কাজটিতে চরম ঈমানী পরীক্ষার মুহূর্তে একমাত্র ইব্রাহীমী ত্যাগের স্মৃতিই উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মস্তবড় পাথেয় হতে পারে। আমাদের সমাজ তথা গোটা বিশ্ব-মানবগোষ্ঠী আজ অশান্তির কবলে নিপতিত। সর্বত্রই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে মানব সমাজের উপর নমরূদী মনোবৃত্তির প্রভুত্ব চলছে, যদ্দরুন মানুষ আজ অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নিপীড়নের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে। মানবতাকে এ দুর্বিষহ অবস্থার হাত থেকে রক্ষাকল্পে প্রতিটি ঈমানদার কুরবানিদাতার ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঈমানী চেতনা ও ত্যাগের স্পৃহা নিয়ে এগিয়ে আসা কর্তব্য। মুমিন-আত্মায় ঈমানী

www.pathagar.com

শক্তির নতুন উদ্বোধন ঘটাবার জন্যে কুরবানি অনুষ্ঠান প্রতিবছর আমাদেরকে এই আহ্বানই জানিয়ে যায়।

বস্তুত ঃ নিজের কামনা-বাসনা, ব্যক্তিসত্তা, কষ্টার্জিত সম্পদ ও প্রাণাধিক প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির সামনে সমর্পণের উদাত্ত আহ্বান নিয়েই প্রতিবছর কুরবানির ঈদ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। কুরবানি একদিকে যেমন ত্যাগের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মহান নবী ইব্রাহীম (আঃ)-এর ত্যাগদীপ্ত সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস আমাদের স্মৃতিপটে জাগিয়ে দেয়, তেমনি প্রতিটি মুমিন অন্তরকে ঈমানী চেতনায় করে তোলে উজ্জীবিত। ঈদুল আযহার দিনে কুরবানির পশুর গলায় ছুরি চালাবার পূর্বাহ্নে কুরবানিদাতা যখন উচ্চারণ করেন ঃ "আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার বেঁচে থাকা, মৃত্যু বরণ সবকিছু বিশ্ব প্রতিপালকের জন্যে"-এ কথার দ্বারা একজন কুরবানিদাতা মূলত ঃ নতুন করে আল্লাহর সাথে এই অঙ্গীকারেই আবদ্ধ হয় যে, হে খোদা ! হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যেভাবে পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার বাধাবিপত্তি, অমানুষিক জুলুম-নিপীড়নকে উপেক্ষা করে তোমার নির্দেশের উপর অটল ছিলেন এবং বাতিলের সাথে আপোস না করে সামাজিক বয়কট ও রাষ্ট্রীয় চরম দণ্ড অগ্নিকুণ্ডে পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয়ে নিজের জীবনকে নির্মম মৃত্যুর হাতে ঠেলে দিতে ইতস্তত ঃ করেননি, আমিও ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় যাবতীয় প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এজন্যে যদি আমাকে তার মতো দেশান্তরিত হতে হয় তাও রাজি আর যদি রাষ্ট্রীয় রোষানলে পড়ে জেল-জুলুম এমনকি নির্মম প্রাণদণ্ডাদেশের ন্যায় চরম নির্দেশও শুনতে হয়, সেজন্যেও আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত। এছাড়া আমার যেই প্রিয়তম সন্তান যাকে আমি নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসি, তোমার নির্দেশকে সকল কিছুর উপর তুলে ধরতে গিয়ে যদি তারও প্রাণনাশ বা প্রাণহানির মতো বেদনাদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সে অবস্থাকেও আমি হাসিমুখে মেনে নিতে প্রস্তুত। তেমনিভাবে তোমার পথে চলতে গিয়ে যদি প্রিয়তমা স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, স্বাভাবিক অবস্থায় যা কোনো স্বামীই মেনে নিতে রাজি নয়, আমি অনুরূপ পরিস্থিতিতেও তোমার দ্বীনের স্বার্থে রিষ্টচিত্তে তা করে যাবো।

বলাবাহুল্য, প্রতিবছর কুরবানী অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বিশ্বের দিকে দিকে কোটি কোটি পশু যবেহর যদি এটাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে এবং আল্লাহর নির্দেশকে সকল কিছুর উপর বলবৎ করার জন্যে মুমিন অন্তরে নতুন প্রেরণা সঞ্চারের জন্যে এ অনুষ্ঠান পালিত হয়, তাহলে ঐ মহান লক্ষ্য আমাদের সমাজে কতদূর পালিত হচ্ছে? কুরবানী অনুষ্ঠানের এদিনে প্রতিটি কুরবানীদাতাকে সেই আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হতে হবে। অন্যথায় এই কুরবানী আপন আত্মীয় ও বন্ধু -বান্ধব নিয়ে শুধু গোশত ভক্ষণেরই একটি উৎসবে রূপান্তরিত হবে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে আল্লাহ তায়ালা যেই উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছেন, তার স্বাভাবিক দাবী হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়িত করা

www.pathagar.com

এবং তাঁর জীবনের শিক্ষা আদর্শকে নিজেদের চলার পথের মশালে পরিণত করা। আল্লাহতায়ালা এ জন্যেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সত্যের উপর আপোসহীন দৃঢ়তা ও অটল ভূমিকার প্রশংসা করার সাথে সাথে বলেছেন, "ঘোষণা করে দাও আল্লাহ্ যা বলেছেন যথার্থই বলেছেন। তোমাদের উচিত নির্দ্বিধায় ইব্রাহীমের পন্থা অনুসরণ করা আর ইব্রাহীম শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" (আলে ইমরান)

এখানে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দু'টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন ঃ (১) 'হানীফ'। অর্থ-তিনি আল্লাহর প্রভুত্বে ছিলেন দ্বিধাহীন এবং তাঁর দাসত্ব পালনে ছিলেন একাগ্রচিত্ত। ইব্রাহীম (আঃ)-এর গোটা জীবনই এ কথার সাক্ষী যে, তিনি আল্লাহর খাতিরে গোটা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। একমাত্র আল্লাহর খাতিরেই নিজ পিতাকে ত্যাগ করেছেন। নিজ সমাজকে ছেড়েছেন। আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়েই তাকে দেশান্তরিত হতে হয়েছে। ছাড়তে হয়েছে নিজের বাড়িঘর, আরাম-আয়েশ। আল্লাহর দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যেই তাঁকে নিজ জন্মভূমি ইরাকের 'উর' থেকে ফিলেস্তিনে, মিসরে এবং হেজাজে যেতে হয়েছে। যখন আল্লাহর নির্দেশ হলো, নিজের প্রিয় পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হলেন। মূলত তিনি তো তাঁর ইচ্ছা মতো প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে যবেহ করেই ফেলেছিলেন এটা আলাদা কথা যে, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাঁর ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর খাতিরেই তিনি আপন স্ত্রী এবং দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে নির্জন বাস দিয়ে এসেছেন। এক কথায় এমন কোনো ত্যাগ, কুরবানী তিনি বাকি রাখেননি যা আল্লাহর জন্যে নিবেদন করেননি।

(২) তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো এই যে, জীবনের কোনে পর্যায়ে এমনকি মহাসংকট মুহূর্তেও তিনি আল্লাহর প্রতি আস্থায় দ্বিধান্বিত হননি। আল্লাহর নির্দেশ পালনে যেমন তাঁর কোনো দ্বিধা-সংশয় ছিলো না, তেমনি আল্লাহ ছাড়া অপর কারুর কাছে তিনি সাহায্য কামনা করেননি। সর্বাবস্থায় আল্লাহকেই তিনি মনে করতেন সর্বশক্তির আধার এবং একমাত্র মুক্তিদাতা। তাঁর ইচ্ছা পূরণ করাই ছিল ইব্রাহীম (আঃ)-এর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বস্তুত আল্লাহ তাঁর প্রতিটি মুমিন বান্দার মধ্যে সেই ইব্রাহীমী গুণাবলী ও ঈমানী দৃঢ়তাই দেখতে চান। এ কারণেই মহাত্যাগী ইব্রাহীম (আঃ)-এর সংগ্রামী জীবনের অনুসরণ করার জন্যে তিনি সূরা আলে-এমরানের উল্লেখিত আয়াতে সরাসরি সকলকে আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা সেই আহ্বানে কতদূর সাড়া দিচ্ছি? প্রতিবছর কুরবানী আসে, কুরবানী যায়, আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও সামগ্রিক মুসলিম উম্মাহর জীবনে তার কি প্রতিফলন ঘটছে?

পদে পদে আজ আমরা আপন প্রবৃত্তির পূজা করে যাচ্ছি। ন্যায়, অন্যায়, হালাল, হারাম, হক না হক-কোনো কিছুরই আমাদের মধ্যে আজ তমিয নেই। একদিকে দুর্নীতি, অসাধুতা আমাদের ছেয়ে ফেলেছে, অপরদিকে আমরা প্রকাশ্যে ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসৃত নীতি-আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করছি। সামান্য অর্থ, সামান্য জমিন, সামান্য পদমর্যাদা ও খ্যাতির জন্যে আমরা আল্লাহর যে কোনো নির্দেশের অমান্য

www.pathagar.com

করতে দ্বিধা করি না। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বাতিলের সাথে আপোস করা, অসত্যের আশ্রয় নেয়া, অসত্যের কাছে মাথানত করা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। মুমিনসুলভ দৃঢ়তা ও সৎসাহস হারিয়ে গেছে। সত্য পথ, সত্য মত ও সত্য কথনকে মনে করা হচ্ছে জীবন উন্নয়নের অন্তরায়। চাতুর্য, অসাধুতা, কথাকর্মের বৈপরীত্য ও ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক চিন্তা আমাদেরকে এমন এক পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছে যে, আমরা এখন প্রায় সবকিছু বৈষয়িক স্বার্থের মাপকাঠি দিয়েই বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ফলে আজ যেমন ব্যক্তিগত জীবন থেকে আমাদের আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য ও ন্যায়নীতি বিদায় নিয়েছে, তেমনি সমষ্টিগত জীবনের অবস্থাও ইব্রাহীমী শিক্ষার মাপকাঠিতে সম্পূর্ণ অবর্ণনীয়। গোটা উম্মতের মধ্যেই যেনো এক ঘুণেধরা অবস্থা বিরাজমান।

বলাবাহুল্য, এভাবে কোনো উম্মতের মধ্যে যখন সামগ্রিকভাবে ঈমানী দৃঢ়তাসম্পন্ন লোকের অভাব দেখা দেয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে একদিকে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও পারস্পরিক মারামারি হানাহানির সূত্রপাত ঘটে, অপরদিকে দুনিয়ার বাতিলপন্থী নমরূদদেরও দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়।

মুসলিম সমাজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজ ইতিহাসের ঠিক এমন এক যুগসন্ধিক্ষণের মধ্যদিয়েই এগিয়ে চলেছে। আল্লাহতায়ালা মুসলমানদের ভৌগোলিক দিক দিয়ে প্রায় একই অবস্থান প্রদান ছাড়াও তাদেরকে দান করেছেন প্রাকৃতিক বহু সম্পদ। তারা ইব্রাহীমী ঈমান বলে বলিয়ান হয়ে নিজ নিজ দেশ থেকে নমরূদী বিধি—বিধান ধ্যান—ধারণার উৎখাত করে যদি খোদায়ী ন্যায়-বিধান প্রতিষ্ঠা করতো তাহলে যেমন নিজেদের মধ্যে এতোসব আত্মকলহ থাকতো না, তেমনি বিজাতীয় কোন নমরূদী শক্তি মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে আফগানিস্তান বা আরবিস্তান কোথাও নিজেদের দন্ত নখরাঘাতে মুসলিম জনপদকে ক্ষতবিক্ষত করতে সাহসী হতো না। মৃত্যুর ভয়ে ঈমানী দুর্বলতায় আড়ষ্ট মুসলমান আজ যেমন সকল দিক থেকে নিজ বাসভূমিতে অসহায় বোধ করে, তেমনি নমরূদী বহিঃশত্রুর ভয়ে তারা শংকাগ্রস্ত। আল্লাহ না করুন, এ অবস্থা আরও কিছুদূর অগ্রসর হলে মুসলমানদের নিজ ভূমিতে অবস্থানও কঠিন হয়ে পড়া অসম্ভব নয়।

আমরা যে মুহূর্তে প্রতিবছর পশুর গলে ছুরি চালিয়ে ঈদুল আযহার কুরবানী উদযাপন করি সে সময় বিশ্বের দিকে দিকে আমাদের মুসলমান ভাই বোনেরা নমরূদী শক্তির হাতে যবেহ হতে থাকে। ঈদুল আযহার কুরবানী অনুষ্ঠানকে সার্থক ও সফল করে তুলতে হলে প্রতিটি কুরবানী দাতাকে আগে নিজের খোদা তায়ালার নিদের্শিত কুপ্রবৃত্তিকে 'কুরবানী' দিয়ে নিজ সমাজ থেকে অজ্ঞতা—তাজনিত অন্যায় অবিচারকে উৎখাত করতে হবে। মূলত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায় ঈমানী তেজও সংগ্রামী চেতনা নিয়ে নমরূদী পশুত্বের হাত থেকে মানবতাকে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে বাঁচাতে হবে।

www.pathagar.com

সৌদি আরবে 'গুরু অপরাধে' 'গুরুদণ্ড' দান প্রসঙ্গে

[প্রকাশ ঃ ২৩. ৯. ২০০০ ইং]

আজকাল উন্নত, উন্নয়নশীল, অনুন্নত সকল দেশে, সকল সমাজেই অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেছে। সময়ের বিবর্তনে এবং অপরাধের বিচিত্র কার্যকারণে সংঘটিত হচ্ছে বিচিত্র ধরন ও চরিত্রের বিচিত্র অপরাধ। বিশেষ করে পরকাল ও সে জগতে জীবনের সকল কার্যক্রমের জবাবদিহিতার ওপর আস্থাশীল সমাজগুলোতে যেখানে অপরাধ প্রবণতা ছিল অতি কম, এখন সেসব সমাজেও অপরাধের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টিকারী চেতনাকে বিভিন্ন উপায়ে ধ্বংস করে দেয়াতে নানান প্রকার অপরাধ প্রবণতা অতি তুঙ্গে সমাসীন হয়েছে। অপরাধ প্রবণতার এই বেগবান স্রোতের মধ্যে পড়ে সকল সমাজের মানুষই আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। অভিভাবক মহল নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিয়ে খুবই চিন্তিত। কিন্তু অপরাধ আক্রান্ত ঐ সমস্ত সমাজ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে সৌদি আরব বহুলাংশে অপরাধ প্রবণতামুক্ত।দেশটিতে অপরাধের কোনো ঘটনা সংঘটিত হলেও অপরাধীকে তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করে আল কুরআনে বর্ণিত খোদায়ী আইন মোতাবেক প্রকাশ্য জনতার উপস্থিতিতে শাস্তি দেয়া হয়। এবং যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট অপরাধের উৎসটি দূরীকরণের চেষ্টা করা হয়। অপরাধ দমন ও অপরাধ হ্রাসে ইসলামী আইনের এই সাফল্য ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তি ও বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা তাদের তল্পীবাহক, সুবিধাভোগী ভাবশিষ্যদের সহ্য করার কথা নয়। তাই অনেক সময় এই শ্রেণীর লোক নানান ভণ্ডামির মাধ্যমে এ আইনের বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে উঠে। একেক সমাজে সরকারি কোনো অপশাসনে ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিদিন নির্মম হত্যাকাণ্ডসমূহে তারা তেমন একটা উচ্চ বাচ্য না করলেও অথবা দায়সারা গোঁছের প্রতিবাদ জানালেও ইসলামী দণ্ডবিধির প্রয়োগ ও সফলতা দেখে তারা হয়ে ওঠে ঈর্ষান্বিত। মানবতার দরদ তখন তাদের উথলিয়ে ওঠে। ইসলামের গুরু অপরাধে গুরুদণ্ড দেখে তারা একে বর্বরতা 'অমানবিকতা' ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত করতে থাকে। অথচ কোনো সমাজের অপরাধীরা একাধিক মানুষ হত্যা করে টুকরো টুকরো করে ফেললেও এই শ্রেণীর জ্ঞানপাপীদের মানবতাবোধ একটুও নড়াচড়া করে না। সে সময় আর তাদেরকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে খুঁজে পাওয়া যায় না যে, বেআইনীভাবে সন্ত্রাসী কায়দায় এভাবে মানুষ হত্যা করে টুকরো টুকরো করাটা কিংবা কাউকে ছোরা মেরে বা গুলী করে তার ৭০/৮০ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়াটা কোন্ মানবিকতা বা কোন্ মনুষ্যত্ব? চলতি সালে মাস তিনেক পূর্বে সৌদি আরবে দু'একটি গুরুতর অপরাধীকে কুরআনের আইন মোতাবেক শাস্তি দেয়া হলেও ইসলামী আইনের সমালোচকরা অন্য দেশে তার সমালোচনা করে। তখন সৌদী সরকার তার জবাব দেন। খোদ খাদেমুল হারামইন শরীফাইন সৌদী বাদশাহ

www.pathagar.com

ফাহ্‌দ বিন আব্দুল আজিজ বলেছিলেন, "ইসলামই হচ্ছে মানবাধিকারের সর্বোত্তম গ্যারান্টি।" চলতি সালের জুন মাসের শুরুতে অনুষ্ঠিত জেদ্দায় মজলিসে সূরার উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে বাদশাহ এ মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, ঐ সময় মানবাধিকার সংস্থা সৌদি আরবে সমাজ বিরোধী অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের নির্ধারিত মৃত্যুদণ্ড ও অন্যান্য দণ্ডবিধির সমালোচনা করে বক্তব্য দিয়েছিল। বাদশাহ্ উক্ত সমালোচনা নাকচ করে দিয়ে তাদের এই সমালোচনার জবাবে এ কথা বলেন। তখন সমালোচকদের কিছু সমমনা ব্যক্তি ইসলামী আইনের মানবিক তাৎপর্য উপলব্ধির চাইতে সমালোচকদের সুরে সুর মিলিয়েই "হুক্কা হুয়া" বলে রব তুলেছিল। অথচ খোদায়ী আইনের সেই অনুপস্থিতি ও ন্যায় বিচারহীনতাজনিত কারণে তারপর ওসব লোকের সামনেই অন্যায় খুনের সয়লাব বয়ে যেতে দেখেও তাদের মুখ দিয়ে টু শব্দটি উচ্চারিত হতে দেখা যাচ্ছে না।

বিশ্ববাসী বহু আগে থেকেই এ ব্যাপারে অবহিত যে, সৌদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সূচনা লগ্ন থেকেই সেখানে পবিত্র কুরআনের নির্দেশিত আল্লাহ্ প্রদত্ত অপরাধ দণ্ডবিধি জারি রয়েছে। কারণ, ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কা মদীনার রক্ষক তথা সৌদী আরবের শাসক মহলের এটা দৃঢ় ঈমান যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত একমাত্র খোদায়ী জীবন দর্শন ও তাঁর অবতীর্ণ বিধি-ব্যবস্থা ও আইন-কানুন দ্বারাই মানব সমাজে যথার্থ ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বিশেষ করে অপরাধ দমন আইন যাকে সৌদি আরবে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে আসা হচ্ছে, এ আইন ছাড়া মানব রচিত কোনো আইন ও জীবন দর্শনের সাহায্য মানব সমাজ থেকে কার্যকরভাবে অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণ সম্ভব নয়। বাস্তবেও তার সত্যতা প্রমাণিত। কারণ, এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, সারাবিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর যত অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে, সে তুলনায় সৌদি আরবে অপরাধমূলক ঘটনার সংখ্যা বহু কম। এটা একমাত্র কুরআনে বর্ণিত খোদায়ী আইনের বরকতেই সম্ভব হয়েছে। তার পরও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক সৌদি অপরাধ দণ্ডবিধির সমালোচনাটিকে সংস্থাটির মানব দরদ নিঃসৃত নয় বরং ইসলাম ও তার আইনের প্রতি অযৌক্তিক বৈরি মনোভাবাপন্নদের গৎবাঁধা সমালোচনারই এক রুটিনওয়ারী প্রতিধ্বনি ছাড়া এটি কিছু নয়। কারণ, For capital crime capital punishment 'গুরু অপরাধের জন্যে গুরুদণ্ডই যৌক্তিক' এবং সমস্যা সমাধানে কার্যকর। ইসলামী ন্যায় বিধানে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড অন্যায়, তেমনি গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড দানকেও ইসলাম অপরাধকে পরোক্ষে প্রশ্রয় দান বলে মনে করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন-ওয়াফিল কিসাসি হায়াতুন। 'কিসাস' তথা 'খুনের বদলা খুনে'র আইনে রয়েছে অপরাপর মানুষের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।" এটি কোনো মানুষের কথা নয়- খোদ মহান স্রষ্টা আল্লাহর উক্তি। বাস্তবে আমরা কি দেখি? আমাদের সমাজসহ যে-কোনো সমাজে বাস্তব সত্যরূপে এটাই প্রতিভাত যে, কোনো খুনীকে তার খুনের সাজা দেয়া না হলে তার বুকের পাটা বেড়ে যায় এবং পরে সে আরো বহু মানুষ খুন করতে আদৌ দ্বিধা করে না। বর্তমানে

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বিচারাধীন বহু বিখ্যাত খুনী সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে যে, তাদের কেউ কেউ একজন নয়, দু'জন নয় ডজনে ডজনে মানুষ খুন করেছে। তাদের অনেকের মৃত্যুদণ্ডাদেশও হয়েছে। এক্ষেত্রে কি প্রশ্ন ওঠে না যে, প্রথম খুনটির বিচার খোদায়ী দণ্ডবিধি অনুসারে সম্পন্ন হলে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে তার হাতে কি পরবর্তী লোকগুলো খুন হতে পারতো? এ ক্ষেত্রে খোদায়ী অপরাধ দমন আইন লংঘিত হবার কারণেই নিরপরাধ মানুষগুলোকে এই নরঘাতকদের হাতে জীবন দিতে হয়েছে। এ সাথে অবশ্য নৈতিক শিক্ষাসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারও সমাজে নিশ্চিত করতে হবে। তবেই ইসলামী আইনের মানব কল্যাণী রূপ সামনে আসবে।

ইসলামের খোদায়ী আইন সর্বকালের সর্বযুগের শাশ্বত চিরন্তন আইন। নিরপেক্ষ আইন। মানব রচিত আইন বহুলাংশেই পক্ষপাতদুষ্ট। ইসলামী আইন বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক আইন। কারণ মানবদেহের কোনো অঙ্গ যদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তখন বিজ্ঞ চিকিৎসাবিদ এজন্যে সেই অঙ্গটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেন যেন সেটি মানবদেহের অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতি করতে না পারে। তেমনি সমাজদেহের অঙ্গরূপ কোনো নাগরিক যদি চরিত্র, চিন্তা ও মননের দিক থেকে এতোই অপরাধ প্রবণতার কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় যে তাকে 'অপারেশন' করে সমাজদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা না হলে গোটা সমাজই সেই রোগযন্ত্রণায় ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন সমাজদেহে সেই অঙ্গ তথা অপরাধী ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিচারের পর মৃত্যুদণ্ড না দেয়াটা প্রকারান্তরে গোটা সমাজকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ারই নামান্তর। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা যেমন সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে গড়ে দৈনিক ৫/৬ জন করে খুনীদের হাতে খুন হচ্ছে অথচ খুনীদের বিচার হচ্ছে না বরং তারা প্রভাবশালীদের দ্বারা আশ্রয় পাচ্ছে।

ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তিগুলো সকল সময় ইসলামের ইনসাফপূর্ণ দণ্ডবিধিসমূহকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে তাদের জ্ঞান চক্ষু এতোই অন্ধ হয়ে গেছে যে, তারা ভণ্ডামিপূর্ণ মানব দরদ দেখাতে গিয়ে কোনো খুনীকে ইসলামী আইনে ফাঁসী বা কোনো চোরকে হাত কাটার শাস্তি দানের যখন সমালোচনা করেন, তখন আদৌ একথা ভাবে না যে, খুনীকে মৃত্যুদণ্ড দান এবং অপরের কিংবা জাতীয় তহবিলের কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুটকারীদের হাত কাটা হলে সেটা যদি বর্বরতা ও মানবতা বিরোধী কাজ হয় খুনীরা যাদেরকে অন্যায়ভাবে খুন করলো বা চোর অন্যায়ভাবে অপরের অতি কষ্টার্জিত যেই সম্পদ চুরি করলো, সেটা কোন্ মানবতা ও সভ্যতার কাজ করলো? এদিক থেকে সৌদী বাদশাহ চলতি সালের (২০০০ইং) জুনের প্রথম সপ্তাহে ইসলামী আইনের সমালোচক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার জবাবে যেই উক্তি করেছেন-'ইসলামই হচ্ছে মানবাধিকারের সর্বোত্তম গ্যারান্টি'। তার এই উক্তিই বাস্তবধর্মী। বস্তুত সমগ্র বিশ্বে যদি এই খোদায়ী আইনসহ তার অন্যান্য আইন মানব জীবনের সকল স্তরে কার্যকর করা না হয়, বিশ্ব মানব সমাজে শান্তি কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের উচিত জীবনের সকল স্তরে খোদায়ী ন্যায়বিধান প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইহ ও পারলৌকিক সার্বিক শান্তি নিশ্চিত করা এবং এই পথের সকল বাধা অপরাসণে দুর্জয় মনোভাব গ্রহণ করা।

www.pathagar.com

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে এ আইনের কার্যকারিতা সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ এই আইনদাতা মানুষের মহান স্রষ্টা। যাবতীয় শ্রেণী বৈষম্যের উর্ধ্বে এই সত্তা। সাদা, কালা, আশরাফ, আতরাফ, ধনী-দরিদ্রের সকল ভেদচিন্তার উর্ধ্বে ন্যায়ের তুলাদণ্ডে উন্নীত তাঁর এসব আইন।

অন্য আইনে অপরাধ দমনে ব্যর্থ হয়ে পৃথিবীর অনেক দেশই এখন এ দণ্ডকার্যকর করছে। এমনকি লঘু অপরাধেও অনেকে গুরুদণ্ড দিচ্ছে। চীনেতো সবজি বিনষ্টকারী তরকারীর আড়ৎদারকেও মৃত্যুদণ্ড দানের নজির দেখা যায়।

প্রসঙ্গত এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, স্বমত ও দলীয় মতের প্রাধান্য দানের অন্ধ প্রবণতা অনেক সময় মানুষকে ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। মানবতার কল্যাণ বিধানে ভাবধারা তখন গৌণ হয়ে পড়ে। এমনটি হয় কিছুটা অজ্ঞতাবশত, কিছুটা অবিশ্বাসজনিত কারণে, কিছুটা নিজেদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার জ্ঞানপাপীসুলভ মনোভাব থেকে। বস্তুত আজকাল কোনো সমাজে অপরাধ প্রবণতার কারণসমূহ উপর-নীচ সকল শ্রেণীর মানুষের জানা থাকা সত্ত্বেও উল্লেখিত এসব কারণেই কেউ মানব কল্যাণের প্রেরণা নিয়ে সে ব্যাপারে মুখ খোলে না। অন্যথায় এটা কে না জানে যে-পাশ্চাত্য ভোগবাদ -সঞ্জাত তথাকথিত চিত্তবিনোদন ও সাংস্কৃতিক প্রচার মাধ্যমসমূহে যেসব অপরাধমূলক অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়, সমাজের তরুণ ও যুব চরিত্রে এর কি বিরূপ প্রভাব পড়ে? টিভি, সিনেমা, সংবাদপত্র ইত্যাদি মাধ্যমে নারীদেহের কুরুচীপূর্ণ যৌন সুড়সুড়ি দানকারী ছবিসমূহ এবং অপরের শরীরে ধারালো ছোরা বসিয়ে দেয়া ও রক্তাক্ত অবস্থায় তা দৃশ্যমান হওয়া কিংবা কারও মস্তকে পিস্তলের সাহায্যে গুলী মেরে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে দেয়া-এসব অপরাধমূলক ছবি সমাজের যুব চরিত্রকে অপরাধী করে তুলবে , নারী গঠিত ছবিসমূহ তাদের মনকে নারী নির্যাতন ও নারী সম্ভ্রম বিনষ্টকারী হিসেবে গড়ে তুলবে এটা কে না জানে? কোনো মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে নারী চুম্বন, এটা কি ঐ সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি? এটাতো সেই নিছক ভোগবাদী সমাজ-সভ্যতার প্রতিচ্ছবি যারা বিশ্ব খেলায় সারা দুনিয়ার সকল বয়সের দর্শককে সাঁতার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নারীদের নগ্ন নিতম্ব দেখানোকে সভ্যতা-সংস্কৃতি বলে এবং একেই নারী মর্যাদাবৃদ্ধি বলে আখ্যায়িত করে। মানব নামের রুচিবান কেউ এই যুক্তি মানতে পারে। অথচ সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে মানবদেহে বিশেষ করে নারীদের আবৃত রাখাই মানব সভ্যতারূপে গণ্য হয়ে আসছে। এসব বিষয় এবং উল্লেখিত অপরাধমূলক ঘটনাবলী যা অপরকে খুনী, হাইজ্যাকার ও লম্পটরূপে গড়ে উঠতে উস্কিয়ে দেয়, অতঃপর এর প্রভাবে সমাজবিরোধী অপরাধ প্রবণদের দৌরাত্মে সমাজ জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে, এমনকি নিজ ছেলেমেয়েদের সুস্থ জীবন ও চরিত্র গড়ে তোলাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তবুও বোধগম্য কারণে ঐ সমস্ত লোক অপরাধের এসব কার্যকারণ উৎখাতের দাবী তোলে না। কারণ, না জানি এসব করতে গিয়ে মৌলবাদী খেতাব কুড়াতে হয়।

বলাবাহুল্য, এ শ্রেণীর হীনমন্যতা, স্বকীয়তাবোধ থেকে বিচ্যুতি ইত্যাদি বিষয় ও উল্লেখিত কারণসমূহের দরুনই মুসলিম সমাজে আজ চরম বিকৃত দেখা দিয়েছে।

www.pathagar.com

এদেশসহ অনেক মুসলিম সমাজ আজ চরম বিকৃত দেখা দিয়েছে। এদেশসহ অনেক মুসলিম সমাজ অপরাধ প্রবণদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। এভাবে দেশ, সমাজ, জাতি এমনকি স্বাধীনতা পর্যন্ত চরম হুমকির মুখে উপনীত হতে দেখেও সমাজের জ্ঞানপাপী শ্রেণীটি ইসলাম বিদ্বেষী মানসিকতা হেতু এসবের বিরুদ্ধে কিছুই বলতে চায় না। অথচ অন্যায়ভাবে দলমতের প্রাধান্য দান কিংবা অজ্ঞতা, অবিশ্বাস যেই অবাঞ্ছিত পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতাই এই ব্যাপারে তাদের সত্য বলতে প্রতিবন্ধক হোক না কেন দেশ, সমাজের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হলো স্পষ্ট ভাষায় সমাজ থেকে অপরাধের এসব কার্যকারণ দূর করা। অন্যথায় সমাজে অপরাধ বিরোধী আইনও থাকবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যরাও থাকবে কিন্তু থাকবে না সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক পবিত্রতা ও মূল্যবোধ। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের কোনো কোনো ভূখণ্ডে প্রচার মাধ্যমে নষ্টামি ও কুরুচীপূর্ণ চরিত্র বিধ্বংসী অনুষ্ঠানাদি প্রচারিত হয়। এর পরিণতিতে এখন দেশে অপরাধ প্রবণতা সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে আল্লাহর ভয়ে দলমত নির্বিশেষে সকলেরই উচিত এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠা এবং কোনো দলীয় সংকীর্ণতা দ্বারা পরিচালিত না হওয়া। যেকোনো যথার্থ মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস, আল কুরআনের অপরাধ দণ্ডবিধি কার্যকর করে যে কোনো দেশ তার জাতীয় ও সামাজিক জীবনকে অপরাধমুক্ত করতে পারে– যদি সংশ্লিষ্টরা নিষ্ঠা সহকারে সমাজে কৌনিক বিধান কার্যকর করার সংকল্প গহণ করে।

ভারত ও বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা উচ্ছেদ ষড়যন্ত্রের অন্তরালে

[প্রকাশ ঃ ৬. ৪. ২০০০ ইং]

যেই মুহূর্তে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। ঠিক একই সময় ভারতের মাদ্রাসা বিরোধী অভিন্ন ষড়যন্ত্রের কথা শোনা যাচ্ছে। ভারতের ক্ষমতাসীন উগ্র সাম্প্রদায়িক বিজেপি তার মুসলিম বিরোধী নীল নকশার অংশ হিসাবে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপনের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়। এর সূচনা হয়েছে মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী উত্তর প্রদেশ থেকে। রাজধানী নয়া দিল্লীসহ ভারতের সর্বত্র মুসলমানরা কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবার" এর এহেন অসৎ উদ্যোগের প্রতিবাদে রাজধানী দিল্লীসহ সারা ভারতে মুসলমানদের বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে প্রকাশ।

কলকাতার সাপ্তাহিক কলম-এর ১২-১৮ মার্চ সংখ্যার লীড নিউজের শিরোনাম ছিল উত্তর প্রদেশ বিধান সভায় প্রস্তাবিত ধর্মস্থান বিল, মসজিদ মাদ্রাসা তৈরি রুখতে নয়া কৌশল।" উক্ত রিপোর্টটিতে বলা হয়, উগ্রপন্থী দমনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 'টাডা' আইন প্রণয়ন করেছিল। পরে দেখা গেছে সেই আইন প্রয়োগ করা হয়েছে কেবল সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রেই। প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে উত্তর

www.pathagar.com

প্রদেশে। সম্প্রতি বিধান সভা ধর্মস্থান। বিল আনা হয়েছে। এর নাম দেয়া হয়েছে পাবলিক রিলিজিয়াস বিল্ডিং এ্যান্ড প্রেস বিল বিশেষজ্ঞদের মতে এ বিল মূলত আনা হয়েছে উত্তর প্রদেশের অসংখ্য মাদ্রাসা মসজিদকে লক্ষ্য করে।" এই বিলে উল্লেখ করা হয়েছে রাজ্য সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোথাও ধর্মস্থান তৈরি কিংবা পরিবর্তন বা সংস্কার করা যাবে না। তা করতে হলে ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লাগবে অর্থাৎ ডিএম অনুমতি না দিলে মসজিদ মাদ্রাসা ইত্যাদি কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

এই নতুন আইনের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের নিদারুণ উদ্বেগ ও আশংকার কারণ হলো, মাত্র কিছুদিন পূর্বে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাম প্রকাশ গুপ্ত বলেছেন, "এই প্রদেশের মাদ্রাসা ও মসজিদগুলো আই এস আই (পাকিস্তানী গোয়েন্দা বিভাগ) এর আখড়া।" এই ব্যক্তির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদে ভারতব্যাপী সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন মুসলিম সমাজ। এর পরই "ধর্মস্থান বিল" আসায় মুসলমানরা সঙ্গতভাবেই ধারণা করছেন, এই বিলের টার্গেট মুসলমানরাই। মসজিদ মাদ্রাসা স্থাপনের পথ রুদ্ধ করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

গোটা হিমালয়ান উপমহাদেশকে রাম রাজত্বে পরিণত করার পুরাতন লক্ষ্য হাসিলের প্রয়াস এখন সক্রিয় বলেই মনে হচ্ছে। যারা স্বপ্ন দেখে, বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের অস্তিত্বকে ছলে বলে কৌশলে ধ্বংস করে আবার খন্ড ভারতকে অখণ্ড ভারতবর্ষে পরিণত করে গোটা উপমাহাদেশে একমাত্র ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মকৃষ্টি অনুসারী সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু নেতৃত্বের জোঁয়ালেই পৌনে ৮শ' বছর ভারত শাসনকারী মুসলমানদেরকে নিস্ক্রিয় করে আটকাতে হবে, তারা এখন ভারত বিভক্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের অস্তিত্বের মূল শিঁকড়ে আঘাত হানার কাজে হাত দিচ্ছে। পাকিস্তানে এখনও তাদের পরিকল্পনায় সায় দেয়ার লোক বাহ্যত না পাওয়া গেলেও বাংলাদেশে ঐ মূল শিকড়ে আঘাত হানার সহযোগী রয়েছে বলে তারা মনে করছে। বিভক্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুটি স্বাধীন দেশের মূল প্রেরণা হিসাবে যেই দর্শন ও চেতনা কাজ করেছিল, তা ছিল ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তাবোধের চেতনা। চল্লিশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই চেতনা সম্ভাব্য হয়ে উঠেছিল। ভারত দখলকারী ইংরেজদের ভারত ত্যাগের উপান্তকালে হিন্দু নেতৃত্বের মুসলিম স্বার্থবিরোধী সংকীর্ণ চিন্তা থেকে মুসলমানদের নতুন উপলব্ধি জাগে। হিন্দু-মুসলমার্ন মিলনের সেতু বন্ধন হিসাবে সচেষ্ট কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ হিন্দু নেতৃত্বের মুসলিম বিদ্বেষী চিন্তায় বিস্মিত হয়ে উঠেন। হিন্দুদের মুসলিম স্বার্থ বিরোধী সংকীর্ণ চিন্তা লক্ষ্য করে তিনি অখন্ড ভারতের চিন্তা পরিহার করেন। এই মুসলিম নেতা হিন্দু নেতৃত্বের সাথে দীর্ঘ দিন কাজ করে দেখতে পেলেন যে, ভারত থেকে ইংরেজ শাসকরা চলে যাবার পর বারতের কোটি কোটি মুসলমানকে হিন্দুদের শাসন নেতৃত্বের অক্টোপাসে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। তাদেরকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে হিন্দুদের গোলামে পরিণত হতে হবে। বাস্তবে হিন্দু নেতারা ঐ মতলব নিয়েই কাজ করছেন। মূলতঃ কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তখনই কংগ্রেস ত্যাগ করে পূর্ব থেকে উত্থিত মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী

www.pathagar.com

উত্থাপনকারী মুসলীমলীগে গিয়ে যোগ দেন এবং স্বতন্ত্র মুসলিম আবাসভূমি পাকিস্তান কায়েমের আন্দোলন জোরদার করে তোলেন। সেই আন্দোলনের পরিণতি হিসাবেই বাংলাভাষা মুসলিম এলাকা নিয়ে মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান নামের স্বাধীন রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭১-এ রক্তাক্ত লড়াইয়ের মাধ্যমে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও ভারত সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না।

তারা নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভারত বিভক্তির মূল চেতনা মুসলমানদের স্বাতন্ত্রবোধ ও জাতীয় চেতনা জাগ্রতকারী মূল প্রাণ শক্তি-ইসলামী শিক্ষাকে এবার আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে। কারণ, তারা মনে করে, এই শিক্ষার প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাসমূহ ও মসজিদগুলো যত দিন টিকে থাকবে, এগুলোতে শিক্ষা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় না গেলেও তাদের দ্বারাই মুসলিম সমাজে জাতীয় ও সংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রবোধ কালাকাল ধরে টিকে আছে। এমনকি ইংরেজ শাসন ও তাদের আমলের বিজাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির দীর্ঘ পৌনে দুশ' বছরের দাপটের মধ্যেও মুসলমানরা যেই কারণে নিজ স্বাতন্ত্রবোধ বিস্মৃত হতে পারেনি, সেটি হলো-মুসলিম, অস্তিত্ব ও পরিচিতি রক্ষাকারী একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাসমূহ। তাই তারা একদিকে নিজ দেশের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে সেখানকার মসজিদগুলো ধ্বংসের সূচনা করেছে অপর দিকে এবার নতুন করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মাদ্রাসাসমূহ উচ্ছেদের পদক্ষেপ নিচ্ছে।

বাহ্যত ভারত বিশ্ব দরবারে নিজেকে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে জাহির করলেও মূলত সেখানকার মুসলমান তাদের অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার মধ্যদিয়েই প্রায় যাবতীয় অধিকার বঞ্চিত হয়ে এক দুর্বিষহ অবস্থার মাধ্যমে জীবন যাপন করছে। ভারতীয় মুসলমানরা ৪৭ সাল থেকে যেই সাম্প্রদায়িক হিংস্রতারদন্ড নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আসছে, এখনও তাদের উপর তা অব্যাহত চলছে। সরকারি চাকরি বাকরি থেকে মুসলমানরা বঞ্চিত। বরং সেখানকার কোনো কোনো অঞ্চলের মুসলমানরা যে ভারতীয় শাসকদের দ্বারা বিশ্ব স্বীকৃত মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো ভারত অধিকৃত কাশ্মীর। মোটকথা, অর্ধশতাধিক মুসলিম বিদ্বেষী বছরকাল ধরেই ভারতে মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক হিংস্রতাজনিত হাজার হাজার দাঙ্গা সংঘটিত হয়ে আসছে, যেগুলোতে অগণিত মুসলিম নারী-পুরুষ শিশুর প্রাণ ও সম্পদের বিরাট হানি ঘটেছে। বলাবাহুল্য, ৪৭ সালে মরহুম কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং বাংলাদেশের তৎকালীন মুসলিম জাতীয় নেতৃবৃন্দ শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক, হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাশেম প্রমুখ মুসলমানদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আপোসহীন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়লে, আজ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান, বিশেষ করে এদেশের মুসলমানদেরও কাশ্মীরী ও ভারতীয় অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় বিপদে নাকের পানি চোখের পানি" এক হতো।

কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এবং ভারত বিভাগকারী মুসলিম নেতাদের অযোগ্য উত্তরসূরীদের কারণে পরবর্তী বংশধর এটা বুঝতেই পারলো না যে তাদের

www.pathagar.com

পিতৃপুরুষরা কোন জ্বালায় এবং হিন্দু নেতৃত্বের কিরূপ মুসলিম বিদ্বেষী মানসিকতার শিকার হয়ে নিজেদের জন্যে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে ৪৭ সালে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করতে বাধ্য হয়েছিল। এদেশের লাখ লাখ মুসলিম তরুণ, যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণীর বিরাট অংশ আজও ভারত বিভক্তকারী তাদের পূর্ব পুরুষদের মনের জ্বালা অনুধাবন করছে বলে মনে হয় না।

বলাবাহুল্য, এদেশের নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষিত একটি শ্রেণীর পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার ছিদ্রপথ ধরেই ভারত বাংলাদেশকে নিজেদের অধীনস্থ করদ রাজ্যের মতোই শুধু মনে করে না, এর স্বাধীন সত্ত্বা ও এর স্বাধীনতার সাক্ষী সীমান্ত পিলার পর্যন্ত কার্যতঃ অস্বীকার করতে চাচ্ছে। নিজেদের লোকদের মাধ্যমে কথা ছুঁড়ে দিচ্ছে- ভারতকে ৪৭ পূর্ব অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এখানকার রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম। এটি মসজিদ মাদ্রাসার দেশ। এখানকার লাখো মসজিদে পাঁচ বেলা লাখো কণ্ঠে আল্লাহর লা শারীক সত্ত্বার শ্রেষ্ঠত্বে ও মহত্বের বাণী উচ্চারিত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। এখানকার মাদ্রাসাসমূহে লাখ লাখ ছাত্র লেখাপড়া করে। এসব মাদ্রাসাকে যুগোপযোগী করায় ছাত্র সংখ্যা আরও বাড়ছে। এখানকার রাজনীতি করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ন্যায় একটি ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের অনুসারী হতে পারেন না। মাদ্রাসা বন্ধের বিষয়টি তো এখানে কল্পনাও করা যায় না। তারপরও এখানে বহু দিনের চেষ্টায় কিছু লোক সৃষ্টির দ্বারা জোর করে এটি চালাবার শত প্রয়াসের পরও দেখা যাচ্ছে, এখানকার মানুষ সেই ধর্মীয় স্বাতন্ত্রের কথা ভুলতে পারছেনা। দলমত নির্বিশেষে তারা বিস্মৃত হতে চায় না তাদের ধর্মীয় পরিচিতি ও কৃষ্টি সংস্কৃতি। তাই এবার ভারত চাচ্ছে বাংলাদেশে তাদের সমমনা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দাবীদার আওয়ামী সরকারের আমলে কিছু করা যায় কিনা। মূলতঃ একারণেই দেখা যাচ্ছে– সম্পূর্ণ অকল্পনীয় হলেও এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের অনুরূপ রাজনৈতিক মতাদর্শের ধারক কিছু কিছু সংবাদপত্র ও লেখক সাংবাদিক এদেশের মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট আলেমদের সামাজিকভাবে ভাব মর্যাদা বিনষ্টের নীতি অনুসরণ করে আসছে। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি এবং এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে তারা কোনো দিন এক অক্ষর না লিখলেও এসব প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্টদেরকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে আসছে। তাদেরকে সন্ত্রাসী, ফতোয়াবাজ রূপে পত্রিকায় দেখাচ্ছে এবং তাদের নিয়ে নাটক সিনেমায় ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ, করছে আর মাদ্রাসাগুলোকে সন্ত্রাসী তৎপরতার আখড়া বলে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, তারা ও এখানকার মসজিদের ইমামরা নাকি ভারতের শত্রুদেশ পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইসি এস-এর নেতৃত্বে চলে বলেও তাঁরা গাঁজা খোরী প্রচারণা চালাচ্ছে।

ভারতীয় মদদপুষ্ট ও সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং এ দেশে বিজাতীয় ভোগবাদী মতাদর্শের অনুসারী আরেকটি অংশ হলো এনজিও প্রতিষ্ঠান এডাব, এদেশের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা তুলে দেয়া এবং মাদ্রাসা খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব

www.pathagar.com

দেয়ার যাদের কোনো অধিকার নেই তারাও মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথা বলছে, সরকারকে মাদ্রাসা বিরোধী পদক্ষেপ নিতে উস্কানি দিচ্ছে। সরকারও এ ব্যাপারে নতুন মাদ্রাসা স্থাপনে কড়া শর্ত শরায়েত আরোপ এবং নানান ছুতা নাতায় অনেক মাদ্রাসার মঞ্জুরি বাতিলের মধ্যদিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের অনুসরণ করলেও এখনও এ ব্যাপারে ব্যাপক কোনো পদক্ষেপ নিতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু এটা ঠিক যে,-কোনো প্রকারে আরও অনুকূল অবস্থা হাতে আসা মাত্রই যে, ভারতের মতো মাদ্রাসা বিরোধী অভিযান চলা অসম্ভব নয়, তা বিভিন্ন আলামতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে।

সুতরাং এদেশের নিষ্ঠাবান মুসলমান ও মুসলিম নেতৃত্বকে যারা তাদের বিদেশী প্রভুদের ভাষায় মৌলবাদী বলে প্রচার করে এবং মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালায়, তাদের আসল মতলব হলো মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ টিকিয়ে রাখার প্রধান অবলম্বন মাদ্রাসাগুলোকে উচ্ছেদ দেশবাসীর মুসলিম পরিচিতিকে মুছে দেয়া। এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের সাথে এদেশের স্বাধীনতা এখানকার মানুষদের স্বাধীন সত্তাকে মিলিয়ে ফেলা। বিভিন্ন আলামতে এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাই এটা আজ পরিষ্কার যে, ভারত বিভাগ চেতনার উৎসমূলে আঘাত হানার দুরভিসন্ধি নিয়েই ভারত-বাংলাদেশে একই সময় মাদ্রাসা বিরোধী ষড়যন্ত্র চলছে।

আমাদের এ উক্তি কোনো অনুমান ভিত্তিক নয়। সেদিন বাংলাদেশ সফরকারী ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের এক দায়িত্বশীল ব্যক্তির উক্তিও আমাদের বক্তব্যেরই পোষকতা করে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী অনিল চন্দ্র সরকার ভাইয়ের শ্রাদ্ধ খেতে গত ৩১ শে মার্চ কুমিল্লার বরুড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে এসেছিলেন। তিনি ৩ মার্চ রোববার শৈশবের শিক্ষালয় বরুড়া তলাগ্রাম হাই স্কুল পরিদর্শনের সময় স্কুলটির প্রধান শিক্ষকের কক্ষে অন্যান্য শিক্ষক ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে বলেন, মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আগেকার দিনের লোকেরা টুপী ও তিলক দিয়ে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার যে শ্লোগান উঠেছে, তা শুভ লক্ষণ, আপনারা তা ধরে রাখবেন। ধর্ম থাকবে গৃহকোণে। সাবধান! মৌলবাদীরা যেন বাংলাদেশে জয়যুক্ত হতে না পারে। তিনি উপস্থিত লোকদের সামনে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, সম্ভবত আগামী ৬ মাসের মধ্যেই ট্রানজিট চুক্তি হয়ে যাবে।"

এসব বক্তব্য এবং ভারতে মাদ্রাসা মসজিদ বিরোধী অভিযানের উদ্যোগের পরেও যদি বাংলাদেশের মুসলমানদের চৈতন্য উদয় না হয় যে, - দেশটিকে একশ্রেণীর লোক কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাহলে ধরে নিতে হবে যে– পলাশী যুগে মীর জাফর আলী, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ প্রমুখ গাদ্দারদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নকালে তৎকালীন সাধারণ মুসলমানদের নীরবতা তাদেরকে যেভাবে দুশ' বছর যাবত পথের ভিক্ষারী করে রেখেছিল, তদ্রূপ আজকের বাংলাদেশী মুসলমানরা দেশের স্বাধীনতা ও ইসলামের বিরোধীতায় নীরব থাকলে তাদেরকেও একই বরং এর চাইতে কঠিন পরিণতির জন্যে অপেক্ষায় থাকতে হবে। এ নীরবতা তাদের বংশধরদেরকে বানাতে পারে ব্রাহ্মণ্যবাদের গোলাম, যা থেকে শত শত বছরেও মুক্তির আশা করা কঠিন। সুতরাং সাবধান বাংলার মুসলমান!

www.pathagar.com

দায়িত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ উক্তি অবিচ্ছিন্ন

[প্রকাশ ঃ ১২. ১১. '৯৯ ইং]

সম্প্রতি ফটো সাংবাদিকদের উপর পুলিশী নির্যাতন প্রসঙেগ সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এসব বিএনপি পুলিশের কাজ। প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি নিয়ে জনগণের মধ্যে নানান ধরনের মন্তব্য চলছে। তাঁর মুখে এই উক্তি শুনে কেউ বিস্ময় প্রকাশ করছে, কেউ প্রশ্ন তুলছে, তাহলে কি পুলিশ বাহিনীতেও রাজনৈতিক দল রয়েছে? অথচ সবাই জানে যে, পুলিশরা, সরকারি কর্মচারি। তারা বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়। রাষ্ট্রীয় আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ তাদের কাজ। পুলিশের নিজস্ব রাজনৈতিক মত যাই থাকুক, পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধে থেকে সরকারি নির্দেশ পালনই তাদের কর্তব্য। অপরাধীর শাস্তি বা অব্যাহতি দানের ফয়সালা তাদের হাতে নয়। পুলিশ তথা সরকারি কোনো কর্মচারি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী হলে তার পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন বিধায় সরকারি কর্মচারীদেরকে দলীয় নেতা-কর্মী হওয়া আইন পরিপন্থী। অন্যথায় তাতে সরকারি আইনের নিরপেক্ষতা ব্যাহত হতে বাধ্য! পুলিশ মাত্রেই সরকারি লোক বিধায় তাদের ভাল-মন্দ সকল কাজের দায়িত্ব সরকারের উপরই বর্তায়। কিন্তু কোনো পুলিশ অন্যায় করলে যদি রাষ্ট্রীয় উচ্চমহল থেকে বলা হয় যে, সে 'উমক' দলের পুলিশ, তখন ধরে নিতেই হয় যে, পুলিশ বাহিনীতে 'অপর দলে'র পুলিশও রয়েছে। বিশেষ করে দেশের সরকার প্রধান এমন তথ্য দিলে তা বিশ্বাস না করেও উপায় থাকে না, যার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে পুলিশের মধ্যে আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য দলের পুলিশও রয়েছে। এখন দলীয় পক্ষপাতদুষ্টের কারণে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করতে গিয়ে আওয়ামী দলীয় পুলিশ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের লোককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করলে কিংবা বুলেটবিদ্ধ করে হত্যাজখমী করলে সেটাকেই হয়তো স্বাভাবিক নিয়ম বলে ধরে নিতে হয় বৈ কি। আর সরকারি দলের পুলিশদের শক্তি স্বভাবতঃই বিরোধী দলীয় পুলিশদের তুলনায় অধিক থাকাতে বিরোধী দলীয় লোকেরাই পুলিশী আঘাত বেশি খাবে এবং খাচ্ছেও। অথচ অতীতে পুলিশের মধ্যে এই কথিত বিভাজনমূলক পরিচয় কেউ শুনেছে বলে মনে হয় না।

এটা জাতির জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্য যে, দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত জাতীয় ঐক্য সংহতি বজায় রাখার জন্য যেখানে রাজনৈতিক দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা সকল দেশেই ঐক্যবিরোধী বক্তব্য থেকে বিরত থাকে, সে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংকীর্ণ স্বার্থে এ মহল থেকেই জাতীয় ঐক্যবিরোধী উস্কানিমূলক বক্তব্য বেশি আসে। ফলে জাতির মধ্যে আজ বহুধাবিভক্তির আগুন বিদ্যমান। অনৈক্যের এই আগুনে ঠিক এমন এক মুহূর্তে

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ মহল থেকে যদি এমন কোনো উক্তি করা হয়, যা বাহ্যত স্থূল মনে হলেও তার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভারি, তাহলে এ ধরনের উক্তি পুলিশ বাহিনীতে অনৈক্য ও বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আজকাল শুধু পুলিশের মধ্যেই এ প্রবণতা সৃষ্টিমূলক বক্তব্য আসছে না, দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্পর্কেও অনেক দায়িত্বশীল লোক এমন সব উক্তি প্রকাশ করেন যা কিছুতেই সঙ্গত নয়। খোদ সাবেক সেনাপ্রধান দেশের সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ অনেক তথ্য প্রবন্ধাকারে সংবাদপত্রে প্রকাশ করে এতে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও বাহিনীর ভাবমর্যাদাই শুধু ক্ষুন্ন হয় না, তাদের মধ্যে অনৈক্যের ভাবধারাকেও জাগিয়ে তুলতে পারে। এটা কিছুতেই দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রীয় সুষ্ঠু নেতৃত্বের পরিচায়ক নয়। এটি জাতীয় অনৈক্য সৃষ্টির দ্বারা কোনো আগ্রাসী শক্তিকেই সাহসী করে তোলার কাজ করবে।

কোনো দেশে নির্বাচিত সরকার নির্বাচনের প্রাক্কালে দলীয় যত কথাই বলুক না কেন নির্বাচিত হবার পরক্ষণেই সেই সরকারের মর্যাদা দলীয় সীমাবদ্ধ গণ্ডির বহু ঊর্ধে উঠে যায়। তখন সরকার গঠনকারী নির্বাচিত দল ও তার সরকার দলমত নির্বিশেষে সকলেরই সরকার। এমনকি যেই বিরোধী দল সরকারের কাজকর্ম ও অনুসৃত নীতির ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করে সেই বিরোধী দলকেও বৃহত্তর দৃষ্টিতে জাতি গঠনে সরকারের পরোক্ষ সহায়ক শক্তি হিসাবেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে গণ্য করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিরোধী দলকে রীতিমতো সরকারের জানি দুশমন মনে করে তার সাথে সম্পূর্ণ দুশমনের মতোই আচরণ করা হয় এবং তার ব্যাপারে সরকারি নীতি হয়ে দাঁড়ায় "পারি অরি মারি যে কৌশলে"। তখন গণতন্ত্র, দেশের সংবিধানে স্বীকৃত সকল মৌলিক অধিকার ও মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় কোন কিছুর প্রতিই ভ্রুক্ষেপ দানের প্রয়োজন বোধ করা হয় না। এই গণতন্ত্র বিরোধী, ফ্যাসিবাদী ধ্যান-ধারণা কোনো দলের জন্যেই শুভ পরিণতি বয়ে আনতে পারে না, তেমনি দেশ গঠন ও শাসন পরিচালনায় এহেন দৃষ্টির কোনো দলের পক্ষে ন্যায়-নীতি বজায় রেখে চলা ও সফল নেতৃত্বদানও অসম্ভব। এই চরিত্রের কোনো সরকার গায়ের জোরে ক্ষমতায় টিকে থাকতে বেহদ চেষ্টা করলেও তার এই হটকারী মনোভাবের পরিণতি শেষ পর্যন্ত তার জন্যে যেমন সুখকর হয় না তেমনি জাতির জন্যে ওনা। বরং গোটা জাতীয় জীবনে তখন একটি বিশৃংখলারই সৃষ্টি হয় এবং চরমভাবে ব্যাহত হয় দেশের উন্নতি-অগ্রগতি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বর্তমান আওয়ামী সরকার বাংলাদেশের ক্ষমতায় সমাসীন হবার পর থেকে দেশে এমন একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিই সব সময় বিরাজ করে আসছে। যদ্দরুন জাতি এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় দিনযাপন করছে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির ঘটেছে চরম অবনতি। আইন প্রয়োগ কর্তাদের মধ্যে দলীয় প্রবণতা সৃষ্টির অপচেষ্টার ফলে এখন তারা অনেকটা সেই প্রবণতা দ্বারাই চালিত। অপরদিকে সমাজ বিরোধী, সন্ত্রাসী ও বেআইনী অস্ত্রধারীরা প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সহযোগী তায়

www.pathagar.com

সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত হতে দ্বিধা করছে না। তারাও এই প্রশাসন থেকেই কোনো সিগনাল বা প্রশ্রয়-আশ্রয় পেয়ে জননিরাপত্তাবিরোধী কাজে অধিক তৎপর হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, আমদের দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং আমাদের জাতীয় পরিচিতির যারা ঘোর বিরোধী, তারা এবং তাদের এ দেশীয় দোসররা সকল সময়ই এ দেশের পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি ও অনৈক্য সৃষ্টির দ্বারা দেশটির ক্ষতি করতে সচেষ্ট। এমতাবস্থায় সরকারি দায়িত্বশীল হোন কিংবা বিরোধী রাজনৈতিক কোনো নেতৃত্ব, কারুর মুখ থেকেই দেশের পুলিশ, বিডিআর সেনাবাহিনীর ঐক্যবিরোধী বক্তব্য দেশের সাথে বৈরিতারই নামান্তর। তদ্রূপ সরকারি বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের মধ্যে দলীয় প্রবণতা সৃষ্টির দ্বারা জাতীয় বিশৃংখলার ইন্ধন যোগানোও দেশের অস্তিত্বের পাদমূলে কুঠারাঘাত ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং সরকারি দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা নিজ পদমর্যাদার প্রতি তাকিয়েই বক্তব্য রাখবেন এটাই সকলের কাম্য। কারণ, দায়িত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ উক্তি বিচ্ছিন্ন নয়।

বন্ধু সরকারের আমলে ভারত সীমান্তে বাংলাদেশীদের হত্যার সংখ্যাবৃদ্ধি

[প্রকাশ ঃ ২২. ৯. '৯৯ ইং]

আমাদের প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখে প্রায়ই শোনা যায়, ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। কেউ ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা ও বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ভারতীয় নীতির সমালোচনা করলে, তারা নাকে মুখে গোস্সা করেন এবং সাথে সাথে ভারতপ্রীতি দেখিয়ে সাফাইসূচক বিবৃতি দিয়ে বসেন। যেখানে তারা ভারতের এসব কাজের প্রতিবাদ করবেন, সেখানে তারা তৃতীয় পক্ষের মতো উদ্বেগ প্রকাশ করে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেন। এদিকে ভারত সীমান্তবর্তী বাংলাদেশীদের একের পর এক হত্যা করছে।

দেশের জনগণ, সরকারি ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সীমান্ত প্রহরীদের একটি অংশ, পুলিশ বাহিনী গং সকলের মনমস্তিষ্ক যেই মুহূর্তে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির চিন্তা-ভাবনায় আচ্ছন্ন, সেমুহূর্তে ভারত একেক এলাকা করে বাংলাদেশের মাটি দখল করে নিচ্ছে। সীমান্তবর্তী নদনদীর বিশাল চরসমূহ তারা দখল করে নিচ্ছে। সীমান্ত উত্তেজনা বজায় রেখে সংঘাত-সংঘর্ষ অব্যাহত রেখে আসছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের উত্তেজনা থেমেও যেন থামতে চাচ্ছে না। গত কয়েকমাস ধরেই নানান ছুতানাতায় ভারতীয় সীমান্ত প্রহরীরা বাংলাদশ সীমান্তে উস্কানিমূলক হামলা চালিয়ে আসছে। সীমান্তবর্তী বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা

www.pathagar.com

করছে। লুট করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের সহায়সম্পদ ধান, গরুবাছুর ইত্যাদি। এমনকি সীমান্তবর্তী বাংলাদেশীরা সব হামলার প্রত্যক্ষ শিকার বিধায় তারা নিজেদের শক্তিতে যথাসাধ্য প্রতিরোধের চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশ ভূমির অখণ্ডতাকে তারা নানানভাবে আহত করে আসছে। বলাবাহুল্য বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা ও তার জনগণের জন্যে এসব নেহায়েতই অবমাননাকর। অব্যাহত ভারতীয় তৎপরতার সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে ঠাকুরগাঁও সীমান্তে। ভারতীয় সীমান্ত প্রহরীরা দু'জন বাংলাদেশীকে গত বৃহস্পতিবার হত্যা করেছে। প্রকাশিত সংবাদসূত্র থেকে জানা যায়, ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ থানার দানজিপুর, ফকিরগঞ্জ সীমান্ত এলাকার দুই বাংলাদেশী নাগরিককে ভারতীয় বিএসএফ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ভারত সীমান্তে গুলী করে হত্যা করেছে। এঘটনায় সীমান্তে এখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। নিহতরা হচ্ছেন ভারতের উত্তর দিনাজপুর (রায়গঞ্জ) জেলার হেমতাবাদ থানার সুখা গ্রামের ৩৪১/৩ এস নং পিলারের বিপরীতে উপদইল গ্রামের মুহাম্মদ এবং সহিদুর রহমান। বিএসএফ এ দু'জনকে গভীর রাতে ডেকে নিয়ে সীমান্তের কাঁটা তারের বেষ্টনীর মধ্যে গুলী করে। এজন্যে তারা একটি মিথ্যা অভিযোগেরও আশ্রয় নেয়। বিডিআর দিনাজপুর ব্যাটালীয়নের সেক্টর কমান্ডার ও পীরগঞ্জ থানার ওসি মফিজউদ্দীন লাশ গ্রহণের জন্যে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তারা লাশ ফেরত দেয়নি। ফ্লাগ মিটিং ব্যর্থ হয়েছে। সীমান্ত উত্তেজনা সেখানে চরমে। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বসার পর থেকে ভারতীয় সীমান্ত প্রহরীরা বিনা উস্কানিতে ৬০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিশাল সীমান্ত এলাকা দখল, উস্কানিমূলক অব্যাহত উত্তেজনা বজায় রাখা ও বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যার ঘটনাবলী এদেশবাসীর কাছে আজ বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ, এটা সকলেই জানে যে, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের অতীব প্রিয় ও বন্ধু সরকাররূপে গণ্য। আওয়ামী নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি ছাড়াও তাদের আমলে ভারতের সাথে একের পর এক জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও ভারতের স্বার্থরক্ষাকারী চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাই প্রশ্ন জাগছে, বাংলাদেশে বন্ধু সরকারের বিদ্যমানতায় কি করে সীমান্তে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটছে? সীমান্তবর্তী বাংলাদেশী ভূমিও বা কি করে তারা এসরকারের আমলে একের পর এক গিলে খেয়ে চলেছে?

সীমান্তকেন্দ্রিক বাংলাদেশ বিরোধী ভারতীয় এই নীতির দু'টি অবস্থা হতে পারে। এক, ভারত হয়তো মনে করে বাংলাদেশে সমাসীন বর্তমান সরকারটি তাদের বশংবদ, এই সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে, তারা বাংলাদেশ বিরোধী যত কিছুই করুক না কেন এজন্যে তাদেরকে তেমন চ্যালেঞ্জ, প্রতিরোধ ও কড়া প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হবে না।

বাস্তবেও তাই দেখা যায়। বর্তমান আওয়ামী সরকার ভারতের অন্যায়ের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া তো দূরের কথা বরং তাদের ভূমিকা দেখলে সেই বিখ্যাত প্রবাদ বাক্যটির কথা মনে পড়ে।

www.pathagar.com

"মেরেছিস কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেবো না?" এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায় ৬০ জন বাংলাদেশীকে হত্যা সত্ত্বেও তার তেমন মাথাব্যথা হয় না বলে মনে হয়। প্রতিবাদের ভাষাও দুর্বল। বরং জটিল পরিস্থিতিতেও নিরব থাকে। বিরোধী দলের নেতারা যখন এই নীরবতার রহস্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখনই দায়সারা গোছের একটি বিবৃতি দিয়ে তাতে বিস্ময় প্রকাশ করে। অথচ বিস্ময় শব্দটি প্রকাশ করার কথা অন্য কোনো দেশের। ভুক্তভোগী হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আসবে কড়া প্রতিবাদ অথবা কোনোরূপ দাঁতভাঙ্গা জবাব। কিন্তু তা আসে না। ফলে ভারতও এ সরকারকে নিজের বশংবাদ সরকার মনে করে হোক বা অপর কিছু, এখন "অতি আপন" মনে করে একেবারে আমাদের অন্দর মহলে ঢকুতেও দ্বিধা করছে না, যেমন কয়েকদিন পূর্বে "উসামা বিন লাদিন" ও তার সহযাত্রীদের হারিকেন দিয়ে খোঁজার জন্যে আমাদের রাজশাহী সীমান্ত দিয়ে ঢুকে পড়েছিল, যেমনটি তারা করে প্রতিবেশী বশংবদ আরো দু'একটি রাষ্ট্রের বেলায়। ভূটান, নেপাল কর্তৃপক্ষ তাদের আভ্যন্তরীণ ঘরোয়া কোনো বিরোধে মীমাংসায় পৌঁছুতে না পারলে তখন ভারত সেসব দেশস্থ নিজেদের তল্পীবাহকদের মনোবল বৃদ্ধির জন্যে নিজেদের সীমান্ত বিদ্রোহীদের ধাওয়া করার উসিলায় বা অপর কোনো ছুতা ধরে ঐসব দেশের সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে ঐগুলোর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে আদৌ দ্বিধা করে না। বাংলাদেশের বেলায়ও তারা এ সরকারের আমলে এমনিভাবে সম্প্রতি সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে ঢুকে পড়েছিল, যদিও পরে এর চাতুর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছে। এটাকে তাই পর্যবেক্ষক মহল টেস্টিং কেইস বলে আখ্যায়িত করেছে।

দুই সীমান্তে বাংলাদেশ বিরোধী ভারতীয় অপতৎপরতার দ্বিতীয় কারণটি এই হতে পারে যে, ভারত মনে করে থাকবে, এদেশে আমার বশংবদ সরকারতো আছেই, যারা সকল সময় সকল প্রকার চুক্তি এমনকি জাতীয় অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জকারী বিষয় সংক্রান্ত চুক্তিতেও আমার (ভারতের) স্বার্থ রক্ষায় প্রস্তুত। এমতাবস্থায় ভারতের স্বার্থে যত প্রয়োজনীয় চুক্তি করা দরকার একদিকে তার গায়ে হাত বুলিয়ে অপরদিকে সীমান্ত পথে চাপ সৃষ্টি করে নরম-গরম কৌশল প্রয়োগে সেগুলো করিয়ে নিতে হবে। বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর বিদ্রোহ দমনকল্পে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের উপরদিয়ে যেই করিডোরটি অধিক প্রয়োজন ট্রানশিপমেন্টের নামে হোক বা অপর যেই কোনো নামে, সীমান্তে চাপ সৃষ্টির দ্বারা বাংলাদেশকে আতঙ্কিত করে হলেও সেই চুক্তিটি এ সরকার থাকতে থাকতেই করিয়ে নিতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, গত দীর্ঘদিন থেকে ভারতীয় পত্র-পত্রিকাসমূহে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর বিদ্রোহীদের বাংলাদেশে প্রবেশ এবং এখান থেকে বিদ্রোহের ট্রেনিং গ্রহণ ও পরিকল্পনা তৈরি, বাংলাদেশে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ও উসামা বিন লাদেনের অনুসারীদের তৎপরতা বৃদ্ধির উদ্ভট কাহিনীসমূহ অব্যাহতভাবে প্রকাশ করে যাওয়া একথারই প্রমাণ যে,– ভারত তার পরবর্তী কোনো দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্যেই প্রেক্ষাপট তৈরির অংশ হিসাবে এসব করে চলেছে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, ভারত তার অংকিত

www.pathagar.com

দুরভিসন্ধিটি কার্যকর করার লক্ষ্যে উল্লেখিত কোনো ষড়যন্ত্র সফল না হলে বাংলাদেশে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করবে। এজন্যে সে তার বশংবাদ ও তল্পীবাহকদের দ্বারা বারবার এখানে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার অবতারণা করে থাকে। যদিও বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দিক থেকে একটি নজিরবিহীন দেশ। অনুমান করা হচ্ছে যে, উল্লেখিত তথাকথিত কাল্পনিক বিদ্রোহীদের দমন অথবা আশংকিত সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টির দ্বারা কৃত্রিম শরণার্থী সংকট তৈরি করে, উক্ত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ছুতায় সে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

মোটকথা, ভারতীয় কোনো কোনো ব্যক্তি ও তার পত্র- পত্রিকায় মিথ্যা প্রচারণা ও ভারত কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতার জবাবে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ না আসায় এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ সরকারের দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয়।

‘কেসাস’ আইনের অনুপস্থিতিই ৬০ খুনের আসামী এরশাদ শিকদারদের জন্ম দিয়েছে

[প্রকাশ ঃ ১৮. ৯. '৯৯ ইং]

বর্তমানে সারাদেশে প্রায় প্রতিদিন রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক বিভিন্ন নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটছে। সন্ত্রাসী তৎপরতা, বিপুল অর্থ ছিনতাই, লুট, নারী ধর্ষণ, ডাকাতি রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধমূলক তৎপরতায় দেশবাসী হতবাক তারা অধিক হতবাক এ জন্যে যে, গণতন্ত্র অর্থনৈতিক উন্নতি, শান্তি, নিরাপত্তা ইত্যাদির লক্ষ্যে তারা যেই সরকারকে ক্ষমতায় বসালো, সেই সরকারের আমলেই এইসব অপরাধ বহুগুণ বেড়ে চলেছে এবং সমাজ বাসের অনুপযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে আজকাল এমন সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে যে- খুলনার এক মহা সন্ত্রাসী একাই তার অপকর্মের শরিকদের নিয়ে মোট ৬০ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। সমাজের সন্ত্রাসী খুনীদের এসব লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পর্শী কাহিনীসমূহ একের পর এক বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়ে চলেছে। বহু খুনের নিষ্ঠুরতম নায়ক, দেশে হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের সর্বোচ্চ সংখ্যক খুনের এই খুনী হচ্ছে খুলনার এরশাদ আলী শিকদার। এরশাদও তার সহযোগীদের গণহত্যার লোমহর্ষক কাহিনীসমূহ পাঠ করে মানুষ হতভম্ভ হয়ে যাচ্ছে যে, দেশে সরকার, বিভিন্ন প্রকার বাহিনী এবং প্রশাসন থাকা সত্ত্বেও মানব নামের অনুপযোগী দরেন্দা স্বভাবের এই নরঘাতক কি করে এতদিন এদেশে এহেন গণহত্যাচালিয়ে নিরাপদে ছিল? তার সম্পর্কে খুনের চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে টপটেরর এরশাদ আলী শিকদারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী নূর আলমের দেয়া ১৬১ ও ১৬৪ ধারায় দু'টি জবানবন্দিতে। এরশাদ শিকদারের বিপুল হত্যাকাণ্ডের অজানা লোমহর্ষক কাহিনীসমূহ তার মুখ থেকে বিবৃত হয়েছে। এই নরঘাতক মোট ৬০ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে

www.pathagar.com

দেহরক্ষী নূরে আলমের জবানবন্দীতে উল্লেখিত হয়েছে। একেকটি মানুষকে সাধারণ অজুহাতে এবং নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে নির্মমভাবে হত্যা করে প্রতিটি লাশ জমাট বাঁধা সিমেন্টের সাথে বেঁধে নদীতে ফেলে দেয়া হতো। তার হাতে ছিল বিপুল বেআইনী অস্ত্র এবং ঐসব অস্ত্রধারী এক দুর্ধর্ষ বাহিনী। এরশাদ শিকদারের বধ্যস্থল নদী ঘাট এলাকায় অস্ত্র উদ্ধারের জন্যে অভিযান চালানোর কাজ চলছে। ইতিমধ্যে এরশাদ শিকদার ও তার দোসরদের দ্বারা হত্যার শিকার বিভিন্ন ব্যক্তির কার মোটর সাইকেল, ও অন্যান্য আলামত ঐ ঘাট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তার খুনের ঘটনার তথ্যাবলী কোনো দিন ফাঁস হয়ে না যায়, এজন্যে ঐসব ঘটনার সাক্ষী-শরিকদার আপনজনদেরকেও সে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। তারপরও নিজের গোপন তথ্য ফাঁস হওয়ায় সে ধরে নিল, নিজ ভাগ্নে জাহাঙ্গীর তার টাকা পয়সার লেনদেন করতো। সে হয়তো তার শত কোটি টাকার মালিক হবার এ তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে জাহাঙ্গীরই, কাজেই তারও বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এ কারণে জাহাঙ্গীরকেও সে হত্যা করে।

উল্লেখ্য গত ১১ই আগস্ট গ্রেফতারকৃত এরশাদ ইতিপূর্বে ক্ষমতাসীন দলে যোগদিয়ে ৩০টি মামলার ২৬টি থেকে নিষ্কৃতি পায়। মামলাগুলো থেকে সে কিভাবে নিষ্কৃতি পেলো পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে বলে জানা যায়। ঢাকা জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে ৭ দিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে এরশাদকে গত ৩১ আগস্ট যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়। গত মঙ্গলবার পুলিশ এরশাদ শিকদারের বিলাস বহুল 'স্বর্ণকমল' বাড়িতে অভিযান চালায়। সম্প্রতি খুলনা হাদীস পার্কের সামনে এরশাদ শিকদারের হাতে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এরশাদ শিকদারের হাতে খুন হওয়া লোকদের আপনজনরা এ যাবত ভয়ে কোনো কথা না বললেও তারা এখন একের পর এক এই খুনীর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এতে সন্দেহ নেই যে, ৬০টি খুনের আসামী এরশাদ আলী শিকদারের বিচার হলে হয়তো তার ফাঁসি হবে। এই সঙ্গে প্রমাণ সাপেক্ষে এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডসমূহের সাথে জড়িত অন্য কিছু সংখ্যক লোকেরও হত্যার বিচার হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সব চাইতে বড় প্রশ্ন হলো, এরশাদ শিকদার ও তার সহযোগীরা যখন এসব হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে, তখন বা এর পরবর্তী পর্যায়ে এদেশে কি কোনো সরকার ও সরকারি প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য ছিল না? সে তো এসব ঘটনা অপর কোনো গ্রহে গিয়ে করেনি? খুলনায় তখনও পুলিশ ছিল, পুলিশ কর্মকর্তা ছিল, রাজনীতিকরা ছিলেন, সাংবাদিকরা ছিলেন। হতাহতের একেকটা ঘটনা হজম করতে তাকে অবশ্যই উল্লেখিত লোকদের মুখ বন্ধ করণে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। অন্যথায় এতগুলো দুষ্কর্মের হোতা হয়েও তারপক্ষে কি করে এ যাবত সকল ধরা ছোয়ার বাইরে অবস্থান করা সম্ভব হয়েছে?

এটা করতে গিয়ে তাকে শুধু উল্লেখিত ব্যক্তিদের মধ্যেই বিপুল অর্থই খরচ করতে হয়নি, বিভিন্ন সময় ক্ষমতার হাত বদলের সাথে সাথে ক্ষমতাসীন পরিবর্তিত রাজনৈতিক মহলের সাথে অভিন্ন কৌশলের অভিনয় করে, অঢেল অর্থ ব্যয় করে

www.pathagar.com

চলতে হয়েছে। এলাকার স্থানীয় বিশেষ বিশেষ চরিত্রের ধোপদুরস্ত লোকদের এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতা নিতে হয়েছে। এভাবে চতুর্দিক আটঘাট মেরেই সে তার হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। অপরদিকে স্থানীয় লোকজন এসব হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জেনেও যখন লক্ষ্য করলো যে, থানা, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক মহল এই নরঘাতকের বিরুদ্ধে কোনোই ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তখন তারা অধিক ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রাণভয়ে সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করে, যার জন্যে তাদের দায়ী করাও কঠিন। এমতাবস্থায় স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, যারা উৎকোচ পেয়ে নরঘাতক এরশাদ আলী শিকদারের এই জঘন্যতম নরহত্যাকে বিভিন্ন সময় ধামাচাপা দিয়ে আসছে, যাতে তার বুকের পাটা আরও বেড়ে গেছে এবং হত্যাযজ্ঞের শিকার মানুষদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, এ জন্যে তারাও দায়ী নয় কী? বরং বলা চলে প্রশাসন, রাজনৈতিক মহল ও সমাজের আরও যেই মহলের লোকদের দায়িত্বহীনতা কিংবা স্বার্থপরতা এদেশে খুনের ইতিহাসের এই লোমহর্ষক ঘটনাসমূহের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সহায়তা দিয়েছে, তাদের সকলেই অভিন্ন অপরাধে অপরাধী বলে স্বাভাবিক বিচারবোধই দাবী করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের দেশে সামাজিক অপরাধ প্রবণতার মধ্যে নুনের চাইতেও যেন খুন সস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামান্যতম স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে সেই স্বার্থ রক্ষা করতে তাৎক্ষণিকভাবেই কেউ অপরজনের প্রাণ সংহার করতে দ্বিধা করে না। বলাবাহুল্য, এমন একটি অবস্থা কোনো সমাজে তখনই সৃষ্টি হয় যখন সেই সমাজে অপরাধীরা রাজনৈতিক কারণ বা অসাধুতাবশত শাস্তি পায় না এবং নানান উপায়ে এরূপ জঘন্যতম অপরাধ করেও তা হজম করে ফেলে। এরশাদ যে তার যাবতীয় অপকর্ম, অর্থ ও ভয়াবহ সন্ত্রাসী তৎপরতার থাবা এ যাবৎ ঢেকে রাখতে সক্ষম হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। পত্রান্তরে প্রকাশ, সাম্প্রতিক গ্রেফতারের পরও পরিকল্পনা মাফিক মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে এরশাদ ও তার দোসররা প্রশাসন ও কোনো রাজনীতিকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সূত্রমতে, এরশাদ আলী শিকদার ধরা পড়ার আগে ঠিক করে রেখেছিল কাকে কতো টাকা দিতে হবে কোথায় কোথায় তদ্বির চালাতে হবে। এই চক্রের হাতেই নাকি এরশাদের প্রায় ২০০ আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। এসব অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে আধুনিক রাইফেল, রিভলবার, এমনকি নৌবাহিনীর সদস্যদের ব্যবহারযোগ্য একটি অস্ত্র। এরশাদের অস্ত্রের নিয়ন্ত্রক দেহরক্ষী গ্রেফতারকৃত নূরে আলম তার জবানবন্দীতে এসব অস্ত্রের কথা জানিয়েছে।

সমাজে সাম্প্রতিককালের ক্রমবর্ধমান হত্যা-খুনের ঘটনাবলী বিশেষ করে এরশাদ আলী শিকদারের এসব ঘটনা একথারই প্রমাণ যে, মানব রচিত আইনের দ্বারা মানুষের শান্তি আনতে পারে না, এ জন্যে মহান আল্লাহর প্রদত্ত নিরপেক্ষ আইনই প্রয়োজন। এটি যেমন ন্যায়ভিত্তিক তেমনি যৌক্তিকও। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা বোধকল্পে সমাজ থেকে হত্যা অপরাধ উচ্ছেদ ও হত্যাকারীর জন্যে প্রাণদণ্ডের বিধান রেখেছেন, যাকে এক এক সময় পশ্চিমা বস্তুবাদী সমাজ বর্বরতাপূর্ণ আইন বলে আখ্যায়িত করলেও আজ তার যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। গুরু অপরাধে গুরুদণ্ড এবং

www.pathagar.com

লঘু অপরাধে লঘু দণ্ড, এটাই গুরু অপরাধে লঘু দণ্ড প্রদান মূলত অপরাধীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করারই নামান্তর, যা এই অপরাধ দমনে কিছুতেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হতে পারে না। আল্লাহ এই মর্মে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, ওয়া ফিল কিসাসে হায়াত-অর্থাৎ "কিসাস বা খুনীর প্রাণদণ্ডের মধ্যেই রয়েছে (অপর) মানুষের জীবনের নিরাপত্তা" সমাজে যেসব এরশাদী আলী ও তার চরিত্রের মানবরূপী নরঘাতক রয়েছে–এসব লোককে কুরআনের 'কিসাস' আইন অনুসারে প্রথম খুনের অপরাধেই বিচার করে প্রানদণ্ড দেয়া হলে ৬০টি হত্যাকাণ্ডের অন্তত ৫৯টি মানুষের জীবন অবশ্যই রক্ষা পেতো। সুতরাং ৬০ খুনের হত্যার আসামী এরশাদ আলী শিকদারকে প্রথম খুনের পর কিসাসের সম্মুখীন করার পথে যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করেছে, তাদের সকলেই পরবর্তী হত্যার জন্যে কমবেশ দায়ী, না একমাত্র সূক্ষ্ম বিচারেই নির্ণিত হতে পারে। আমাদের সমাজ থেকে ক্রমবর্ধমান হত্যা, খুন প্রবণতা রোধ কল্পে যেমন অগৌনে কুরআনের আইন চালু অপরিহার্য তেমনি যেসব বিষয় সমাজে হত্যা অপরাধের কার্যকারণ হিসেবে প্রশ্রয় পেয়ে আসছে, সেগুলোর উৎখাতও অপরিহার্য। পরিতাপের বিষয় যে, হত্যা, ধর্ষণ, ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টির উপায়-উপকরণের পরোক্ষ জোগান অনেকটা সরকারি পোষকতার সাহায্যেই হয়ে থাকে, যে ব্যাপারে কেউ গভীর প্রতিকারে এগিয়ে আসতে চায় না। পরিস্থিতির নাজুকতার প্রেক্ষিতে এখন সকলেরই এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা কর্তব্য। দুনিয়াতে আল্লাহর বিধানকে আমরা উপেক্ষা করলেও একদিন তার দিকেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া উপায় নেই, এই বাস্তবতা সকলের সময় থাকতে স্বীকার করে নেয়া কর্তব্য।

কুরআনের আইন বিকৃত করার অপপ্রয়াস!

[প্রকাশ ঃ ১৩. ৯. '৯৯ ইং]

কুরআন বিকৃত করা, কুরআনের আইন বানচাল করার জন্যে অপর কোনো নতুন আইন রচনার চেষ্টা করা ইত্যাদি অবিশ্বাস্য কথা যেখানে এদেশে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, বর্তমান শাসনামলে সেসব কথাই এদেশবাসীকে শুনতে হচ্ছে। শোনা যায় সমাজের কোনো নরাধম লম্পট জ্বিনাকার যদি কোনো নারীর সাথে জ্বিনা করে আর তার পরিণতিতে কোনো সন্তান জন্মে, সেই সন্তানকে উক্ত জ্বিনাকারের সহায়-সম্পদ থেকে মীরাস বা উত্তরাধিকার দানের আইন তৈরির জল্পনা কল্পনা চলছে।

এসব জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে সেসব সমাজের, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা মেশায় কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেখানে ইতর-প্রাণীর ন্যায় নারী-পুরুষ যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া দোষণীয় কিছু নয় এবং যুবতী কিশোরীরা বেগানা পুরুষের সাথে লিভটুগেদার বা একত্রে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় বসবাস করে। সেসব খোদাদ্রোহী সমাজের এ

www.pathagar.com

সমস্ত রীতি-নীতি নিয়ে এই মুসলিম সমাজে আইন তৈরির জল্পনা-কল্পনা করা এবং জ্বেনাকারের অবৈধ সন্তানকে তার সম্পত্তি থেকে উত্তরাধিকার দানের চিন্তা-ভাবনা করা মূলতঃ এই তাওহিদী সমাজে জ্বেনা ব্যাভিচারের দ্বার উন্মুক্ত করার প্রয়াসেরই নামান্তর। এ ধরনের নোংরা ও অসুস্থ চিন্তা তথাকথিত পুঁজিবাদী সমাজের পুতি গন্ধময় অবস্থার প্রতি আসক্ত বিকৃত চিন্তার কোনো মানুষই করতে পারে। অন্যথায় সমাজে জ্বেনার মতো একটি জঘন্য অপরাধ ও যাবতীয় অশ্লীলতার দ্বার রুদ্ধ করার জন্যে যেখানে ইসলাম এই অপরাধের অনুপ্রেরক সকল তৎপরতা ও কার্যকারণ উচ্ছেদ করার নির্দেশ দেয়, সেখানে ঐসব বিষয় চিন্তা না করে উল্টা নারী-পুরুষকে যৌথ অপরাধে উদ্বুদ্ধকারী কার্যক্রমকে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে চালুর অনুমতি দিয়ে সেই অপরাধের "বাই প্রডাক্ট"-এর জন্যে মায়া কান্না এ কোন নোংরা চিন্তা? এর নির্গলিত অর্থ কি এই নয় যে, সমাজে জ্বেনা-ব্যভিচার যা চালু হয়েছে এবং এ ব্যাপারে যুবক-যুবতীদের উদ্বুদ্ধকারী অশ্লীল যেসব ছায়াছবি ও পত্র-পত্রিকার সরকারি অনুমতি এদেশে চালু আছে, তা বহাল থাক, তাতে হাত দেয়া যাবে না বরং এর অপফসল হিসাবে যেসব "হারামজাদা সন্তান" জন্ম নিবে, তাদের লালন-পালনার্থে এদের অবৈধ পিতার সম্পত্তিতে তাদের মালিক করতে হবে? এতো রীতি মতো অবৈধ জনক তথা জ্বেনাকারদের বহাল রাখার আইন তৈরি করার চেষ্টা!

কোটি কোটি মুসলমানের এই দেশে যারা এহেন চিন্তা করে, তাদের চেহারা দেশবাসীর সামনে ভালোভাবে উন্মোচিত হওয়া উচিত। এদেশের মুসলমানদের অর্থ খেয়ে এবং এখানকার মুসলমানদের ভোট ও সমর্থন নিয়ে এক শ্রেণীর লোক কিরূপ গর্হিত চিন্তায় লিপ্ত তা দেশবাসীকে জানানো জরুরি হয়ে পড়েছে। এসব নোংরা চিন্তাকারীদের দেশবাসীর বলা উচিত-এই তওহীদি সমাজে তোমাদের বসবাস করতে অসুবিধা হলে তোমরা সে সব সমাজে চলে যাও, যেখানে অবাধ যৌন অনাচার চলে, তবুও এহেন নোংরা প্রলাপ দিয়ে এ সমাজ পরিবেশকে কলুষিত করবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রে অক্ষম ব্যক্তি, অসহায়, এতিম ও বিকলাঙ্গ মাজুরদের লালন-পালনের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত রয়েছে। তার সেই দায়িত্বই ঠিকভাবে পালন করা কর্তব্য। এবং যেই সন্ত্রাসী প্রবণতার শিকার হয়ে পিতা নিহত হওয়ায় সন্তান এতিম হলো, কিংবা পিতার কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় অনাহার অর্ধাহারে সে অক্ষম হয়ে পড়লো, সরকারের উচিত সেই সন্ত্রাস নির্মূল করা ও বেকারত্বের গ্লানি বহনকারী ব্যক্তিটির জন্যে কর্মসংস্থান করা। তা না করে সন্ত্রাস বহাল রাখা কিংবা কোনো নাগরিকের বেকারত্বের গ্লানি বৃদ্ধির নীতি অনুসরণ করে তার সৃষ্ট এতিম ও অক্ষমের প্রতি মায়াকান্না মূল সমস্যার হোতাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান ছাড়া কিছু হতে পারে না।

মূলত সরকারি পর্যায়ের এসব বিকৃত চিন্তাভাবধারাই দেশের সমাজ সচেতন ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধর্মীয় চিন্তাবিদদের বিচলিত করে তুলেছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর '৯৯ শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে নারী ও শিশু নির্যাতনের কারণ ও তার প্রতিকার" শীর্ষক

www.pathagar.com

এক সেমিনারে সেই উদ্বেগেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে। 'ইসলামী 'ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বংলাদেশ' এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা ওবায়দুল হক বলেছেন,–মুসলিম পারিবারিক আইন হিসাবে দেশে কুরআনের যে মিরাস বা উত্তরাধিকার আইন রয়েছে, তা পরিবর্তনের অধিকার কারও নেই। মীরাসী আইন পরিবর্তনের অপচেষ্টা কুরআনকে পরিবর্তন ও বিকৃত করারই শামিল। এদেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইনে খোদ বৃটিশ সরকারসহ আজ পর্যন্ত কেউ পরিবর্তন আনতে সাহসী হয়নি। অথচ আজ স্বাধীন এই মুসলিম রাষ্ট্রে বর্তমান শাসনামলে কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে অনাস্থা সূচক আইন চালুর অপচেষ্টা চলছে। জনাব খতীব বলেন,–অমুসলিমরা পর্যন্ত মুসলিম আইনের অনেক কিছুই নিজেদের জন্যে কল্যাণকর চিন্তা করে তা গ্রহণ করেছে। হিন্দু সমাজে আগে তালাক, বিধবা-বিবাহ হতো না। এখন হচ্ছে। তাদের মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে এক-অংশও পায় না। এখন সেটাও দেয়ার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। পরিতাপের বিষয় যেখানে মুসলিম পার্সোনাল 'ল' দ্বারা অমুসলিমরা পর্যন্ত প্রভাবিত হচ্ছে, সেখানে এক শ্রেনীর লোক ইসলামী আইন সংশোধনের প্রস্তাব করতে দ্বিধা করছে না। জনাব খতীব বলেন, জ্বেনা-ব্যাভিচারকে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে কুরআন নির্দেশ দিয়েছে। জ্বেনার সঙ্গে মিরাসী আইনকে সম্পর্কিত করে দেখানো হচ্ছে। জ্বেনাকারের জন্যে শাস্তির বিধান রয়েছে, সেই বিধান প্রয়োগ করে সমাজ থেকে এই অশ্লীলতা দূর করা হলে অবৈধ সন্তানকে তার অবৈধ জনকের সম্পত্তির মালিক বানানোর উদ্ভট চিন্তার দরকার হয় না। জ্বিনাকারকে শাস্তিদানের মধ্য দিয়েই এই সমস্যার সমাধান হয়।

আসলে ইসলামই নারীদেরকে যথার্থ মর্যাদায় ভূষিত করেছে। নারী অধিকার মূলত ইসলামেই স্বীকৃতি পায়। তাদেরকে পিতা, স্বামী এমনকি পুত্র আগে মারা গেলে তার সম্পত্তিতেও নারীদেরকে ইসলাম অধিকার দিয়েছে। তা সত্ত্বেও ইসলামের ব্যাপারে অজ্ঞ কিংবা বিজাতীয়দের ক্রীড়নক একশ্রেণীর নারী-পুরুষ নারীদের কুটিল সহানুভূতি দেখিয়ে নারীদের প্রশ্নে কুরআনের নির্ধারিত আইনের পরিবর্তন দাবী করে। মজার ব্যাপার এই যে, হিন্দু সমাজে যেখানে আদৌ পিতার সম্পদে নারীর উত্তরাধিকার নেই সেখানে এই মহলটি সম্পূর্ণ নীরব। ফলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আসলে প্রগতিবাদের নামে এই মহলটির উদ্দেশ্য নারীদের অধিকার আদায় নয় বরং এ ধুয়া তুলে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর উত্তরাধিকার আইনের বিকৃতি সাধন ও ইসলামের ক্ষতিকরা। এই দুরভিসন্ধির কাছে কোনো মুসলিমই নতি স্বীকার করতে পারে না।

বিশ্বময় মহাস্রষ্টা আল্লাহর বিধানের প্রতি সত্যান্বেষী বিবেকবান মানুষদের আকর্ষণ বেড়ে চলেছে। মানব রচিত আইন দেশে দেশে মানুষকে শান্তি দানে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বড় বড় বুলি যারা কপচিয়ে থাকেন, তাদের অনুসৃত নীতি তার বিপরীত হওয়াতেই বিশ্ববাসীর মনে সৃষ্ট হতাশা থেকে মানুষ ইসলামের শাশ্বত ঐশী বিধানসমূহকে আরেকবার নিজেদের সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী

www.pathagar.com

হচ্ছে। তারা এর সুফল আবার দেখতে আগ্রহী। বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের এই জাগরণ প্রত্যক্ষ করেই এর বৈরী শক্তিসমূহ দেশে দেশে নানান নামে মুসলমানদের ইসলামী চেতনা বিনষ্টকারী কার্যক্রমের সূচনা করেছে। তারা একটি মুসলিম দেশে তাদের তল্পীবাহক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনুসারী ভোগবাদী নেতাদের দ্বারা ইসলাম বিরোধী কর্মসূচী বাস্তবায়নের চেষ্টা করে চলছে। ইসলামের আন্তর্জাতিক এসব বৈরী শক্তির লক্ষ্য হলো সুকৌশলে প্রতিটি মুসলিম সমাজে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করা, যেন ইসলামের প্রতি আধুনিক শিক্ষিত যুবসমাজ বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। তাদের উদ্দেশ্য হলো ইসলাম সম্পর্কে মানুষের স্বাভাবিক ধারণার ভিত্তিমূলে আঘাত হানা। কারণ, ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধ বিদ্যমান থাকাবস্থায় কোনো মুসলিম সমাজে অপর কোনো মতাদর্শ মুসলিম জনচিত্তে গ্রহণীয় করে তোলা সম্ভব নয়। আর এভাবে বিশ্বময় বস্তুবাদী সভ্যতার প্রবক্তাদের ভোগবাদী নীতি আদর্শকে বিশ্বের সকল সমাজে প্রতিষ্ঠার দ্বারা নিজেদের আধিপত্যবাদী কর্তৃত্ব বজায় রাখা। তারা যেভাবে রাজনৈতিক দর্শন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দেবে এবং যে ধরনের অর্থনৈতিক বিধান দেবে, যেভাবে নারী স্বাধীনতা চাইবে, যেভাবে উত্তরাধিকার আইন রচনা করবে, সেটাই বিশ্বময় সকলে মেনে নিতে বাধ্য হবে। মুসলমান বিশ্বের যেখানেই ইসলামী অনুশাসনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন চালাবার প্রশ্ন আসে বা এ নিয়ে আন্দোলন দেখা দেয়, ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরি শক্তি ও তাদের স্থানীয় তল্পীবাহকদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগার মূল রহস্য এখানেই। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার শ্লোগান বহু ক্ষেত্রে প্রকৃত স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিরোধী হলেও তারা মুসলিম দেশে কিছুতেই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সফল হতে দিতে চায় না। ছলে-বলে-কৌশলে এ প্রয়াসকে তারা ব্যর্থ করতেই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

বাংলাদেশে কুরআনের উত্তরাধিকার আইনকে বিকৃত করে জ্বিনাকারের অবৈধ সন্তানকে তার সম্পদ-সম্পত্তি থেকে মিরাস বা উত্তরাধিকার দেয়ার যেই ঘৃণ্য জল্পনা-কল্পনা চলছে, তা মূলত ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তিসমূহের ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। এর পটভূমি অনুধাবন না করে যে বা যারাই এহেন ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেবে, সেটা নির্ঘাত কুরআন বিরোধী এবং দেশে জ্বেনা-ব্যাভিচার ও 'লিভটুগেদার' ইত্যাদি 'বদমাশি' পশুবৃত্তিতে সহায়তার নামান্তরই হবে, যার পরিণতি কাফির হয়ে মৃত্যবরণ করা। মোটকথা, এ দেশের ধর্মমান মুসলমানরা কিছুতেই এটা চায়না যে, এখানে অপরাধের মূল উৎস বহাল রেখে তার কোনো অপফসল রক্ষার ভ্রান্ত নীতির অনুসরণ করা হোক বরং তাদের দীর্ঘদিনের দাবী হলো, সরকারি -বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যভিচারসহ যত অপরাধ প্রবণতার নিমিত্ত রয়েছে সেগুলোর কার্যকারণসমূহের উৎখাত হোক। আর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব তওহীদবাদী এ দেশের মানুষের জীবন-চেতানা ও জীবনবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোক। তার ব্যতিক্রম ইসলাম বিরোধী কোনো কিছুই দেশবাসী মেনে নিতে পারে না, মেনে নেবেও না কখনো।

www.pathagar.com

উপমহাদেশের শান্তি এবং কাশ্মীর

[প্রকাশ ঃ ৬. ৯. '৯৯ ইং]

ভারত-পাকিস্তান উত্তর দেশের কোনোটিই যুদ্ধযুদ্ধ খেলার বিলাসিতা দেখানোর অবস্থায় নেই। উন্নত বিশ্বের জীবনযাত্রার মানের তুলনায় বাংলা-পাক ভারত উপমহাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক নিচে। জনবহুল এসব দেশকে সমস্যার পাহাড় অতিক্রম করতে হচ্ছে। এখনও এসব দেশ অর্থাভাবে জাতীয় উন্নয়নের বহু জরুরি অবকাঠামোই তৈরি করতে পারেনি। জনগণের ৫টি মৌলিক অধিকার ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে প্রতিটি দেশের লক্ষ কোটি মানুষ বঞ্চিত। কিন্তু তারপরও নেতৃত্বের ভুল সম্প্রসারণবাদী চিন্তা ও কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার প্রবণতা হেতু উপমহাদেশের মানুষদেরকে নিজেদের নেতৃত্বের খায়েশ ও দুরভিসন্ধি চারিতার্থ করতে গিয়ে বারবার প্রাণ সম্পদের অঢেল খেসারত দিয়ে আসতে হচ্ছে। অতি সম্প্রতি কারগিলের যুদ্ধ এবং গত ২/৩ সপ্তাহ ধরে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত প্রহরীদের মধ্যে গোদাগাড়ী ও বিলুনিয়ায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতীতের কথা যাই হোক, ভারত-পাকিস্তান পরাশক্তিতে পরিণত হবার পর পৃথিবীর এই অঞ্চলের নেতারা যদি আগের মতোই যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে অটল থাকেন এবং অন্যায়ভাবে অপর প্রতিবেশীর এবং দেশের অধিকার হরণ ও তাকে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত করার হটকারী নীতির অনুসরণ করে দ্বিপাক্ষিক বিরোধসমূহ নিষ্পত্তিনা করেন, তা হলে একে কেন্দ্র করে সৃষ্ট কোনো উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে উগ্রমাথার কোনো নেতৃত্ব পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করে বসতে পারে। ফলে পৃথিবীর এই অঞ্চলে এর ভয়াবহ পরিণতি দেখা দিতে পারে। পিটিআই পরিবেশিত এক তথ্যে জানা যায়, ১৯৪৫ সালে হিরোসিমা শহরের ওপর নিক্ষিপ্ত একই ক্ষমতাসম্পন্ন ধ্বংসাত্মক একটি পারমাণবিক বোমা ভারত ও পাকিস্তানের কোনো শহরে বর্ষণ করা হলে ৮ লাখ মানুষ মারা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী এমভি রামানা গত ২৪শে আগস্ট (৯৯) নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের একথা জানান। তিনি বলেন, ১৫ কিলো টনের একটি বোমা উভয় দেশের কোনো একটিতে নিক্ষিপ্ত হলে অগ্নিঝড়, তেজস্ক্রিয়তা, আঘাত এবং তীব্র বায়ু প্রবাহের কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যেই ১ লাখ ৬০ হাজার থেকে ৮ লাখ ৬৬ হাজার লোক মারা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা কর্তৃক জাপানের হিরোসিমায় বোমা বর্ষণে ১ লাখ ৬০ হাজার লোক মারা গিয়েছিল বিকলাঙ্গ হয়েছিল হাজার হাজার জাপানী। বিজ্ঞানী রামানা বলেন, ১৫০ কিলো টনের একটি বোমা বিস্ফোরিত হলে ৭ লাখ ৩৬ হাজার থেকে ৮ লাখ ৬৬ হাজার লোক মারা যেতে পারে। তিনি উভয় দেশের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের উপর নিরীক্ষা চালান। তার বর্তমান হিসেবে বোমার প্রতিক্রিয়ায় ক্যান্সার অথবা জনেটিক মিউটেশনের মত দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া ধরা হয়নি।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের যোগ্যতা, নিষ্ঠা, দুরদর্শিতা, দেশপ্রেম ও জনদরদ একটি জাতিকে উন্নতি, সমৃদ্ধির উত্তুঙ্গ চূড়ায় সমাসীন করে। তেমনি তাদের অযোগ্যতা,

www.pathagar.com

দাম্ভিকতা, অপরের উপর অন্যায়ে প্রভুত্ব বিস্তার ও নিজ কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার লক্ষ্যে অন্ধ হটকারিতা সংশ্লিষ্ট জাতিকে পথে বসিয়ে ছাড়তে পারে। এদিক থেকে বাংলা-পাক-ভারতের বর্তমান পারস্পরিক তিক্ততাজনিত অশান্ত পরিস্থিতিসহ গত অর্ধশত বছরের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সংঘাত-সংঘর্ষ ও পটপরিবর্তনের ইতিহাসের দিকে তাকালে, উল্লেখিত দৃশ্যই স্পষ্ট হয়ে উঠে। দীর্ঘ এই সময়ে জাতীয় ও আন্তঃদেশীয় ঘটনাবলী বিশেষ করে এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে অপর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত কিংবা পানি, গ্যাস, ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ অথবা কাশ্মীরের ন্যায় সাবেক কোনো দেশীয় রাজ্য বা তালপট্টির ন্যায় সুমুদ্রে গজিয়ে ওঠা।

নতুন কোনো ভূখণ্ডের মালিকানা ছিনিয়ে নেয়ার অবৈধ প্রবণতাকে কেন্দ্র করে এসব দেশে ছোটবড় অনেক তিক্ত ঘটনা ঘটছে এবং এখনও ঘটায়মান অবস্থাতেই রয়েছে। কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে তিন তিনবার মারাত্মক যুদ্ধ ঘটে গেছে। প্রাণ ও সম্পদের হানি ঘটেছে প্রচুর। এই ধারাবাহিকতারই এক পর্যায়ে বছর খানিক আগে প্রথমে ভারত সফল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। তাতে পাকিস্তানসহ উপমহাদেশীয় অন্যান্য দেশ ও প্রতিবেশী দেশসমূহে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কারণ গত অর্ধশত বছর যাবত ভারত তার প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পারস্পরিক সহাবস্থান নীতি বজায় না রেখে নিজের অধিপত্যবাদী চরিত্রেরই পরিচয় দিয়ে আসছে। তাই বিস্ফোরণ ঘটাবার পর প্রত্যেকেই পৃথিবীর এই অঞ্চলে ভারতের পরাশক্তিতে পরিণত হবার বিষয়টিকে আতংকের চোখেই দেখেছে। বিশেষ করে এ ঘটনার পর যখন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দাম্ভিকতার সুরে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সাথে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে শুরু করে এবং পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন কাশ্মীর রাজ্যে অপর অংশ আজাদ কাশ্মীরও ছিনিয়ে নেয়ার হুমকি দিচ্ছিল, তখন প্রতিবেশী সকল রাষ্ট্রের জনগণের স্মৃতিপটে ভারত কর্তৃক সামরিক হামলা চালিয়ে হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়, মানবাদাড় ও কাশ্মীরের শ্রীনগর ও জম্মু দখলের দৃশ্যটি ফুটে উঠে। অনেকে ধরেই নেয় যে, এবার আর ভারতীয় আগ্রাসনের জবাব দেবার মতো কাউকে পাওয়া যাবে না। বর্তমানে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে তাদের আগ্রাসন বিরোধী কোনো প্রতিরোধের চিন্তাতো সংগত কারণেই নেই, যদ্দরুন তাদের পুলিশ নিজ দেশের মতই একদিকে এই স্বাধীন দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে মসজিদে পর্যন্ত তল্লাশী চালায়, অপরদিকে গোদাগাড়ি-বিলোনিয়া ইত্যাদি সীমান্তে বাংলাদেশের সীমান্ত প্রহরীদের সাথে যুদ্ধ করে ও তাদের ধরে নিয়ে যেতেও দ্বিধা করে না। পারমাণবিক সফল বিস্ফোরণ ঘটাবার পর অপর স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতি ভারতীয় সামরিক-বেসামরিক নেতাদের ঔদ্ধত্ত ও ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির মাত্র কয়েক দিন পরই পাকিস্তান তার চাইতেও অধিক শক্তিশালী সফল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। তখন ভারতের উদ্যত গোঁপে কিছুটা নমনীয়তা দেখা দেয়। তবে কাশ্মীরে তাদের মানবাধিকার বিরোধী কার্যক্রম অব্যাহতই থাকে। যদ্দরুন কাশ্মীরী মুজাহিদরা কারগিল দখল করে এবং ভারতকে ঘর্মাক্ত করে তোলে। কারগিল যুদ্ধেও ভারত-পাকিস্তানের বিপুল সম্পদের হানি ঘটে। কয়েকজন সামরিক অফিসারসহ অনেক সৈন্যই হতাহত হয়।

www.pathagar.com

বলার অপেক্ষা রাখে না, পাক-ভারত উভয় দেশের কোনোটিরই এখন প্রয়োজনীয় জীবন যাত্রার উপকরণ নেই আর এই অবস্থার মধ্যেই দু'দেশের মধ্যে বারবার এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলছে এবং খেয়ে না খেয়ে সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো পারমাণবিক বোমা বানাতে গিয়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। আর এর খেসারত দিতে হচ্ছে উভয় দেশেরই সাধারণ মানুষকে। কিন্তু কেন, এ জন্যে প্রকৃত অর্থে দায়ী কে বা কারা? উভয় দেশের কোন্ কোন্ নেতার অপরিণাম দর্শিতা, অযোগ্যতা, অসাধুতা ও কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার অসৎ প্রবণতা থেকে এসব রক্তাক্ত সংঘাত-সংঘর্ষ ঘটে আসছে বা আরও ঘটার আশংকা তা আজ সমস্যা জর্জরিত উপমহাদেশীয় শান্তিকামী মানুষদের ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সময় এসেছে। বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তান পরমাণু শক্তিতে পরিণত হবার পর অতীতের মতো মাথা গরমের পরিচয় দিলে গোটা অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষকেই পারমাণবিক ভয়াবহ যুদ্ধের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এই উপমহাদেশের হাজার হাজার মানুষকে পারমাণবিক অস্ত্রঘাতের অবর্ণনীয় গ্লানি বহন করে চলতে হবে।

এদিক থেকে চিন্তা করলে গত অর্ধশতাধিক বছর ধরে উপমহাদেশের যেই সমস্যাটি অর্থাৎ কাশ্মীর কেন্দ্রিক বিরোধে পারমাণবিক বোমা তৈরি ও তা প্রয়োগে লাখো মানুষের প্রাণহানির আশংকা মাথার উপর ঝুলছে, এ জন্যে আবেগমুক্তভাবে প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে হবে। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধ দেখা দিলে ভারতীয় পরলোকগত নেতা নেহরু জাতিসংঘে গৃহীত প্রস্তাব মেনে যুদ্ধ বিরতি করেন এবং গণভোটের মাধ্যমে সমস্যাটি ফয়সালা মেনে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। সেই প্রস্তাব আজও রয়েছে। জাতিসংঘও বিদ্যমান। কিন্তু সেই প্রস্তাব কার্যকর না হওয়াতেই আজ পারমাণবিক অস্ত্রের নির্মম আঘাতে উভয় দেশের লাখ লাখ মানুষের প্রাণ সংহারক পরিস্থিতির আশংকা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় কোনো নেতার পুরাতন ভ্রান্তি ও গোয়ার্তমিপূর্ণ ভূমিকার উপর অটল থেকে কি লাখো মানুষের জীবনের ঝুঁকি নেয়া হবে, না বিরোধের মূল কারণ উৎপাটিত করে পৃথিবীর এই অঞ্চলের মানুষ শান্তিতে বসবাসের স্থায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে আন্দোলনে এগিয়ে আসবে, এটাই সময়ের বড় জিজ্ঞাসা। সুতরাং আমরা মনে করি, পারস্পরিক দ্বন্দ্বমুখর পারমাণবিক শক্তির অধিকারী উপমহাদেশের ভয়াবহ সম্ভাব্য এই পরিস্থিতি এড়াতে হলে দীর্ঘস্থায়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানে মার্কিনী নাগরিকরা না করে ছিল অনুরূপ কিছু করা দরকার। শান্তিকামী মার্কিনী জনগণ তাদের তৎকালীন যুদ্ধবাজ শাসকদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। ভারত-পাকিস্তান বিশেষ ভারতীয় জনগণকেও আজ কাশ্মীর নিয়ে অন্যায় ও হটকারির ভূমিকায় অবতীর্ণ নেতাদের উপর মার্কিনীদের ন্যায় একই চাপ সৃষ্টি করত্বে হবে। উপমহাদেশকে পারমাণবিক যুদ্ধের সর্বগ্রাসী ধ্বংসলীলার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। বলা বাহুল্য, ভারত কর্তৃক জাতিসংঘে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ গণভোট মেনে নেয়া এবং ন্যায় সত্যের প্রতি অকপট স্বীকৃতিই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং উপমহাদেশ পারমাণবিক বিপদমুক্ত হতে পারে।

www.pathagar.com

'হত্যা অপরাধীর প্রাণদণ্ডে রয়েছে অন্যদের জীবনের নিরাপত্তা'

[প্রকাশ ঃ ২৩. ৭. '৯৯ ইং]

অপরাধের জন্যে অপরাধীর শাস্তি পাওয়া বিশ্বজনীন স্বীকৃত একটি বিধান। এই বিধান যেমন ন্যায়-ইনসাফের ভিত্তিতে তেমনি যুক্তিগ্রাহ্য তার ভিত্তিতেও সঠিক। আবার মনস্তাত্ত্বিক মানদণ্ডেও অপরাধের জন্যে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান একটি অপরিহার্য বিষয়। কারণ কোন কারণে সে শাস্তি থেকে অব্যাহত পেলে তার এই হত্যাপ্রবণতা আরও অধিক উৎসাহিত হবে। নিজের কুপ্রবৃত্তির আর্থিক, জৈবিক ও অন্য যাবতীয় অবৈধ চাহিদা পূরণে তখন সে তার এই হিংস্র ও জঘন্য প্রবণতাকে কাজে লাগাতে আদৌ দ্বিধা করবে না। এ কারণেই বিশ্ব মানবের সকল দেশের, সকল সমাজের রাষ্ট্রীয় ইউনিটই জাতীয় ও সমাজ জীবনের সকল স্তরের সকল অপরাধ দমনকল্পে অপরাধীর জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছে। নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ব্যবস্থা রেখেছে অপরাধদণ্ডবিধির। এর মধ্যে কারও অপরাধ দন্ডবিধি অধিক কড়া, আবার কারও কিছু শিথিল। তবে দণ্ডবিধি অবশ্যই আছে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত ও স্বীকৃত যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা হলেও তার মধ্যে ভাল মন্দ উভয় প্রবণতা দিয়েই স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই উভয় কাজের স্বাধীনতা দিয়েই ইহজগতের এই পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠিয়েছেন। মানুষ যাতে এ পরীক্ষায় যথাযথ উত্তীর্ণ হতে পারে, এ জন্যে তার ভাল মন্দ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে আবার খোদায়ী বিধান দিয়ে নবী-পয়গাম্বরও পাঠিয়েছেন। স্রষ্টা মানুষকে তার তিনটি প্রবৃত্তি বা প্রবণতার অধিকারী করেছেন।

এক. কুপ্রবৃত্তি, যা সকল সময় মানুষকে খারাপ, অন্যায় ও অবাঞ্ছিত কাজের প্রতি প্ররোচিত করে। দুই. ভর্ৎসনাকারী প্রবৃত্তি যা অন্যায় ও কুপ্রবৃত্তিকে তার অসৎপ্রবণতার জন্যে তাকে ভর্ৎসনা করে থাকে। তিন. সৎ বা প্রশান্ত প্রবৃত্তি যেই প্রবৃত্তি ন্যায়-অন্যায়ের সীমা সম্পর্কে সদাজাগ্রত এবং সৎপ্রবণতা ছাড়া অসৎপ্রবণতা তাকে স্পর্শই করতে পারে না। এটিই সুস্থ বিবেক অভিধায় আখ্যায়িত। এই প্রবৃত্তির অধিকারী আত্মাই প্রশান্ত আত্মা যা স্রষ্টার কাঙ্খিত এবং যাকে আল্লাহ্ ডেকে বলবেন, "আমার অনুগত বান্দাদের কাতারে যাও এবং আমার তৈরী জান্নাতে প্রবেশ করো।" মূলত প্রশান্ত আত্মার অধিকারী হবার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত ও সার্বিক সফলতা। এই সফলতার অধিকারী চরিত্রসম্পন্ন মানব সমাজ গঠনকল্পেই তিনি ইসলাম ও তার শেষ পয়গাম্বর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে মানবতার পথিকৃৎ রূপে আল কুরআন সুবিধানটি দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। তিনি সেই সংবিধানের ভিত্তিতে অনুরূপ চরিত্রের নেতা-কর্মী ও সমাজ নাগরিক গঠন করে আল্লাহর কাঙ্খিত মানব সমাজ গঠনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও

www.pathagar.com

স্থাপন করে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজ ও রাষ্ট্রকেই আমরা ইসলামী রাষ্ট্র বা খেলাফত অভিধায় আখ্যায়িত করে থাকি, যেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানরা সাধারণ মানুষ যা খেতেন, যা পরতেন, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তার ব্যতিক্রম না করে তারাও তাই খেতেন, তাই পরতেন। যেই খেলাফত বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার নায়করা রাষ্ট্রীয় তহবিলের অর্থে কেনা মোমবাতির আলোতে রাষ্ট্রীয় কাজ ছাড়া নিজ ব্যক্তিগত মেহমানের সাথে ব্যক্তিগত কথা বলাকেও সরকারী অর্থের অপচয় মনে করে তা পরিহার করে চলতেন। যেই রাষ্ট্রনায়করা একজন সাধারণ মানুষকে প্রকাশ্য জনসভায় রাষ্ট্র প্রধানের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ পেশ করার পূর্ণ বাকস্বাধীনতা দিতেন, যেই রাষ্ট্রনায়ক বা যুদ্ধে বিজিত এলাকার পরাজিত শত্রু বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যাবার মুহূর্তেও সাম্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে ভুল করতেন না। বিজিত সৈন্যদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যাবার সময় তারা উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহন ও উষ্ট্রের রশি টানার দায়িত্বটি পালাক্রমিকভাবে নিজ ভৃত্যের সাথে জয় করে নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান স্থলের নিকটবর্তী হলে দেখা গেল এখন খোদ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের রশি টানার পালা। উষ্ট্রপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রয়েছে তাঁর ভৃত্য। প্রতিপক্ষ বাহিনী আরোহীকে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান জ্ঞানে তাঁকে অভিভাদন জানাতে এগিয়ে আসতেই বলা হলো – "না ইনি নয়, যিনি উষ্ট্রের রশি টেনে এগিয়ে আসছেন, তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান।" শুধু তাই নয়, আল-কুরআন সংবিধানের ভিত্তিতে নবী কর্তৃক আল্লাহর কাঙ্খিত সমাজ ও রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক যখন কোনো দিন দেখতেন যে, তাঁর নাস্তা বা নিয়মিত খাদ্যের মান দৈনন্দিনকার খাদ্য-খাবারের মান অপেক্ষা উন্নত তারা তাৎক্ষণিকভাবে এর কারণ জিজ্ঞেস করে যখন জানতেন যে, – প্রতিদিনের নির্ধারিত সরকারী খাদ্য সামগ্রী থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে আজকের এই উন্নত খাবার তৈরী করা হয়েছে, তখনই তাঁরা খাদ্য বিভাগীয় সরকারী কর্মকর্তাকে বলে দিতেন, ঐ পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী যেন তাঁর নির্ধারিত বরাদ্দ থেকে হ্রাস করা হয়।

এমনিভাবে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত এবং মহানবীর প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজেরই নাগরিক চরিত্র এমন ছিল যে, – দক্ষিণ আরব থেকে উত্তর সীমান্তবর্তী কোনো গন্তব্যস্থলে দিব্যি রাতের অন্ধকারে যুবতী নারী একা নিরাপদে পৌঁছুতে পারতো সমস্যাজনক কোনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতো না। দস্যু বর্বরের উপদ্রব থেকে মুক্ত ছিল গোটা সমাজ। খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, ছিলো না বললেই চলতো। প্রশ্ন. এমন একটি সমাজ পরিবেশ যেই মহান নীতিমালা ও সংবিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো, আমরা কি পারি না সেই নীতিমালা ও সংবিধানকে আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে পরিণত করে তেমন একটি সমাজ গঠন করতে?

মূলত সেই সংবিধানভিত্তিক রাষ্ট্রীয় অপরাধ দণ্ডবিধিরই একটি ছিল। গুরু অপরাধের জন্যে গুরুদণ্ড আর লঘু অপরাধের জন্যে লঘুদণ্ড। যার নীতি হিসেবে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,–"হত্যা অপরাধীর প্রাণদণ্ডে রয়েছে অন্যদের জীবনের নিরাপত্তা।"

আমাদের সমাজে আজকাল খুন, হত্যা, লুট, ছিনতাই, ডাকাতি ও ধর্ষণের বল্গাহীন দৌরাত্ম্য চলছে। এমনও ঘটে একজন লোক ৯টি খুনের আসামী হবার পরই

www.pathagar.com

ধরা পড়ে। মাঝখানে ধরা পড়লেও জামিনে মুক্তি পেয়ে যায় এবং অর্থলোভে আরও কিছু মানুষ হত্যা করতে দ্বিধা করে না। সে এই প্রশ্রয় কার দ্বারা পাচ্ছে? তাকে প্রথম অপরাধের পরই গ্রেফতার করার দায়িত্ব কার ছিল? সে ছাড়া পেয়ে এবং শাস্তি এড়াতে সক্ষম হয়ে পরবর্তী যেসব লোককে হত্যা করলো, সঠিক বিচারে এ দায়িত্ব কার ওপর বর্তায়, আজ এসব জিজ্ঞাসার জবাব অনুসন্ধানের সময় এসেছে। আমাদের বিশ্বাস, শুধু বাংলাদেশ কেন বিশ্বের যে কোনো ভূখণ্ড, যে কোনো রাষ্ট্র যে কোন সমাজে যতদিন না আল কুরআন সংবিধানের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, সেখানে যথার্থ অর্থের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান ভয়াবহ সমাজ পরিবেশ থেকে বাঁচতে হলে একমাত্র ইসলামী অনুশাসনই রক্ষাকবজ, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং দলমত নির্বিশেষে আজ এই দেশবাসীর সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে সকলকে একমাত্র নিরপেক্ষ সংবিধানগ্রন্থ–আল-কুরআনের বিধানের দিকেই ফিরে আসা কর্তব্য। এই সংবিধানের ভিত্তিতেই আমাদের শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি সকল কিছুই নিয়ন্ত্রিত হবার জন্যে সকলের সর্বাত্মক সংগ্রাম করা উচিত। অন্যথায় আমরা যে যেই দলের মুসলমানই হই না কেন–কেয়ামতের দিন "আল্লাহর রাসূল বলবেন, হে আমার প্রভু আমার এই উম্মতরা কুরআনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল।" সুতরাং এর পরিণতি যা হবার তাই সকলকে ভোগ করতে হবে।

অভাবই স্বভাব নষ্টের একমাত্র কারণ নয়

[প্রকাশ ঃ ২২. ৩. '৯৯ ইং]

"অভাবেই স্বভাব নষ্ট"–এই প্রবাদ বাক্যটি ক্ষেত্রবিশেষে সত্য হলেও সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। অনেক দরিদ্র রিকশা-বেবী চালকও যাত্রীর ভুলে ফেলে যাওয়া লাখো টাকার বান্ডিল তার বাড়িতে নিয়ে পৌছিয়ে দেয়ার নজির আছে। প্রবাদে বর্ণিত বদ্ধমূল ধারণার কারণ হলো বস্তুবাদী শিক্ষা মানুষকে সম্পূর্ণ পেটসর্বস্ব ভোগবাদী জীব বলে গণ্য করে এবং তাকে ব্যক্তিস্বার্থ কেন্দ্রিক সত্তায় পরিণত করে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্যসমৃদ্ধ দেশসমূহে আজকাল যে সব বিচিত্র প্রকৃতির অপরাধ সংঘটিত হয়ে চলেছে, তা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে উপায় নেই। অথচ সেখানকার জীবন উপকরণের প্রাচুর্যের কারণে মানুষের জীবনমান বহু উন্নত। বলা চলে অনেকেই প্রাচুর্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকে। তাদের ওখানে যেসব সমস্যা সমাজ জীবনকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সেগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে প্রাচুর্যজনিত ভারসাম্যহীন জীবনপ্রণালীর কুফল। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অভাব-দারিদ্র্যের কোনো ব্যাপারই ঐসব দেশের অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কোনো পাশ্চাত্য দেশ কেন আমাদের ন্যায় অতি গরীব দেশের গরীব সমাজের নাগরিকদের মধ্যেও ইদানীং অপরাধের যেই চরিত্র প্রত্যক্ষ করা যায় এবং সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি তৎপরতায় যারা জড়িত তাদের পরিচয় ও

www.pathagar.com

শিক্ষাগত যোগ্যতাও এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, কেবল অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয় না, বৈধ-অবৈধ প্রাচুর্যও স্বভাব নষ্টের একটি মস্তবড় নিমিত্ত। আর এখানে এসেই মানুষের জীবনে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন জরুরী হয়ে দেখা দেয়। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনাবলীতে দেখা যায়, সমাজের বিরাট বিরাট রুই-কাতলা এসব দুর্নীতি ও আত্মসাৎমূলক ঘটনার সাথে জড়িত। কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, কেউ লোভ-লালসা ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে এসব অপরাধে জড়িয়ে পড়েছে। কেউ ভোগবাদী জীবনটির ষোলআনা আকাঙ্খা নিবৃত্তির জন্যে স্বার্থান্ধ সেজে অপরের অধিকার হরণ করেছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশ-বিদেশে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধজনিত ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের শতকরা সত্তর ভাগই বিত্তশালী পরিবারের সদস্য এবং কমবেশী শিক্ষিত। অভাব তাদের নৈতিকতার।

মার্কিন বিচার বিভাগের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সমৃদ্ধতর দেশে কারাবন্দী অপরাধীদের সংখ্যা গত ১২ বছরে দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বে কারাবন্দীর সর্বোচ্চ হার হচ্ছে রাশিয়াতে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা বৃদ্ধির গতি অনেকগুণ বেশী। তবে শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্র অপরাধপ্রবণতার ঘটনায় রাশিয়াকে ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৮-এর মাঝামাঝিতে অপরাধী কয়েদীদের সংখ্যা ছিলো ১৮ লাখ; কিন্তু মাত্র ৩ বছর আগের ১৯৮৫ সালে এই সংখ্যা ছিলো ৭ লাখ ৪৪ হাজার ২শ' ৮ জন। অন্যভাবে দেখলে এই পরিসংখ্যানটি দাঁড়ায় এরকম-যেমন ১৯৮৫ সালে প্রতি ১ লাখ মার্কিন নাগরিকের মধ্যে কারাগারে আটক ছিলো ৩শ' ১৩ জন এবং ১৯৮৫ সালে প্রতি ১ লাখে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬শ' ৬৮ জনে পৌঁছে। রাশিয়ায় বর্তমানে প্রতি ১ লাখ লোকের মধ্যে ৬শ' ৮৫ জন কারাগারে জীবন কাটাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংস্থা সেনটেনসিং প্রজেক্ট এই তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটি আবার যুক্তরাষ্ট্রে কঠোর শাস্তি প্রদানের বিরুদ্ধে আন্দোলনও করে যাচ্ছে। সেনটেনসিং প্রজেক্টের মুখপাত্র জেনি গেইসবোরো বলেন, রাশিয়া ১ লাখ বন্দীকে ক্ষমা করে দিলে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বন্দীর সংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে আগামী ২ বছরে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত শীর্ষকারাবন্দীর দেশে পরিণত হবে। গত ২৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে কারাবন্দীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদক অপরাধীদের বিচার এবং সব ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান চালু করায় কারাবন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়াও অনেক অপরাধীর দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হওয়ায় জেল বাসিন্দাদের সংখ্যা ১৯৯০ সালে ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানে এই বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। পরিসংখ্যানবিদ ডারেল গিরিয়ার্ড তার রিপোর্টে বলেছেন, ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৮-এর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত কারাবন্দীদের সংখ্যা বছরে ৬ দশমিক ২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূলত আর্থিক অভাব অপরাধের একটি কারণ হলেও নৈতিকতার অভাব ও অবক্ষয়ই যে অপরাধের মূল কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় অতীব সমৃদ্ধ দেশের অপরাধপ্রবণতার ক্রমবর্ধমান সংখ্যাই তার প্রমাণ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, নৈতিকতার উন্নতি

www.pathagar.com

কিভাবে হবে? যেমন জাতীয় তেমনি আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে এখন কার্যত মানব সমাজ থেকে নৈতিকতাকে ঝাঁটাপেটা করে তাড়াবারই এক পরিকল্পিত অভিযান শুরু হয়েছে। খোদ যারা ক্ষমতার শীর্ষ আসনে বসে নৈতিকতার প্রচার ও প্রসার করবে, এ জন্যে সমাজে অবকাঠামো সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাবে, তাদেরকেই দেখা যায় চরম লাম্পট্য চরিত্রের পরিচয় দিতে। শুধু তাই নয়, দেশে যতো প্রকার প্রচার মাধ্যম রয়েছে সবগুলোর ব্যাপারে সেব কর্মকর্তা এমন নীতির অনুসরণ করে চলেছেন, যাতে নৈতিকতা উন্নতি ঘটার সকল সম্ভাবনা ও অবকাশের ছিদ্র পথগুলোও শক্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তারপরও নাগরিকদের কোনো শ্রেণী ধর্মীয় দায়িত্ববোধ ও সৎপ্রবণতার তাগিদে নৈতিকতার উন্নয়নমূলক কোনো কিছু করার উদ্যোগ নিলে "তাদেরকে উক্ত শ্রেণীর লোকেরা একই সুরে মৌলবাদী" বলে চিৎকার শুরু করে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশের সমাজজীবনকে আজ দুর্নীতি, সন্ত্রাস, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন, নিষ্ঠুরতা যেভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, যার পরিণতিতে হররোজই কোনো না কোনো মানুষের জীবনহানি ঘটছে এবং খোদ অপরাধ দমনকারী পুলিশদের একটি শ্রেণীও অপরাধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, সরকারী এমপি'র গৃহে তৈরী হচ্ছে মানুষ মারার বোমা, বিদেশী পণ্য কেনার নামে কোনো পণ্য ছাড়াই এদেশের চরিত্রহীন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে এই গরীব দেশের কোটি কোটি টাকা পুলিশ কর্তৃক খোদ থানাতে ধর্ষিতা হচ্ছে দেশী-বিদেশী সম্মানিতা মহিলা। লুটপাট ও ক্ষমতার অপব্যবহারে উদ্বেগজনকহারে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী ব্যাংকের টাকার ডিপোজিট, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজ যেসব অপরাধমূলক সমস্যার কষাঘাত মানবতাকে ক্ষতবিক্ষত করছে, তার সমাধান চিন্তা সরকারী-বেসরকারী সকল মহল থেকেই করতে হবে। বিশেষ করে যাদের অবিমৃশ্যকারিতার দরুণ নৈতিক অবক্ষয়জনিত এই সমস্যা আজ গোটা জাতির প্রতিটি স্তর বিভাগকে গিলে খেয়ে চলছে, তাদেরকেই প্রথম এ সংকটের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসার উদ্যোগ নিতে হবে। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, আলোচ্য সমস্যার সমাধান শুধু দমন নীতি নয়, বরং এই প্রবণতার মূল উৎস কেন্দ্র সমাজের চিন্তা-মননকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। এ জন্যে সরকারীভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের জন্যে সুষ্ঠু কর্মনীতি প্রণয়ন করতে হবে। আবার সেই নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে, যার জন্যে প্রয়োজন আদর্শ ও চরিত্রবান লোকের। এই মাপের লোক পেতে হলে বদলাতে হবে সমাজের সৎসাধু যোগ্য কর্মী লোকদেরকে মৌলবাদী বলা।

এই উভয়ের কোনোটাই যদি করা সম্ভব না হয় তাহলে কোনো সরকারের অধিকার থাকে না। একটি দেশের শাসন ক্ষমতায় সমাসীন থেকে দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্গতি বাড়িয়ে তোলার। এমনকি জাতির পরিচিতি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে তোলার। মূলত এ কথাটিই সেদিন বলেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম জাতীয় সংসদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি। তিনি বরিশালে এক জনসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, একটি গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

সরকারের দায়িত্ব হলো জনগণের জানমাল, নারীর সতীত্ব-সম্ভ্রম রক্ষা এবং দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডত্বের নিশ্চয়তা বিধান করা। হাজার হাজার জনতার শ্লোগানে মুখরিত মাহফিলে মাওলানা সাঈদী বলেন, দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়েছে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস চলছে, পরীক্ষার হলসমূহে নকলের দৌরাত্ম্য সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ৩ বছরের শিশুকন্যা থেকে শুরু করে ৭০ বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত দেশী-বিদেশী নারীরা পাইকারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, দেশে সরকার বলতে কিছুই নেই। এমতাবস্থায় যদি লজ্জা-শরমের বালাই থাকে তাহলে অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ করা উচিত।

দেশে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি, অপরাধ সংগঠনের মুল কারণসমূহ মাওলানা সাঈদীর বক্তব্যের মধ্যদিয়ে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এসব অপরাধের মূল কার্যকারণের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট, প্রশ্রয়দাতা, উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষকতাকারী, তাদের সকলেই সমাজের বর্তমান অপরাধজনিত নাজুক পরিস্থিতির জন্যে দায়ী। সুতরাং দায়ী ব্যক্তিদেরই কর্তব্য হলো এই দুরবস্থার হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্যে সকল দলের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করা, নতুবা স্বেচ্ছায় পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের সরকার ও সরকার প্রধানের ন্যায় ইস্তেফা দিয়ে জাতিকে তার অভিপ্রায়মাফিক কাজ করতে দেয়া।

আফগানিস্তানে শান্তি চুক্তির আলোচনা

[প্রকাশ ঃ ২১. ৩. '৯৯ ইং]

সর্বশেষ খবরে জানা যায়, আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন তালেবান সরকারের কর্মকর্তারা বিরোধীদের সঙ্গে সপ্তাহব্যাপী আলোচনায় ক্ষমতা ভাগাভাগি চুক্তির ভিত্তিতে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রশ্নে প্রচারিত খবরের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যাতে আলোচনা বৈঠকের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইতিপূর্বে বার্তা সংস্থার প্রচারিত খবরে বলা হয়েছিল যে, উভয় পক্ষ গত রোববার (১৪/৩/৯৯) ঘোষণা করে যে,-তারা ক্ষমতা ভাগাভাগিতে সম্মত হয়েছে এবং স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে। তালেবান সরকারের মুখপাত্র ওয়াকিল আহমদ মুতায়াক্কিল তুর্কমেনিস্তানে জাতিসংঘ মধ্যস্থতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৩ দিনের আলোচনা শেষে দেশে ফিরে শরীয়া বেতারে বলেন, চুক্তির অর্থ এই নয় যে, ভবিষ্যতে হুবহু কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে। তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশকারতে চুক্তি সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, তালেবান, নির্বাহী আইন সভা এবং বিচার বিভাগে ক্ষমতার ভাগাভাগির ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। মুতাওয়াক্কিলের উদ্ধৃতি দিয়ে রেডিও শরিয়া আরও জানায়, বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা আফগানিস্তানের ভিতরে ভবিষ্যতে আলোচনায় বসবেন। উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে ইতিপূর্বেও আলোচনা এবং চুক্তি

www.pathagar.com

কম হয়নি। কিন্তু এ পর্যন্ত ঐ সব আলোচনা ও চুক্তি কোনো সুফল বয়ে আনতে পারেনি। এবারকার আলোচনা বৈঠক গতবারের ন্যায় মাঝপথে ভেঙ্গে না গিয়ে স্বাভাবিকভাবে শেষ হলেও ক্ষমতার ভাগাভাগির প্রশ্নে যখন দরকষাকষি শুরু হবে, তখন বিভিন্ন পদ প্রাপ্তির প্রশ্নে এই সমঝোতা ভেঙ্গেও যেতে পারে এবং পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। এমনকি পূর্ব অভিজ্ঞতায় বলা যায়, এই লেখা প্রকাশের আগেই যুদ্ধ বেধে গেলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

আফগানিস্তানের ৯০ ভাগ এলাকা তালেবান সরকারের দখলে আর ১০ ভাগ সাবেক সরকার ও তার সহযোগিদের হাতে। মনস্তাত্ত্বিক কারণেই ধরে নেয়া যায়, তারা তাদের অবস্থানে দৃঢ় থাকতে চাইবে। তালেবানরা গত প্রায় দু'বছর ধরে দেশটি শাসন করে আসছে। তারা দেশটির পুনর্গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। দেশবাসীও সাবেক সরকার আমলের অশান্তিকর অবস্থার তুলনায় এখন বহুলাংশে নিরুপদ্রব ও শান্ত পরিবেশে রয়েছে। আফগান সাধারণ মানুষ ধর্মপরায়ণ, তাই ধর্মীয় অনুশাসনের পূর্ণ অনুসারী তালেবান শাসনে তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু সৌদী আরব, পাকিস্তান ও আরব আমিরাতই শুধু তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সমাজ এখনও এ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। তারা চায় আফগানিস্তানে একটি সর্বদলীয় ঐকমত্যের সরকার। সেখানে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পুনর্গঠন কাজকে ত্বরান্বিত করতে এরূপ একটি সরকার প্রয়োজন।

মূলত বিশ্বসমাজের এই স্বীকৃতির অভাব এবং অপরদিকে বিদ্রোহী গ্রুপের উপদ্রব এই দুইয়ের কারণেই দেশটিতে তালেবান শাসন তার যথাগতিতে উন্নয়ন কর্মসূচী এগিয়ে নিতে পারছে না। তবে তাদের শাসিত এলাকায় যে পূর্ববর্তী রাব্বানী সরকারের শাসনামল অপেক্ষা শান্তি-শৃঙ্খলা অধিক বিদ্যমান তা সহজেই অনুমেয়।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের শান্তিকামী জনগণ চায় বিবদমান মুজাহিদ দলগুলো জেদ, হঠকারিতা এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পরিহার করে দেশবাসীকে শান্তিতে থাকতে দিক। বিদ্রোহী জোটের প্রধান প্রফেসর বুরহানুদ্দীন রব্বানী, তার সহকর্মী আহমদ শাহ মাসউদ গং কয়েক বছর ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও আফগানিস্তানে তারা কেন শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছিলেন, সে সব কারণ উপেক্ষণীয় নয়। তন্মধ্যে প্রধান কারণ ছিল এককভাবে রব্বানী গ্রুপের ক্ষমতায় থাকার প্রবণতা এবং অন্যান্য দলকে ক্ষমতায় শরীক না রাখার মানসিক সংকীর্ণতা। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনায় সাবেক সরকারের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, তারা আফগান জেহাদের মূল লক্ষ্য ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ত্যাগী পথ পরিহার করে অনেকে ভোগবাদের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন যাতে তাজিক, উজবেক বংশোদ্ভূত হয়েও একই পরিচয়ের একাধিক নেতার মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ইসলামী ন্যায়নীতি, ভ্রাতৃত্ব ও মূল্যবোধ বিরোধী এই অবস্থা ধর্মানুরাগী আফগানদের অন্তরকে সাবেক সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। ফলে ঐ সরকারের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন হয় এবং নবাগত নিঃস্বার্থ তালেবান নেতৃত্ব তাদেরকে অধিক আকৃষ্ট করে। যেমন, সাবেক বুরহানুদ্দীন সরকারের

www.pathagar.com

প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব যিনি রুশ আগ্রাসন বিরোধী জেহাদে বীরত্বের বিরাট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে জনগণের পক্ষ থেকে দুর্নীতির মস্তবড় অভিযোগ রয়েছে। তিনি অতীতে স্বল্পবিত্তশালী থাকলেও ক্ষমতায় গিয়ে বেশী আখের গুছিয়ে নিয়েছেন এবং "আরইয়ানা এয়ার লাইন্স"-এর মালিক বনেছেন। আহমদ শাহ মাসউদ সম্পর্কে আরও অভিযোগ আছে যে, তিনি পাঞ্জেশির থেকে মূল্যবান পাথর বিদেশে রফতানি করেন এবং নিজের রাষ্ট্রদূত দাউদ মীরকে চার কিলো পান্না (যুমুররুদ) পাঠান যেন দাউদমীর সেগুলো বিক্রি করে তার মূল্য মাসুদকে পাঠিয়ে দেন কিন্তু দাউদ "চোরের উপর বাটপাড়ি" করে পান্নাগুলো নিয়ে কানাডা চলে যান এবং পান্না বিক্রলব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করে মাসুদ তখন আপন সহোদর ওয়ালী মাসউদকে দাউদমীরের পশ্চাদ্ধাবনে পাঠান, যা নিয়ে লন্ডনস্থ আফগান দূতাবাসে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি হয়। ফ্রান্সের সংবাদপত্রেও এ নিউজ বেশ ফলাও করে প্রচার করা হয় বলে জানা যায়। এভাবে ইসলামের ন্যায়নীতির শিক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে জাতীয় সম্পদ আত্মসাতের নীতিবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়ায় তারা জনসমর্থন হারান। পূর্ববর্তী সরকার ও সরকারের সমর্থক বাইরে অবস্থানকারী অন্যান্য নেতার বিরুদ্ধেও এ জাতীয় গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। যেমন করিম খলীলী নাকি "রাশিয়ান এয়ারলাইন্সের" মালিক। রশিদ দোস্তামের রয়েছে "বলখ এয়ার লাইন্স"। এককালের এসব অর্থ সম্পদহীন মানুষ জনস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সম্পদশালী হবার এই স্বার্থদ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে দেখে জনগণ নিঃস্বার্থ তালেবান নেতৃত্বকে সমর্থন জানায়। কাজেই জনপ্রিয় তালেবান সরকারকে সমর্থন না দিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে জনপ্রত্যাখ্যাত নেতাদের সাথে নিয়ে সরকার গঠনে স্বার্থকথা কোথায়?

মোটকথা, সাবেক আফগান সরকার আমলের এসব কার্যক্রমের ফলে আফগান জেহাদের মূল প্রাণসত্তা জনগণের মধ্যে ও তাদের নিষ্ঠাবান নেতাদের মধ্যে অসন্তোষ প্রকট হয়ে উঠে। তারপরও যদি রাব্বানী সরকার সারাদেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক কারণে সফলকাম হতো একটি কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি এবং সাধারণ মানুষ সেই সরকারের কর্মী-সমর্থক একশ্রেণীর সশস্ত্র ব্যক্তির অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। জনগণের জানমাল, ইজ্জত-আব্রুর ছিলনা কোনো নিরাপত্তা। গোটা আফগান জনতা তখন এই দুর্বিষহ অবস্থার হাত থেকে রক্ষার জন্যে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে। ঠিক এমন এক প্রেক্ষাপটে মোল্লা ওমর প্রমুখের নেতৃত্বে সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ গ্রুপগুলো একের পর এক কোণ্ঠাসা হয়ে পড়তে থাকলে জনগণ তালেবানের সমর্থনে এগিয়ে আসে। এভাবে দেশের প্রায় ৯০ ভাগ তালেবান প্রভাবাধীনে এসে যায়। অপরদিকে সাবেক ব্যর্থ সরকার ও তাদের দোসররা কাবুল তথা আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যায় কিংবা সীমান্তবর্তী কোনো এলাকা দখল করে সেই এলাকাকে মুক্ত এলাকারূপে ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, তারা প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের সহায়তায় তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধও অব্যাহত রাখে, যদিও সেসব যুদ্ধে বিদ্রোহী গ্রুপ শেষ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তালেবান নেতারা শুরুতেই তাদেরকে যুদ্ধ পরিহার করে কাবুলে চলে

www.pathagar.com

আসতে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তারা আতে সাড়া দেননি। বিশেষ করে প্রতিবেশি কয়েকটি দেশের তালেবান শাসন বিরোধী মানসিকতা বিদ্রোহী গ্রুপকে ঐকমত্যে পৌঁছার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে যেসব দেশ তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের এই স্বীকৃতিকেও যেমন বিদ্রোহী গ্রুপের পৃষ্ঠপোষক প্রতিবেশী দেশগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে ভাল চোখে দেখেনি, তেমনি আন্তর্জাতিক সমাজও তালেবানদেরকে তাদের ইসলামী অনুশাসনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়াকে পছন্দ করতে পারেনি। তাই আন্তর্জাতিক সমাজ তাদের মনের আসল ভাব লুকিয়ে রেখে কেবল সর্বদলীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনের উপরই অধিক জোর দিয়ে আসছে। অথচ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত বিজয়ী সরকারই স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে দেশের ৯০ ভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত তালেবান সরকারকে যেখানে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ্ থেকেও স্বীকৃতি দিতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়, তারপরও বিশ্ব সমাজ নেতৃত্ব কিছুটা নিজেদের ইসলাম বিদ্বেষের দরুণ আর কিছুটা অন্য রাজনৈতিক কারণে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। অন্যথায় এতদিনে আফগান পরিস্থিতির বহু আগেই উন্নতি ঘটতো। আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধে ঘটতো না এতো বিপুল প্রাণহানি, সম্পদহানি। আমরা মনে করি, একদিকে পরাজিত বিদ্রোহী গ্রুপের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনে তালেবানদের রাজি হতে চাপ দেয়া এবং অপরদিকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠিত নিয়মবিধির বরখেলাফ বিজয়ী তালেবানদের স্বীকৃতি না দেয়া, উভয় দৃষ্টিকোণই পরস্পর বিরোধী। এমনকি তা বিদ্রোহী মানসিকতাকে স্বীকৃতি ও উস্কানি দেয়ারই নামান্তর অথচ যা নীতি হিসাবে স্বীকৃত, তাই শান্তি উদ্যোক্তাদের কাছে প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল। তাতে যেমন দেশটিতে রক্তারক্তি বন্ধ হতো, তেমনি এতদিনে পুনর্বাসন কাজও এগিয়ে যেতো।

আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার আলোচনা সফল হওয়াই সকলের কাম্য। যদি তা ব্যর্থ হয় তাহলে সেটা যে শান্তি উদ্যোক্তাদের দ্বারা আফগানিস্তানের বাস্তবতার স্বীকৃতি না পাবার কারণেই ঘটবে, তাতে সন্দেহ নেই। সাবেক ব্যর্থ সরকারের কর্মকর্তারা যদি সত্যিই দেশটির কল্যাণ চান, তাদেরও উচিত নিজেদের অতীত কার্যক্রমের পুন-মূল্যায়ন করা এবং ঐকমত্যের সরকার গঠনে আলোচনা যতদূর অগ্রসর হয়েছে, কোনো অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক দরকষাকষিতে গিয়ে এই শুভ উদ্যোগকে নস্যাতের পথে ঠেলে না দেয়া। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব যোগ্য ব্যক্তিবর্গের দিকেই যায়, এটা সকলের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

দেশের ৯০ ভাগ যারা নিয়ন্ত্রণে রেখে এ যাবত দেশটিকে আফগান জেহাদের মূল লক্ষ্য ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার দিকে নিয়ে যেতে প্রয়াসী এবং যারা জনসমর্থন পুষ্ট, দেশের অবশিষ্ট ১০ ভাগ বাদ দিয়েও তারা দেশটি শাসন করতে পারে। সেখানে স্থিতিশীল সরকার গঠনের প্রশ্নে তাদের এই প্রাধান্য কিছুতেই উপেক্ষনীয় নয় এ কথাটি সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনায় রাখলে সমস্যা সমাধানে তা সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

www.pathagar.com

"খেলাফতভিত্তিক রাষ্ট্রই জনদুর্গতি লাঘবের উপায়"

[প্রকাশ ঃ ১১. ১. '৯৯ ইং]

জনবহুল বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য কবে সুপ্রসন্ন হবে, কবে তাদের জীবনে উন্নতি, শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা আসবে; তা আজ এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এদেশের মানুষ আরও দশটি উন্নয়নশীল দেশের মানুষের ন্যায় স্মরণকালে কখনও সমস্যামুক্ত ছিল না, একথা সত্য কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হয়, বর্তমানে এদেশের মানুষ যেই ধরন ও চরিত্রের সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ এমনটি অতীতে কখনও দেখা যায়নি। এখন একদিকে মানুষ অর্থাভাবে জর্জরিত অপরদিকে কিছু কিছু ব্যক্তি যারা বর্তমান শাসনকালে বিভিন্নভাবে সুবিধা পেয়েছে তারা ছাড়া সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী, চাকরিজীবী কারও কাছেই পয়সা নেই। সর্বত্রই পয়সার এক আকাল বিরাজমান। অতীতে দেশে শত অভাব-অনটন থাকলেও একজনের কাছে না থাকলে অপরজনের কাছে পয়সা থাকতো। তার কাছ থেকে ধারকর্জ নিয়ে অন্যেরা নিজেদের সমস্যা সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হতো। এখন সকলের কাছেই 'নাই নাই' শব্দ ছাড়া আর কোনো কথা শোনা যায় না। হতাশায় যেন আচ্ছন্ন। গ্রামবাংলায় যেসব লোক উঁচু পড়শী বলে খ্যাত ছিলেন দুর্দিনে মানুষ তাদের শরণাপন্ন হলে ধার-কর্জে হোক কিংবা প্রচলিত নিয়মে মুনাফার ভিত্তিতে যদিও তা অসিদ্ধ-আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে নিজের সমস্যা সমাধান করতো। জানা যায়, সেসব উঁচু পড়শীদের শতকরা ৯৫ ভাগই এখন অর্থশূন্য। তাদের অনেকেই এখন নিজেদের আর্থিক সংকট মোচনকল্পে জমি বিক্রির চেষ্টা করছেন। কিন্তু বিদেশগামী কোনো সদস্যের পরিবারবর্গ ছাড়া সেসব লোকের জমি কেনারও লোক সমাজে পাওয়া দুষ্কর। সর্বত্র অর্থের এই আকাল হেতু দেশের জনগণ অতীব এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে দিনযাপন করছে। কিছু কিছু এনজিও মানুষের এই অর্থাভাবের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন শর্তে টাকা পয়সা লগ্নি করলেও এ জন্য মানুষকে দিতে হচ্ছে চড়ামূল্য যা পত্র-পত্রিকায় প্রায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

আর্থিক এই দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে থেকেও দেশের মানুষ চায় সমাজে শান্তি নিরাপত্তা বহাল থাকুক, সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য থেকে সমাজের শান্তিকামী মানুষরা রক্ষা পাক। দেশে 'দুষ্টের দমন' ও সমাজে 'শিষ্টের পালন' এর এক আবহ গড়ে উঠুক।

বিশেষ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত এবং অতীতে গনতন্ত্র হত্যার জন্যে ধিকৃত ও এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকারী ক্ষমতাসীন সরকারের আমলে জনগণ তাদের কাছে কিছুটা গণতান্ত্রিক আচরণ ও মূল্যবোধ প্রত্যাশা করেছিল, ভেবেছিল তারা পাবে সামাজিক নিরাপত্তা, কিন্তু ক্ষমতার দাপটে তারা অতীত চরিত্রেরই নির্লজ্জ প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের আমলে জনৈক সম্মানিত সংসদ সদস্য, যিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন

www.pathagar.com

একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বও তাকে পর্যন্ত জনসভা করতে না দেয়ার ইতরামি প্রদর্শন করা হচ্ছে। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি'র মতো দেশবরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্বকে সেদিন পূর্ব নির্ধারিত স্থানে সভা করতে না দেয়া এবং সভাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-বিরোধীদের পক্ষাবলম্বন মূলক নীতি অনুসরণ চরম ফ্যাসিবাদিতাই নয়–এই পবিত্র রমযান মাসে এ কাজ কর্তৃপক্ষের ইসলাম বিরোধিতারই আরেকটি নজির নয় কি? এভাবে বিরোধী দলীয় লোকদের গণতান্ত্রিক ও ধর্মীয় অধিকার প্রয়োগে বাধা দান, আইনের দ্বারা দুষ্টের লালন ও শিষ্টদের দমনের চাইতে আইনের অপপ্রয়োগ আর কি হতে পারে। নানান ছুতা নাতায় ও মিথ্যা অভিযোগে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের অন্যায়ভাবে মামলায় জড়ানো ও হামলার দ্বারা তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করার নজির অতীতে যারাই সৃষ্টি করেছে, তাদের দমন নীতি এদেশে বিভিন্ন সময় কি সুফল বয়ে এনেছে ক্ষমতাসীন সরকারের উচিত ইতিহাসের সেসব অধ্যায় নতুন করে অধ্যয়ন করা এবং তার থেকে শিক্ষা নিয়ে যাবতীয় দাম্ভিকতা পরিহার ও দেশে আইনের শাসন কায়েম করা। কিন্তু আওয়ামী সরকারসহ অতীতের ক্ষমতায় মদমত্ত বিভিন্ন সরকার যেমন নিজেদের ভুলকে ক্ষমতায় থাকাবস্থায় শিকার করে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে, বর্তমান সরকারও একের পর একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে নিজেদের আমলনামাকে ভারি করে চলছে আর চরম ভোগান্তির শিকারে পরিণত করে চলেছে দেশের জনগণকে। এই সরকারের আমলেই জনগণ সবচাইতে বেশি আইনের শাসনের সুফল থেকে বঞ্চিত থাকছে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রতিটি মানুষ অজানা দিক থেকে এক আতঙ্কজনক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। কখন কে সমাজবিরোধী মস্তান-চাঁদাবাজের কবলে পড়ে, কখন হাইজ্যাকারের শিকার হয়, কখন গুণ্ডা-খুনির হাতে তার কন্যা-বোনের ইজ্জত লুট হয়, কখন কে সমাজবিরোধী অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাতে জীবন হারায়, কখন তার কষ্টার্জিত অর্থে কেনা জমিনটি, দোকানটি সন্ত্রাসীদের জবরদখল হয়ে যায়, কখন তার কাছে সন্ত্রাসী সশস্ত্র চাঁদাবাজদের উড়ো চিঠি আসে ইত্যাদি টেনশনের মধ্যেই সকলকে থাকতে হচ্ছে। বিশেষত ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা যেন অর্থ নাড়াচাড়া করার পেশায় জড়িত হয়ে মস্তবড় এক অপরাধই করে ফেলেছেন। তাদের বেচাকেনার অর্থ নিয়ে না তারা স্বাচ্ছন্দ্যে কোথাও মালামাল কিনতে যেতে পারছেন, না টাকা-পয়সা ব্যাংকে জমা দিতে যেতে পারছেন বা ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে নিরাপদে দোকানে বাড়িতে ফিরতে পারছেন। সমাজ দুশমনদের হাতে পড়ে শুধু তাদের সম্পদই ছিনতাই হয় না, অনেক সময় এইসাথে জীবনটিও তাদের দিয়ে আসতে হয়। নয়তো বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালাতে হয়। ব্যবসায়ীরা যতক্ষণ না দোকান বা কর্মস্থল থেকে ঘরে ফিরে না যাবেন, ততক্ষণ তাদের আপনজনেরা এক চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন। অনেকের অভিভাবক রাতে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরও তার সন্তানের বাসায় ফিরতে বিলম্ব দেখে অজানার আশংকায় জড়োসড়ো থাকেন। কারও কারও মা-বাবা রাতের অন্ধকার ভেদ করেই সন্তানের খোঁজে বের হয়ে পড়েন। এমন একটি দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষ বর্তমানে দিনযাপন করছে। ফলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির হাত

www.pathagar.com

থেকে অব্যাহতির উপায় কি? আমরা মনে করি জনগণকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হলে খেলাফত আলা মিনহাজিন্নবুয়ত ভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েম করার বিকল্প নেই। আল্লাহর পথে, ন্যায় এবং সত্যের পথে টিকে থাকতে হলে কেউ শুনুক বা না শুনুক সত্যের বাণী বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেই যেতে হবে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম দেশবরেণ্য আলেম ও খেলাফত মজলিসের নেতা মাওলানা আজিজুল হক ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের এ সংক্রান্ত ঈমানদীপ্ত পৌনপুনিক স্পষ্ট ভাষণে মূলত এ বাস্তবতারই নির্ভীক অভিব্যক্তি ঘটেছে। এটা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তীব্র টকবিশিষ্ট তেঁতুলের বীজ বপন করে পাকা পাকা সুস্বাদু ফজলি আম খাবার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। অন্যথায় বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার কিছুতেই পবিত্র মাহে রমযানের মর্যাদা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারতো না। মূলত সারাদেশে বর্তমানে যেই মূল্যবোধের অবক্ষয় চলছে তরুণ সমাজের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ভয়াবহ আর কেনইবা আজ আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার এই দুর্গতি? এসবের মূল কারণ কোথায় এবং সমাধান কোন্ পথে? বলাবাহুল্য এসব জিজ্ঞাসার ইদানীং বিভিন্ন সভায় বিবৃতিতে জবাব দিয়ে যাচ্ছেন দেশের বিভিন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব। এইসাথে তারা এ জন্য অভিযুক্ত করছেন বর্তমান সরকারকে। তারা বলছেন, সরকার সমাজে রমযানের শিক্ষা আদর্শ প্রতিষ্ঠার বদলে এই পবিত্র মাসে রাস্তায় মূর্তি স্থাপন করে এদেশের তাওহীদবাদী জনগণের ধর্মীয় চেতনায় মারাত্মক আঘাত হেনেছে। এখানে ভারতীয় অপসংস্কৃতির সয়লাবে আমাদের তরুণ সমাজ আজ বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। দ্রুতগতিতে সমাজের বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ও রুচিহীনতা বেড়ে চলেছে যার জন্যে সরকারের অনুসৃত নীতিই দায়ী। দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোর মারফত যে সব নির্লজ্জ ও দৃষ্টিকটু ছবি অব্যাহতভাবে প্রচারিত হয়ে আসছে এবং এগুলোতে যৌন সুড়সুড়ি দানকারী যেসব দৃশ্য দর্শক-পাঠক- শ্রোতাদের দেখতে ও শুনতে হচ্ছে তাতে যে কোন সমাজের তরুণ-তরণীরই চরিত্র ধ্বংস হতে বাধ্য। পত্রান্তরে প্রকাশ, চলচ্চিত্রের কোনো বই এতই অশ্লীলতাদুষ্ট যে, সমাজ চরিত্রে সেগুলোর ক্ষতিকর অশুভ প্রভাবের কথা ভেবে সেন্সর বোর্ড সেসব বইয়ের কোনো কোনো অংশের প্রচার নিষিদ্ধ করলেও প্রচারকালে সেসব নিষিদ্ধ বিষয়সহ তা প্রচার করতে পরোয়া করা হয় না। এ থেকে কি এটাই প্রতীয়মান হয় না যে, আসলে একদিকে ধর্মপ্রাণ দেশবাসীর সেন্টিমেন্টের প্রতি লক্ষ্য করে কর্তৃপক্ষ দায়সারা গোঁছের কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করে অপরদিকে নেপথ্যে তার বিপরীত ইঙ্গিতই দিয়ে রাখেন। অন্যথায় সেন্সর বোর্ডের নীতির বিরুদ্ধাচারণ করার পরও কি করে সেই আপত্তিকর ছবি জনসমক্ষে প্রচারিত হতে পারে? এটি দেশবাসীর ইসলামী রুচি বিনষ্ট করে জনগণের কাছে ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থাকে অপ্রিয় করে তোলারই দূরভিসন্ধি ছাড়া কিছু নয়। অন্যথায় এজন্যে আইন বিরোধী সংশ্লিষ্টরা অবশ্যই আইনের কষানিতে পড়তো। কিন্তু তাতো নয়ই বরং দেশ, জাতি, ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ঐসকল অপসংস্কৃতির দালালদেরকে সরকার নানানভাবে পোষকতাই দিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের স্বকীয়তা, জাতীয় পরিচিতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতি, তা মুছে ফেলার জন্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল দিক থেকে দীর্ঘদিন যেই ষড়যন্ত্র চলে আসছে, নিকট বা দূর অতীতে এদেশের ক্ষমতায় যারা ছিলেন, তারা বিষয়টিকে কোনোদিনই সিরিয়াসভাবে নেননি বরং নিজেরাও ক্ষমতায় থাকাকালীন তার পোষকতামূলক নীতিরই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু এতদিনকার বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাত এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যদিয়ে আসলে যে সেই অপশক্তি আমাদেরকে শুধু সাংস্কৃতিকভাবেই নয়, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল দিক থেকেই তার এজেন্টদের মাধ্যমে গোলাম বানিয়ে রাখতে চায়, এখন দেশের সেসব নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দও তা আঁচ করতে পেরেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আর তাদের সেই অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিরূপেই এ সপ্তাহে দেশের জাতীয়তাবাদী ইসলামী শক্তির সমন্বয়ে ঐক্যজোট গঠিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। সুতরাং তারা ক্ষমতায় থাকাকালীন এতদিন যেসব বিষয়কে শুধু দেশের আলেমদের আশংকা ও চিল্লাচিল্লী বলে উড়িয়ে দিতেন, তাদেরও আজ কর্তব্য হলো–ইসলামবিরোধী অপশক্তিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিরূপে চিহ্নিত করে, সেই শক্তির বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে গর্জে ওঠা। অন্যথায় অতীতের দ্বিমুখী নীতির দ্বারা বাংলাদেশী কোটি কোটি মুসলমানের জাতীয় সত্তা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যেই ষড়যন্ত্র চলছে তার মোকাবিলা দুরুহ হয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত আমও যাবে ছালাতো যাবেই।

মহানবী (সাঃ)-এর মি'রাজ গমন

[প্রকাশ ঃ ১৭. ১১. '৯৮ ইং]

হিজরতের দেড় বছর পূর্বে ২৬শে রজব দিবাগত রাত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর জীবনের অকল্পনীয় ঘটনা হিসেবে মি'রাজ সংঘটিত হয়। ফিরিশতাকুলের নেতা জিবরাঈল (আঃ) এসে মহানবীকে খবর দিলেন, আপনাকে পরম প্রভুর সান্নিধ্যে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে। এই ধূলির ধরা থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- কে মহাকাশ অতিক্রম করে পরম প্রভুর সান্নিধ্যে নিয়ে যাবার জন্যে "বুরাক" দরজায় দাঁড়িয়ে। বিদ্যুতের চাইতেও হাজার হাজার গুণ অধিক গতিসম্পন্ন বুরাকের পিঠে সওয়ার হওয়ার পূর্বে আল্লাহর রসূল ওযু করে নিলেন। অতঃপর বুরাক যোগে সর্বপ্রথম মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে সফর করেন। উল্লেখ্য যে, মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস তথা মসজিদুল আকসায় সকল নবী-রসূল (সাঃ) জামায়াতে নামায আদায় করেন। সেখান থেকে অবসর হয়ে মহাকাশের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বায়তুল মা'মুরে পৌঁছেন। বাতুল মা'মুর হচ্ছে ফিরিশতাদের আসমানী কা'বা। নভোমণ্ডলের প্রতিটি স্তরে ফিরিশতাকুল শেষ নবীকে বিরাট সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন–"মারহাবা ইয়া রাসূলাল্লাহ মারহাবা" বলে তাঁকে স্বাগত জানান। 'বায়তুল মা'মুর থেকে মহানবী (সাঃ)- কে নিয়ে বুরাক 'সিদরাতুল মুনতাহা' গিয়ে

www.pathagar.com

পৌঁছে। সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছেই বুরাক থেমে যায়। মহানবীর দৃষ্টিতে তখন থেকেই অভূতপূর্ব নূরানী আভা পরিদৃশ্যমান হয়ে উঠে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আমার গন্তব্যস্থল এখানেই শেষ। এখান থেকে আমার আর এক পাও সামনে অগ্রসর হবার ক্ষমতা নেই। তাহলে নূরের তাজাল্লীতে আমার পাখার পরসমূহ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বায়তুল মা'মুর থেকে মহানবী (সাঃ)- কে আল্লাহর "আরশে মুআল্লা" পর্যন্ত নিয়ে যায় অপর একটি কুদরতী সওয়ার–তার নাম হচ্ছে "রফ রফ"। মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছেই রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে উচ্চারিত হলো ঃ 'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু। অতঃপর আল্লাহ পাক হযরতের প্রতি সম্বর্ধনার বাণী উচ্চারণ করে বললেন ঃ আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিউ ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। " হে নবী তোমার প্রতি শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক।" আল্লাহ তায়ালা সালামটি শুধু প্রিয় নবী (সাঃ)- কে উদ্দেশ্য করে দিলেও তিনি তা গ্রহণকালে তাঁর উম্মতদেরকেও শামিল করে নিলেন–জবাবে বললেন ঃ আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন অর্থাৎ "এ শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর ও সকল নেকবান্দার উপর।"

নবীজীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মি'রাজের সময় পরম প্রভুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ পর্বে নামাযের পরিমাণসহ তৎকালীন ও অনাগত দিনের মনুষ্য সমাজের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীবকে বিশেষ বিশেষ সামাজিক বিধান প্রদান করেন। মি'রাজ উত্তরকালে মদীনাকেন্দ্রিক একটি পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ রাষ্ট্র, তার প্রশাসনিক ও সামাজিক কাঠামো ঐ বিধানসমুহের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সূরা ইসরাতে বর্ণিত চৌদ্দটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতির গুরুত্ব সর্বকালের সর্বযুগের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। যাঁর মাধ্যমে নবুওত ধারার পরিসমাপ্তি ঘটবে, তাঁর দ্বারা যেমন গোটা মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক, তেমনি এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অর্পণকালে দায়িত্বদাতা কর্তৃক মানব জাতির এ মহান নেতাকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব বুজিয়ে দেয়াটাই যুক্তিযুক্ত। বড় বড় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো নির্দেশ প্রদানকালে সেখানে টেলিফোনে কথা না বলে আঞ্চলিক শাসনকর্তাকে কাছে ডেকে নিয়েই কথা বলেন, তাকে নির্দেশ প্রদান করেন ও আদিষ্ট বিষয়ে গুরুত্ব বুঝিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট নির্দেশটির গুরুত্বের প্রেক্ষিতে এর প্রয়োগের দ্বারা জাতির কল্যাণ ও এর প্রতি উপেক্ষা অবজ্ঞার ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কি কি খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে, সে সম্পর্কেও আভাস দিয়ে থাকেন। তাই উক্ত বিধানটির প্রচারের গুরুত্ব, তার অনুসরণে সুযোগ-সুবিধা ও অমান্যকারীদের কি কি মারাত্মক শাস্তি হতে পারে, সে সম্পর্কেও দায়িত্বদাতা সুপ্রীম অথরিটি তাগিদ-তাম্বি করে থাকেন। মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভের শুভলগ্নে আল্লাহর শেষ নবীকে আল্লাহ তায়ালা এ জন্যেই তাঁর বিধানের অনুসারী ও অস্বীকারকারীদের পরিণতিসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়েছিলেন। বেহেশত ও দোজখ আল্লাহর রসূল সরাসরি দেখেছেন। কোন্ পাপ কর্মের কি শাস্তি, কোন্ পুণ্যের কি পুরস্কার তাকে তা দেখানো হয়।

www.pathagar.com

মিরাজের বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রসঙ্গ

প্রত্যেক নবী-রসূলের জীবনেই কিছু কিছু মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা থাকে। শেষ নবী (সাঃ)-এর জীবনের মুজিযাসমূহের মধ্যে মি'রাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা বললেও যথেষ্ট নয়। কাজেই মি'রাজের বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজতে যাওয়া একটি অবান্তর চিন্তা। মি'রাজ নবী -জীবনের এমন একটি ঘটনা, যার সাথে রয়েছে ঈমানের গভীরতম সম্পর্ক। এ সম্পর্কের কারণেই এ ঘটনা শোনামাত্র কোনো কোনো সাহাবী কিছুটা ইতস্তত করতে থাকলেও হযরত আবু বকর (রাঃ) নির্দ্বিধায় বলে উঠলেনঃ আল্লাহর রসূল যদি একথা বলে থাকেন, তা হলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত ঈমানের এই কামালিয়াতের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন বলেই তিনি 'সিদ্দীক-ই-আকবর' রূপে চিরদিন অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেনও।

বলাবাহুল্য, যুক্তি কোনদিনই ঈমানের ভিত্তি নয়–ঈমানই হচ্ছে যুক্তির ভিত্তি। বরং যুক্তির ক্ষমতা যেখানে শেষ ঈমানের যাত্রা সেখান থেকেই শুরু। তারপরও কোনো কোনো মহৎ ব্যক্তির এ ব্যাপারে যুক্তির অবতারণা সেটা শুধু ঈমানের স্বাদ অনুভব করার জন্যই। যেমন আল্লাহ কর্তৃক মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পূর্ণ ঈমান থাকা সত্ত্বেও নিজের স্পৃহা দমন ও মনের আকাংখা পূরণের উদ্দেশ্যে তার বাস্তব দৃশ্য দেখার জন্যে তিনি আল্লাহর কাছে আবদার করেছিলেন। আর আল্লাহও তাঁর সেই আবদার পূরণ করেছিলেন। মি'রাজের ব্যাপারে মনের এরূপ স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাও তার সম্ভাব্যতার বাস্তবরূপ সম্পর্কে মনের সান্ত্বনা লাভের ইচ্ছা জাগতে পারে যে, জীবদেহ কি করে মধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করতে পারে? আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে যেখানে মানুষ মধ্যাকর্ষণ শক্তির স্তর অতিক্রম করে একাধিকবার বিভিন্ন গ্রহ ঘুরে আসে, সেখানে খোদ মধ্যাকর্ষণ শক্তির স্রষ্টার নির্দেশ তাঁরই বিশেষ মহান অতিথি শেষ নবীর জন্য তিনি কি সেই ব্যবস্থা করবেন না? হযরত ইবরাহীম (আঃ)- কে সম্রাট নমরূদ কর্তৃক যেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেই আগুনের দাহন শক্তি হরণ করে ইবরাহীম নবীকে যিনি রক্ষা করেছিলেন, তিনিই মহানবীর জন্যে মধ্যাকর্ষণ শক্তির স্তর ভেদ করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বুরাক কথাটি 'বারকুন' থেকে গঠিত। এর অর্থ বিদ্যুৎ। মধ্যাকর্ষণ শক্তি ভেদ করার জন্যেই হয়তো বৈদ্যুতিক গতি শক্তি বিশিষ্ট এই বুরাক প্রেরিত হয়। বিজ্ঞান ইসলামের অনেক কিছুকেই বর্তমানে যুক্তিগ্রাহ্য করে দিয়েছে, যা শত শত বছর ধরে সম্পূর্ণরূপে জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানহীন লোকদের কাছে অযৌক্তি ছিল। হাদীসের মর্ম অনুযায়ী, মৃতকে কবরস্থ করা হলে সেখানে শেষ নবীকে উপস্থিত করে ফিরিশতা কর্তৃক তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসার ব্যাপারটিও একদিন অনেকের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। কারণ সওয়াল-জওয়াবের সময় এক নবী সত্তাকে বহু স্থানে কি করে পেশ করা হবে? কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কার-টিভি তার সম্ভাব্যতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছে। তেমনি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষের প্রতিটি কথা সংরক্ষিত রাখা হয়। এ ব্যাপারেও কারও কারও জিজ্ঞাসা ছিল যে, এটা কি করে সম্ভব? তার জবাব আজকাল টেপরেকর্ড -সিডি-ভিসিডি থেকে সহজেই পাওয়া যায়। কাজেই মি'রাজের ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও এর বাস্তবতা প্রশ্নাতীত।

মি'রাজ সশরীরেই হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তায়ালার যেই বাণীটির দ্বারা মি'রাজের ঘটনা সত্যায়িত, সেই বাণীতে তিনি মহানবীকে তাঁর 'আব্দ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, "সুবাহানাল্লাযী আস্রাবি'আবদিহী লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারামে ইলাল মাসজিদিল আকসাল্লাযী বা-রাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা-"পূতপবিত্র মহান শক্তিধর সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের সামান্যতম অংশের মধ্যে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত সফর করিয়েছেন। (অতঃপর মি'রাজের সফর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন) যেন আমি আমার "বড় বড় নির্দেশনাবলী তাঁকে দেখাতে পারি।" বলাবাহুল্য মহানবীর মি'রাজকে যদি আধ্যাত্মিক বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে আল্লাহ্ কর্তৃক 'আবদ'শব্দটি বলা অর্থহীন হয়ে যায়। এছাড়া আধ্যাত্মিক সফরের ক্ষেত্রে বুরাকের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না-কেননা আত্মার জন্য বুরাকে বসার দরকার হয় না। রক্ত- গোশতের দেহ-সত্তার ক্ষেত্রেই 'আব্দ' শব্দটি ব্যবহৃত।

আত্মিকভাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ও কথা বলার কাজ তো নবীর জমিনে থেকেই হতে পারতো। মি'রাজ সে রকম কিছু হলে এর তাৎপর্যই থাকতো না এবং এটা এত অধিক আলোচনারও বিষয় হতো না। তদ্রুপ "বড় বড় নিদর্শন দেখানোর" কথাটিও তখন অনেকটা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়তো। অথচ আল্লাহর রাসূল সেগুলো সশরীরে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন।

মি'রাজ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, 'আল-আকসায় যেতে প্রায় হাজার মাইলের কাছাকাছি পথ রাতের সামান্য অংশে ভ্রমণ, সেখানে নবী রাসূলদের সাথে নিয়ে জামায়াতে নামায আদায় করা, মহাকাশ সফর করা, বায়তুল মা'মুর ও 'সিদরাতুল মুনতাহা' অতিক্রম করে পরম প্রভুর সাথে কথা বলা, বেহেশত- দোযখ দেখা ইত্যাদির পর পুনরায় ফিরে এসে কি করে নিজ কামরার কড়া নড়তে দেখা বা ওযুকৃত পানি গড়িয়ে যাবার দৃশ্য দেখা সম্ভব? এর জবাবে এই জড়জগত ও সুদূর মহাকাশের সময় ও আলোর গতির প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় যে, কোনো দেশে অপর দেশের রাষ্ট্রীয় অতিথি আগমনকালে যেমন স্বাগতিক দেশের যান-বাহনবিধির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয় এবং আমন্ত্রিত অতিথি তার অভ্যর্থনা কক্ষ বা অবস্থান কেন্দ্রে পৌঁছার আগ পর্যন্ত চলন্ত যানবাহন যেটা যেখানে গিয়ে থেমেছে সেখানেই তাকে দাঁড়াতে হয়, তেমনিভাবে মহাস্রষ্টার মহাঅতিথি শেষ নবীর 'আরশে আজীম' সফর উপলক্ষেও আল্লাহ তায়ালা তাঁর গোটা প্রাকৃতিক জগতের নিয়মকে হযরতের মহান সফর সমাপ্তি পর্যন্ত একই অবস্থায় স্থির রেখেছিলেন। ফলে তিনি এত বিরাট সফর সমাপ্ত করেও তাঁর দরজার কড়া নড়তে বা ওযুর পানি গড়িয়ে যাবার দৃশ্য

www.pathagar.com

দেখতে পেয়েছিলেন। মহানবীর জন্যে এটা করা অস্বাভাবিকও নয়–কারণ হাদীসে আছে, শেষ নবীকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান জমিন কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করতেন না।

দুধের মধ্যে কত প্রকার ভিটামিন রয়েছে, সে সম্পর্কে অবগত ব্যক্তির শরীরে যেমন দুধ উপকার করে দুধের উপকারিতা সম্পর্কে কারও পুঁথিগত জ্ঞান না থাকলেও একইভাবে সেও দুধ খেয়ে উপকার পায়। আসল কথা হচ্ছে দুধ পান করা। মি'রাজের ব্যাপারেও বলতে হয়, এ থেকে উপকার গ্রহণ সম্পূর্ণ নির্ভর করবে মহানবী (সাঃ) কর্তৃক আনীত নীতিসমূহের উপর ঈমান এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর প্রতিষ্ঠার উপর। মানব সমাজ আজ অগণিত সমস্যার ভারে জর্জরিত। মানব রচিত বিধি বিধানের ব্যর্থতা প্রাচ্য-প্রতিচ্য সর্বত্রই সুস্পষ্ট। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে,মহান স্রষ্টা তাঁর রাসূলকে কাছে ডেকে নিয়ে সর্বকালের সর্বযুগের সকল মানুষের জন্যে তাদের উপযোগী যেই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধান দিয়েছেন, মানব জাতি যে পর্যন্ত না সে বিধানের দিকে ফিরে যাবে তাতে সঠিক শান্তির পথ পাবে না। মি'রাজের স্মৃতি ও আলোচনা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে এবং জীবনের সার্বিক মুক্তি আনয়নে সহায়ক হোক-এটাই একজন মুমিনের কাম্য হওয়া উচিত।

মি'রাজ শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ঈমানের সাথে এ ঘটনার রয়েছে নিবিড়তম সম্পর্ক। তাতে সামান্যতম শৈথিল্য একজনকে মি'রাজের প্রশ্নে বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে ঠেলে দিতে পারে। শেষ নবী (সাঃ)-এর স্বল্প সময়ে সশরীরে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ এবং তার সাথে কথোপকথন, সেখানকার অনেক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্যে একটি পরিপূর্ণসমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের মৌল নীতিমালা নিয়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন, এতগুলো কাজ এ সময়ের মধ্যে কি করে সম্ভব, সর্বোপরি জড়দেহী নবী মুস্তফা (সাঃ) পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি স্তর কি করে ভেদ করলেন, এসব প্রশ্নে কারও মনে আদৌ কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। পবিত্র কুরআনে সূরা ইসরা তথা সূরা-বনী ইসরাইলের শুরুতে বর্ণিত আব্দ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা সকলের কর্তব্য।

'আব্দ' (বান্দা-দাস) রক্ত-গোশত বিশিষ্ট একটি দেহসত্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং আল্লাহ তাঁর আবদ মুহাম্মদ (সাঃ)- কে মক্কা থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত স্থানে রাতের সামান্য সময়ের মধ্যে যদি ভ্রমণ করাতে পারেন, তারপক্ষে ঐ 'আব্দকে' মহাকাশ সফর করানোটা কি করে অসম্ভব হতে পারে? এ সফর যে স্বাভাবিক সফর নয় এ জন্যেই তো একে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা হয়েছে অন্যথায় কোনো মামুলি সফর হলে কিছুতেই "লাইলান" বা "রাতের সামান্য অংশ" শব্দটির ব্যবহারের তাৎপর্য থাকতো না। তেমনিভাবে হযরতের মহাকাশ সফরের বাহন হিসাবে বুরকি তথা বৈদ্যুতিক সওয়ারী ব্যবহারেরও অর্থ হয় না। পৃথিবীর রক্ত-মাংসের মানুষকে অন্য গ্রহ অতিক্রম করাতে হলে এটিই প্রয়োজন ছিল। মি'রাজের ব্যাপারে প্রশ্ন জাগা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কাছে নতুন কোনো ব্যাপার নয়–অস্বাভাবিকও নয়। এ

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসা তৎকালীন আরব সমাজেও জেগেছে। হযরত (সাঃ) মিরাজ সফর সমাপ্ত করে যখন মক্কাতে এ ঘটনার বর্ণনা দেন, তখন আবু জেহেল, আবু লাহাবের ন্যায় কাফির নেতারা মহানবীর নবুওত ও তাঁর প্রতি নাযিলকৃত ওহীর ব্যাপারে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি করছিল। এ ঘটনাকে তারা একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবেই পেয়ে গিয়েছিল। তারা বলতে শুরু করলো, দেখো আমরা যে মুহাম্মাদ ও তার বক্তব্যকে অস্বীকার করি সেটি এমনি করি না। এ ধরনের আজগুবী কথা কি কোনো সুস্থ মানুষ বলতে পারে? এটা কি সম্ভব, রাতে মক্কা থেকে হাজার মাইল অতিক্রম করে ফিলিস্তিনে অবস্থিত বাইতুল মুকাদ্দাস সফর করা?আবার সেখান থেকে নাকি মুহাম্মদ খোদ আল্লাহর সাথেও সাক্ষাত করে এসেছে? কাফির নেতারা হযরতের অতি বিশ্বস্ত সাহাবী এবং আরব সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট ছুটে গিয়ে তার মতামত জানতে চাইল। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে জবাব দিলেন, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যদি এ কথা বলে থাকেন, তাহলে সত্যিই বলেছেন–কেননা তিনি নবী। তিনি অসত্য কথা বলতে পারেন না। অতঃপর কাফিররা পরীক্ষা করার জন্য মুহাম্মদ (সাঃ)-কে দলবদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা সত্যই যদি আপনি মসজিদে আকসা তথা বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে থাকেন, তাহলে বলুন দেখি, সে ঘরের কয়টি স্তম্ভ, কয়টি দরজা-জানালা ইত্যাদি রয়েছে? প্রশ্নটি সাধারণ ছিল না। মানুষ সাধারণত যে পাঠশালায় দীর্ঘদিন লেখা-পড়া করে বা শিক্ষা দেয় সে ঘরের ব্যাপারেও এভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তার পক্ষে জবাব দান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে বৈ কি। হযরতের পক্ষেও এ প্রশ্নের জবাব দান সহজ ব্যাপার ছিল না। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। তখনই আল্লাহ তায়ালা মুহূর্তের মধ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের ছবি তার স্মৃতিপটে হাজির করে দিলেন। তিনি সে দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবিশ্বাসী কাফিরদের সকল প্রশ্নের হুবহু জবাব বলে দিলেন। তারপরও কাফির নেতারা শেষ নবীর প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করতে পারেনি।

আসলে নবুওত ও রিসালাতের প্রতি যারা পূর্ণ আস্থাশীল, তাদের কাছে মি'রা;জের ঘটনায় সন্দেহ ও বিস্ময়ের কিছুই নেই। সন্দেহ থাকলে তো প্রথমেই থাকার কথা ছিল, যখন হযরত (সাঃ)-এর ন্যায় একজন উম্মী ব্যক্তি দীর্ঘদিন হিরা গুহায় অবস্থানের পর এসে বললেন যে, আমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাঈল ফিরিশতা এসে বলেছেন, 'ইকরা'-পড়ো, তখন বললাম, আমি তো পড়া জানি না আর তিনি আমার বুক স্পর্শ করলেন। তৃতীয়বার এভাবে স্পর্শ করার পর যখন বললেন, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল-লাযী খালাক–পড়ো সেই সত্তার নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তখন আমার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে তো বের হয়ে আসলো। সেখানেও তো প্রশ্ন জাগাতে পরে যে, কোনো নিরক্ষর ব্যক্তির বুক স্পর্শ করলে কিংবা তার বুকের সাথে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির বুক মিশালে যেমন মুহূর্তের মধ্যে সেই নিরক্ষর ব্যক্তির জ্ঞানী হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে তা কি করে সম্ভব হলো? কি করে মুহাম্মদ (সাঃ) তার সামনে বেহেশতী বস্ত্রে লিখিত কুরআন পড়তে পারলেন?

বস্তুত এটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা, বস্তুগত যুক্তি দ্বারা যা বুঝে আসতে পারে না। ইসলামের মূল ভিত্তিই তো আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বাসের উপর। যুক্তি প্রয়োগে সেখনে কি

www.pathagar.com

পাওয়া যাবে? ইসলাম নিছক বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গির একটি জীবন বিধান নয়-বরং এটি এক আধ্যাত্মিক খোদায়ী জীবন বিধান। এ কথাটি ভুলে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল হয়ে যাবে। তারপরও কোনো মহৎ ব্যক্তির এ ব্যাপারে যুক্তির অবতারণা সেটা শুধু ঈমানের স্বাদ অনুভব করার জন্যে। যেমন আল্লাহ্ কর্তৃক মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূর্ণ ঈমান থাকা সত্ত্বেও নিজের স্পৃহা দমন ও মনের আকাঙ্খা পূরণের উদ্দেশ্যে এর বাস্তব দৃশ্য দেখার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে আবদার করেছিলেন। আল্লাহ্ পাকও একটি ঘটনার মধ্যদিয়ে তা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দেখিয়েছিলেন, ইতিপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে।

মানব রচিত পক্ষপাতদুষ্ট আইন ও নিয়ম-বিধির যাঁতাকলে নিষিপষ্ট হয়ে মানবতা আজ ত্রাহি ত্রাহি করছে। মানব আইনের ব্যর্থতাজনিত সমস্যাবলী আজ পূর্ব পশ্চিম সকল দিককেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সর্বজ্ঞানের আধার মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাসুলকে মিরাজ রাজনীতে কাছে ডেকে নিয়ে সর্বকালের মানুষের কল্যাণে যে শাশ্বত বিধান দিয়েছেন, মানবজাতির যতদিন না সে বিধানো দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, সঠিক পথের দিশা পাবে না। তাই মহাকাশ পাড়ি দিয়ে মহানবী (সা) বিশ্ব জাহানের স্রষ্টার সান্নিধ্যে গিয়ে মানব কল্যাণে কি কি বিধান এনেছেন আজকের এ দিনে সকল মানুষের কর্তব্য হলো সে সব বিধানের অনুসন্ধান করা এবং সে অনুযায়ী ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে গড়ে তোলার ইস্পাত কঠিন শপথ গ্রহণ করা। উল্লেখ যে,

মহান আল্লাহ্ শেষ নবীর মিরাজের মাধ্যমে মানব জাতির জন্যে সার্বজনীন ১৪টি মূলনীতি সুরা বনী ইসরাইলে ঘোষণা করেছেন, যেগুলো একটি সার্থক সমাজ বিপ্লবের জন্যে একান্ত জরুরী। মিরাজ দিবসের শিক্ষা আদর্শের চর্চা এবং এর মূল লক্ষ্যকে সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত করণে ও আমাদের সার্বিক মুক্তি আনয়নে তখনই সহায়ক হবে, যদি আমরা এ ব্যাপারে আপোষহীন হই।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র সংশোধন বিতর্ক

[প্রকাশ ঃ ২০. ৯. '৯৮ ইং]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ১১ই সেপ্টেম্বর জাতীয় পরিষদের এক অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে সে দেশের সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদা দানের কথা ঘোষণা করেন এবং এ জন্যে পনরতম শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী বিল পেশ করেন। এ উপলক্ষে তিনি জাতীয় পরিষদ, রেডিও এবং টেলিভিশনের সাহায্যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে দাবী করেন যে, পনরতম শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর দ্বারা দুর্নীতি, অনিয়ম-অসাধুতা ও ঘুষখুরির অবসান ঘটবে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূর হবে, জাতীয় সম্পদ, উপায়-উপকরণে সকল নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত হবে। গরীবরা শক্তিশালী হবে। মজলুম এদিক থেকে শক্তির অধিকারী হবে যে, তারা অন্যায় ও

www.pathagar.com

শোষণ বিরোধী আইনের সহযোগিতা পাবে। তিনি বলেন, বিচার ব্যবস্থায় এ পরিবর্তন পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। পাকিস্তানে ইসলামী শরীয়া প্রবর্তনে সমাজের শ্রেণী বিশেষের সম্ভাব্য সমালোচনার দিকটিও নওয়াজ শরীফ উল্লেখ করেন। কিন্তু জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির বিরোধী দলীয় শরীক দলগুলো ('পিপলস পার্টি, মুহাজির কওমী মহার্য (এমকিউএম)' এই বিল প্রত্যাখ্যান করে। বিলটির খসড়া প্রচারিত হবার পর পক্ষে-বিপক্ষে পাকিস্তানে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা চলছে পনরতম শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী বিলটির খসড়া পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী "পরামর্শ পরিষদ" পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শর্তাধীন তার প্রতি সমর্থন দিলেও নওয়াজ শরীফ সরকারের অনুসৃত বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করছে। নওয়াজ শরীফের ঘোষণাটি বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রে গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তাৎক্ষণিকভাবে এ ব্যাপারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, "এটি একটি পশ্চাৎপদ পদক্ষেপ। প্রতিবেশী দেশসমূহের ওপর এটি প্রভাব ফেলবে। পাকিস্তানের এ পদক্ষেপ উদ্বেগজনক।" পাকিস্তানে শরীয়া আইন চালুর বিরুদ্ধে ভারতের এই মন্তব্যের পাকিস্তান প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, "পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য অনধিকার চর্চা এবং অবাঞ্ছিত।"

পাকিস্তানে ইসলামী শরীয়া আইন প্রবর্তনের বিল পেশের কথা শুনে ইসলামপ্রিয় অনেকেই আনন্দ অনুভব করছেন এবং তাদের কাছে বিষয়টি যেন একটি কাংখিত 'না- হওয়া ঘটনা' ঘটতে যাচ্ছে। অনেকে এতে অবাকও হয়েছে। কিন্তু যারা আল-কুরআনের দাবী এবং শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সংগ্রামী মহান সাথীদের কর্মময় জীবন সম্পর্কে পূর্ণ অবগত, তাদের কাছে বিষয়টি তেমন অবাককর মনে হয়নি। কোনো জনপদের মুসলিম অধিবাসীরা "নামাজ পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে" কিংবা তারা" এ বছর "রমযান মাস থেকে রোযা থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে" বললে যেমন ব্যাপারটি নতুন কোনো তাৎপর্য বহন করে না, তেমনি মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে শরিয়তী শাসন চালুর জন্যে শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী বিল আনার খবরটিও অনেকটা এরকমই। কারণ, কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আইন চালু হবে এটাই স্বাভাবিক। পাকিস্তান একটি মুসলিম দেশ এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে সেখানকার রাষ্ট্রীয় আইনে গোলামিযুগের আইনের পরিবর্তে ইসলামী আইনই থাকার কথা। দেরীতে হলেও বর্তমান পাকিস্তান সরকার একথাটিই নতুন কের সামনে এনেছে। কিন্তু তারপরও কি কারণে এ ঘোষণায় নতুন তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা অনুভূত হচ্ছে, সে কারণ অনেক দীর্ঘ। আজকের পাঠকদের সামনে সংক্ষিপ্ত আকারে তার কিছুটা আসা প্রয়োজন।

মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী আইন চালু না থাকার দৃশ্যই মুসলিম সমাজের আধুনিক-শিক্ষিত বিশেষ করে যুবসমাজ দেখে আসছে। অথচ মুসলিম দেশগুলোতে ঔপনিবেশিক শাসনের সময় তখন তারা সাবেক মুসলিম আমলের ইসলামী আইনসমূহ বাতিল করে দেয়। মুসলিম দেশগুলোতে প্রায় দু'শ/ পৌনে দু'শ বছর ধরে বিদেশী বিজাতীয়দের শাসনাধীন তাদের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, ভোগবাদী জীবন দর্শন, জীবন চেতনা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির মানদণ্ডে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও চাল-

www.pathagar.com

চলনে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। অতঃপর মুসলিম সমাজের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের রক্তাক্ত সংগ্রাম ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্বাধীনতা আন্দোলনের বদৌলতে দেশ ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হয় অতঃপর যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসে, তারা বিদেশী ইংরেজ শাসনাধীন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মনমানসিকতায় অভ্যস্থ থাকায় সেসব নেতৃত্বের পক্ষে ইসলামী আইন চালু করা সম্ভব হয়নি। তাই মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী আইন চালু না থাকা একটা সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হয়। এখান থেকেই মুসলিম যুবকদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

এভাবে গোলামী যুগের বিদেশী আইন দ্বারা মুসলিম দেশসমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সমস্যাবলীর সমাধান না হয়ে সেগুলো আরও জটিল রূপ ধারণ করে। অনেক আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম শাসকেরই এখন সম্বিত ফিরে আসতে শুরু করেছে। অপরদিকে সমাজের সচেতন বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, রাজনীতিক শিক্ষাবিদ প্রভৃতি সমাজ সচেতন শ্রেণীও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনা এবং পশ্চিমী জীবনধারার হোতাদের মানব দরদজনিত গালভরা বুলিসমূহের তাৎপর্য অনুধাবন করতে থাকে, যেই চেতনার স্বাভাবিক দাবী মোতাবেক আপন স্বকীয়তা, জীবনাদর্শ এবং গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতিও তাদের নজর পড়ারই কথা। মুসলিম ও ইসলামী আইন এবং মুসলিম দেশ ও ইসলামী আইন অবিচ্ছেদ্য। মুসলমানদের চিন্তা, মনন ও ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী আইন ও বিধি-ব্যবস্থার অনুশীলন না থাকলে তারা নামে মুসলিম থাকলেও কার্যত মুসলিম থাকার কথা নয়। অনুরূপভাবে কোনো মুসলিম দেশে ইসলামী আইন ও সংবিধান না থাকলে, তাও প্রকৃতপক্ষে মুসলিম দেশ পদবাচ্যের অধিকারী থাকে না। এমনকি মুসলিম পরিচিতি এবং ইসলামের নামে কোনো দেশ অর্জিত হলে যখন উল্লেখিত কোনো কারণ, ষড়যন্ত্র বা কারও চাপে সেই পরিচিতি, নাম ও সংশ্লিষ্টদের সংস্কৃতি মুছে যায় আর ঐ মুসলমানদের অন্তরে এ জন্য কোনো জ্বালা ও স্বকীয়তাবোধ জাগ্রত না হয়, তখন তাদের স্বাধীনতার মূল দর্শনগত যৌক্তিক ভিত্তিও আর অবশিষ্ট থাকে না। তখনই এ জাতিকে পদানত করে রাখার এতোসব ষড়যন্ত্র যারা এঁটে আসে, তাদের পক্ষ থেকে অথবা তাদের নিয়োজিত ছদ্মবেশী এজেন্টদের দ্বারা নানান কৌশলে এই যুক্তির অবতারণা ঘটতে থাকে যে—সীমান্তের এপার-ওপারের মানুষের জীবনধারার সকল কিছুই যখন এক ও অভিন্ন, তখন আর ভৌগোলিক সীমারেখার প্রাচীরটি রেখে দিয়ে লাভ কি? যেমন আজকাল কোনো কোনো আত্মবিক্রীতের পক্ষ থেকে অতি সুকৌশলে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের '৪৭-এর সীমান্ত রেখা মুছে ফেলার প্রস্তাব করতে দেখা যায়। এসব কারণে পাকিস্তানে ইসলামী আইন চালুর জন্য আনীত বিলের খবরে দেশ-বিদেশের যে কোনো সচেতন এবং স্বাধীনচেতা মুসলমানের খুশী হবারই কথা। কিন্তু প্রশ্ন জাগে শাসকগোষ্ঠীর অধিকাংশের চিন্তা-চরিত্র ইসলামী না হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেও পাকিস্তানের ইসলামী রিপাবলিক নামকরণ যেমন দেশটিকে ইসলামী করতে সক্ষম হয়নি বরং ইসলামেরও দুর্নামের নিমিত্ত সৃষ্টি করেছে, তেমনি

www.pathagar.com

আশংকা করা হয় পরিকল্পিত শরিয়তী বিলটিরও একই দশা হয় কিনা? যে কোনো মুসলমানেরই আন্তরিক প্রত্যাশা হলো, পাকিস্তানসহ প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রেই খোদায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র গঠিত হয়ে বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষদের জন্য আশার প্রদীপ জ্বলে উঠুক। মুসলিম জাতি আবার জ্ঞানপ্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও চরিত্রে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষদের দিশারীর আসন লাভ করুক। কিন্তু খোদ মুসলমানই যদি ইসলামের আন্তর্জাতিক ভোগবাদী বৈরী শক্তিসমূহ এবং বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বাজপেয়ীদের পথ ধরে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের প্রয়াসকে অজ্ঞতাবশতঃ পশ্চাৎমুখিতা কিংবা 'ধর্মান্ধতা' ইত্যাদি বলে সমালোচনা করে, তাহলে এটা অবশ্যই আত্মঘাতী এক চিন্তা বৈ কি। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানেরই কর্তব্য হলো এই বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করা।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে ভাষণ দেয়ার পর দেশের বিরোধী দলসমূহ বিশেষ করে বেনজীর ভুট্টো এর তীব্র সমালোচনা করছেন। তারা এটাকে আখ্যায়িত করছেন নওয়াজ শরীফের একটি রাজনৈতিক চাল হিসেবে। সমালোচকরা বলেছেন, সিটিবিটিতে দস্তখতের প্রতিক্রিয়া রোধে এটি নওয়াজের এক ফন্দী। আবার কেউ কেউ বলছেন, ১৯৮৮ সালে জুনেজো সরকারের পতনের পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এক আইন পাশের মাধ্যমে শরীয়াকে দেশের মূল বিচারব্যবস্থার ধারক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। ফলে এরপর নওয়াজের সংবিধান সংশোধনের আহ্বানটি অযৌক্তিক। তাদের কেউ কেউ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ কুরআন ও সুন্নাহকে দেশের সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদাদানসূচক বিল পেশের ঘোষণাটি ঠিক তখনই দিয়েছেন যখন পার্লামেন্টে তিনি দু'তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন থেকে বঞ্চিত। যেসময় তিনি দু'তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনের অধিকারী ছিলেন এবং জাতীয় পরিষদে বিদ্যমান প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই মুসলিম লীগের অনুকূলে ছিলো, সে সময় তিনি নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি, পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য ভারি মেন্ডেটের বোল্ডডোজারটি ব্যবহার করেন আর নিষ্প্রয়োজনে শুধু পশ্চিমী শক্তিকে খুশি করার জন্য জুমার দিনের সরকারী ছুটি বাতিল করে পাকিস্তানী সমাজের ইসলামী পরিচিতিকে আঘাত হানেন। তখন তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আইনের উচ্চমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আইন সংশোধনে নিজের ঐ শক্তি ও প্রভাবকে কাজে লাগাননি। বর্তমান সময় এই পদক্ষেপের দ্বারা তিনি পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ ক্রীড়নক শ্রেণীটিরই শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন ক্ষমতাসীন শ্রেণী ভারত বিভক্তির মাধ্যমে দেশটি প্রতিষ্ঠার মূল দর্শন বিস্মৃত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার আত্মঘাতী পথ অনুসরণ করেছিল। সে সময় জাতীয় পরিষদের স্পীকার ছিলেন তমিজুদ্দীন খান। তিনি অধিবেশন চলাকালে মরহুম মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীকে বলেছিলেন,

www.pathagar.com

"হযরত মওলানা! কওম এক নাজুক মারহেলা চে গুযার রাহি হ্যায়, আগার আপকো কুছ্য কাহ্না হ্যায়, তু ফরমাইয়ে।" (জাতি এক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এই মুহূর্তে আপনার কোনো বক্তব্য থাকলে পেশ করুন।) তখন মওলানা উসমানীর যুক্তিগ্রাহ্য বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে সদস্যরা তাদের মত পাল্টান এবং পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের আদর্শ হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ স্বীকৃতি পায়, যাকে আদর্শ প্রস্তাব বলা হয়। সে সময় ইসলামী শাসনতন্ত্র বিরোধী চক্র এ ব্যাপারে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ জন্য আন্দোলনকারী প্রধান সংগঠন জামায়াতে ইসলামী নেতা মরহুম মওলানা সাইয়েদ আবুল আলীমও দূদীকে তৎকালীন মুসলিমলীগ সরকার কারাবন্দী করে। প্রতিপক্ষের ইসলামী শাসনতন্ত্র বিরোধী সকল প্রচেষ্টাই জমদাবীর সামনে তখনকার মত ব্যর্থ হয়। মূলত দেশটিতে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও তার বিরোধিতার সেই ধারাবাহিকতার যেমন একটি হলো বর্তমান পাকিস্তানে এ নিয়ে বিল উত্থাপন, তদ্রূপ একটি হলো সাবেক বিরোধীদের প্রেতাত্মাদের বিরুদ্ধাচরণ। জনাব নওয়াজ শরীফ যদি মুসলমানদের প্রত্যাশা নিয়ে অতীত একশ্রেণীর শাসকের ন্যায় এ নিয়ে কোনো "রাজনীতি" করেন, তাহলে মুসলমানদের সাথে ইসলামী শাসনতন্ত্র নিয়ে সেসব নেতার "রাজনীতি" যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেনি, নওয়াজ শরীফেরও সেই একই পরিণতি বরণ করা অসম্ভব নয়। মুসলিম উম্মাহ্র ইতিহাসের মস্তবড় গৌরব পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবার ঘোষণাদাতা এবং এ উপলক্ষে একজন যথার্থ মুসলিম শাসকের ন্যায় অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক ভাষণদানকারী নওয়াজ শরীফের ভূমিকা এমনটি না হোক এবং তার সহকর্মীরা নিষ্ঠা সহকারে দেশটিকে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হোক, সকর ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরই এটা হৃদয়ের কথা।

যারা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের দর্শন এবং উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের বিপরীত পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার পক্ষে ওকালতি করে এবং বাজপেয়ীদের ন্যায় কথা বলে থাকেন, তারা অতীতে যেমন ঐ দেশটি এবং মুসলমানদের ক্ষতি করেছেন আজও তাই হবে। এ ব্যাপারে পাকিস্তানী মুসলমানদের আগে-ভাগেই সতর্ক হওয়া কর্তব্য।

কায়েদে আজমের দৃষ্টিতে পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্য ঃ

এক শ্রেণীর লোক পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াতো। পাকিস্তানের জন্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার দাবীতে দেশজোড়া কোনো আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেই পশ্চিমা ভোগবাদী জীবন দর্শনে প্রভাবিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী কিংবা ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তির তল্পীবাহক শ্রেণীটি এক যুগে 'হুয়াক্কা হুয়া' রব তুলতো। তৎকালীন পাকিস্তানে তারা দেশটির জনক মরহুম কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর এ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বক্তৃতা-ভাষণগুলো সরাসরি অস্বীকার করে মিথ্যা প্রচারণা চালাতো যে, শরীয়ত তথা ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কখনও পাকিস্তান আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল না। নিম্নে কায়েদে আজমের কতিপয় ঐতিহাসিক উক্তির আলোকে এ বিষয়টি লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

১১ই অক্টোবর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই ভাষায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দর্শনটি পেশ করেন যে,

"পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে যেই দর্শন কাজ করেছে, তাহলো আমাদের এমন একটি রাষ্ট্রের প্রয়োজন, যেখানে আমরা স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে ও শ্বাস ফেলতে পারবো, যেখানে আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির অধীন আমরা উৎকর্ষ ও বিকাশ লাভের সুযোগ পাবো এবং যেখানে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবে ইসলামের সামাজিক ন্যায় বিচার।

Speaches and writings of mr. Jinnah গ্রন্থের ২৪১ পৃষ্ঠায় ইসলামের ব্যাপকতা সম্পর্কে কায়েদে আজম বলেন, "অনেক লোকই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারছে না। জানা দরকার, যখনই আমরা 'ইসলাম' কথাটি উচ্চারণ করি, এর দ্বারা আমরা একথাই বুঝিয়ে থাকি যে, ইসলাম নিছক কতিপয় বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক আমল এবং আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণারই নাম নয়, ইসলাম প্রতিটি মানুষের জন্যে একটি জীবন ব্যবস্থাও বটে, যা অর্থনৈতিক কার্যক্রমসহ তার গোটা জীবনের সকল কর্মকান্ডে তাকে একটি আইন-শৃংখলা ও নিয়মরীতি প্রদান করে।"

পাকিস্তানের এই বিঘোষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যই নওয়াজ শরীফ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন কি পারবেন না, কিংবা তা আন্তরিকভাবে চান কি চান না, এ বিষয় এই মুহূর্তে আলোচনা না করে, তিনি লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হোন এটাই পাকিস্তানীদের চাওয়া উচিত।

নিছক শ্লোগান ও দেহ প্রদর্শনী নারীমর্যাদা নয়

[প্রকাশ ঃ ১৮. ৩. ২০০৪ ইং]

সেদিন বিশ্ব নারীদিবস উদযাপিত হয়ে গেল। এমনিতে পৃথিবীতে নারী স্বাধীনতার যথেষ্ট ঢাকঢোল পেটানো হয়, পশ্চিমা বিশ্বে এবং তাদের প্রাচ্যের দোসররা নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের উপর দীর্ঘদিন থেকে জোরেশোরে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে নারী নির্যাতনের সংঘটিত কোনো ঘটনাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে এবং মুসলিম সমাজের নারীদেরকে সবসময় জুলুম-নিপীড়নের শিকার হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। অথচ পাশ্চাত্য সমাজেও নারীরা কম নির্যাতনের শিকার নয়। এই পরিস্থিতির পাশাপাশি আরেকটি নতুন প্রবণতা হল পুরুষদের নিন্দাবাদ ও তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা। বিশেষ করে মুসলিম পুরুষদের নারী নির্যাতনকারী হিসেবে প্রমাণ করার পাশ্চাত্য প্রবণতা যেন একটু বেশিই মনে হয়। ইসলাম সম্পর্কিত যেসব ভ্রান্তধারণা ও কুসংস্কার প্রচলিত আছে, সেগুলো বেশি বেশি

www.pathagar.com

করে হ্রাস করা হয়ে থাকে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ অনুসারে জীবন পরিচালনাকারী নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকে সংকীর্ণমনা, অত্যাচারী, মানবতার দুশমন এবং অনুদার প্রমাণ করার চেষ্টা চলছেই। নারী অধিকারের প্রশ্নে তাদের এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার পাশাপাশি আরেকটা উদ্বেগজনক বিষয় হলো -এসব ধারণাকে তারা বিশ্বময় ব্যাপক প্রচারের এক অভিযান শুরু করেছে। মুসলিম সমাজের নারীদেরকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দেওয়ার নানান চেষ্টা চলছে।

মুসলিম নারীদেরকে ইসলামী নীতি-আদর্শের ব্যাপারে বিদ্বিষ্ট করে তোলার এ অপচেষ্টা শুধু পাশ্চাত্য মিডিয়াতেই নয়, বরং বিভিন্ন পাশ্চাত্য শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচ্যের দেশসমূহে কর্মরত এনজিওগুলোও প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে এ ব্যাপারে নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নারীদেরকে ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, ইসলামী আইন নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে বড় অন্তরায়। এই সকল আইন নারীদের শোষণেরই হাতিয়ার। এভাবে ইসলামের ব্যাপারে নারীদেরকে বীতশ্রদ্ধ ও বিদ্রোহী করে তোলার উস্কানি দীর্ঘদিন থেকেই দিয়ে আসা হচ্ছে। উত্তরাধিকার আইনে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পত্তিতে নারীদেরকে ছেলেদের অংশের তুলনায় কম দেয়া হয় বলে প্রচার চালানো হয়। কখনও কখনও নারীদেরকে পুরুষের অনুরূপ বিবাহবিচ্ছেদ অধিকার চাওয়ার দাবী তুলতে উস্কানি দেয়া হয়। এছাড়া নানানভাবে তাদের ধারণা দেয়ার চেষ্টা চলে যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীরাই অধিক জ্ঞানবান এবং বিশেষ করে মুসলিম পুরুষদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা দিতে গিয়ে আরও বলা হয়, তারা নিম্ন চরিত্রের অধিকারী, অসৌজন্য আচরণকারী, ন্যূন মেধার অধিকারী, সদাচরণবর্জিত, স্বার্থপর ও নারীবিদ্বেষী, মুসলমান পুরুষরাই নারী সমাজের উন্নতি-প্রগতির পথে বড় অন্তরায়। এসব উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণায় তারা আরেকটি যেই শব্দ বেশি বেশি উচ্চারণ করে, সেটা হলো "পুরুষ শাসিত সমাজ"। অতঃপর এই সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যে, সুতরাং নারীস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীঅধিকার প্রাপ্তির মাধ্যমে নারীসমাজের সঠিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে ইসলামী মূল্যবোধ এবং বিধিবিধান ও নীতি-আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে। নারী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনারে পাশ্চাত্যের নারী সমাজের প্রতি যে জুলুম-নিপীড়ন হয়ে থাকে, ঐগুলোও যদি তুলে ধরা হতো, তবেই ভাল হতো। কিন্তু একশ্রেণীর বক্তাদের মুখে তা কমই শোনা যায়। বরং সচেতনভাবেই এ সংক্রান্ত আলোচনা সভায় সেগুলো পরিহার করা হয়। তাজ্জবের বিষয়, ঐ সকল সমাজকেই আমাদের সামনে আদর্শ সমাজ হিসেবে তুলে ধরার অধিক চেষ্টা করা হয়। মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় ও সমাজ নেতৃত্বকে নানানভাবে এসব বিষয় গেলানোর সূক্ষ্ম চেষ্টা চালানো হয়, যে ব্যাপারে তারা অনেক ক্ষেত্রেই সফল বলা যায়।

বলাবাহুল্য, নারীস্বাধীনতা ও নারী সমাজের সমানাধিকারের নামে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবন-দর্শনের অনুসারী ইসলাম বৈরীদের এই অপচেষ্টারই পরিণতি হলো মুসলিম মেয়েদের স্বকীয়তা বিচ্যুতির প্রধান কারণ। পশ্চিমা সমাজের স্টাইলে কুরুচীপূর্ণ পোশাক পরা, বেপরোয়াভাবে গৃহ ত্যাগ করে চলা এবং পরিণামে জুলুম-

www.pathagar.com

নিপীড়নের শিকার হওয়া এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। মজার ব্যাপার হলো, অতঃপর নারীদের প্রতি এসব জুলুম-নিপীড়নকেই আবার ইসলামের কুৎসা রটনার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এসব প্রচারণায় একশ্রেণীর মুসলিম নারী বিভ্রান্ত হয়ে অভিভাবকদের দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হলে কিংবা অবাঞ্ছিত পথে চলতে গিয়ে সমাজ বিরোধীদের লালসার শিকার হয়ে পড়লে, এসব ঘটনাকেই আবার বিশ্বময় নারী নির্যাতন হিসেবে দেখানো হয়। যাহোক, এভাবে নানান প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়া নারীদেরকেই ইসলামের বৈরী মহল সারা দুনিয়ার সামনে অতীব যোগ্য সম্মানিত ও নারী সমাজের গৌরবরূপে উপস্থাপন করে থাকে।

ইসলামী মূল্যবোধ পরিহারকারী এই নারীদেরকে তাদের ধর্ম ও অভিভাবকমণ্ডলী বিরূপ দৃষ্টিতে দেখলে ইসলাম বিদ্বেষীরা তাদেরকে তখন প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী এবং মানবতা ও নারী সমাজের দুশমন বলে প্রচারণা চালায়।

এভাবে ধীরে ধীরে নারীদের জীবন ধারাকে পুরুষের অনুরূপ গড়ে তোলার চেষ্টা চলে, যেন তারা পুরুষ ছাড়াই স্বচ্ছল এবং স্বাবলম্বী জীবনের অধিকারী হতে পারে।

এতে বাহ্যত আর্থিক দীনতা মুক্তির এক ভাল দিক প্রত্যক্ষ করা গেলেও এর বাস্তব পরিণতি অন্য সমস্যাকে ডেকে আনে। অন্যদিক বাদ দিয়ে জীবন উপকরণের দিক থেকে এভাবে নারীরা স্বাবলম্বী হওয়ার পরই দাবী উত্থিত হতে থাকে যে, জৈবিক চাহিদা পুরণার্থে বৈবাহিক বন্ধনের কোন প্রয়োজন নেই। দাম্পত্য বন্ধন ছাড়াও তা চলতে পারে। বলতে দ্বিধা নেই, চিন্তার এ স্তরে পৌছার পর তখনই পশ্চিমা সমাজে সমকামিতা ও লীভ টুগেদারের ন্যায় পাশবিক ও ঘৃণ্য বিষয়ের আলোচনা আসতে থাকে। কয়েকবছর আগে মিসরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে এ ধরনের কাজের অনুমতি এবং আরও কতিপয় বিষয়কে আইনের আওতায় আনার দাবী তোলা হয়েছিল, যেগুলো কোনোভাবেই মুসলিম অমুসলিম কোনো সমাজের নারীমর্যাদা ও নারী সম্ভ্রমের সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং এর দ্বারা নারীত্বের পবিত্রতা ও মর্যাদা ধ্বংসের দ্বারই উন্মুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমা সমাজে তথাকথিত নারী স্বাধীনতা অনেক আগেই ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক ব্যবস্থা কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়েছে। পাশ্চাত্যের তথাকথিত নারী স্বাধীনতার ধারণা, সীমাহীন যৌন-উচ্ছৃংখলা, নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্ক বিহীন একান্তে সহাবস্থান, কুমারী মেয়েদের মা হবার ঘটনাসহ বহু জটিল সমস্যা এখন বিশ্ববাসীর সামনে নিয়ে এসেছে, পরকালীন জীবনে নিজ জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জবাবদিহিতার অনুভূতিবর্জিত নিছক ভোগবাদী এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বিবাহ বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন পরিবাররূপ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্ত সমাজের মানুষ এখন দাম্পত্য সম্পর্ক ছাড়াই এক সাথে বসবাস করতে পছন্দ করছে। কেননা, পশুপাখী ও জীব জানোয়ারের অনুরূপ দাম্পত্য সম্পর্কহীন এই জীবনে তালাক এবং উত্তরাধিকার আইনের আর কোন বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন আসছে না। নারী-পুরুষ যে সময় যে যাকে পছন্দ, সে তারই সাথে

www.pathagar.com

চলে যেতে পারছে তার সাথে থাকতে পারছে। অভিন্ন কারণে, শিশু পালনের ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্যে ও অনেক নারী এখন সন্তান নিচ্ছে না।

পরিবার পরিকল্পনার নামে নিত্যনতুন জন্মনিরোধক ওষুধপত্রের ব্যবহার পাওয়ায় পাশ্চাত্যের বহু দেশে বিবাহ বন্ধন ছাড়া সৃষ্ট কুমারী মাতাদের সংখ্যা দিনের দিন বেড়েই চলেছে। সেখানকার বিবাহহীন নারীদের শতকরা পঞ্চাশ জনই অপগর্ভের অধিকারী। নারীদেরকে মাত্রাতিরিক্ত উপার্জনে অধিক আগ্রহী করে নারী-পুরুষের মধ্যকার প্রকৃতিগত স্বাভাবিক বৈষম্যের ভারসাম্য বিনষ্ট করার প্রয়াস চলছে। এর ফলে পারিবারিক কাঠামোর ধ্বংসাবস্থাই আজ আমাদের সামনে উপস্থিত। এইবাস্তবতা কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক, এটাই সত্য যে, নারী জীবনের উল্লেখিত অবাধ জীবনাচার ও পারিবারিক ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী রূপেই মানুষের চিরায়ত শান্তিপূর্ণ সমাজ ও সমাজ কাঠামোকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে বাধ্য।

সংশ্লিষ্ট সকলেরই স্মরণ রাখা দরকার, মানব সভ্যতা শত শত বছরের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পরই একটি যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছিল। এর মধ্যে নারী পুরুষের দায়িত্ব আলাদাভাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল, যাতে কিছু দায়িত্ব হলো পিতার আর কিছু দায়িত্ব মাতার। নারী-পুরুষ শারীরিক গঠন প্রকৃতিতেই আলাদাভাবে সৃষ্ট এ বাস্তবতাকে অস্বীকারের কোন উপায় নেই। এর সাথে সঙ্গতি রেখেই উভয়ের জন্য আল্লাহ সম অধিকার রেখেছেন। তাই তার ধরন আলাদা। তাদের মধ্যকার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ আল্লাহ যেভাবে ভাগ করেছেন সেই ভাগই মূলত মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রত্যেক ধর্ম ও সমাজ এই সত্যকে অঘোষিতভাবে স্বীকার করে নিয়েছিল যে, বহু কাজ এমন রয়েছে, যা নারীদের ক্ষমতায় বর্হিভূত বা কিছু কিছু কাজ এমন, যা পুরুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু নারী স্বাধীনতার বিকৃত ধারণা ও নারী -পুরুষের সমান অধিকারে ভ্রান্ত মতবাদ নারীদেরকে এক মেশিনে পরিণত করেছে। বর্তমানে অবলা নারীদের ঘাড়ে পুরুষদের সমতা অথবা, নারীদের স্বাধীনতার শ্লোগান বাস্তবে দ্বিগুণ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। এর ফলে নারীদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রত্যেক নারী ডিপ্রেশন -এর শিকার হচ্ছে। একদিকে তাদেরকে কৃত্রিমভাবে পুরুষদের সমপর্যায়ে আনার এমনকি পুরুষদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দিনরাত্র কষ্ট পরিশ্রমে নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে। অপরদিকে জৈবিক চাহিদা পূরণার্থে এমন সব পথ অবলম্বন করতে হচ্ছে যা সরাসরি মানসিক, সামাজিক, আত্মিক ও শারীরিক নানান ব্যাধিকেই ডেকে আনছে।

মূলত গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মুসলিম দেশসমূহের যেখানে পুরুষ দ্বারা নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে বলে মনে হয়, তা ইসলামের কারণে নয়, বরং ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকার কারণেই এমনটি হচ্ছে। কারণ, এমন লোকের সংখ্যা অনেক কম, যারা সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষা আদর্শ সম্পর্কে অবগত এবং ইসলামী নীতিমালার অনুসারী। অন্যথায় ইসলাম নারীদের যে অধিকার এবং মর্যাদা দিয়েছে, পাশ্চাত্য সমাজে শত চেষ্টা করেও নারীরা সেই অধিকার এবং মর্যাদা আজও পায়নি। বরং

www.pathagar.com

তাদের প্রদত্ত 'সাম্য ও স্বাধীনতার' শ্লোগান নারীদের ভাব-মর্যাদা ও তাদের প্রকৃত শান্তি -সুখকেই ধ্বংস করেছে। যারা নারী সম্পর্কিত ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক বিধান এবং শিক্ষাসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন না করে এর প্রতি ভাসাভাসা নজর বুলায়, তারাই ইসলামকে অজ্ঞতা ও বিদ্বেষবশত একটি অত্যাচারী ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালায়।

বিনয়ের সাথে না বলে পারা যাচ্ছে না যে, এক শ্রেণীর সংকীর্ণ জ্ঞান ও সংকীর্ণ মনের ধর্মীয় ব্যক্তিও ইসলামের ব্যাখা উপস্থাপনায় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার বদলে মানুষকে এ ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধই করে তোলে। তাদের অনমনীয় ভূমিকা এবং ইসলামী শিক্ষার মূল তাৎপর্যের ব্যাপারে অগভীর জ্ঞানও ধর্মের ভাব মর্যাদাকে বহুলাংশে বিনষ্ট করছে, এর কোনো কোনো মানুষ এতে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে মহানবীর জীবন-চরিত্র ও কোরআনের মূল দাবী ও আদর্শ থেকে। ফলে ধর্ম সম্পর্কে আজ ক্ষেত্র বিশেষে এমন ধারণারও সৃষ্টি হয়েছে যে, অতি ধার্মিকতাই বোধ হয় মানবতার থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। মুসলিম নামের ছদ্মবেশীদের দ্বারা নারীদের ক্ষেত্রে অনেক হিন্দুয়ানি নিয়ম-রীতি ও কৃষ্টিকালচারকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট করা হয়েছে। ফলে অনেক নারী মনে করে, ইসলামী রীতি-নিয়ম অনুসরণের কারণেই তাদের জীবন দুর্বিষহ ও শোষিত। এ জন্যই নারীরা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের সামনে এই পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্যের তথাকথিত নারী স্বাধীনতা ও নারী পুরুষের সমান অধিকারের শ্লোগান নেহায়েৎ চিত্তাকর্ষক বলে অনুভূত হয়েছে। ফলে তারা নিজেদের প্রকৃত দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার থেকে মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞানীদের ভ্রান্ত মতের অনুসারী হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ প্রদত্ত পারিবারিক কাঠামোকে ধ্বংসের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

ইসলামের সঠিক শিক্ষা, বিধিবিধান এবং তাতে নারীদের অধিকার , কর্তব্য ও মর্যাদার বিষয়সমূহ শুধু মুসলিম নারীদের কাছেই নয়, জাতি ধর্ম অঞ্চল নির্বিশেষে গোটা বিশ্ববাসীর সামনেই যে এগুলো উপস্থাপন জরুরী উল্লেখিত পরিস্থিতি তারই দাবী করছে। নারী অধিকার ও নারী মর্যাদা সম্পর্কিত যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণে ও সকল অপপ্রচার রোধেও মুসলিম দায়িত্বশীলদের উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য। জাতির সত্যিকার দরদী বুদ্ধিজীবী মহল, উলামা এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা এবং ইসলামের নারী অধিকার সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করা সকলেরই নৈতিক, ধর্মীয় ও মানবিক কর্তব্য। এই কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের মধ্যদিয়েই নারী সমাজের যথার্থ কল্যাণ, তাদের অধিকার ও প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়কে নিশ্চিত করতে হবে। এই বজ্র কঠোর শপথ নিয়ে নারী দিবস পালিত হলেই সেটা যথার্থ নারী দিবস উদযাপন হবে। অন্যথায় গতানুগতিক নারী দিবস উদযাপন, এর তথাকথিত আলোচনা মুসলিম জাতিসত্তা ও এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ, মূল্যবোধ ধ্বংসের পথকেই এগিয়ে নিয়ে যাবে বৈকি।

www.pathagar.com

ভাষা সাহিত্য ব্যবহারের আল্লাহনির্দেশিত ক্ষেত্র

মানব মনের ভাবের আদান-প্রদানের বাহন হচ্ছে ভাষা। জ্ঞানের আহরণ, বস্তু রহস্য ও বিষয় রহস্য সম্পর্কে অবগতির মাধ্যম হচ্ছে ভাষা। জীবন সাফল্যের বিভিন্ন দিকের উন্মোচন ঘটে এই ভাষার সাহায্যেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে, আল্লাহর বাণী পবিত্র কোরআনে যেখানে মানব জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে এবং পথনির্দেশক রয়েছে ভাষার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে মানবস্রষ্টা তার অমর বাণীতে এ ব্যাপারে মানুষকে কি ধারণা বা পথ নির্দেশনা দিয়েছেন তেমনি আল্লাহর সৃষ্ট অসংখ্য ভাষার মধ্যে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কেই বা তার পবিত্র কুরআনে আমাদের উদ্দেশ্যে কি বলা হয়েছে?

আরবী ভাষায় অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনে ভাষা শব্দেরই আরবী লিসান প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর সাথে মায়ের ভাষার গুরুত্ব এবং ভাষা সাহিত্য ব্যবহারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত পবিত্র কুরআনের সূরা ইবরাহীমে তাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ সূরা ইবরাহীমের শুরুতেই এ মর্মে ঘোষণা করেছেন যে, - **ওমা আরসালনা মিন রাসূলিন ইল্লা বিলিসানে কওমিহী লেইউবায়্যেনা লাহুম**-অর্থাৎ আমি প্রত্যেক রাসূল (তথা মনুষ্য জাতীর কাছে খোদায়ী বাণী বাহক) কে তার জাতির ভাষা (অর্থাৎ মায়ের ভাষা) দিয়েই পাঠিয়েছিলেন। তিনি (মানব সমাজের কাছে আল্লাহর নির্দেশ) সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরতে পারেন।

এই আয়াতে মাতৃভাষার গুরুত্ব যেমন ফুটে ওঠে তদ্রূপ এ ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্য চর্চার বহুবিদ লক্ষ্যের মধ্যে প্রধান লক্ষ্যটি কি হওয়া কর্তব্য তা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আর সেটি হলো, মানবজাতির পারস্পরিক ভাববিনিময়ের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে প্রধান লক্ষ্যই হওয়া উচিত, এই ভাষা সাহিত্যের সাহায্যে অপরের কাছে মানুষসহ সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহর নির্দেশসমূহ সুস্পষ্ট, যৌক্তিক ও বোধগম্যভাবে তুলে ধরা। সুতরাং ভাষা সাহিত্যের চর্চাকারী প্রতিটি শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী এবং কবি-সাহিত্যিক -সাংবাদিক সকলেরই প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় নিজেদের ভাষা জ্ঞান, ভাষা সাহিত্যের ব্যবহার ও চর্চা দ্বারা নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করা। যেমন ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা অপরকে মহাস্রষ্টার মনোনীত জীবনবোধ, জীবনধারা ও জীবনাচারের দিকে আহবান জানানো এবং খোদায়ী বিধি ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সকল কিছুর উপর প্রতিষ্ঠা করা ও ভাষা সাহিত্য আশ্রিত পন্থায় আল্লাহর দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণার জবাবে এই ভাষা সাহিত্যের সঠিক ব্যবহার করা।

বলার অপেক্ষা রাখে না, বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) -এর উম্মতের এ যুগটিতে ইসলামের বিরুদ্ধে এর বিরোধী আগ্রাসী শক্তির অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সাহিত্য। তথা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখনী তথা বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থাতেই প্রচার মাধ্যমসমূহের দ্বারা এর ক্ষতি সাধনের অধিক প্রয়াস চলবে। এ জন্যে মহান আল্লাহ মানবতা ও

www.pathagar.com

ইসলাম বিরোধীদের বস্তুগত অস্ত্র, উপায় উপকরণের সাহায্যে যে কোনো হামলার মোকাবিলা করে যেমন চরম ত্যাগ-তিতিক্ষার দ্বারা এ জাতি ও তার আদর্শকে টিকিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি মুসলমানরা যাতে ইসলাম বিরোধী সকল আগ্রাসনের বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় মোকাবিলা করতে পারে সে জন্যে তাদের নিজস্ব ভাষা-সাহিত্যের ব্যবহারের উপরও নানানভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তৎকালীন আরবী ভাষা-সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধবাদী কবি-সাহিত্যিকদের সমালোচনা এবং ইসলামের কুৎসার জবাবে এ কারণেই মহানবী তার দরবারে ইসলামী কবি-সাহিত্যিকদেরও মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। বিখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিক কবি হাসসান বিন সাবিত তার জোরদার লেখনী সাহিত্য কর্ম ও কাব্য জ্ঞানের সাহায্যে ইসলামবিরোধী লেখক-সাহিত্যিকদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরতেন বলেই মহানবী (সাঃ) -এর দরবারে কবি হাসসান এবং তার মতো অন্যান্য লেখক-সাহিত্যিকদের সম্মান ও মর্যাদা ছিলো। আল্লাহর রাসূল তাদের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। অপরদিকে যেসব লেখক ও সাহিত্যিকদের লেখা ও সাহিত্য চর্চা ইসলাম, মানবতা ও সত্য সুন্দরের অনুকূলে ব্যবহৃত না হয়ে তার বিপরীত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো তিনি যেমন সেসব সাহিত্য চর্চার নিন্দা করেছেন, তেমনি খোদ্ আল্লাহও শুধু ঐ সব সাহিত্যের নিন্দাই করেননি বরং তাদের অনুসারীদেরকে অবাঞ্ছিত শব্দে আখ্যায়িত করেছেন।

যেমন ঐ সব কবি সাহিত্যিকদের উল্লেখ করে বলেছেন, "ওয়াশ্ শোয়ারাউ ইয়াত্তাবিউনাহুমুল গা-বূন অর্থাৎ ঐসব কবি সাহিত্যিকদের অনুসরণ করে কেবল অজ্ঞরাই।" সুতরাং ভাষা সাহিত্যের গুরুত্ব এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন, তেমনি ভাষা সাহিত্যের ব্যবহারের লক্ষ্যটিও তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষাতেই গোটা মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছেন, যা সেই কেয়ামতের অনাগত দিন পর্যন্ত ভাষা সাহিত্যের অনুশীলনকারীরা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্যটি সহজেই অনুধাবন করতে পারেনি।

মূলত ভাষা সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যম হিসেবে এর গুরুত্ব যে মহাস্রষ্টা আল্লাহর কাছে কি পরিমাণ, জ্ঞান অর্জনের এই মাধ্যম ও উপকরণটির উল্লেপূর্বক আলকলম নামে একটি সূরা নাজিল থেকেও তা সহজে অনুমেয়। প্রবাদই আছে " কালি কলম মন, লেখে তিনজন।" জ্ঞানচর্চার বাহন ভাষা সাহিত্যের চর্চায় কলমের ভূমিকা বলার অপেক্ষা রাখে না। পবিত্র কুরআনে কলমের উল্লেখ দ্বারা যেমন আল্লাহর কাছে ভাষা সাহিত্যের গুরুত্ব ফুটে উঠে, তেমনি কলমের সৃষ্টি জ্ঞান ও তার দ্বারা লিখিত ভাষা সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি হওয়া কর্তব্য সেই পদনির্দেশনা এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন আল্লাহ বলেছেন -নূন, ওয়াল কালামে ইয়াদতুরুন। কবি বলে গেছেন , মাতৃভাষা বাংলা ভাষা খোদার সেরা দান। প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখিত মাতৃভাষার গুরুত্বসূচক আয়াতটির ভাব ব্যঞ্জনাই যে কবির এই বক্তব্যে ফুঠে উঠেছে, তাতে সন্দেহ নেই। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যে, এ ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূচনাতেই এর গুরুত্ব তাৎক্ষণিকভাবে এদেশের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পূর্বসূরিরা অনুধাবন করেছিলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তাদের এই অনুধাবনটি যেই তীব্র স্বকীয়তাবোধ থেকে সৃষ্ট হয়েছিল আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় জীবনকে সকল স্তরে গড়ে তোলার প্রয়াসে সেই স্বকীয়তাবোধকে ধরে রাখতে সক্ষম হইনি। ভাষা কেন্দ্রিক আমাদের সেই স্বকীয়তাবোধ সার্বিকভাবে অটুট না থাকাতে এবং এই বোধশক্তিকে আহত ও খর্ব করার ষড়যন্ত্র পরবর্তী পর্যায়ে তীব্র হয়ে উঠাতে, তাকে আশ্রয় করেই এখন আমাদের মাঝে জাতীয় ঐক্য সংহতিতে ফাটল ধরেছে। অথচ স্বকীয়তাবোধের সেই ঐক্যশক্তি দিয়েই আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে আপতিত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সূচিত সংগ্রামে আমরা জয়ী হয়েছি। এমনকি বিরাট রক্তাক্ত সংগ্রামেও জয়ী হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। কিন্তু সেই স্মৃতি নিদর্শন ভাষা দিবসটি আমরা জাঁকজমকে উদযাপন করলেও স্বকীয়তাবোধ নিঃসৃত সেই জাতীয় সংহতি ও তার দ্বারা অর্জিত ভাষাগত রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে জাতি গঠনের মুহূর্তে আমরা এখন স্বকীয়তা বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের শিকার। যেই মাতৃভাষার সংগ্রাম আমাদেরকে বিশ্ব দরবারে সম্মানে ভূষিত করেছে, সেই মাতৃভাষার অপপ্রয়োগের দ্বারাই একটি শ্রেণীর লেখক সাহিত্যিক আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী করে তুলছে। শুধু তাই নয়, এই ভাষার অপব্যবহার দ্বারাই আমাদের জাতিসত্তা, জীবনবোধ ও জীবনাদর্শ এবং স্বাধীনতা সকল কিছুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

সুতরাং আজকের মহান ভাষা দিবসে আমাদের নিজস্ব ভাষার গুরুত্ব, এর সৎ ব্যবহার বিশেষ করে ভাষাদাতা মহান স্রষ্টার অভিপ্রায় অনুসারে এই ভাষা ব্যবহারের নতুন করে শপথ নিতে হবে। তেমনি যেই স্বকীয়তাবোধের চেতনার ফল হিসাবে আমাদের মাতৃভাষা বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসন পেয়েছে, সেই স্বকীয়তাবোধকে আমাদের জাতি গঠন লক্ষ্যে জাতীয় জীবনের সকল স্তরে ফিরিয়ে আনার জন্যে সকলকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।

সার্ক-নেতৃবৃন্দের প্রতি একটি মানবিক আবেদন প্রসঙ্গ

[প্রকাশ ঃ ৭. ১. ২০০৪ ইং]

গত রোববার পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ৩দিন ব্যাপী দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক-এর ১২ তম শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়েছে। সার্কসম্মেলনের ৭টি দেশে বিশ্বের এক পঞ্চমাংশ মানুষের বাস এই অঞ্চলে যেই কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে, সে সব মানুষকে সমস্যামুক্তকরণ এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও আঞ্চলিক শান্তি-নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে পারস্পরিক উন্নয়ন কাজে সহযোগিতার জন্যেই এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাটি গঠিত হয়। এই সংস্থার এজেন্ডায় এযাবত দ্বি-পাক্ষিক বিষয়াদি না থাকলেও এবার সার্ক নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও মুক্ত বাণিজ্যের বিষয়াদিও প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে এ সবের পথে যেসকল সমস্যা অন্তরায় হয়ে আছে, সেগুলো দূরীভূত হবারও সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবার আলামত দেখা যাচ্ছে। সার্ক সংস্থার জন্যে এটিকে এক শুভ লক্ষণই বলতে হয়।

www.pathagar.com

সার্ক সম্মেলনের এমন এক প্রেক্ষাপটেই সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের প্রতি "একটি মানবিক সমস্যার সমাধানের আবেদন"-এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এর একটি পোস্টারও রাজধানী ঢাকার প্রাচীর গাত্রসমূহে দেখা গেছে। আবেদনটিতে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রপ্রধান বিশেষ করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে " আটকেপড়া পাকিস্তানী" বলে কথিতদের করুণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ৩৩ বছরকাল স্থায়ী এই মানবিক সমস্যাটির সমাধানের জন্যে আবেদন জানানো হয়েছে। এই সাথে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানকে বিগত ৩০শে জুলাই ২০০২ সালে তাঁর প্রদত্ত একটি প্রতিশ্রুতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তিনি বাংলাদেশে সরকারী সফরের সময় এখানে অবস্থানকারী উর্দুভাষী আড়াই লাখ নারী-পুরুষ- শিশুর করুণ অবস্থার কথা শুনে ব্যথিত হয়েছিলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের সমস্যাবলী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ঐ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবার আশায় এ সব বঞ্চিত মানুষ আজও চাতক পাখীর ন্যায় তাকিয়ে আছে।

উল্লেখ্য বাংলাদেশে ৬৬টি ক্যাম্পে এবং এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করছে প্রায় আড়াই লাখ উর্দুভাষী, যারা বিহারী হিসাবে এখানে পরিচিত। তারা এক চরম অমানবিক অবস্থার মধ্যেই জীবন যাপন করছে।

আবাসিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা- সাংস্কৃতিক, সকল দিক থেকেই এই বিপুল জনগোষ্ঠী নিদারুণ এক মানবেতর জীবন যাপন করছে। না আছে কর্মসংস্থান, না আছে ব্যবসা-বাণিজ্যের পুঁজি। বহু পরিবারে একাধিক প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে রয়েছে, অর্থাভাবে যাদের না উপযুক্ত শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেয়া যাচ্ছে, না তারা কোনো উপযুক্ত ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারছে। ফলে দীর্ঘ প্রায় তিন যুগ ধরে জীবন ধারণের মৌলিক উপাদান বঞ্চিত এই বিপুল জনগোষ্ঠী এখন নিজেদের পরিচিতি ও ভাষা পর্যন্ত ভুলে যেতে বসেছে।

এখন তাদের অনেকের ভাষা উর্দূ না বাংলা, না হিন্দী তা বোঝা মুশকিল হয়ে পড়েছে। এভাবে অশিক্ষা ও অনিশ্চিত জীবন ধারায় গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা ওদের বংশধররা নানান কুশিক্ষা, কুআচার ইত্যাদির শিকার হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় সামাজিক অপরাধপ্রবণতা বেড়েছে। নানান অস্থিরতা কু প্রবণতার বিস্তার ঘটছে। যা আরও কয়েক বছর পর অধিক খারাপ অবস্থার রূপ নিতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। "আটকেপড়া পাকিস্তানি " বলে কথিত উদূভাষীদের মধ্যে আরেক নীরব সমস্যা হিসাবে বিরাজ করছে কন্যাদায়গ্রস্ততা ও বয়স্ক ছেলে সন্তানদের বৈবাহিক বন্ধনের ব্যাপারটি। এ সমস্যার মূলেও সেই অর্থনৈতিক কারণই প্রধান।

এজন্যে রাজনৈতিক কারণও একটি। কারণ, অনেক বাংলাদেশী যেমন এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে ইতস্তত করে যে, তারা অস্থায়ী, তেমনি তারাও একই চিন্তায় দ্বিধাগ্রস্থ থাকে। বাংলাদেশে অবস্থানরত অবাঙ্গালীদের এ সমস্যা নিঃসন্দেহে একটি মানবিক সমস্যা। ১৯৪৭ সালে তারা স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে

www.pathagar.com

মুসলিম ভাইদের সাথে নিরাপদে বসবাস করার মানসেই এখানে এসেছিলেন এবং নিজ দেশ, খেশ, জমিজিরাত, মানসম্ভ্রম এমনকি অনেকে সাম্প্রদায়িকতার নির্মম শিকার হয়ে আপনজনদের রক্তাক্ত লাশের স্তূপ ডিঙ্গিয়েই এখানে এসেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আজ তারা বর্তমান অবস্থায় দীনহীনভাবে জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছেন । মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ হিসাবেও তাদের এই অমীমাংসিত সমস্যাটি এই উম্মাহর জন্যে অবমাননা কর কম নয়।

বাংলাদেশস্থ উর্দূভাষী অবাঙ্গালীরা এখানে " আটকেপড়া পাকিস্তানী" হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেও এবং কোনো কোনো নেতা তাদেরকে পাকিস্তানে নিয়ে যাবার জন্যে দাবী জানালেও তাদের বৃহত্তর অংশ, বিশেষ করে উর্দূভাষী বর্তমান যুব সমাজ বাংলাদেশ ছেড়ে পাকিস্তানে যাবার বিরোধী বলেই জানা যায়। স্ট্র্যান্ডেড পাকিস্তানীজ ইয়ূথ রেহেবিলিটেশন মুভমেন্ট (Stranded Pakistanis youth Rehabilitation Movement) নামের এই সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা জনাব মোশ্‌তাক আহমদ এবং অন্যতম নেতা সেলীম ও তাঁদের সঙ্গীসাথীরা অতীব জোর দিয়ে বলেছেন যে, যারা অতীতে নিজেকে পাকিস্তানী বলে দাবী করেছেন এবং এ মতের অন্যেরাও পাকিস্তানে যেতে আগ্রহী ছিলেন, তাদের অনেকেই অতীত হয়ে গেছেন এবং হতাশ হয়ে সেই ইচ্ছা পরিহার করেছেন। অতঃপর সময়ের পরিক্রমায় এবং পরিস্থিতির বিবর্তনে তাদের মধ্যকার অবশিষ্টরা বলছেন, আমরা '৭১-এর পর এদেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছি, তার মায়া ছাড়তে পারবো না। পাকিস্তান আমাদের মধ্যবর্তী পুরুষদের আবাসস্থল হলেও সেটা আমাদের জন্যে আজ পরদেশ , এখন সেখানকার মানুষের ভাষা, কালচার, চিন্তা-চেতনা , জীবনধারায় সকল দিক থেকেই আমাদের সাথে গরমিল বিদ্যমান। আমরা, যেভাবেই থাকি মাতৃভূমি বাংলাদেশই আমাদের দেশ। জীবন দিতে হয় এদেশের জন্যই দেবো, যেমন আজ ইরাকের মানুষ, ফিলিস্তীনের মানুষ নিজ নিজ জন্মভূমির জন্যে জান দিচ্ছে।

বাংলাদেশের উর্দূভাষী সিংহভাগ মানুষ নিজেদের ঐক্যবদ্ধ এই চিন্তা-চেতনা থেকেই তারা বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার প্রাক্কালে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সমীপে বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্যে আবেদন জানায় এবং হাইকোর্টে এ জন্যে রীট আবেদনও পেশ করা হয়, যার রায় এখন, প্রকাশ পায়নি। ঐ সংগঠন সূত্রে আরও জানা যায় যে, জেনেভা ক্যাম্প থেকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ উল্লেখিত যুক্তিতে নাগরিকত্বের জন্যে আবেদন জানালে তারা অনুমতিও পেয়ে যান। উর্দূভাষী এই যুব সংগঠনের বক্তব্য হলো, তাদের বর্তমান মানবেতর জীবনের অবসানকল্পে এই ভাষাভাষী লোকদের ক্যাম্প জীবনের দুর্বিষহ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশের শহর বা শহর উপকণ্ঠে কোথাও সরকারী জমিন দেয়া হোক, যেখানে তারা আরও দশটি স্বাধীন মানুষের মতো বসবাস করতে পারে। তারা সার্ক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে পাকিস্তান (যেই পাকিস্তানের জন্যে তাদের পূর্বপুরুষরা সর্ববৃহৎ ত্যাগ স্বীকার করেছেন) বাংলাদেশ এবং ভারত এসব দেশের

www.pathagar.com

নেতাদের কাছে আকুল আবেদন জানান, যাতে এখানকার উল্লেখিত অবাঙ্গালীদের পুনর্বাসনে তারা এগিয়ে আসেন এবং এই মানবিক সমস্যার সমাধান করেন।

বাংলাদেশস্থ অবাঙ্গালীদের পুনর্বাসনে উল্লেখিত সংগঠনের নেতারা এ সময় নেতৃবৃন্দের প্রতি এই পরামর্শও পেশ করেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থানরত উর্দূভাষীদের খাতে রাবেতা সহ আন্তর্জাতিক অন্য সংস্থা-সংগঠনের যেই অর্থ ব্যয়িত হয়ে আসেছ, যা উক্ত খাতে জমা আছে, সেই অর্থ এবং প্রয়োজনে এই সাথে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ বিশেষত "ওআইসি" আরও প্রয়োজনীয় অর্থ সহযোগিতায় এগিয়ে এলে, এই বিপন্ন কয়েক লাখ অবাঙ্গালীর পুনর্বাসনের একটি বিহিত ব্যবস্থা সহজেই হতে পারে।

সার্ক হোক কি জাতিসংঘ বা ওইসি— আন্তর্জাতিক যত সংস্থা-সংগঠন রয়েছে, সকল সংস্থার মূল কর্মসূচীর বিঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার কল্যাণ সাধন করা। বিশেষ করে বিশ্বের দুস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক কি যুদ্ধ বিগ্রহ কিংবা অপর কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে মানবতার গগণবিদারী আর্তনাদ ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকলে যদি এসব সংস্থা এগিয়ে না আসে, তাহলে এটা অতীব আফসোসের বিষয়। বিশেষ করে যেই দেশ বা যেসব দেশের নেতৃত্বের অনুসৃত নীতির সাথে এই মানবিক সমস্যাটি সম্পর্কিত, তাদেরই কর্তব্য হলো এদের আর্তনাদে সাড়া দিয়ে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসা। অতঃপর নিজেরা অক্ষম হয়ে আপন সহমর্মী সঙ্গী-সাথীদেরকেও এ ব্যাপারে সহযোগিতায় আহ্বান করা। এদিক থেকে এবং অন্য সকল বিচারে পাকিস্তানী নেতৃত্বের প্রধান কর্তব্য হলো বাংলাদেশের উল্লেখিত শ্রেণীর উর্দূভাষী অবাঙ্গালী মুসলমানদের এই আবেদন আর্তনাদে সাড়া দেয়া। এই সাথে সার্কভুক্ত অন্যসহযোগী দেশের নেতৃবৃন্দের কর্তব্য সার্কভূক্ত দুটি দেশের এই মানবিক সমস্যার উত্তরণে সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা।

তাবলীগ-এ-দ্বীনের সফলতার জন্য চাই ইযহার-এ-দ্বীন ও ইকামত-এ-দ্বীন

[প্রকাশ ঃ ৪. ২. ২০০০ ইং]

টঙ্গীতে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত তাবলীগ-এ - জামায়াতের বিশ্ব ইজতেমা গত রোববার মুসলিম উম্মাহ ও দেশ জাতি ধর্মের জন্যে শেষ মুনাজাতের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। এবারও দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ আল্লাহপ্রেমিক মানুষ এই মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। ষাটের দশকে সর্বপ্রথম এই মহাসম্মেলন টঙ্গীতে শুরু হয়েছিল। সেই থেকে এটি প্রতিবছর একই স্থানে বাৎসরিক বিশ্ব ইজতেমারূপে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এদেশেয় ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার ধারক-বাহক মুসলমানদের অন্তর ও চিন্তা-চেতনায় এই মহাসম্মেলন-এর ওয়াজ-নসীহত ও মুনাজাত এতই প্রভাব বিস্তার করে আছে যে, প্রাকৃতিক ও অন্য যত প্রকার প্রতিকূলতাই থাক, তার সকল বাধা

www.pathagar.com

উপেক্ষা করে তারা এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। ফলে ইজতেমার কটি দিন যেন কহর দরিয়া তথা আজকের তুরাগ নদীর তীরবর্তী মাঠ-ময়দান ও বিশাল এলাকায় লাখো জনতার ঢল নামে। আর তারই ঢেউয়ের দৃশ্য যেমন ধর্মীয় আবেশে সিক্ত হয়ে উঠে তেমনি সেই দৃশ্য যেন ইসলামের বিজয় গৌরবের কথা অশ্রুত বাক্যে ঘোষণা করতে থাকে।

বিশ্বের বহু দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানদের আগমনে ও তাদের সেসব ভাষার বক্তৃতা ও সেগুলোর বাংলা অনুবাদের সুব্যবস্থা , ইসলামী ঐক্য, শৃঙ্খলা, সাম্য ও সহমর্মিতার এক বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে বিমণ্ডিত পরিবেশের অবতারণা ঘটায়। এই মহাধর্মীয় সমাবেশের বক্তব্য শুনে এবং হৃদয়ে ধারণ করে মুমিম-মুসলমানরা নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। তবে তাবলীগ এবং এই বিশ্বইজতেমার সঠিক মর্ম অনুধাবন ও অনুসরণ করতে হবে আলকুরআন, নবীজীবন ও তাঁর ত্যাগদীপ্ত সংগ্রামী সাহাবীদের জীবন-দর্পণের আলোকে। তবেই এই তাবলীগ ও এই বিশ্বসম্মেলন যেমন অধিক সার্থক ও সফল হবে, তেমনি সমাজ থেকে সন্ত্রাস, অন্যায়, অনাচার, শোষণ-বঞ্চনা ও জুলুম-নিপীড়ন দূরীভূত হয়ে যে-কোনো জনপদ ও ভূখণ্ডে শান্তি-সুখের ফল্গুধারা বয়ে যেতে পারে। তাই আসুন, এবার আলকুরআন ও মহানবী (সাঃ) এর ত্যাগদীপ্ত জীবনাদর্শের আলোকে তাবলীগে-এ-দ্বীনের আলোচনা করা যাক।

'তাবলীগ' অর্থ প্রচার করা , কোনো কথা-বক্তব্য অপরের কাছে পৌঁছানো। দ্বীন-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে প্রতিদান, জীবন ব্যবস্থা, ধর্ম, উপদেশ। ইসলামের পরিভাষায় মানবজাতির জন্যে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থার নাম হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং তাবলীগ-এ- দ্বীন'র অর্থ হলো, আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা, ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ অপর মানুষের কাছে প্রচার করা বা পৌঁছানো।

'ইজহার' শব্দের অর্থ কোনো কিছুর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অপর কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত করা। কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী আল্লাহ্র প্রদত্ত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যকে মানব উদ্ভাবিত জীবন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করার নাম হচ্ছে 'ইজহার-এ-দ্বীন'। তদ্রূপ 'ইকামত' শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুকে দাঁড় করানো, পতিত অবস্থা থেকে উপরে সোজা করে তা স্থাপন করা। আর 'ইকামত-এ দ্বীন' শব্দের অর্থ হলো সমাজে দ্বীন কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ দ্বীনের শিক্ষা, এর আইনকানুন, বিধি বিধানসমূহ ব্যবহারিক সমষ্টিগত জীবনে বাস্তবায়ন করা। কারণ, ইসলাম নিছক কোনো তন্ত্রমন্ত্র যপ করারই তথাকথিত ধর্মের মতো কিছু নয়। এর রয়েছে একটি বাস্তব ব্যবহারিক দিকও। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো রাষ্ট্ররূপ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়মবিধি, আইন- কানুনসমূহ। মূলত এসব আইন-কানুনের ভিত্তিতেই একটি শোষণ মুক্ত দুর্নীতিমুক্ত মুত্তাকী সমাজ বিনির্মাণের কাজ চলে, গঠিত হয় একটি আদর্শ জাতি, পরিশুদ্ধ হয় জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় চিন্তা-চেতনা। এসব খোদায়ী আইন-কানুন আল-কুরআনের যেসব আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে

www.pathagar.com

এবং আল্লাহ্ যেগুলো সমাজে বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন, কোনো মুসলমানের পক্ষেই ঐসব আয়াত এবং ঐগুলোতে নির্দেশিত আইনকানুন হুকুম আহকামকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বরং নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত সংক্রান্ত আয়াতসমূহের মর্মকথার যেই গুরুত্ব, ঐ সমস্ত আয়াতের মর্মবাণীরও সমগুরুত্ব। বরং বলা যায়, কোনো দেশের রাষ্ট্রীয় নীতি, শিক্ষানীতি, সমর নীতি, বিচার ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা অপরাধ দণ্ডবিধি, মিডিয়া ইত্যাদি ইসলামী না হলে নাগরিকদের পক্ষে সঠিক মুসলিম বান্দা হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি যদি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং উল্লেখিত বিভাগসমূহ কুরআনের আইন বিধানের ভিত্তিতে না চলে বরং ইসলামের বিপরীত হয়, তখন সমাজ ও রাষ্ট্রে 'ইজহার-এ-দ্বীন' দূরের কথা নামাজ রোজার ন্যায় আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহ পালনও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে রয়েছে। এমনকি এক সময় কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশও মুসলিমশূন্য হয়ে অমুসলিম দেশে পরিণত হবার নজির পৃথিবীতে নেই যে তা নয়। এ কারণেই মহান আল্লাহর রাসূল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে আবু জেহেলের ন্যায় ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে ছেড়ে দিয়ে নিজে শুধু মসজিদ বা খানকাহ্নশীন হয়ে পড়েননি। বরং তিনি পূর্ণাঙ্গ 'ইকামত-এ, দ্বীন'এর লক্ষ্যে এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যেখানে আল কুরআনের রাষ্ট্রীয় অনুশাসনগুলো পুরোপুরি সমাজে কায়েম ও বাস্তবায়ন করেছেন।

পরিতাপের বিষয় যে, সেই জীবন্ত ইতিহাসকে উপেক্ষা করে একশ্রেণীর লোক কার্যত মহানবী (সাঃ) কে সাধারণ অর্থের একজন ধর্মীয় নেতার অনুরূপ মূল্যায়ন করে। ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হয়েও আমরা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও নিয়মবিধির প্রশ্নে কুরআনের এ সংক্রান্ত একটি আয়াতের উপরও আমল করতে পারছি না । অথচ আল্লাহ্ এই মর্মে আয়াত নাজিল করে বলেছেন, "তোমরা দ্বীন কায়েম করো" অর্থাৎ দ্বীনের অনুশাসনসমূহ সমাজজীবনে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করো। (আকীমুদ্দীন) বলাবাহুল্য, এই অবস্থায়ও যদি ইসলামের প্রচারকদেরই কেউ সমাজজীবনে খোদায়ী বিধান প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং কার্যত দ্বীনের দুশমনদের সহযোগিতা দেয়, তাহলে তার ঈমান কোথায় থাকে? সেও কি আল-কুলআনের 'অংশবিশেষে বিশ্বাসী' হওয়ার পর্যায়ে পড়ে যায় না? অথচ আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "মানব সমাজে একমাত্র আল্লাহর হুকুম বা শাসনবিধি ছাড়া আর কারও আইন ও শাসনবিধি চলবে না।" (যেমন,- ইনিলহুক্মু ইল্লালিল্লাহ) । অন্যত্র বলেছেন, "যে সব শাসক (ক্ষমতা পেয়েও) আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান মোতাবেক দেশ শাসন করে না, তারা জালিম, --- ফাসিক,---- কাফের। "তারপরও কোন ইসলামী মহল "ধর্মনিরপেক্ষ" ইসলাম বিরোধী কোনো মহলকে খুশি করার জন্যে কিংবা নিজের দ্বীন সম্পর্কিত বিভ্রান্তিবশত 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ইসলাম' প্রচারের নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও কতদূর নবী জীবনের সুন্নত বা আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, ভাবাবেগমুক্ত হয়ে তা ভেবে দেখা জরুরী। কেননা, আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি পেতে হলে মহানবীর পূর্ণ অনুসরণ করতেই হবে। (ইনকুনতুম তহিব্বুনাল্লাহা

www.pathagar.com

ইউহবি বকুমুল্লাহ্) আর তিনি সাইয়েদুল মুরসালীন হবার সাথে সাথে সাইয়েদুলমূলক রাষ্ট্রেরও নেতা ছিলেন। অথচ 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ইসলামের অনুসারীরা এটা একটুও চিন্তা করে না যে, ঐ আকীদা ও কর্মনীতি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। নবীর সুন্নত বিরোধী। বিশ্বব্যাপী ইসলামের শত্রুরাই ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কৌশলে রাজনীতি থেকে দূরে রেখে তাদের করতলগত করে রাখার এই থীওরী ছড়িয়েছে।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মহানবী (সাঃ) কে উদ্দেশ করে ইরশাদ করেছেন, "তোমার নিকট যা নাযিল করা হলো অপরের কাছে তার তাবলীগ বা প্রচার করো।" (বাল্লিগ্ মা উন্যিলা ইলাইকা) আল্লাহ্ আরও ইরশাদ করেছেন, "তোমরা অন্যদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় আল্লাহর পথে আহ্বান করো।" অপর ব্যক্তিকে যারা আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানায়, তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "সেই ব্যক্তির চাইতে অতীব উত্তম ব্যক্তি আর কে আছে, যিনি মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেন? "(মান্ আহ্সানু কওলান মিম্মান দাআ' ইলাল্লাহ্) এমনিভাবে মহান আল্লাহ্ মানবজাতির জন্যে একমাত্র ইসলামকেই তাঁর মনোনীত সর্বশেষ জীবনবিধান হিসাবে ঘোষণা করে বলেছেন, "ইসলামই হচ্ছে মানুষের জন্যে আল্লাহর অনুমোদিত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা" (ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম)। "ইসলাম ছাড়া কেউ অপর কোনো জীবন ব্যবস্থার সন্ধান করলে, তা কখনও গৃহীত হবে না।" -(ও মাই ইয়াবতাগী গায়রাল ইসলামে দ্বীনান, ফাঁলাই ইউক্বাল)। নিজের সুবিধা মতো ইসলামের কিছু অনুশাসন পালন করা আর কিছু পরিহার করারও কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। এ ব্যাপারেও আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, "তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো।"- উদখুলো ফিস্সিলমি কা-ফফাহ্)। তিনি এর উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে আরও বলেছেন "তোমরা কি আমার বিধানগ্রন্থের কিছু অংশ বিশ্বাস করো আর আর কিছু অবিশ্বাস করো? -(আফা তু'মিনুনা বি-বাযিল কিতাবে ওয়া তাক্ফুরূনা বিবায)?

এসব আয়াত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে খণ্ডিতভাবে বিশ্বাস এবং এর প্রতি আমল দ্বারা কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের প্রত্যাশা করলে সেটা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ইসলামের প্রতিটি অনুশাসনকেই জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়নে বিশ্বাসী ও সচেষ্ট হতে হবে। অন্তত এ ব্যাপারে দৃঢ় একীন-আকীদা অবশ্যই পোষণ করে চলতে হবে আর এ জন্য যারা কাজ করে, তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা কল্যাণ এবং 'তাকওয়ার'কাছে সহযোগিতা করো আর পাপ কাজ ও ইসলামের বিরুদ্ধে বৈরিতার কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না।" (তাআ'ভানূ আলাল বিররে ও ত্তাক্ওয়া, ওলা তা'ভানূ আলাল ইসমে ওয়াল উদ্ওয়ান)। এই হিসেবে ইসলামের প্রতি খণ্ডিতভাবে আমল করলে অর্থাৎ কয়েকটি আমলের উপর আমল করেই নিজেকে ইসলামের উপর পরিপূর্ণ আমলকারী বলে মনে করতে থাকলে, তাতে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে কিন্তু তাকে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী বলা যাবে না। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো আয়াতের উপর কারও আমল সম্ভব না হলে, অন্ততঃ এ ব্যাপারে সমর্থক হতে হবে

www.pathagar.com

এবং সুযোগ আসলেই তা করার নিয়ত রাখতে হবে অথবা যারা এ কাজ করে, তাদের সম্ভাব্য নকল উপায়ে সহযোগিতা দিতে হবে। বিশেষ কতিপয় ইবাদতের নির্দেশসূচক আয়াত ছাড়াও পবিত্র কুরআনে মানুষের করণীয় আরও অনেক কাজের আদেশ নিষেধ জারি করে মহান আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। অন্যথায় পবিত্র কুরআন ৮ পৃষ্ঠাতেই শেষ হয়ে যেতো— বিশাল আকারের গ্রন্থটির দরকার হতো না।

সুতরাং নামাযের উপর আমল করলে যেমন নামাযের আয়াতের উপর আমল হলো, রোযা, হজ্ব, যাকাতের আয়াতসমূহের উপর আমল করলে যেমন এসব বিষয় সংক্রান্ত আয়াতের উপর আমল হলো, অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হুকুম-আহকামের উপরও আমল করে সেসব আয়াতের উপর আমল করতে হবে। সেগুলো শুধু রিডিং বা মতন পড়ার জন্য আল্লাহ নাযিল করেননি। যেমন, ইসলামী হুকুমত বা রাষ্ট্র কায়েম করা, খোদায়ী বিধান অনুযায়ী জ্বেনা-ব্যভিচার ও চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত কিংবা অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শাস্তি দানের জন্য রাষ্ট্রীয় অপরাধ দণ্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তি দেয়া ইসলামী খেলাফত বা রাষ্ট্র ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় কেউ যদি পুরো কুরআনের উপর আমল করার অভিপ্রায়ে অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় ঐ সমস্ত খোদায়ী আইনের উপর আমলে সচেষ্ট হয়, তখন তাদেরকে সহযোগিতা দান করতে হবে। কিন্তু তা না করে কেউ উল্টো ঐ সব লোকদের যদি খারাপ জানে, যারা কুরআনের সকল আয়াতের উপর আমলে সচেষ্ট, যাতে দেশের প্রশাসনিক আইনবিধি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রচার মাধ্যম, শিক্ষা-কৃষ্টি সবকিছু রয়েছে, তাহলে কি সেটা তাবলীগ ও ইজহার -এ দ্বীনের বিরোধিতা হলো না? দ্বীনের বিরোধিতাকারীদেরকে সহযোগিতা করা হলো না? শুধু তাই নয়, কেউ পূর্ণ কুরআনের উপর আমলের নিয়তে মহানবী (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণে যদি দেশে ইসলামী খেলাফত বা খোদায়ী আইন-কানুন ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও চেষ্টা করে আর কেউ ইসলামের উপর খণ্ডিতভাবে আমল করেও তাদের মন্দ বলে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তারা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও নবীর সুন্নাতের ইত্তেবা অনুসরণ ও কুরআনের দাবী অনুধাবনে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

মহান আল্লাহ তাঁর নাযিলকৃত যেসব বিধানে তাঁর বাণীর তাবলীগ বা প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মহানবী (সাঃ) বিদায় হজ্বের দিন "তোমরা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে দ্বীনের তাবলীগ বা প্রচার করো" বলে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সব নির্দেশে ইসলামের পরিপূর্ণ বিধানসমুহের প্রচার ও সেগুলো সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের কথাই বলেছেন। সেখানে ইসলামের খণ্ডিত তাবলীগ ও এর উপর খণ্ডিত আমল ও এর খণ্ডিত বাস্তবায়নের কথা আদৌ বলেননি। এ ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট করে কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে য, "তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও।" ইতিপূর্বে আয়াতটি একবার উদ্ধৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ অনুকূল-প্রতিকূলের প্রশ্ন তোলা অবান্তর। রাসূলুল্লাহর সময় সমাজ পরিবেশ সব চাইতে খারাপ থাকা সত্ত্বেও রাসূল কারও ভয়ে কুরআনকে খণ্ডিতভাবে পেশ করেননি।

www.pathagar.com

এ ছাড়া পবিত্র কুরআনে তাবলীগ ও 'দাওয়াত-এ-দ্বীন'তথা ইসলামের বাণী অপরের কাছে কিভাবে পৌঁছাতে হবে, কতদূর পৌঁছাতে হবে, প্রতিকূল অবস্থায় কোথায় ছাড় দেয়ার কোনো নিয়ম বা অবকাশ আছে কিনা - তার সবকিছুই মহানবী (সাঃ) ও তাঁর ত্যাগী সংগ্রামী সাহাবীদের জীবনে উজ্জ্বল গ্রন্থের ন্যায় প্রতিভাত আছে। গ্রন্থের ন্যায় কেন বরং প্রামাণ্য গ্রন্থ আকারে তাদের প্রতিটি কথা, কাজ ও তৎপরতা পুঙ্খাণূপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নবী জীবনের সেসব কার্যক্রম ও তার প্রতিটি বাণী মূলত কুরআন পাকের একেকটি আয়াতের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা। কেননা নবী মোস্তফা (সাঃ)-কেই আল্লাহ্ এমন এক সর্বোচ্চ মর্যাদা ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব রূপে মানব জাতির কাছে প্রেরণ করেছেন, যার কোনো ভুল ছিলো না। তিনি তাঁকে তাঁর সান্নিধ্যে ডেকে নিয়ে কথা বলেছেন। মানবীয় দুর্বলতাবশত মহানবী (সাঃ) কোনো ভুলের শিকার হতে লাগলেও তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তাঁকে সেই ভুলের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। যেমন একবার মহানবী (সাঃ) আরবের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দকে ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ বুঝাচ্ছেন, এমন সময় অন্ধ সাহাবী আবুদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম কোন একটি কথা বলার জন্যে হযরতকে সম্বোধন করে "এয়া রাসুলাল্লাহ ! এয়া রাসূলাল্লাহ! বলে ডাকতে শুরু করলে, হযরতের বক্তব্যের কিছুটা ব্যাঘাত ঘটায় " তিনি তাঁর প্রতি ঈষৎ বিরক্ত হলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।" সাথে সাথে এর প্রতিবাদে আল্লাহ্ এই মর্মে ওহী নাযিলের মাধ্যমে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, "তিনি (মুহাম্মদ) বিরক্তিবোধ করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন এ জন্যে যে, তাঁর কাছে (ঐ সময়) অন্ধলোকটি এসেছে।" (সূরা আবাসা)। এই আয়াতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, একজন আল্লাহতে বিশ্বাসী মানুষ তার শারীরিক অবস্থা যাই থাকুক, তার সামাজিক স্ট্যাটাস যাই হোক, অপর প্রভাবশালী বেঈমান ব্যক্তিবর্গের চাইতে আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা অধিক। এসব অবিশ্বাসী বেঈমান সমাজনেতা সামাজিকভাবে যত বড় মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তিরই অধিকারী হোক না কেন, একজন ইমানদারের মর্যাদার সমান তাদের মর্যাদা নয়। সুতরাং হে নবী! তাদের প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে আপনার এমনটি করা সঙ্গত হয়নি। তখনই আল্লাহর নবী সতর্ক হয়ে যান।

এমনিভাবে একবার কোরাইশ গোত্রের যুবক বৃদ্ধসহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে মহানবীর কাছে প্রস্তাব রাখলো যে, আপনিতো আমাদেরই লোক এবং আমাদেরই সম্মানিত একজন ব্যক্তি। আপনি কেন সকলের বিরাগভাজন থাকবেন? আসুন! একটি সমঝোতা করা হোক, আপনি আমাদের দেবতাদের প্রতি আঙ্গুলের ইশারায় সামান্যতম সম্মান প্রদর্শন করুন তখনই আমরা সকলে "জয় মুহাম্মদ" বলে আপনার কাফেলায় যোগদান করবো। মহানবী তখন সাথে সাথে তাদের মুখের উপর এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান না করে কিছুটা নীরবতা অবলম্বন করছিলেন। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এই মর্মে ওহী আসলো যে "হে মুহাম্মদ! তুমি যদি মুশরিকদের এই প্রস্তাবে সামান্যতম সায়ও দিতে, তাহলে আমি অবশ্য অবশ্যই দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে তোমাকে চরম শাস্তি দিতাম।"

www.pathagar.com

এসব ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট আয়াত একথারই প্রমাণ দেয় যে, নবী মোস্তফা (সাঃ) তাঁর গোটা জীবনের যাবতীয় কাজ ও কথা দিয়ে আল্লাহর একজন নবী হিসেবে যেসব উদাহরণ রেখে গেছেন, এগুলোই কুরআনের ব্যাখ্যা। হযরত আয়েশা (রাঃ) মহানবী (সাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রশ্নকারীকে পাল্টা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি কুরআন পাঠ করোনি? রাসূলের চরিত্র ছিল আল-কুরআন অর্থাৎ কুরআনে আল্লাহ মানুষের যেরূপ কাঙ্খিত চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, নবী চরিত্র হুবহু সে রকমই ছিল।" বস্তুত এ কারণেই আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রদত্ত জীবনবিধানের হুবহু অনুসরণের সুবিধার্থে নমুনা বা আদর্শ হিসেবে রাসূল (সাঃ)-কেই নির্ধারণ করে বলেছেন, "তোমাদের জন্যে রাসূলের জীবনে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ। "-(লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহে উসওয়াতুন হাসানাহ্)। অতঃপর আল্লাহ বলেন, " অতএব রাসূল তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ম-বিধি নিয়ে এসেছেন, তোমরা তার অনুকরণ করো আর তিনি তোমাদেরকে যেসব বিষয় নিষেধ করেছেন, তোমরা তা থেকে বিরত থাকো।"(মা-আ-তাকুমুররাসূলু ফাখুযূহু ওমা নাহাকুম আনহু ফানতাহূ)।

সুতরাং তাবলীগ ও দ্বীনের দাওয়াতসহ আমাদের জীবনের সকল স্তরের কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে দৈনন্দিন কার্যাবলীতে আমরা যা কিছু করবো প্রত্যেক কাজের মধ্য দিয়ে আল-কুরআনের দাবী কতদূর পুরণ হচ্ছে এবং নবী জীবনের আদর্শের প্রতিফলন ও সামঞ্জস্য কতদূর রয়েছে, তার ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ ও কর্মধারা কুরআন-সুন্নাহর মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক, না তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে, এসব বিষয় সূক্ষ্মভাবে নজর রাখতে হবে। কারণ, অনেক সময় দেখা যায়, আমরা লক্ষ্যের চাইতে অনেক উপলক্ষকে বেশী প্রাধান্য দিতে যাওয়ায় মূল লক্ষ্য আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে যায়।। যেমন ধরা যাক, আমাদের দেশে ইসলামী তাবলীগ বা দ্বীন প্রচারের যেসব ব্যবস্থা রয়েছে এবং যেসব সংগঠন প্রতিষ্ঠান এই মহান নবওয়তী দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছে, সেগুলোর কোথাও কোথাও কোথাও লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে মূল কুরআন ও নবী জীবনের আদর্শ উপেক্ষিত হচ্ছে এবং সেখানে কুরআন ও হাদীসের সাথে সম্পর্কের চাইতে বিশেষ ধর্মীয় নেতা মুরুব্বী, পীর-মাশায়িখ ও জ্ঞানী -গুণীদের কথা কাজকে অধিক প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কুরআনের বক্তব্য এবং মহনবী (সাঃ) -এর জীবনের জ্বলন্ত ও প্রতিষ্ঠিত প্রামাণ্য বিষয়সমূহকে আমলের প্রেরণা হিসেবে না নিয়ে ঐসব ব্যক্তির কথা কাজকেই বারবার আলোচনায় আনা হচ্ছে। তাদের লিখিত বই কিতাবকে কুরআন-হাদীসের চাইতেও অধিক গুরুত্ব দিয়ে পাঠ করা হচ্ছে। যার মধ্যে হয়তো এমন সব বর্ণনাও রয়েছে, যেগুলো সরাসরি কুরআন-হাদীস ও সীরাতে রাসূলের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীনই নয় বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিকও বটে। বলাবাহুল্য, এভাবে কুরআন হাদীস ও সীরাতে রাসূলের মূল শিক্ষা থেকে আমরা লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বিচ্যুত হয়ে পড়াতে বর্তমানে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, তাতে সমাজে ইসলামের মর্যাদা তো বৃদ্ধি পাচ্ছেই না বরং দিনের দিন তা আরও অধঃগতির দিকেই চলে যাচ্ছে। কুরআন ও সীরাতে রাসূল থেকে সেই বিচ্যুতির দরুনই এখন কোথাও মুসলিম সমাজ-নেতৃত্ব আবু জেহেল, আবু লাহাব ও ফেরাউন, নমরুদ, আদ সামুদ সম্প্রদায়ের চরিত্রের

www.pathagar.com

অধিকারী লোকদের হাতে চলে গেলেও, তাতে সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। বরং ইসলামের সেবক নামের কেউ কেউ সেই অবস্থাকে মেনে নিয়ে থাকাকেই কার্যত ইসলাম বলে ধরে নিচ্ছেন। ফলে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি এ পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, সমাজে একদিকে আবু লাহাবী ও আবু জেহেলী কর্তৃত্ব নেতৃত্ব চলতে থাকলে, সেই বাতিলের সাথে মিতালী করে মসজিদ-মাদ্রাসা, পীর-মুরিদী ও দ্বীনী জালসা মাহফিল ইত্যাদি করার অনুমতি থাকলে, তাতেই ইসলামের দাবী পূরণ হয়ে যায় বলে মনে করা হয়। যদিও এর সাথে নবী জীবনের আদর্শের কোনই মিল নেই এবং আল্লাহর নির্দেশ এতে লংঘিত হচ্ছে। অথচ এসব দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করা হচ্ছে না । কোরআনের সাথে মুসলিম সমাজের নিবিড় সম্পর্ক না রেখে অন্য বই-কিতাবকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার ফলেই এমনটি হয়েছে। কুরআনের তরজমা -অর্থের সাথে যদি সরাসারি মুসলমানদের সম্পর্ক থাকতো এবং এ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাকে নবীর অসন্তুষ্টির কারণ মনে করা হত, তাহলে এমনটি কিছুতে হত না।

অথচ পবিত্র কোরআনের প্রতি তাকালে দেখা যায়, কোনো ব্যক্তি অপর কোন বই-কিতাব কতদূর পড়েছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ সেটা জিজ্ঞেস করার চাইতে কুরআনের সাথে তার কি সম্পর্ক ছিল, সে ব্যাপারেই তাকে জিজ্ঞাসা করবেন। শুধু তাই নয়, আমরা যেই মহানবী (সাঃ) এর সুপারিশে বেহেশতে যাবার জন্যে বুক ভরা আশা নিয়ে আছি সেই দরদী নবীও আল্লাহর সমীপে কুরআন পরিত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে এই বলে মামলা দায়ের করবেন বলে কুরআনে উল্লেখ্য রয়েছে। যেমন "ক্বা লাররাসূল ইয়া রাব্বি, ইন্না কাওমীত্তাখাযূ হা-যাল কুরআনা মাহজূরা" "আল্লাহর রাসূল বলবেন, "হে আমার পালনকর্তা! আমার জাতি এই কুরআনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল।"

কুরআন পরিত্যাগ করার অর্থ হলো (১) তা শুদ্ধভাবে না পড়া , (২) তার অর্থ না জানা (৩) এবং কুরআনের মূল নির্দেশসমূহ জীবনের সর্বস্তরে পালন না করা। যেই বই কিতাব না পড়লে না বুঝলে এবং সে অনুযায়ী কাজ না করলে কেয়ামতে সুপারিশকারী দরদী নবী (স) পর্যন্ত রাগান্বিত হবেন এবং আল্লাহর কাছে আমাদের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হবেন, সেই কুরআন ফেলে রেখে বিভিন্ন ধর্মীয় ও মুরুব্বীদের লিখিত কিতাব অজীফা তালীম নিয়েই কেবল আমরা ব্যস্ত। এসবের মধ্যে প্রামাণ্য বই কিতাব পড়াশোনায় যদিও কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক হীনতার দরুন, মহানবীর পেশকৃত মামলার আসামী হলেও কি আমরা কুরআন পরিহার করে চলবো? তাতে কেয়ামতের দিন যেই সার্বিক বিপদ নেমে আসবে, তারপরও কি কুরআনকে উপেক্ষা করে আমরা মানুষের লেখা বই কিতাবকেই অধিক গুরুত্ব দিতে থাকবো? পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল বাস্তবে তাই দেখা যাচ্ছে। কোথাও মসজিদে একদিকে আল্লাহর কালামের তরজমা হচ্ছে অপর দিকে তা উপেক্ষা করে অনেকে শ্রদ্ধেয় মুরুব্বীদের লিখিত অন্য বই কিতাব অজীফাকে অধিক প্রাধান্য দিচ্ছেন। এমনটি সঠিক ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যে শুধু ক্ষতিই করে না— ক্ষেত্র বিশেষে অপরাধও বৈকি। এদিকে যথার্থ মুরুব্বীদের লক্ষ্যদান জরুরী।

www.pathagar.com

যেই বিষয়টির বেশী তাবলীগ আবশ্যক

পবিত্র কুরআনের যাবতীয় আদেশ নিষেধ, আইন-কানুন, বিধিমালার মধ্যে যেই শিক্ষাটির তাবলীগ ও দাওয়াত সমাজে ব্যাপক না হওয়ার কারণে আজ মুসলিম জাতির এত দুর্গতি, বিভ্রান্তি, অপমান, যিল্লতি এবং পরমুখাপেক্ষিতা, সেটা হলো ধর্মীয় সকল মহলের সম্মিলিতভাবে মানব সমাজে নবী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যটির যথাযথভাবে তাবলীগ না করা এবং তা প্রতিষ্ঠার কার্যকর ও প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক চেষ্টা না হওয়া। সূরা সাফ-এ সেই উদ্দেশ্যটি এভাবে বিবৃত হয়েছে যে— হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিলহুদা ও দ্বীনিলহাক্কে লেইউযহিরাহু আলাদ্দ বনে কুল্লিহী-ওলাও "কারিহাল মুশরিকুন"-অর্থাৎ "মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হেদায়াত বা পথ নির্দেশক বিধিবিধান সমূহ এবং সঠিক জীবন ব্যবস্থা দিয়ে এ জন্যেই প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি মানব উদ্ভাবিত অপরাপর জীবন ব্যবস্থার উপর এর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন, — যদিও মুশরিক অবাধ্য মানুষেরা এ কাজকে মন্দ বলে জানবে।"

বলার অপেক্ষা রাখে না, মুসলিম জাতি তার জীবনাদর্শ দ্বারা এই পৃথিবীতে তখনই শোষিত বঞ্চিত মানব জাতির মুক্তি সাধন ও মানব সভ্যতার উন্নতি-বিকাশদানে ঐতিহাসিক অবদান রাখতে পেরেছিল, যখন তারা নবী আগমনের এ মহান উদ্দেশ্যকে যথাযথ বাস্তবায়ন করে ছিলো এবং মানব জীবনের সকল স্তরে তারই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেতনা নিয়ে কাজ করেছিল। কিন্তু এখন বহু দ্বীনী কাজ হলেও 'ইজহারে দ্বীন তথা ইসলামী মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্বকে মানবজীবনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠার চেতনা সম্মিলিতভাবে সক্রিয় না থাকায়, দ্বীনের উপর শুধু খণ্ডিত আমলই চলছে। ফলে সর্বত্রই দ্বীনের মূল্যবোধ উপেক্ষিত হচ্ছে। বরং একশ্রেণীর মুসলিম নামের লোকই এর বিরুদ্ধে অধিক তৎপর।

কোন দেশে লাখ লাখ দ্বীনি ব্যক্তিত্ব ও হাজার হাজার দ্বীনি প্রতিষ্ঠান থাকা এবং সমাজে শত শত বড় ইসলামী সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত ওয়া, তাতে লাখ লাখ শ্রোতা এমনকি দেশের সরকার প্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানসহ তাতে যোগ দিলেও সংশ্লিষ্ট দেশে সার্বিকভাবে ইসলামী মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব ততদিন পর্যন্ত কায়েম হবে না, যত দিন না " ইজহারে দ্বীন"-এর ব্যাপারে সম্মিলিত চেতনা সকলের সক্রিয় হবে। "ইজহারে দ্বীনের" ভিত্তিতে দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, তথা গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে ঢালাই করে সাজানোর নীতি অনুসৃত হবে।

এ কাজটি যেমন সঠিক দ্বীনি জ্ঞান সাপেক্ষ, তেমনি ত্যাগ ও ঈমানী পরীক্ষা সাপেক্ষ। মূলত আমাদের দেশ দ্বিতীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ ও দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থায় 'ইজহারে দ্বীনের ' দৃষ্টিভঙ্গিটি অস্পষ্ট। তাই ধর্মীয় প্রচারক মণ্ডলির বক্তব্য ও তাদের অনুসৃত নীতি, বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা নীতি এর সহায়ক না হওয়াতে আজ আমাদের জাতীয় জীবনে দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত নেই। এছাড়া কোনো মহৎ কাজের সুফল পাবার জন্যে যেমন সেই কাজটির প্রতি শুধু সমর্থন জ্ঞাপনই যথেষ্ট নয় বরং তা প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে তা বাস্তবায়নে ত্যাগও পূর্ব শর্ত, ইসলাম প্রতিষ্ঠায়ও

www.pathagar.com

তা জরুরী। ইসলাম একটি ভাল ব্যবস্থা হিসাবে এর থেকে ইহ-পারলৌকিক সার্বিক সুফল পেতে হলে, এজন্যে ত্যাগ ও কুরবানীর প্রয়োজন আছে বৈ কি। মহান আল্লাহ্ এ কারণেই তাঁর ক্ষমা ও চিরশান্তি নিকেতন জান্নাত লাভের পূর্ব শর্ত হিসাবে "ইজাহারে দ্বীন"- এর জন্যে শারীরিক, মানসিক, আর্থিক বুদ্ধিবৃত্তিক ত্যাগকে পূর্ব শর্তরূপে গণ্য করেছেন। কারণ, মানব সমাজে এজহারে দ্বীন একটি বড় ত্যাগসাধ্য কাজ। সমাজের সর্বত্র দ্বীন তথা খোদায়ী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে নামলেই নিজ কুপ্রবৃত্তিসহ সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী সকল মহল এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তখন যারা শেষ নবীর আদর্শে আজীবন ইজহারে দ্বীনের লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন, সেই প্রতিকূল অবস্থায় সার্বিক ত্যাগের পরিচয় দিবেন তারাই আল্লাহর মাগফেরাত ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।

সুতরাং 'তাবলীগে-এ-দ্বীনে'র সাথে সাথে ইজহার-এ-দ্বীন এবং ইকামত-এ-দ্বীনের ও চেতনা না থাকাটা সম্পূর্ণরূপে কুরআন, ইসলামী আকীদা , সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবার বিরোধী। আল্লাহ্ এ বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থেকে নবীজীবনের আদর্শে আমাদের সকলকে তাবলীগে দ্বীনের সাথে সাথে ইজহারে দ্বীনের আন্দোলনের ও তওফীক দিন। আমীন!

একটি নিহত সত্যের পুনরুজ্জীবন ও প্রাসঙ্গিক কথা

[প্রকাশ ঃ ১৭. ১২. ২০০৩ ইং]

কথা ছিল শিক্ষা বিস্তার ও মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষের মানবীয় সদ্‌গুণাবলীর উৎকর্ষ ও বিকাশ ঘটবে। কিন্তু কি জাতীয় পর্যায়ে, কি আন্তর্জাতিক , সর্বত্র বিভিন্ন ঘটনার মধ্যদিয়ে সম্পূর্ণ জাহিলিয়াতের ঘোর তমসা যেন মানব জাতিকে আজ আচ্ছন্ন করে আসছে। হিংস্রতা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, পশুত্বের সকল স্তর ছাড়িয়ে যাচ্ছে একশ্রেণীর মানুষ। হিংস্র বন্য প্রাণীকূলের মধ্যেও যেই নৃশংসতা কেউ দেখেনি, সৃষ্টির সেরা অভিধায় আখ্যায়িত মানবকুলের মধ্যে মনুষ্য নামের এসব জীব আজকাল তাই করে চলেছে। সম্ভবত একারণেই তাদের জন্যে কুকুর বাহিনীর দরকার হয়েছে। সামাজিক জীব হিসাবে মানব সমাজের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে রাষ্ট্র। মানবতার শত্রু এ সমাজ দুশমনদের দমনে রাষ্ট্রেরই থাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা। কিন্তু সেই ক্ষমতার আসনে বসা কোনো রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যদি অযোগ্যতা কিংবা অসাধুতার শিকার হয় তখন জাতির উপায় কি? পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতা ও প্রতিহিংসাবশত সরকার খাদ্য মানবতা বিরোধী সেই অপশক্তি নির্মূলে এগিয়ে না আসে বরং পৃষ্ঠপোষকতা করে, তাহলে ঐ সমাজ এক নরককুণ্ডেই পরিণত হয়। সর্বত্র অন্যায় অশান্তি অরাজকতা ছেয়ে

www.pathagar.com

যায়। অনুরূপ মানসিকতার শাসকদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দান মূলক নীতি সমাজে ঐ অপরাধী চক্রের সংখ্যাই বৃদ্ধি করে। পূর্ণ রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করেও তখন এ সমস্যার সমাধান করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যারাই দেশের শাসন ক্ষমতায় সমাসীন হবার সুযোগ পেয়েছেন, এই অভিজ্ঞতা দলমত নির্বিশেষে কমবেশ তাদের সকলেরই রয়েছে। এমনকি যারা ক্ষমতাকে কায়েমী স্বার্থ রক্ষার মোক্ষম হাতিয়ার মনে করে ঐ অপশক্তিকে ক্রীড়নক হিসাবে কাজে লাগায়, একসময় সেই অপশক্তিও এ শ্রেণীর শাসকদের জন্যে বুমেরাং হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। আমাদের সমাজদেহ আজ অপরাধপ্রবণতার ব্যাধিতে কত যে ঘোরতরভাবে আক্রান্ত, প্রাত্যহিক অপরাধের ঘটনাবলী ও এগুলোর নিষ্ঠুর চরিত্র দেখে সহজেই তা অনুমেয় ।

বিশেষ করে এক্ষেত্রে যে জিনিসটি সকলকে অধিক ভাবিয়ে তোলার মতো, সেটি হলো , রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকাবস্থায় ক্ষমতাসীন দলেরই কোনো অংশের কোনো নেতা বা কর্মী যদি রাষ্ট্রীয় আইনবিরোধী কোনো জঘন্য অপরাধ করে বসে, সেই অপরাধের ন্যায্যবিচার তো নয়ই বরং উক্ত অপরাধকে সম্পূর্ণ চাপা দেয়ার চেষ্টা চলে এবং নিজ দলের বলে সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে রক্ষার সযতন প্রয়াস চলে। কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে যদি অপরাধীর সন্ধান না পাওয়া যায়, সরকারের সেখানে কর্তব্য হলো রাষ্ট্রীয় সকল মিশনারীকে এ কাজে লাগিয়ে প্রকৃত অপরাধী খুঁজে বের করা। ভবিষ্যতে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংঘটিত অপরাধটির কার্যকারণ ও উৎসমূল ধ্বংস করার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালানোই উচিত। সে ক্ষেত্রে তা না করে উল্টো অপরাধটি ধামাচাপা দিয়ে অপরাধীকে বাঁচানোর জন্যে যদি খোদ রাষ্ট্রযন্ত্রই সক্রিয় হয়ে উঠে, তখন ঐ সন্ত্রাসী অপরাধী আর প্রশ্রয়দাতা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে অপরাধের দিক থেকে পার্থক্য থাকে কোথায়?

বলার অপেক্ষা রাখে না, কায়েমী স্বার্থকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আপন দাপট বহাল রাখার জন্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগে যদি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কোনো সত্যকে জীবন্ত কবর দিতে চায়, তাহলে সেই সত্যের পুনরুজ্জীবন বহুলাংশেই অসম্ভব। আর এ সত্য যদি কোনো হৃদয়বান ন্যায়পরায়ণ সরকার কোনোদিন উদঘাটনে চেষ্টা না করে, তাহলে যেই অপরাধকে আড়াল করা ও যেই অপরাধীদের বাঁচানোর জন্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই জঘন্য অপরাধ করা হলো, সেই সত্যের কখনও সূর্যের মুখ দেখা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যেই হতভাগা দেশে এরূপ জালিম শাসনকর্তৃত্ব কোনোভাবে ক্ষমতায় এসেছে, তাদের আমলের এ জাতীয় বর্বরতার রহস্য কখনও উদঘাটিত হয়নি আর তার গণবিরোধী নেপথ্য খুনী নায়কদের পরিচয়ও ধরা পড়েনি অন্যদের কাছে। অবশ্য বিখ্যাত সেই প্রবাদ অনুযায়ী "খুনি যত সাবধানতাই অবলম্বন করুক না কেন, অপরাধের কোনো না কোন চিহ্ন অবশ্যই সে রেখে যায়।" যার সূত্র ধরে একসময় আসল ছবি সামনে এসে নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকেই ভোগ করতে হয়। কিন্তু এমনটি যদি না ঘটে এবং পৃথিবীতে ফেরাউন-নমরুদ ও তাঁবেদার প্রেতাত্মাদের অনুরূপ কারও উপর এ দুনিয়াতেই আল্লাহর মার না পড়ে, তখন তো কোনো

www.pathagar.com

অপরাধমূলক সত্য ঘটনা মৃতই থেকে যায়। পরজীবনে হয়তো যার প্রকৃত বিচার হবে। বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুর জেলাতে দু'হাজার সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট নূরুল ইসলামের নৃশংস হত্যার ঘটনাটিকেও এভাবে দাফন করা হয়েছিল, যেই সত্যকে এমনভাবে গোপন করা হয়েছিল যে, বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই নিহত সত্যকে পুনরুজ্জীবিতকরণে প্রশাসনিক তৎপরতা ও বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম যথাগতিতে সক্রিয় না হলে এ সত্যেরও পুনরুজ্জীবন হয়তো সম্ভব হতো কিনা বলা মুশকিল।

উল্লেখ্য, দেশব্যাপী বহুল আলোচিত লক্ষ্মীপুরের এডভোকেট নূরুল ইসলামের চাঞ্চল্যকর অপহরণ ও হত্যা মামলার রায়ে আদালত ৫ জনের মৃত্যুদণ্ড, ৯ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং দু'জনকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। গত ৯ই ডিসেম্বর '০৩ মঙ্গলবার জনাকীর্ণ আদালতে চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক এই রায় দেন। আদালতের রায়ে বলা হয় যে, ২০০০ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর গভীর রাতে লক্ষ্মীপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী বিএনপি নেতা এডভোকেট নূরুল ইসলামকে তার মামা নূরুল হুদার বাসা থেকে অপহরণ করে লক্ষ্মীপুর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু তাহেরের পুত্র বিপ্লবসহ ১৩ জন দুর্বৃত্ত। এদের মধ্যে জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তাহের পুত্র টিপু, সেক্রেটারী আরজু, পৌর ছাত্রলীগ সেক্রেটারী সাজুও ছিল। দুর্বৃত্তরা নূরুল ইসলামকে তাহেরের বাসায় নিয়ে তার পুত্র বিপ্লবের বাথরুমে আটকিয়ে জবাই করে হত্যা করে। পরে লাশ টুকরো টুকরো করে মেঘনা নদীবক্ষে ফেলে দেয়া হয়। ঘটনার পর লক্ষ্মীপুর বারের সাবেক সভাপতি এইচএম তারেক উদ্দীন মাহমুদ থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় ৯ দিন পরই তদন্তকারী কর্মকর্তা বদল করা হয়। মোট ৫বার তদন্তকারী কর্মকর্তা বদল হয়। পরে সি আই ডি মামলাটির তদন্ত করে। ৩০/৭/২০০২ সালে মামলায় চার্জশীট প্রদান করা হয়। মামলায় ৫৯ সাক্ষীর মধ্যে আদালতে সাক্ষ্য দেয় ৩৯ জন। মামলায় মোট ৩১ জনকে আসামী করা হয়। যার মধ্যে সর্বশেষ গত ২৯/০২/০৩ তারিখ পর্যন্ত ১৭ জন আসামীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। বাকী ১৪ জন পলাতক রয়েছে। আদালত মোট ৩০টি কর্মদিবসে মামলার রায় ঘোষণা করে।

এই হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা বলে বহুল প্রচারিত লক্ষ্মীপুর আওয়ামী লীগের গডফাদার আবু তাহের, তার স্ত্রী নাজমা তাহেরসহ মোট ১৫ জনকে বেকসুর খালাস দেয়া হলেও আবু তাহের অপর মামলার আসামী হিসেবে রয়ে যায়। প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, এ রায়ে বাদীর স্ত্রী কিছুটা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তার মতে, মূল অপরাধীরা কেউ কেউ সাজামুক্ত রয়ে গেছে।

এই চাঞ্চল্যকর অপহরণ ও হত্যা মামলায় বিজ্ঞ বিচারকের রায় সম্পর্কে সন্তুষ্টি বা আসক্তির আলোচনা বাদ দিয়েও যদি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা হয়, তাতে যেকোন লোকের মনে প্রথম এ জিজ্ঞাসাই আসতে বাধ্য, যেই সত্যটির পূর্ববর্তী সরকারের আমলে মৃত্যু ঘটেছিল, সে সত্য উদঘাটনে এবং তাকে পুনর্জীবিতকরণের লক্ষ্যে

www.pathagar.com

প্রশাসনিক কার্যক্রমের ব্যর্থতা বরণের মূলরহস্য কোথায় ছিল? অতঃপর একাধিকবার তদন্তকারী বদল করতে হলো কেন? সেখানে কত লক্ষ টাকার বিনিময়ে তদন্ত সঠিক পথে না গিয়ে উল্টোপথে যাওয়াতে লক্ষ্য অর্জন ব্যর্থ হলো? এ টাকা কে দিলো, কোত্থেকে এলো? এ সত্য হত্যার পেছনে মূল নেপথ্য শক্তি কি ছিল? অথচ সে সময় দেশে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার ছিল, ছিল তার প্রশাসন, গোয়েন্দা বিভাগ। সরকারদলীয় লোকেরা এই জঘন্য অপরাধে জড়িত থাকায়ই যদি এই সত্য তখন ঢাকা পড়ে থাকার প্রধান কারণ হয়, তাহলে তো তৎকালীন আমলে এরূপ লোমহর্ষক আরও বহু হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারও এভাবে ঢাকা পড়ে থাকবে, সেগুলোরই বা কি হবে? এমনকি বর্তমান ও পরবর্তী কোনো শাসনামলেও যদি অপরাধ দমন প্রশ্নে এরূপ বৈষম্য ও জঘন্য ভেদচিন্তা সক্রিয় থাকে, তাহলে কি হবে সন্ত্রাসবিক্ষত এ সমাজের দশা? সুতরাং এসব ঘটনা দেশবাসীর সামনে এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট উপর-নীচ সকল স্তরের ব্যক্তিদের ইতি ও নেতিবাচক যেই মানসিকতা তুলে ধরে, তারই দাবী হলো, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এই মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন এবং এই অপরাধপ্রবণতা যতদূর শিকড় গেড়েছে, তা চিরতরে উৎপাটনে আইনগত দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

পরিতাপের বিষয় যে, এরূপ নৃশংস ও জঘন্য হত্যাকাণ্ডের যেসব বিচার সম্পন্ন এ পর্যন্ত হয়েছে এবং অপরাধীদের দণ্ড দান করা হয়েছে, তাতে এর নেপথ্য নায়ক ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাদানে অভিযুক্তদের ভূমিকায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা মনে করে, নিজেরা যা করে আসছে ঠিকই করেছে, যারা এসব কাজকে অপরাধ মনে করে এর বিচার করে সমাজে শান্তি আনতে চায়, তারাই বড় অপরাধী। এই মানসিকতা যে দেশের অপরাধী চক্রকে অধিক চাঙ্গা করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা মনে করি, লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত যেই বিজয় দিবস আমরা পালন করছি, বিজয়ের পূর্বের ৯ মাসের রক্ত রঞ্জিত ত্যাগ ও জাতির বীরসন্তানদের আত্মাহুতিদানের সুমহান লক্ষ্যেরও এটি বিরোধী। কারণ, হিংসায় হিংসা ডেকে আনে। যারা জাতির মধ্যে ঐক্যের বদলে অনৈক্য ও বিভাজন সৃষ্টি করে নিজেদের হীন রাজনৈতিক কোটারী স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায় কিংবা অতীতের ন্যায় অপরাধীরা উল্লাসিত হবার রাজনীতি দেশে চালিয়ে এদেশের উন্নতি ও স্বাধীনতাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করতে তৎপর, দেশবাসী তাদের এসব অপচেষ্টার প্রতি পূর্ণ নজর রেখে চলেছে।

খোদ তাদের জানা উচিত, এই চিন্তার কোনো লোক ক্ষমতায় গেলে দেশের কি কল্যাণ করবে জনগণ তা ভাল করে জানে। সরকারেরও কর্তব্য , কোন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, বরং জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অপরাপর রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বকেও যথাসম্ভব সঙ্গে নিয়ে অপরাধ দমন ও দেশ গড়ায় সচেষ্ট হওয়া। তারপরও কেউ বক্রপথের অনুসারী হতে চাইলে সেজন্য তারা নিজেরাই নিজেদের কাজের জন্যে জনগণের কাছে দায়ী হতে বাধ্য। কেননা, মানুষ আর বর্তমানে অসচেতন নয়। আর নয় বলেই তারা প্রতারণা, লুট ও হত্যার রাজনীতি গত নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করেছে।

www.pathagar.com

এই বিপুল অস্ত্রসম্ভার কার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে?

[প্রকাশ ঃ ১০. ১২. ২০০৩ ইং]

জোটসরকার ক্ষমতায় আসার পর তার অত্যাবশ্যকীয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করার পথে যেসব প্রতিকূলতার মোকাবেলা করে এগিয়ে চলতে হচ্ছে, তন্মধ্যে প্রধান হলো সন্ত্রাসী তৎপরতা দমন। আগে থেকে সন্ত্রাসী সৃষ্ট নাজুক পরিবেশ এ সরকারের যৌথবাহিনীর অভিযানের দ্বারা স্বাভাবিক হবার পর, সমাজ পরিবেশ বহুলাংশে উপদ্রবমুক্ত হয় এবং জনজীবনে ফিরে আসে শান্তি নিরাপত্তা। কিন্তু কয়েক মাস পরেই পুনরায় খুন, হত্যা, ডাকাতি, রাহাজানির যেই দৌরাত্ম্য শুরু হয় এবং অব্যাহতভাবে চলছে, তা এ মুহূর্তে সকলকেই ভাবিয়ে তুলেছে। সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেকে এ ব্যাপারে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে একদিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খুন-পাল্টা খুন, অপরদিকে স্থানে স্থানে পুলিশ কর্তৃক অবৈধ বিপুল অস্ত্রসম্ভার উদ্ধার হতে থাকার ঘটনাবলী থেকে এটা বুঝতে কিছুতেই অসুবিধা হয় না যে, এসব অশুভ তৎপরতা কিছুতেই সমাজবিরোধী চক্রের সাধারণ অপতৎপরতা নয়, বরং ১৪ কোটি জনঅধ্যুষিত মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এ এক গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। এর ভিত্তিতেই সুপরিকল্পিতভাবে এসব সন্ত্রাসী তৎপরতা ও অস্ত্রসম্ভার জোগাড়ের এ আয়োজন চলছে। সাধারণ সমাজবিরোধী তৎপরতা কমবেশ সকল দেশেই থাকে। এ দেশেও অতীতে ছিলো না যে তা নয়। এ জন্যে এতো বিপুল অস্ত্রসম্ভারের আয়োজন হয় না। বলাবাহুল্য, ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো দেশের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত কোনো ষড়যন্ত্র চললেই, তখন সেই ঘোলাটে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সুযোগনিয়ে "ঘোলা পানিতে মাছ শিকারকারী" বিভিন্ন চক্রও নিজ কোটারী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে, যাদের কাছে জাতীয় স্বার্থের চাইতে ব্যক্তিগত ও কোটারী স্বার্থটাই বড় থাকে। কেউ নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধার, কেউ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অপর কোনো সুবিধা আদায়ে উঠেপড়ে লাগে। তখন এক পর্যায়ে দেশ-জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সার্বিক যড়যন্ত্রকারীরা প্রত্যেক দেশের কোটারী স্বার্থের পূজারীদেরকে তাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নিজেদের তল্পীবাহক হিসেবে কাজে লাগায় অথবা বড় রকমের লোভ-প্রলোভন দেখিয়ে তাদের দোসরে পরিণত করে। আর ঐ অপরিণামদর্শীরাও সাময়িক লোভ-প্রলোভন কিংবা রাজনৈতিক অন্ধ প্রতিহিংসায় এটা ভুলে যায় যে, দেশ-জাতিবিরোধী এ লোভের হাতছানিতে সাড়া দিলে তাতে নিজের বা ভবিষ্যৎ বংশধরদের পরিণতি কি হবে। ইতিহাস সাক্ষী, এই একই ভুল শত শত বছর ধরে বিভিন্ন দেশের লোভী মীরজাফররা করে আসছে। এর দৃষ্টান্ত যেমন আমরা দেখি বাগদাদে আব্বাসীয় শাসনামলে, তেমনি দেখি স্পেনে মুসলিম শাসন-আধিপত্যের অবসানের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে। তেমনি

www.pathagar.com

দেখি, পলাশীর আম্রকাননে সংঘটিত বাংলার মুসলিম শাসক নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা এবং ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভের সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের মুহূর্তে যেই ভুলের মাশুল দীর্ঘ পৌনে দু'শ বছর ধরে কেবল সরাসরি বাংলার হিন্দু-মুসলিম সকল শ্রেণীর মানুষকেই দিতে হয়নি বরং টেকনাফ থেকে খায়বর পর্যন্ত গোটা হিমালয়ান উপমহাদেশের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল জাতিগোষ্ঠীর কোটি কোটি মানুষকেই সেই অবিমৃশ্যকারিতার বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। গোলামী করতে হয়েছে পৌনে দু'শ বছর ধরে। বরণ করতে হয়েছে নানান জুলুম-নিপীড়ন, অপমান, যিল্লতী। অথচ আঙ্গুলে গোনা দু'চার জন লোকের লোভেরই পরিণতি ছিলো এই দীর্ঘ শাস্তি। দীর্ঘ অর্ধশতাধিক বছর ধরে কাশ্মীরী হাজার হাজার মুসলমানের শাহাদাত এবং সে দেশের মা-বোনদের ইজ্জত-সম্ভ্রম বিনষ্ট ও বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার জন্যে সেই ভূ-খণ্ডের কোটারী স্বার্থের নায়ক শেখ আব্দুল্লাহই কি দায়ী নয়? আজ ঐতিহ্যবাহী বীর আফগান জাতি এবং এককালের মুসলিম গৌরবোজ্জল ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত বাগদাদ তথা ইরাকবাসীর উপর যেই মহাবিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে, সে জন্যে আফগানিস্তান ও ইরাকের যথাক্রমে সেখানকার কোটারী স্বার্থের নায়ক বুরহানুদ্দীন রাব্বানী, আহমদ শাহ মাসউদ, রশিদ দোস্তাম, ইউসুফ কারজায়ী এবং সাদ্দাম ও তার গোষ্ঠী দ্বয়ের মুসলিম উম্মাহর জাতশত্রুদের লেজুড়বৃত্তিই কি দায়ী কম?

তাই আজ বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহে যখন এ দেশের বিভিন্ন গোপন আস্তানা থেকে অত্যাধুনিক শক্তিশালী বিপুল সংখ্যক অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের সচিত্র সংবাদ একের পর এক প্রকাশ পায়, অপর দিকে সন্ত্রাসীদের হাতে অবৈধ পথে আগত অস্ত্রের দ্বারা একের পর এক খুন পাল্টা খুনের খবরাদি ছাপা হয়, তাতে প্রশ্ন জাগে, এটা জাতির কোন্ দুশমনদের ঘৃণ্য মানসিকতার ফল? স্মর্তব্য, একে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী, দল বা চক্রের কোটারী স্বার্থ হাসিলের সুযোগ মনে করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সুখানুভূতি ও পুলকবোধের কারণ নেই। বরং এ ক্ষেত্রে দল-মত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে লাখো শহীদের খুনের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশের প্রতিটি নাগরিকের এ মুহূর্তে ইস্পাত কঠিন ঐক্যের পরিচয় দিতে হবে। এ দেশের মাটি থেকে দেশ-জাতি-ধর্ম ও মানবতা বিরোধী সকল আগ্রাসী শক্তির তৎপরতা উৎখাতে বজ্রকঠোর শপথ নিতে হবে।

প্রতিদিন বিভিন্ন পথে দেশে অবৈধভাবে ছোটবড় গোলাবারুদ আসছেই। রাজধানীসহ সারাদেশে জমজমাট ব্যবসায় চলছে অবৈধ অস্ত্রের। জানা যায়, আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের সদস্যরা এ দেশে খুবই তৎপর। দেশের সীমান্ত পথ ছাড়াও নৌ-পথে নাকি প্রচুর অবৈধ অস্ত্র পাচার হয়ে আসছে। দেশের সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামের বহিঃনোঙ্গরে এসব অবৈধ অস্ত্রের চালান খালাস হয়ে থাকে। অস্ত্রের চোরাচালানী চক্রের সদস্যরা কাভার্ড ভ্যানসহ বিভিন্ন যানবাহনে লুকিয়ে এসব অস্ত্র ঢাকায় নিয়ে আসে। পুলিশ সূত্রে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী জানা যায়, অত্যাধুনিক অস্ত্র চোরাচালানের সাথে শক্তিশালী চক্র জড়িত। মহাখালী থেকে উদ্ধারকৃত গোলাবারুদ এবং এর আগে কুড়িলের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলীর মধ্যে নাকি যথেষ্ট

www.pathagar.com

মিল রয়েছে। পুলিশের মতে, এ ধরনের অস্ত্রের চালান বহু আসছে। অস্ত্র আমদানিকারকদের মতে, বিভিন্ন স্থানে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে। রাজধানীতে ভারতের তৈরি পিস্তল ও রিভলভার পাওয়া যাচ্ছে। প্রকাশ, দেশে বর্তমানে ১০ থেকে ১৫ লাখ অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। পুলিশ বাহিনী এসব অস্ত্র উদ্ধার এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে যথেষ্ট সচেষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিলেও তথাপি প্রশ্ন জাগে, জলে-স্থলে উভয় পথে আমাদের এতো প্রহরী ডিঙ্গিয়ে দেশে এসব অস্ত্রের প্রবেশ কিভাবে ঘটছে। সাথে সাথে আরেকটি প্রকাশিত তথ্যও উদ্বেগজনক কম নয়। জানা যায়, সারাদেশে পুলিশের উদ্ধারকৃত আগ্নেয়াস্ত্র দেশের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে জমা দেয়ার কথা থাকলেও গত ২ বছরে তা সেখানে জমা পড়েনি। তাহলে ঐ গুলো যায় কোথায়? আরও জানা যায়, বিদেশ থেকে জিপিও'র বৈদেশিক ডাকঘরের মাধ্যমে অস্ত্রের চালান আসে। খুলনায় এবং রাজশাহীতে নাকি এ ধরনের ২টি অস্ত্র কেউ ডেলিভারী নিতে আসেনি। তাহলে বিভিন্ন আলামত ও প্রকাশিত অপর তথ্য অনুযায়ী এটাই সত্য যে, রাজধানী ও আশপাশে কিলার গ্রুপ তৎপর এবং চরমপন্থী, সর্বহারা কিলার গ্রুপ ও তাদের গডফাদারদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যারা দেশের পশ্চিম অঞ্চলসহ বিভিন্ন অঞ্চলে হত্যাকাণ্ড, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে রাজধানী ও আশপাশে এসে অবস্থান নিয়েছে। বর্তমানে উপর্যুপরি সংঘটিত রাজধানীর বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড এবং এগুলোতে ওদের ভাড়ায় খাটার তথ্য পুলিশ সূত্রেই পাওয়া যাচ্ছে। কুড়িল এলাকার ৪টি ভয়ংকর অস্ত্র একে-৪৭ রাইফেল ও প্রায় এক হাজার রাউন্ড গুলী, ২০টি হ্যান্ড গ্রেনেড ও ৪টি টাইম বোমা উদ্ধারের পর গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত করতে গিয়ে যদি সত্যই এসব অস্ত্র ও গুলীর সঙ্গে সর্বহারা কিলার গ্রুপের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পেয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি কি অপর কিছুর আলামত নয়? জানা যায়, এই গুলী ও অস্ত্রের চালানের অন্যতম মালিক পলাতক লিংকন খুলনার সর্বহারাদের গডফাদারের ছত্রছায়ায় রয়েছে এবং উত্তরার আশকোণা ও দক্ষিণখান এলাকায় এই গডফাদারের স্থায়ী বসবাস। গত ১৫ই নভেম্বর রাতে উত্তর কাফরুলের বাসায় যুবদল নেতা ও ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান মিজানকে হত্যা শেষে তিন টুকরা করে মৃতদেহ বস্তাবন্দী করে বাসার অদূরে ফেলে রাখা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রধান কিলার যশোরের সর্বহারা নেতা মোজাম ও তার চাচাতো ভাই বলে জানা যায়। মিজানের স্ত্রী লুৎফুন নাহার বেবী ও তার প্রেমিক মামুন আদালতে ৬৪ ধারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে মিজান হত্যাকাণ্ডের এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করে। উত্তরা ৮নং সেক্টরে গত এপ্রিলে ৩ পুলিশ কনস্টেবলকে নেশাযুক্ত খাবার খাইয়ে ২টি রাইফেল, ১টি শর্টগান ও ৬০ রাউন্ড গুলী লুটের ঘটনা পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারে এ ঘটনার সাথেও সর্বহারা জড়িত।

এসব ঘটনা থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অব্যাহতভাবে সংঘটিত খুন-পাল্টা খুনের ঘটনাবলীর প্রতি তদন্ত করলে এ জাতীয় সন্ত্রাসী তৎপরতার অপর দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। তার লক্ষ্য পূর্বেকার সকল সন্ত্রাসী তৎপরাতার ব্যতিক্রম বলেই মনে

www.pathagar.com

হয়। কাজেই এই তথ্যের প্রেক্ষিতে সব ঘটনাকে গতানুগতিক নয় নতুন বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা জরুরি। বিশ্ব পরিস্থিতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে এবং বিশেষ করে উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চিন্তা করলে এসব ঘটনার সাথে জড়িতরা আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের সদস্য হলে পরিস্থিতির মোকাবিলা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন ট্যাকনিকেই করতে হবে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বড় বড় অপরাধ করে অর্থ রোজগার-সংগঠনের নামই হলো মাফিয়া চক্র। বহুমুখী অপরাধমূলক কাজ এই চক্র দ্বারা সংঘটিত করা হয়। এর গোড়ায় রয়েছে তথাকথিত উন্নত বিশ্বের বড় বড় হোমরা চোমরাগণ, যাদের শিরোমনি হিসেবে ইহুদী তাত্ত্বিকরা ভূমিকা পালন করে। এই চক্রের যেসব শাখা-প্রশাখা বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে তাদের দ্বারা আন্তর্জাতিক বড় বড় অপরাধের জাল সুপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক চক্রের অপরাধলব্ধ অর্থকে বিশ্বময় অর্থনৈতিক আধিপত্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তেমনি রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মোক্ষম কাজেও তা হয় ব্যবহৃত।

সবচাইতে আরেকটি যেই মারাত্মক দুরভিসন্ধিতে এই অপরাধলব্ধ অর্থ ব্যয় করা হয় সেটা হলো, কোনো বিশেষ জাতি গোষ্ঠীকে তাদের নিজস্ব জীবনবোধ, জীবনাদর্শ, জাতীয় পরিচিতি ও তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি থেকে অতীব সুকৌশলে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সমাজ ও জাতি গোষ্ঠীর লোকদেরকে নেপথ্যের সেই অপশক্তির রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অনুকূলে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজে লাগানো। বলাবাহুল্য, মুসলিম দেশসমূহে বস্তুবাদী শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারের আড়ালে এই সমাজের আধুনিক মন -মানসিকতায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি ঘৃণা-উপেক্ষা সৃষ্টির দ্বারা মুসলিম শিক্ষিতদের একটি শ্রেণীর উপর তাদের কার্যকর প্রভাব হিসেবেই আজ এ সমাজে মুসলিম নামের ছদ্মাবরণে তসলিমা নাসরীণ ও হুমায়ুন আজাদদের মতো লোকদের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে।

মোটকথা, এটা আজ স্পষ্ট যে, আমাদের প্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ দেশী-বিদেশী নানানমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার। যদ্দরুন ক্ষমতাসীন, ক্ষমতাবহির্ভূত সকল দলমতের নেতাকর্মীদেরকেই জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে সকল কোটারী স্বার্থ চিন্তা ও প্রতিহিংসার মনোভাব পরিহার করে জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে হবে।

একথা দেশপ্রেমিক সকলের স্মরণ রাখা দরকার যে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্রের ব্যাপার নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে যখন ষড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়করা লক্ষ্য করেছে যে, প্রকাশ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশে রাজনৈতিকভাবে তাদের ষড়যন্ত্র সফলকাম হবার নয়, তখনই তারা এই ধ্বংসাত্মক চোরাগোপ্তা পথ অনুসরণ করেছে। আর গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় আসা বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় বসার সাথে সাথেই নতুন চরিত্রের এই ষড়যন্ত্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শুরুর দিকে বগুড়ায় উদ্ধারকৃত বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের সন্ধান থেকেই পর্যবেক্ষক মহল এই আশংকাটি করে আসছে। আনারসের আবরণেঢাকা ট্রাকভর্তি বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে ছিল ৬২ হাজার

www.pathagar.com

রাউন্ড গুলী এবং ১১৪ কেজি বিস্ফোরক। সেটাই ছিল তখন পর্যন্ত এদেশে উদ্ধারকৃত সর্ববৃহৎ গোলাবারুদ। জনৈক সেনা কর্মকর্তার উক্তি অনুযায়ী, উদ্ধারকৃত বিস্ফোরক দ্রব্য এত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন যে, এর মাত্র ২শ গ্রাম দ্বারা ১টি ৫তলা ভবন উড়িয়ে দেয়া সম্ভব। বলা বাহুল্য, তখন থেকেই পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে এ ব্যাপারে আরও কঠোর পদক্ষেপ গৃহীত হলে হয়তো বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারতো না। বগুড়ার কাহালুতে ধরা পড়া আনারস আবৃত অস্ত্রবোঝাই ট্রাকটি কোনো নির্দিষ্ট বাহিনীর প্রহরার ফলশ্রুতি ছিল না। ঘটনাচক্রে জনগণের সন্দেহ থেকে পুলিশে খবর দেয়া এবং তারপর "কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এই গোখরা সাপ" বের হয়ে আসে। এদেশের বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করার ভয়াবহ দুরভিসন্ধিই এর পেছনে সক্রিয় ছিল। এছাড়া এর টারগেট ছিল এদেশের হাজার হাজার মানুষ। এভাবে দেশের বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চল কিংবা নৌপথ যে দিক থেকেই এদেশবিরোধী কোনো ষড়যন্ত্র সক্রিয় হোক, আমাদের মতে বগুড়ার সাধারণ মানুষ যেভাবে গণপ্রতিরোধের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনী দ্বারা তা ধরিয়ে দেয়া ও নাশকতা রোধে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, বর্তমানের নাশকতামূলক সকল তৎপরতার পেছনেও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ভৌগোলিক ও আন্তর্জাতিক যতবড় ষড়যন্ত্রই সক্রিয় থাক না কেন; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দেশপ্রেমসমৃদ্ধ একমাত্র গণচেতনতা ও গণপ্রতিরোধ দ্বারাই তার মোকাবিলা করা আমাদের সংশ্লিষ্ট বাহিনীর দ্বারা সম্ভব, আর এ জন্যে ভবিষ্যতভেবে সকলকেই দলীয় ও কোটারী স্বার্থের উর্ধ্বে থাকতে হবে।

ভবিষ্যতে ইরাকী স্টাইলই কি হবে সবলদের হাত থেকে দুর্বলদের বাঁচার উপায়?

[প্রকাশ ঃ ২৯. ১১. ২০০৩ ইং]

প্রাণী মাত্রই নিজের প্রাণকেই সকল কিছুর চাইতে বড় মনে করে। এজন্যে স্বীয় প্রাণ রক্ষাকল্পে যে কোনো প্রাণী তার সাধ্যের সম্ভাব্য সকল কিছু করে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায়। নিজেকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার এই আকুতি, এই প্রয়াস যে-কোনো প্রাণীর একটি সহজাত বিষয়। সে ক্ষেত্রে সৃষ্টির সেরা অভিধায় আখ্যায়িত মানুষ, যাদের মধ্যে নিজ প্রাণরক্ষার এই সহজাত চেতনা ছাড়াও আত্মমর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার আগ্রহ প্রবল, সে কি করে বিনা প্রতিবাদে নিজেকে অপরের "ছুরির তলের মাছ"-এ পরিণত হতে দিতে পারে? স্বাধীন-সার্বভৌম জাতি হিসাবে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে নিজের জীবনবোধ, জীবনাদর্শ, নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্যের স্বাধীন অনুশীলনের মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকতে চায় এবং একেই যথার্থ বাঁচা বলে মনে করে। নিজেদের এই সবকিছুর উপর কারও হস্তক্ষেপকে যেই মানুষ পরের গোলামী ও দাসত্ববৃত্তি মনে করে, সেই মানুষ ও জনগোষ্ঠী কিছুতেই নিজেদের উপর বিজাতীয় কোনো আগ্রাসী শক্তির অনধিকার কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারে না। বলার অপেক্ষা রাখে

www.pathagar.com

না, এই না পারাটার কারণেই যুগ যুগ ধরে দেশে দেশে চলে আসছে স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং সংঘটিত হয়েছে পরাধীনতার অক্টোপাস থেকে মুক্তির বিভিন্ন রক্তাক্ত যুদ্ধ ও ত্যাগদীপ্ত আন্দোলন। একসময় বিশ্বব্যাপী যখন ঔপনিবেশিক শক্তির দাপট উত্তুঙ্গ চূড়ায় এবং বিশ্বের সর্বত্র এই শক্তির যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল পৃথিবীর বহু ভূখণ্ডের মানুষ, সর্বত্র শোষিত, বঞ্চিত হয়ে জুলুম- নিপীড়নের স্টীমরোলারে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল মানবতা, তখনও স্বাধীনতাপ্রিয় মজলুম মানবতা নিজেদের আত্মমর্যাদার কথা বিস্মৃত হতে পারেনি। শত নিপীড়নে জর্জরিত হয়েও তারা "মজলুম জনতা এক হও" বলে ঔপনিবেশিক জালেমশাহীর বিরুদ্ধে বজ্রনিনাদে গর্জে উঠেছে। চরম জুলুম- অত্যাচার কোনো কিছুই তাদের সেই গগনবিদারী ডাককে স্তব্ধ করতে পারেনি। যেই পরাক্রমশালী বৃটিশ শক্তির শাসন বলয়ে সূর্য অস্ত যেতোনা, সেই অজেয় শক্তিকেও অতঃপর বিশ্বের নির্যাতিত সংগ্রামী জনতার প্রতিরোধের মুখে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পিছু হটতে হয়েছিল। পৃথিবীর দখলকৃত সকল দেশ থেকে নিজ তল্পিতল্পা নিয়ে স্বগৃহে ফিরে যেতে হয়েছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বৃহৎ ও শক্তিশালী হলেই, দুর্বলদের উপর অত্যাচার চিরস্থায়ীভাবে চালিয়ে যাওয়া যায় না। কুরআনে উল্লেখিত সাদ্দাদ নমরুদ, হামান-ফেরাউনের ইতিহাসও একই সত্যের প্রতিধ্বনি করে। বলাবাহুল্য, আজকের মজলুম ইরাকী জনতাও ইতিহাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই সংগ্রামী কাফেলারই উত্তরাধিকার বহন করে চলছে। বিভিন্ন দেশে অতীতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যেই সহজাত চেতনা ও ত্যাগদীপ্ত উদ্দীপনা তাদেরকে আগ্রাসী দখলদার শক্তির কাছে মাথানত করতে দেয়নি, শহীদে কারবালার ত্যাগদীপ্ত স্মৃতিধন্য ইরাকবাসীও তাই নিজেদের স্বাধীন সত্তা ও আত্মমর্যাদা রক্ষার মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। তাদের এই সংগ্রামী চেতনা এতই প্রবল যে, তারা অন্যদের মতো বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই শক্তির কাছে মাথানত না করে, তার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে চলেছে, যেই প্রতিরোধের মুখে এই পরাশক্তির দুর্ধর্ষ ফৌজেরাও মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঢলে পড়ছে যা খোদ্ মার্কিন মুলুকের জনমনেও ভীতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন পরিষদে অনুমোদিত ৪শ কোটি ডলারের সামরিক খাতের বাজেট বিল সিনেটে অনুমোদনের পর জর্জ বুশ-এর চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করলে মার্কিন কর্মকর্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ছোট পর্যায়ের অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস এবং এসব অস্ত্র তৈরির উপর আরোপিত বাধ্য-বাধ্যকতার অবসান ঘটেছে। এখন যুক্তরাষ্ট্র স্বল্প শক্তির পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে পারবে। একই সূত্রমতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পর্যায়ের পারমাণবিক বোমা তৈরির ফলে যুক্তরাষ্ট্র এখন ভূগর্ভস্থ মোরচা ও যে কোনো স্থানের রাসায়নিক, পারমাণবিক হাতিয়ার সংরক্ষণাগারসমূহ ধ্বংস করতে পারবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত বিশ্বের একক সুপার পাওয়ার হিসাবে গণ্য। বিশ্বের ১৫০টির অধিক দেশে কোনো না কোনো অজুহাতে মার্কিন সৈন্য অবস্থান করছে। যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে তুলনাহীন সামরিক প্রযুক্তি। তার গোয়েন্দাবৃত্তির পরিধিও ব্যাপক, যার কোনো তুলনা আজও নেই। যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে বিরাট

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক শক্তি আর সেই শক্তির রয়েছে অসাধারণ প্রভাব। নীতিগতভাবে এই শক্তির উপরই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তার যুদ্ধ উন্মাদনা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ৪শ কোটি ডলারের সামরিক বাজেট নাকি মার্কিন ইতিহাসে একটি রেকর্ড। অথচ বর্তমান অবস্থা হলো, সারা বিশ্বের প্রতিরক্ষা খাতের যা ব্যয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একা নিজ প্রতিরক্ষাখাতে তার চাইতে মাত্র কিছুটা কম। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাতের ব্যয়ের বাজেট বৃদ্ধির যে পরিসংখ্যান দেখা যায়, তা বহাল থাকলে দু'বছরের মধ্যে আমেরিকার সামরিক বাজেট গোটা বিশ্বের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে অনেক বেড়ে যাবে। যদিও এটাকে জর্জ বুশের যুদ্ধ উন্মাদনা বলা হচ্ছে, কিন্তু এটাকে এ ধরনের হালকা দৃষ্টিতে দেখা ভুল হবে।

এই বিলের সমর্থনে যদি ৩৬২ এবং এর বিরোধিতায় মাত্র ৪০ ভোট পড়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, উল্লেখিত বিলটি কেবল রিপাবলিকান পার্টিরই নয় বরং ডেমোক্রেটিক্স --এরও সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন এর অনুকূলে রয়েছে। আর উল্লেখিত বিলটির সবচাইতে ভয়াবহ দিক হলো, বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের মানসিকতা। এ থেকেই এর অনুমান করা চলে যে, আমেরিকা ইরাকে রাতের অংশে সে দিন যে স্থানে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করেছে, সেখানে কিছু দিন পূর্বে তার একটি সামরিক হেলিকপ্টার ভূপাতিত করা হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক, মার্কিন সেনাবাহিনী এলাকাটিতে বৃষ্টির ন্যায় ৫শত পাউন্ড ওজনের বোমাবর্ষণ করেছে। অথচ সেখানে ঐ সময় তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাই তাদেরকে সেখানে এত অধিক বোমা বর্ষণের কারণ হিসাবে জিজ্ঞাসা করা হলে, তারা স্পষ্ট জানিয়েছে যে, এটা একমাত্র শক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসাবে করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল দুশমনদের এটা বুঝিযে দেয়া যে, দেখো যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা করলে কি করতে পারে!

এ থেকে আঁচ করা যেতে পারে যে, অলিগলির সন্ত্রাসী গুণ্ডাদের হীন মানসিকতার চাইতেও সে নীচে চলে গেছে, যেমনটি তার দোসর ইসরাইলের অবস্থা। বর্তমান ইউরোপবাসী লাখো জনতার মুখ দিয়েও আজ যেই অভিন্ন শব্দ উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে। অথচ অলিগলির গুন্ডারাও নিজেদের এরূপ মানসিকতার প্রকাশ থেকে সংযত থাকে। মার্কিনীদের মতে উল্লেখিত বিলের সাহায্যে ছোট এটম বোমা তৈরির পথ উন্মুক্ত হয়েছে অথচ এই বোমা তাদের কাছে আগে থেকেই বিদ্যমান।

আফগানিস্তানের উপর হামলার পূর্বে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন কর্মকর্তা মিডিয়া প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে এও বলেছিল যে, যদি আফগানিস্তানে ছোট পর্যায়ের পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয় সেখানে আমেরিকার তা করতেও দ্বিধা করা উচিত নয়। ইরাকের ক্ষেত্রেও এ ধরনের তথ্য এসেছে যে, মার্কিনীরা সাদ্দাম হোসেনকে বাগদাদে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের হুমকি দিয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে উল্লেখিত বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহারের প্রশ্নটির কোনো অর্থ হয় না। তবে হাঁ, এর অর্থ এটা হতে পারে যে, এখন তারা বেশি মাত্রায় ছোট পর্যায়ের পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে পারবে। বর্তমানের সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের

www.pathagar.com

দৃশ্যকে সামনে রাখা হলে এই বাস্তবতাই নগ্নভাবে সামনে আসে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সকল সামরিক শক্তি এবং ছোট পর্যায়ের পারমাণবিক সকল বোমা একমাত্র মুসলিম দেশগুলোর জন্যেই। এ ব্যাপারে মার্কিনীদের মনস্তত্ত্ব এতই অধঃগতির শিকার যে, তারা কোনো কোনো নামি-দামি সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে সাম্প্রতিককালে এমন সব প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করছে যে, ঐগুলোতে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদীনাতে পর্যন্ত এটম বোমা নিক্ষেপের পরামর্শদানের ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের কেউ কেউ এ ধরনের বক্তব্যকে মার্কিনী হুমকি বলে খাটো করে দেখতে চায়। ইতিহাসের সেই বাস্তবতাকে তাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, এই সেই আমেরিকা, যার বর্তমান আভিজাত্যের লেবাসটি ধোপদুরস্ত থাকলেও তার ইতিহাস মানুষের রক্তে অনেক টাটকা লাল। তার পক্ষে মানুষ খুন করার জন্য কোনো কিছুই করা অসম্ভব নয়। আমেরিকার সাদা চামড়ার মানবতার বুলিবিশারদ এই তথাকথিত অভিজাতরাই ৭০ লাখ রেড ইন্ডিয়ানকে হত্যা করে তাদেরকে আমেরিকান ভূমি থেকে নিশ্চিহ্ন করেছে। কৃষ্ণকায় মানুষদেরকে ইতর প্রাণীর চাইতেও অধঃপতিত জীবন-যাপনে বাধ্য করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে তারাই এটম বোমা নিক্ষেপ করে ১০ লাখ মানব সন্তানকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছিয়েছে। এই মানুষ মারার কাজটিই আমেরিকা আফগানিস্তান এবং ইরাকে ব্যাপকভাবে করে চলেছে। অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্যের হৃদপিণ্ডে বসে ইসরাইলের নামে 'সুরক্ষিত মিনি আমেরিকা গড়ে তোলার লক্ষ্যে যাবতীয় প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে ইসরাইলকে দিয়ে সেখানে নির্দয়ভাবে মানুষ হত্যা করাচ্ছে এবং ঐ এলাকার দেশগুলোকে পদানত করে নিজেদের দখল বলয়কে প্রশস্ত করার কাজে সচেষ্ট রয়েছে। অবস্থার ভাষা এটাই জানান দিয়েছে যে, আমেরিকার বর্তমান পূর্ণ প্রয়াস হলো মুসলমানদেরকে ভয়ভীতি জুলুম-নিপীড়ন যে কোনো মূল্যে পদানত করে রাখতে হবে।

অবশ্য মুসলমানদের এই ইতিহাসও আমেরিকার জানা থাকা উচিত যে, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠকে কখনও শক্তির দাপট দেখিয়ে কেউ ভীতসন্ত্রস্ত রাখতে পারেনি। যদি তাই হতো, তাহলে তারা যেমন ঔপনিবেশিক শাসনের অক্টোপাস থেকে মুক্তি পেতো না, তেমনি যেই ক্ষুদ্র ও দুর্বল আফগানিস্তানের তৎকালীন অন্যতম বৃহৎ শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে শক্তির দিক থেকে কোনো তুলনাই চলতো না, সেখান থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নকে পালাতে হতো না। এখন সেই একই পরিস্থিতি আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকার সামনেও, যেখানে শক্তিধর আমেরিকাকে আফগান ও ইরাকী জনতার হাতে মার খেতে হচ্ছে।

আমেরিকার যুদ্ধ উন্মাদনার বাজেট এবং তার অন্তর্নিহিত রহস্যের দাবী এটাই যে, মুসলিম দুনিয়াকে আজ এক দীর্ঘ যুদ্ধেরই প্রস্তুতি নিতে হবে। আমেরিকা আফগানিস্তান এবং ইরাকে আরও জোরদার প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে জর্জ বুশ রাজনৈতিক ও অন্যান্য দিক থেকে তার আগ্রাসী থাবার পরিধি হঠাৎ আরও ব্যাপক করে তুলতে পারে এবং মুসলিম বিশ্বের আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশ যেগুলোর ধ্বংস করা

www.pathagar.com

আমেরিকার হীন তাঁবেদার হিসাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, তাদের দেশগুলোতেও এই থাবা বিস্তার করতে পারে। তবে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যেকোন পরিস্থিতিতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষাকল্পে আজকের ইরাকী স্টাইলকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। সুতরাং এসব অবিবেচক দানবীয় শক্তির দেশে আজও যদি কোনো বিবেকবান লোক থেকে থাকে যারা বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ একটি আবাসস্থলরূপে দেখতে চায়, তাদের কর্তব্য হবে, বৃটেনে জর্জ বুশের উপস্থিতির বিরুদ্ধে সেদেশের যেই দেড় লাখ বিবেকবান মানুষ সেদিন এর বিরুদ্ধে যেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, সেই প্রতিক্রিয়াকে আরও কার্যকরভাবে এগিয়ে নেয়া।

সৌদি আরবে আত্মঘাতী বোমা হামলা ও প্রাসঙ্গিক কথা

[প্রকাশ ঃ ১৯. ১১. ২০০৩ ইং]

বিশ্ব মুসলিমের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মক্কা-মদীনা বুকে ধারণকারী সৌদী আরবে সকল সময় শান্তি-নিরাপত্তা বহাল থাকুক এবং আধ্যাত্মিক স্পর্শধন্য এই দেশটির সামাজিক, রাজনৈতিক, অন্যান্য দিকের অবস্থা যাবতীয় বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকুক, এটা সারা দুনিয়ার মুসলমানের কাম্য। এমতাবস্থায় দেশটিতে সন্ত্রাসী ধরনের কোনো কিছু ঘটার খবরে সারা দুনিয়ার মুসলিম চিত্তে উদ্বেগ, অশান্তি ও ক্ষোভের সৃষ্টি হবে এটাই স্বাভাবিক। এদিক থেকে গত ৯ নভেম্বর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে আত্মঘাতী বোমা হামলা ও তাতে ১৭ জন নিহত হবার ঘটনায় আমরা গভীরভাবে দুঃখিত এবং উদ্বিগ্ন। সৌদি আরবে সংঘটিত এই হামলার আমরা তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং হামলার সাথে যারা জড়িত এবং যারা এর নেপথ্য পরিকল্পক ও যারা এদেশটিতেও অন্যান্য দেশের মতো অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কাজে লিপ্ত, তাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা ক্ষোভ প্রকাশের সাথে সাথে তাদের কঠোর শাস্তি কামনা করি।

বলা হচ্ছে, বহুল প্রচারিত আল-কায়েদা সংস্থার সদস্যরা এই হামলার সাথে জড়িত। সৌদী কর্মকর্তাদের বরাতে জানানো হয়েছে, আটক এক সন্দেহভাজন আল কায়েদা সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে উপরোক্ত তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এই হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সৌদী সূত্রে বলা হয়েছে যে, "আমেরিকানরাই ছিল এই হামলার লক্ষ্য। হামলাকারী আলকায়েদারা ভেবেছিল, যেই আবাসিক এলাকায় আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়েছে, সেই আবাসিক এলাকাটি ছিল আমেরিকানদের।" এই তথ্যের ভিত্তিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, হামলাকারী আলকায়েদা হোক বা অপর কোনো মতের লোক, তারা এটা চায় না যে, সৌদি আরবে মার্কিন সৈন্য অবস্থান করুক। এখানে উল্লেখ্য যে, কুয়েতের উপর ইরাকের সাদ্দাম বাহিনীর হামলার সূত্র ধরে সংঘটিত উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় সৌদি আরবের নিরাপত্তা

www.pathagar.com

রক্ষাকল্পে এখানে মার্কিন সৈন্যের অবস্থান ঘটে। সেই হিসাবে উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর সৌদি আরব থেকে মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নেওয়াটাই ছিল যুক্তিযুক্ত। এ নিয়ে তখন দেশী-বিদেশী সংবাদপত্রে আলোচনা-সমালোচনা কম হয়নি। কিন্তু তারপরও সৌদী আরবে মার্কিন সৈন্য বহাল থাকে। বরং ইরাকের প্রাক্তন শাসক সাদ্দাম হোসেন গণবিধ্বংসী 'নিষিদ্ধ অস্ত্র' তৈরি করেছে বলে সাদ্দামের পক্ষ থেকে 'আক্রমণের ভয়ে' সৌদি আরবে হয়তো মার্কিন সৈন্যের অবস্থান বহাল রাখা হয়। অতঃপর মাঝখানে দজলা-ফোরাতের পানি বহুদূর গড়িয়ে যায় এবং সাদ্দামের তথাকথিত "গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র" এবং জীবাণু অস্ত্রের কোনো সন্ধান ইরাকে না পাওয়া গেলেও সেই অজুহাতে জাতিসংঘের বিনানুমতিতেই ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে প্রথমে আলকায়েদার উৎসভূমি বলে কথিত কাবুল ধ্বংস করে অতঃপর আফগানিস্তানের ন্যায় ইরাককেও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। ইরাক থেকে উৎখাত করা হয় সাদ্দাম সরকারকে।

ইরাক যুদ্ধের অবসানের পর স্বাভাবিকভাবেই আশা করা গিয়েছিল যে, এখন ইরাকের দিক থেকে যেহেতু সৌদি আরবের উপর হামলার আশংকা নেই, কাজেই সৌদি আরবে মার্কিন সৈন্যের অবস্থানেরও আর দরকার নেই। তাই এবার হয়তো সৌদি আরব থেকে ধীরে ধীরে মার্কিন সৈন্য অপসারণের কাজ শুরু হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, এ নিয়ে জল্প-কল্পনার ঠিক এমন এক প্রেক্ষাপটেই কয়েকদিন আগে সেদেশে আরেকটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে আর গত ৯ নভেম্বর ঘটলো এই আত্মঘাতী হামলা, যাতে ১৭ জন লোক নিহত ও আরও অনেকে আহত হলো। ঘটনার এই পটভূমি একথারই সাক্ষ্য দেয় যে, আসলে সৌদি আরবে সংঘটিত এসব হামলা এবং আত্মঘাতী হামলার মূল লক্ষ্য হলো, মার্কিন সৈন্য যাতে অগৌনে সৌদি আরব থেকে প্রত্যাহৃত হয়।

মূলতঃ সৌদী আরব এখন সন্ত্রাসী তৎপরতার টার্গেট, এতে সন্দেহ নেই। তবে সেখানে যে সব ধ্বংসাত্মক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, এ জন্যে কারা দায়ী এ নিয়ে বিভিন্ন মহল বিভিন্ন মত ব্যক্ত করছে। কারও ধারণা, এটি আমেরিকান মাস্টার প্লানেরই একটি অংশ, যদিও যে কোনো একটা কিছু ঘটলেই এখন প্রথমেই তার দায়িত্ব আলকায়েদার ঘাড়ে ছাপানো হয়, কিন্তু সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে আলকায়েদার ব্যাপারটি নানান সন্দেহ-শোবার আবর্তে মিলিয়ে যায়। কিছু ঘটলে আমেরিকাই এ আওয়াজটি আগে তোলে। বাস্তব অবস্থা যেটার সাক্ষী, সেটা হলো, বর্তমানে বিশ্বের যেখানেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যতকিছু করা হচ্ছে, সেখানেই দোষটি আল কায়েদার ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। আমেরিকার দেখাদেখি একশ্রেণীর মুসলমানও এখন বিভিন্ন মুসলিম দেশে তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামপন্থীদের সন্ত্রাসীরূপে চিহ্নিত করার জন্যে যত্রতত্র আলকায়েদা শব্দ ব্যবহার শুরু করেছে। আসলে যে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল, তখন যেখানেই মার্কিননীতি বিরোধী কোনো গ্রুপ পৃথিবীর কোথাও মাথা তুলতো, আমেরিকা তাদের কমিউনিস্ট আখ্যা দিতো। তেমনি সোভিয়েট

www.pathagar.com

ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের পর আমেরিকার একটা চিন্তা-ফিকির ছিল যে, এবার কাকে কল্পিত শত্রু আখ্যায়িত করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা যায়? অতঃপর তারা বহু চিন্তা-গবেষণা শেষে তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত নামটি পেয়ে যায় আর সেটিই হলো "আল কায়েদা"।

আলকায়েদা বা উসামা বিন লাদেন নামের কারো কোনো অস্তিত্ব বা কর্মতৎপরতা থাকলেও সেটা ছিল আফগানিস্তানে সীমিত। আমেরিকা এখন সেটাকে তাদের প্রচারণার জোরে ব্যাপক করে তুলেছে।

১১ সেপ্টেম্বর -এর পূর্বেও সৌদি আরবে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সে সময় আলকায়েদা নামক কোনো কিছুর নাম শোনা যায়নি। মূলতঃ মুসলিম দেশসমূহে স্থানীয় সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট কিছু গ্রুপ রয়েছে, যারা নিজ নিজ সরকারের প্রতি বিরক্ত। তার মূল কারণ হলো, তাদের সরকারসমূহের অন্যায় পাশ্চাত্যপ্রীতি এবং ধর্মীয় ব্যাপারে ঔদাসিন্য। প্রত্যেক মুসলিম দেশের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা নিজেদের সরকারগুলোকে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুসারী হিসাবেই দেখতে চায়। অন্য কারো মানসিক দাস হিসেবে নয়।

তাই তাদের মুসলিম বিদ্বেষী মার্কিন ঘেঁষা কোনো নীতি জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। কারণ, আমেরিকা অব্যাহতভাবে মুসলমানদের সাথে বৈরিতাপূর্ণ নীতি প্রদর্শন করে আসছে। বিশেষ করে আরব দেশগুলোতে আমেরিকার ইসরাইলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নীতির দরুন তার ব্যাপারে সেখানকার জনগণের ঘৃণা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অতঃপর ইরাক দখল এবং সেখানকার জনগণকে স্বাধীনতা দানের লালস দেখিয়ে তাদের গোলামে পরিণত করার চলতি প্রয়াস আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। সৌদি আরবের আলেমরা দীর্ঘদিন থেকে মার্কিনবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করে আসছেন। ১৯৯৪ সালে রবীদা আলকাসীম থেকে বহু আলেমকে গ্রেফতার করে নেয়া হয়েছে। তবে সেখানে সরকারি নীতি সুদৃঢ়। রহস্যপূর্ণ ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর সকল পাশ্চাত্য মিডিয়া এই প্রচারণা চালায় যে, হামলাকারীদের অধিকাংশের সম্পর্ক ছিল সৌদি আরবের সাথে। উসামা বিন লাদেনও সৌদী। সৌদি আরব নাকি সন্ত্রাসের নার্সিং ভূমি ইত্যাদি।

মার্কিন কংগ্রেসে যেই রিপোর্ট পেশ করা হয়, জানা যায়, তার কিছু পৃষ্ঠা প্রকাশ করা হয়নি। অনুমান করা হচ্ছে যে, তাতে সৌদি আরবের ব্যাপারে কতিপয় অভিযোগের উল্লেখ ছিল। মিঃ বুশ বলেছেন, "আমরা আমাদের বন্ধুদের নারাজ করতে চাই না।" বলাবাহুল্য, সেই আশংকা থেকেই সৌদি আরব আলকায়েদা বিরোধী অভিযান অধিক জোরদার করেছে। অন্যথায় এর পূর্বে মে মাসের দিকে সৌদি আরবের এক প্রভাবশালী কর্মকর্তা তখন সংঘটিত এক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, এর সাথে আল কায়েদার জড়িত থাকার কোনো স্পষ্ট প্রমাণ সৌদি আরবের কাছে নেই। বরং ঐ কর্মকর্তা কুয়েতের আরবী পত্রিকা আসসিয়ামাকে বলেছেন, আল কায়েদা ঐ হামলা করেছে বলে অনেকে বলে থাকেন। তবে এব্যাপারে

www.pathagar.com

নিশ্চিত হবার মতো কোনো সঠিক তথ্য আমার কাছে নেই। তিনি এধরনের হামলাকে 'শয়তানের কাজ' বলে অভিহিত করেন এবং বলেন, আমাদের অভিধানে এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই। এ ধরনের আচরণ ধর্মীয় নয়। ইসলামের অনুসারীদের পক্ষে এটি করা অসম্ভব। ইসলাম অত্যন্ত উচ্চ মূল্যবোধের ধর্ম। ইসলামের প্রকৃতি মধ্যপন্থা। তার ভাবমর্যাদার ব্যাপক প্রচার এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানানো হয়, রিয়াদে বোমা বিস্ফোরণের পূর্বক্ষণে সেখানে দু'টি সন্দেহজনক কার কম্পাউন্ডে প্রবেশ করে এবং সাথে সাথে ফায়ারিংয়ের শব্দ শোনা যায়। অতঃপর বড় বিস্ফোরণটি ঘটে, যার পনর সেকেন্ড পর আরও দু'টি বড় বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে সেখানকার ১০টি ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বিস্ফোরণ কবলিত এলাকায় অধিবাসী শতকরা ৯০ জনই আরব বাসিন্দা বাস করতো। এই এলাকাটি কুটনৈতিক এলাকার অভ্যন্তরীণ সড়কে অবস্থিত। তার এক মাইল দূরত্বে শাহী পরিবারের সদস্যদের নিজস্ব বাসভবন। সৌদি কর্তৃপক্ষ জানান, নিহতদের মধ্যে ৩ জন লেবাননী, ১ জন সুদানী, একজন ভারতী এবং মার্কিন বাসিন্দারা ছিল। জনৈক মার্কিন নাগরিকের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ঘটনার পূর্ববর্তী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র তার সকল মার্কিন নাগরিককে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হামলার আশংকায় সৌদি আরব সফর না করার নির্দেশ দিয়েছিল এবং সম্ভাব্য একই আশংকায় যুক্তরাষ্ট্র আগের বৃহস্পতিবার সৌদি আরবস্থিত তার সকল কূটনৈতিক মিশন বন্ধ করে দিয়েছিল।

কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের ধারণা অনুযায়ী সন্দেহ করা হচ্ছে যে, সংঘটিত এসব ভয়াবহ ঘটনার সাথে খোদ আমেরিকান সিআইএ'র হাত নেই তো? যাতে তাদের দু'ধরনের ফায়েদা নিহিত! (১) সৌদি আরবে মার্কিন বাহিনীর অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধি করার হেতু সৃষ্টি করা। (২) খোদ উপসাগরীয় দেশ সমূহ যেমন ইরাক এবং ফিলিস্তীন নিয়ে চিন্তা থেকে এখানকার লোকদের ফিরিয়ে রেখে নিজেদের সমস্যায় ব্যস্ত রাখা। এছাড়া দেশটিতে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা যত বৃদ্ধি পাবে ততই আমেরিকার পক্ষে কাজ উপসাগরীয় দেশগুলোতে তার পরিকল্পিত নীলনকশা অনুযায়ী নিজেদের মর্জির 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা সহজ হবে, যে ব্যাপারে অধুনা বারবার দাবী জানিয়ে আসছে। আশ্চর্যের কিছু নয়, সে যেভাবে ইরাকী জনগণকে সাদ্দামের হাত থেকে 'স্বাধীন' ও 'মুক্ত' করেছে, ঠিক কয়েকদিন পর অনুরূপভাবে সৌদি জনগণকেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী থেকে'মুক্ত' করার জন্যে অপর কোনো ধুয়া তুলে সে চেষ্টাই শুরু করে দেবে। বলাবাহুল্য, এসব ঘটনায় আমেরিকার তাৎক্ষণিক লাভ তো এটাই হয়েছে যে, আরব শাসকদের পক্ষ থেকে এখন আর ইসরাইলী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও তাঁদের বর্বরতার বিরুদ্ধে কোনো আওয়াজ উঠছে না। অথচ এর আগে আরবী আলেমগণ ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় ত্যাগ ও কুরবানীর ভূয়সী প্রশংসা করে তাদের উৎসাহিত করে আসছিলেন। এক প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, গত সাম্প্রতিক দিনগুলোতে

www.pathagar.com

মক্কাশরীফে দুই ব্যক্তি গ্রেফতারি এড়াবার জন্যে আত্মঘাতী বোমায় নিজেদের প্রাণহানি ঘটায়। সৌদি আরবের পর এখন কুয়েত, কাতারও আশংকাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো, প্রচারণার মাধ্যমে তাদের ভয় দেখাচ্ছে যে, ঐসব দেশও সন্ত্রাসী হামলার শিকার হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অপরদিকে, এসব সন্ত্রাসী ঘটনা থেকে "পাশের বাড়িতে আগুন লাগার সুযোগে আলু পোড়ানো"র জন্যে ভারতও তৎপর কম নয়। আর উপমহাদেশের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো নাগরিককে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে, না জানি এরা কাশ্মীরীদের আন্দোলনে সাহায্যকারী! উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে এমন কতিপয় ব্যক্তিকে এ সন্দেহে বহিষ্কারও করা হয়েছে। উপসাগরীয় দেশসমূহে দরসে কুরআনের যেই রীতি ছিল, তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তো মুসলিম দেশগুলোতে 'জেহাদের' কথা বলা একরকম আশংকারই বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'জেহাদ'তো দূরের কথা, কেউ ইসলামের কথা বললেই তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। পাকিস্তানে দ্বীনী মাদ্রাসা সমূহের পরিবেশকে সংকীর্ণ করে তোলা হয়েছে। পাঠ্য থেকে জেহাদ শব্দ বাদ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে, করাচীর দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহে নাকি তালের এলেমদেরকে সন্ত্রাসী তৎপরতার প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং সন্ত্রাসীদেরকে ঐসব মাদ্রাসায় আশ্রয় দেয়া হচ্ছে বলে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তাদের নাকি রয়েছে বিদেশের সাথে সম্পর্ক। ঐসব মাদ্রাসাগুলোতে সন্ত্রাসীদেরকে ফেরার ঘোষণা করা হয়। অপর এক খবর অনুযায়ী, অধুনালুপ্ত জেহাদী সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে ঈদের পরে অপারেশনের কাজ শুরু হবে। এই তো হলো পাকিস্তানের অবস্থা, যেখানে বাহ্যত গণতন্ত্রও আছে এবং ধর্মীয় বিভিন্ন দলও পার্লামেন্টে রয়েছে। তদ্রূপ মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াতেও একই অবস্থা। আফগানদেরকে তো ইসলামের নাম উচ্চারণ করলেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

চিন্তার বিষয় হলো, মুসলিম দেশগুলোতে একশ্রেণীর সরকার কর্তৃক নিজ পাশ্চাত্য প্রভুদেরকে খুশি করার এসব কার্যক্রমের দ্বারা ফায়দা করা হচ্ছে; অপরদিকে ধ্বংসাত্মক কাজ যেখানেই ঘটুক এবং যারাই ঘটাক, তাকে সেই আল কায়েদা অভিধায় আখ্যায়িত করা হচ্ছে। রিয়াদে সংঘটিত বোমা হামলায় নিহতদের মধ্যে রয়েছে বহু নারী শিশুও। কোনো যুদ্ধেই নিষ্পাপ কাউকে হত্যা করাকে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। আমেরিকা এবং তাদের সমর্থকদের বিরোধিতা যথাস্থানে যাই হোক, কিন্তু এধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা থেকে ফায়েদা লুটছে দুশমনরাই। পাকিস্তানসহ অনেক মুসলিম রাষ্ট্রেই সন্ত্রাসী তৎপরতার ঘটনার কথা ইদানীং শোনা যায়। বিশেষ করে সৌদি আরবের ন্যায় মুসলিম প্রাণকেন্দ্রে এরূপ ঘটনা সম্পূর্ণ নিন্দনীয়। তবে আল কায়েদার নামে সকল দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাবার যেই প্রবণতা চলছে, তার রহস্য সকলের অনুধাবন করতে হবে। পরিতাপের বিষয় যে, কোনো মুসলিম দেশে এ জাতীয় সন্ত্রাসী ঘটনা সংঘটিত হলে সে জন্যে তদন্তের জন্যে সংশ্লিষ্ট তাঁবেদার শাসকরা সেই আমেরিকার কাছেই ধর্ণা দেয় অথচ আমেরিকা মুসলিম দেশসমূহের ব্যাপারে কতদূর যে আন্তরিক, তা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

www.pathagar.com

সন্ত্রাস-দুর্নীতি দমনে কুরআনী শাসনের দাবী প্রসঙ্গ

[প্রকাশ ঃ ১২. ১১. ২০০৩ ইং]

সন্ত্রাস, দুর্নীতি আমাদের সমাজের এখন প্রধান দু'টি সমস্যা। অতীতে দুর্নীতি থাকলেও সন্ত্রাস এত অধিক ছিল না। কিন্তু গত সরকারের আমলে এই উভয়টিই সমাজে এত মজবুতভাবে শিকড় বিস্তার করেছে যে-বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই দুই মারাত্মক অপরাধপ্রবণতা বন্ধে নিরলসভাবে কাজ করেও এখন পর্যন্ত যথাযথ ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। দুর্নীতি কম-বেশ সকল দেশেই থাকে। কিন্তু আমাদের সমাজে এটা একরকম মজ্জাগত হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মার্কিনীদের মতলবি সংজ্ঞায় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মজলুম মানবতার এ জন্যে প্রান্তিক ত্যাগ ও প্রয়াসের ন্যায় আত্মঘাতী হামলাও সন্ত্রাস বলে প্রচারিত, সেটা না হলেও আসলে প্রকৃত সন্ত্রাস বলতে যা বুঝায় সেটাই এখানে চলছে।

ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবিক সকল দিক থেকেই সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী তৎপরতা মানবতাবিরোধী, নিন্দিত, ধিকৃত এক অপরাধপ্রবণতা। এর কার্যকারণ যাই থাক না কেন, এই অমানবিক, পাশবিক প্রবণতা কোনো সমাজে প্রশ্রয় পাবার অর্থই হলো সংশ্লিষ্ট সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের সকল প্রয়াসকে স্তব্ধ করে দেয়া এবং সমাজের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহকে অচল করে দেয়া। যা কোনো অবস্থাতেই কোনো সমাজে কোনো জনদরদী সরকার শিথিল দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। কোথাও যদি কেউ এমনটি করে, তাহলে এটি খুনী বর্বর পশুশক্তির হাতে সংশ্লিষ্ট সমাজকে জিম্মি করে দেয়ারই নামান্তর হবে। এ কারণেই যে কোনো সমাজে সন্ত্রাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে সকল দেশ ও সকল সমাজেই এই অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাসীন সরকার তা দমনে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেখানেই এ সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে আসছে তার বিরুদ্ধে কেউ কি এখনও প্রকৃত সফলতা অর্জন করতে পেরেছে? খোদ মার্কিন সমাজ জীবনে সংঘটিত সন্ত্রাসের বিবরণও মাঝে মধ্যে সামনে আসে। তখন দু-একটি মার্কামারা সন্ত্রাসীর সন্ত্রাসের ধরন-প্রকৃতি, চরিত্র যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি, রীতিমতো হতবাক হয়ে যেতে হয়।

অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের এক কিলার গ্যারিলিওন সম্পর্কিত এক খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, ৫৪ বছর বয়সের এ লোক ৪৮ জন লোককে হত্যা করেছে। যাদেরকে হত্যা করেছে, তারাও অন্য অপরাধে অপরাধী ছিল। তবুও এক ব্যক্তির এত লোক হত্যার ঘটনায় বিষয়টি কি অনুমিত হয়? বৈষয়িকভাবে উন্নত ঐসব জাতির দুর্নীতির ধরন-প্রকৃতির প্রতি নজর দিলেও ঠিক তেমনি অবাক হতে হয়।

www.pathagar.com

দেশে দেশে সমাজে সমাজে সন্ত্রাস ও অন্য অপরাধপ্রবণতা দমনে ব্যর্থতার কারণ কিন্তু অভিন্ন। আর সেটি হলো 'গর্তের ভিতরে ইঁদুর রেখে মাটি দ্বারা তার মুখ বন্ধ করা'র মতো অনুসৃত ব্যবস্থা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মূল কার্যকারণ দূরীকরণের চাইতে বাহ্যিকভাবেই তা প্রদমনের চিন্তা করা হয়।

এদিক থেকে অপরাধপ্রবণতার এই দুই ব্যাধি নিরাময়ে আমরা যদি খোদায়ী অপরাধ দমন বিধির প্রতি তাকাই, তাহলে একমাত্র সেখানেই এর স্থায়ী সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক পন্থা দেখতে পাই। যার সফলতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ইসলামের সোনালী যুগে প্রত্যক্ষ করা গেছে। চলমান আধুনিক বিশ্বেও এই সফলতার কিছুটা বাস্তব নমুনা সৌদি আরবে দৃষ্টিগোচর হয়। বিভিন্ন সময় যখন পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজের অপরাধপ্রবণতার পরিসংখ্যান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় আর তার তুলনামূলক হার সামনে আসে, তখন একমাত্র সৌদি আরবেই অপরাধপ্রবণতা ও অপরাধমূলক সংঘটিত ঘটনাবলীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। বলাবাহুল্য, এটা একমাত্র অপরাধ দমনে খোদায়ী আইনেরই সুফল বৈ কিছু নয়।

সৌদি আরবে ইসলামী বিধানের আংশিক প্রয়োগের কারণেই যদি বিশ্ববাসী এই জটিল সমস্যায় এমন সুফল পেতে পারে, সেক্ষেত্রে কোনো দেশে পূর্ণ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তার পূর্ণ অবয়ব নিয়ে কার্যকর করা হয়, বিশেষ করে কুরআনে বর্ণিত খোদায়ী অর্থনৈতিক বিধান ও অপরাধ দমন আইন চালু হয় তাহলে সেখানে যে অতি সহজেই এক সুখী-সমৃদ্ধ, শান্তিময় উন্নত নিরুপদ্রব সমাজ বিনির্মীত হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, একমাত্র ইসলামী জীবন দর্শনেই রয়েছে মানুষের অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণের সঠিক ও যুক্তিগ্রাহ্য পন্থা, যা অপর কোনো বিধানে নেই। কেননা মানুষের মনে অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টির পেছনে যেসব কার্যকারণ বিদ্যমান সেগুলো নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা মানবরচিত বিধিবিধানে নেই। যেমন, জীবনের সকল কাজের জন্যে আল্লাহর কাছে পরকালে জবাবদিহিতার অনুভূতিকে তীব্র করা। এই অনুভূতিকে জীবনের সব কর্মকাণ্ডে ধরে রেখে নিজ চরিত্র-প্রকৃতি ও চিন্তা-মননে তাকে স্থায়ী রাখার সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণমূলক ব্যবস্থা আছে কি অন্য কোথাও? একমাত্র এই বিধানেই রাত-দিনের ২৪ ঘণ্টার দৈনন্দিন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ইবাদত ও অন্য সকল কাজের কর্মসূচীতে তা বিদ্যমান।

সর্বক্ষণ সৎপ্রবণ থাকা ও অসৎ প্রবণতা বর্জনের এই অনুভূতি ও অভ্যাসকে ধরে রাখার জন্যেই রাত-দিনের অন্যান্য নির্ধারিত ধর্মীয় কাজ করতে হয়। এ ছাড়াও সাপ্তাহিক জুমা, বাৎসরিক একবার মাহে রমযানের তাকওয়া বা সংযম, আল্লাহর ধ্যান, গবেষণা, অনুশীলন দ্বারা অন্যায় থেকে বিরত থাকার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থ বুঝে কুরআন চর্চা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে একজন লোক তার প্রতিটি কাজের জন্য এক মহাসত্তার কাছে জবাবদিহির অনুভূতিকেই নিজের মধ্যে বারবার জাগিয়ে তোলে। ফলে এসব কিছুর মধ্যদিয়ে মানুষ যেমন ন্যায়-অন্যায়ের সীমা মেনে চলতে অভ্যস্থ

www.pathagar.com

হয়ে যায়, তেমনি অপরাধপ্রবণতার মূল প্রেরণা অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভক্ষণের প্রবণতাও তার মধ্যে আল্লাহর ভয়ে হ্রাস পায়। মহাশক্তিধর আল্লাহর কাছে নিজের সকল কাজ-কারবারের জবাবদিহিতার এই ভয় মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে। হ্যাঁ, এত কিছু শিক্ষা- প্রশিক্ষণের পরেও কেউ কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানি প্ররোচনার তাঁবেদার হয়ে যদি সামাজিক শান্তি বিঘ্ন ঘটায় সে জন্যে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষাকল্পে আল্লাহর যেই নির্ধারিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রয়েছে, তা যথাযথ প্রয়োগে তাকে অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনতে হয়। কোন ওয়াচ মেশিনের সামনে দিয়ে যাবার সময় যেমন মানুষ মনে করে তার গতিবিধি রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে, তেমনি সকল কাজের মূল প্রেরণার উৎস অন্তরকেও জবাবদিহিতার চেতনা দ্বারা সজাগ রাখা হলে, এমনিতেই একটি সমাজ থেকে অপরাধপ্রবণতা দূর হতে বাধ্য। স্মরণ রাখা দরকার, তা করা না হলে ঘরে ঘরে সেনাবাহিনী বসিয়েও সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

অপরাধ প্রবণতার কারণ অবৈধ উপার্জনের সুযোগ

অবৈধ উপার্জনের সুযোগ থাকাটা হচ্ছে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। আর একারণ তখনই অধিক মাথাচাড়া দিয়ে উঠে যখন অবৈধ উপার্জনের ছিদ্রপথসমূহ খোলা রাখা হয়। বলাবাহুল্য, মানবরচিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে অবৈধ উপার্জনের ছিদ্র পথসমূহ থাকবেই। কারণ, এসব আইনে মানবজ্ঞানের খর্বরতা ও শ্রেণী বৈষম্যবোধ সক্রিয় থাকে। পক্ষান্তরে খোদায়ী আইন থাকে সকলপ্রকার শ্রেণী বৈষম্যবোধের ঊর্ধ্বে। কেননা, মহান স্রষ্টা আল্লাহর দৃষ্টিতে ছোট-বড় বর্ণ-ভাষা পেশা নির্বিশেষে তাঁর সকল স্তরের বান্দাই সমান। এ আইন সকল পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র খোদাই আইনেই এই জোরদার তাগিদ রয়েছে যে, কি বিচার ব্যবস্থা, কি অর্থ ব্যবস্থা, কি ব্যবসা-বাণিজ্যিক নীতি, কোথাও এমন কোনো নীতি অনুসরণ করতে পারবে না, যাতে অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন হয় বা অপর কারও প্রবঞ্চনা-প্রতারণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, বিচারে পক্ষপাতিত্ব চলবে না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কেউ ওজনে কম দিতে পারবে না, ভেজাল করতে পারবে না, অধিক মুনাফা অর্জন করা চলবে না। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মজুদদারি করা যাবে না। যার যে পরিমাণ পরিশ্রম মেধা, তাকে সে অনুযায়ী এর প্রতিদান দিতে হবে। তা না করে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে জাতির সম্পদ বাড়ে, তাদেরকে ঠকানোর নীতি অনুসৃত হলে আর যাদের শ্রম ও মেধা কোনটাই উন্নয়নের কাজে আসে না চাতুর্যপূর্ণ নীতি দ্বারা তাদের অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দেয়া হলে, তাতে অর্থনৈতিক বৈষম্য অবশ্যই সৃষ্টি হতে বাধ্য। ইসলাম কখনও তা

www.pathagar.com

অনুমোদন করে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণের হাতিয়ার সুদ ও এজাতীয় বৈষম্যমূলক নীতির দরুনই সমাজের কিছু কিছু মানুষের মনে বঞ্চনাবোধ প্রকট হয়ে উঠে। আর সেই বঞ্চনাবোধ ও হীনমন্যতা থেকেই তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইসলাম তথা আল্লাহর আইন বিধিতে এহেন বৈষম্যের কোনো অবকাশ নেই। আজকের দিনের প্রচলিত অর্থব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থায় এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরাট প্রভাব রয়েছে। এর অবসান ঘটানোর কোনো ব্যবস্থা মানবরচিত আইনে আদৌ নেই। থাকলেও এজন্যে ঐসব আইনে যেই মানদণ্ড আছে, সেটিও নানা বৈষম্যবোধে আক্রান্ত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে পুলিশ বাহিনীর বেতন ভাতা ইত্যাদির প্রশ্নটি আসে। যারা রাত-দিন শারীরিক পরিশ্রম ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অপরাধ দমনের পেশাগত কাজে নিয়োজিত থাকে, নিজেদের ও পরিবারের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করার জন্যেই তারা এত কষ্টসাধ্য কাজ করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি তাদেরকে এ পরিমাণ বেতন দেয়া হয় যে, সে তার প্রাপ্ত বেতন দ্বারা পারিবারিক সদস্যদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষ হিসাবে তার অলক্ষ্যেই অন্তরে এক প্রকার অপরাধপ্রবণতা দানা বেঁধে উঠবে। তখনই সে তার ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করে দেবে। মূলত এ দুর্নামেরই শিকার হয়ে আছে আমাদের দেশের পুলিশ বিভাগের একশ্রেণীর সদস্য। অথচ এই একটি মাত্র বিভাগই এমন যাকে নৈতিক আর্থিক চারিত্রিক যথার্থ মানে গড়ে তোলা গেলে এবং এবিভাগ সম্পর্কিত নীতিমালা কঠোরভাবে পালিত হলে, দেশে অপরাধপ্রবণতা কিছুতেই মাথা তুলে উঠতে পারতো না। কিন্তু এখানেও কারণ সেই একটিই, অপরাধ করার ছিদ্রপথ এখানেও উন্মুক্ত ও অবারিত। নৈতিকতা, পরকালে জবাবদিহিতা ও খোদা ভীতির কোনো বোধই এখানে নেই। বরং বলা চলে মহান ক্ষমতাধর ন্যায় পরায়ণ আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে তার চলার নিয়ম বিধির যে বেরিকেড দিয়ে দিয়েছেন খোদাই আইনের সেই নিয়ম অনুযায়ী গোটা সমাজ গড়ে তোলা হলে এত পুলিশেরও প্রয়োজন হতো না।

সুতরাং একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা চলে যে, মহাস্রষ্টা আল্লাহর কাছে জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতামূলক আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের সমাজকে সন্ত্রাস ও অপরাধমুক্ত করা সম্ভব নয়। গোটা এই রমযান শরীফে শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যতজনই রমযানের সিয়াম অনুশীলনের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে ব্যক্তি চরিত্র গঠন ও সমাজে কুরআনের আইন বাস্তবায়নের পৌনপুনিক প্রস্তাব দিয়ে আসছেন, তার মূল কারণ এখানেই। এই বাস্তবতা উপলব্ধি ও তা সমাজে বাস্তাবায়নের শুভবুদ্ধি আল্লাহ আমাদের সকলকে প্রদান করুন, পবিত্র দিনের এই পবিত্র বাসনা নিয়েই আজকের লেখা শেষ করলাম।

www.pathagar.com

অপসংস্কৃতি দ্বারা ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র নবী জীবনেই শুরু হয়েছিল

[প্রকাশ ঃ ৮. ১০. ২০০৩ ইং]

নসর বিন হারিসের ন্যায় আল্লাহ্ রাসূলের ঘোরতর দুশমনই সর্বপ্রথম বিকৃত চরিত্রের নর্তক-নর্তকী ও গায়িকাদের দ্বারা আল্লাহর দ্বীন থেকে মুসলমানদের বিপথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে নবগঠিত সমাজের ইসলামী মুল্যবোধ ধ্বংসের দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত হয়েছিলো। অশ্লীল নাচ-গান ও মদ-জুয়ার আসর জমিয়ে মুসলিম যুব মানসের বিকৃতি ও তাদের চরিত্র হননের সে উদ্যোগ নেয়। ইসলামের সাফল্যকে দাবিয়ে রাখা এবং তার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পরই ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি মুসলিম যুবকদের আকর্ষণ বিনষ্টের জন্যে নসর বিন হারিস এমনটি করেছিল। সে যেই পদ্ধতিতে মুসলিম সমাজে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রচার করতো ইসলামের দুশমনদের সেই একই ষড়যন্ত্র একই লক্ষ্যে এখনও যে সক্রিয়, মুসলিম সমাজ নেতৃত্বের অনেকে এখনও তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ বলেই মনে হয়। তাই দেখা যায়, চরিত্র ও নৈতিকতা বিধ্বংসী এসব অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে ধর্মীয় মহল কোনো আপত্তি তুললে তাদের অনুসৃত নীতি যেন এই আপত্তি ও প্রতিবাদকে "মোল্লাদের চিৎকার" তথাকথিত প্রগতি বিরোধী বলেই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে চান। ফলে বহু আগে থেকেই লক্ষ্য করে আসা হচ্ছে যে, অপসংস্কৃতি আশ্রয়ী ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী এসব কাজে অনেক সময় সমাজের অনেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব সমাজের জন্যে, নিজ পরিবার ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে তার ক্ষতিকর পরিণতির কথা ভেবে একে নিরুৎসাহিত করার বদলে উৎসাহিত করার নীতিই গ্রহণ করে আসছেন। এমনকি হাজারো সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ দেশবাসীর জীবন থেকে সমস্যার সেসব বোঝা হালকা করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে তেমন কিছু করতে না পারলেও জনগণের অর্থে ঐসব অবাঞ্ছিত কাজে মদদ যুগিয়ে যেতে তাদের দেখা গেছে। বলাবাহুল্য, সেই অতীত থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের এই পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েই অপসংস্কৃতি মুসলিম সমাজে অধিক প্রসার লাভে সক্ষম হয়েছে। আর বর্তমানে অপসংস্কৃতি আশ্রিত সেই বিনোদন ব্যবস্থা এখন মুসলিম জাহানের অনেক সমাজের পরিচিতি ও অস্তিত্ব নিয়েই টান দিচ্ছে। যেখানে মহান আল্লাহ তার কল্যাণের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, মানবচিত্তের যাবতীয় অস্থিরতা দূরীকরণ এবং প্রকৃত মানসিক শান্তি ও স্বস্তি একমাত্র আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই সম্ভব; সে ক্ষেত্রে আজকাল মানসিক শান্তি-স্বস্তির উপায় হিসাবে অনেকে নিছক নাচ-গান ও খেলাধূলাকেই মনে করে। নির্মল আনন্দ ইসলামে নিষিদ্ধ না হলেও ঐসব ক্ষেত্রে সেই নির্মলতা কোথায়? পরন্তু বিনোদন শত নির্মল হলেও ইহ-পারলৌকিক জীবনে সফলতার জন্যে পূর্বশর্ত হিসাবে সময় –

www.pathagar.com

কালের যেই গুরুত্ব আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তুলে ধরেছেন, জীবনের মূল্যবান সম্পদ সেই সময়ের দীর্ঘ অপচয়ও তো কিছুতেই সঙ্গত নয়। তাতে যেমন ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে উন্নতকরণের কাজ ব্যাহত হয়, তেমনি আল্লাহমুখী মননশীলতাকেও তা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। এ জন্যে মহাস্রষ্টা যেমন, সময়কেও তার অন্যতম নেয়ামত গণ্য করে ঘোষণা করেছেন, ঐদিন তোমাদেরকে প্রদত্ত সকল নেয়ামতের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি তিনি সুরাতুল জুমুয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, "আল্লাহর কাছে বান্দার সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু রয়েছে, সেগুলো (তাদের বৈষয়িক জীবনের) খেলাধুলা ও ব্যবসায়ের চাইতে অনেক অধিক উত্তম।"

প্রাক ইসলামী যুগে আরব সমাজে মাদকদ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার, জুয়া, খুন-খারাবী, নিম্ন পেশা ও নিম্নবিত্তের মানুষদের প্রতি অন্যায় আচরণ, প্রতিহিংসা প্রতিশোধ, অশ্লীল নাচ-গানের দৌরাত্ম্য, নর্তক-নর্তকীদের কাজের প্রতি গুরুত্বদান, নারী সমাজের প্রতি অমর্যাদাকর আচরণ, অশ্লীল কাব্যচর্চা, নারী সম্ভ্রম বিনষ্ট করা ইত্যাদি গর্হিত কাজের দৌরাত্ম্য ছিলো অতি ব্যাপক। নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সকল দিক থেকেই মানুষ চরম অশান্ত পরিবেশেই বসবাস করতো। তাদের ঐ অবস্থার কারণ ছিলো দীর্ঘ প্রায় পৌনে ছ'শ বছর ধরে তারা নবী-রাসূলদের শিক্ষা-আদর্শ থেকে দূরে ছিলো। জীবনের সার্বিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নিজেদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মহা সত্তার কাছে জবাবদিহিতার কোনো ধারণা তাদের ছিলো না। তৎকালীন আসমানী পবিত্র গ্রন্থও তখন বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। আলো পাবার কোনো পথ অবশিষ্ট ছিলো না। ফলে লক্ষ্যহীন জীবনের বেলায় যা অবশ্যম্ভাবী, সেই জীবনেরই সকলে অনুসারী ছিলো জবাবদিহিতামুক্ত লক্ষ্যহীন স্বেচ্ছাচারী জীবনে কোনো লোকের যা যা করার কথা, সব কিছুই ঐ সমাজের লোকেরা করতো।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, উল্লেখিত প্রতিটি গর্হিত কাজ আজ মুসলিম সমাজেও অতি দাপটে চলছে। অথচ আমরা আল্লাহ প্রেরিত সেই মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনেরই অনুসরণকারী বলে দাবীদার, যেই নবী মোস্তফা (সাঃ) এবং যেই আলোর দিশারী মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিলের পর প্রাক ইসলাম যুগের উল্লেখিত অপসংস্কৃতিজনিত সকল অসভ্যতা, বর্বরতা ও যাবতীয় জুলুম-নিপীড়নের অন্ধকার নবীচরিত্র ও কুরআনের শিক্ষার আলো দ্বারা দূরীভূত হয়ে গিয়েছিলো। ন্যায় ও সত্য-সুন্দরের আলোর দিশারী ঐ পবিত্র কুরআন এবং সমাজে এর শিক্ষা বাস্তবায়নকারী মহানবী (সাঃ)-এর পূতপবিত্র জীবন ও তার অমর বাণীসমূহ আমাদের হাতে বিদ্যমান থাকাবস্থায়ও সেই প্রাক-ইসলাম যুগের অন্ধকারেই হাবুডুবু খাচ্ছি। উল্লেখিত অপসংস্কৃতির ঘোরতমসা আমাদের জীবনের সকল বিভাগকেই আজ সার্বিকভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে যে, আমরা আজ যে দিকে তাকাই সে দিকেই যেন দেড় হাজার বছর পূর্বেকার খোদাদ্রোহী অপসংস্কৃতির ঐ সমাজ পরিবেশেই নিজ চোখে দেখতে পাই। আমাদের সমাজে আজ এমন কোন্ মন্দ কাজটি নেই, যা প্রাক-ইসলামী যুগের খোদাদ্রোহী সমাজে ছিলো না? অপসংস্কৃতি প্রভাবিত বর্তমান আধুনিক সমাজ-পরিবেশ আমাদের সৎ চিন্তা, সৎ প্রবণতা ও আল্লাহর কাজে নিজ কর্মকাণ্ডের

www.pathagar.com

জবাবদিহিতার সকল চেতনা যেভাবে নিঃশেষ করে দিচ্ছে, তার পরিণতি কি আমরা এখনও লক্ষ্য করছি? এ সমস্ত অপকীর্তিই আজ সমাজের লোকদের শান্তিতে ঘুমুতে দিচ্ছে না। নিরাপদে পথ চলতে গিয়ে ছিনতাই-রাহাজানিতে লাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য কেন্দ্রে লালবাতি জ্বলার উপক্রম, বিদ্যালয়গামী মেয়েদের সম্ভ্রমই শুধু হুমকির সম্মুখীন নয়, গৃহে অবস্থানকারী যুবতী-কিশোরীরাও হায়েনা চরিত্রের সমাজ বিরোধীদের দ্বারা হয় ধর্ষিতা। নিত্যদিনের কাগজে ঐসব খবর পড়তে পড়তে প্রতিটি পিতা-মাতাই দিশেহারা। চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যে শান্তিপূর্ণ ভ্রমণ ও বসবাস অশান্তিকর। নিষ্ঠুর সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ অপসংস্কৃতিজনিত উল্লেখিত প্রতিটি অপকর্মের নায়কদের কাছে আজ গোটা সমাজ যিম্মী। বিভিন্ন বাহিনী দিয়েও এসব অপরাধ সংগঠককে বাগে আনা যাচ্ছে না। বলার অপেক্ষা রাখে না, সমাজের যুব-কিশোররা মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণা ও প্রশিক্ষণ নেয় আমাদের প্রচার ও সাংস্কৃতিক মাধ্যমগুলো থেকেই। যেগুলো নানান উপায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোনো না কোনোভাবে সরকারি মদদপুষ্ট। আধুনিকতা ও প্রগতির 'জাতে' উঠতে গিয়ে আজ আমরা পবিত্র কুরআন, মহানবী (সাঃ)-এর সুন্নাহ ও তার জীবনাদর্শ নিজেদের জীবন থেকে বিদায় দিতে চাচ্ছি এবং সকলেই যেন লক্ষ্যহীন চিত্তবিনোদনের বেগমান স্রোতের পেছনে ধাবমান। এমনকি তারা চার বছরের যেই শিশুটির মুখে আল্লাহর পবিত্র নাম ও কুরআন মজিদের দু'একটি আয়াতের আবৃত্তি শুনে সমাজের মুসলিম মাতা-পিতার খুশীতে বাগবাগ হবার কথা, সেই মাসুম শিশুটির মুখেও এখন ডিস্কো নাচ-গানের কলি উচ্চারিত হতে শোনা যায়।

এভাবে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মানস গঠনের পরিণতি আমাদের জীবনকে ইহলোকেই শুধু যন্ত্রণাদায়ক করে তুলছে না, পরবর্তীতে তার ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী বেদনাদায়ক শাস্তিরও উপকরণাদি তৈরি করে যাচ্ছে। অতীত ইতিহাসই সাক্ষী যে, কোনো সমাজে যখনই নাচ-গান, মদাসক্তি, অশ্লীলতা, নগ্নতা ও স্থূল ধরনের বিনোদন ইত্যাদি মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায়, সেই সমাজ তখনই বিকৃতির শিকার হয়ে পড়ে। সেখান থেকে সৎ ও মহৎ চিন্তা, জাতীয় শক্তি সাহস এবং যথার্থ সৌন্দর্যবোধের বিলোপ ঘটে। মুসলমানদের পতন যুগের আগমন এভাবেই তরান্বিত হয়েছিলো। মুসলমান দীর্ঘদিন পৃথিবীর বিরাট অংশ শাসন করেছে। এই উপমহাদেশে প্রায় পৌনে আটশ বছর তাদের শাসনকাল ছিলো। কিন্তু যখন থেকে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী অশ্লীল নাচ-গান, মদ-নারী ইত্যাদি অপসংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন থেকেই সর্বত্র তাদের পতন দেখা দেয়। স্পেনসহ দুনিয়ার সকল দেশেই তারা শাসকের মর্যাদা হারায়। এই দুর্বলতার সুযোগে তাদেরকে যখন অযোগ্যতা ও দায়িত্বহীনতা বেষ্টন করে ফেলে, সেই সুযোগে ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা এসে তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ পায়। আন্দালুসের শাসকরা যখন বাদ্য-যন্ত্র, নাচ-গান ইত্যাদি আয়াশীতে মগ্ন হন, তখন সেখানে তাদের আটশ বছর স্থায়ী মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

বর্তমানে মুসলিম জাতি.ক ধ্বংসের সূক্ষ্ম কৌশল হিসাবেই অপসংস্কৃতির পথ বেছে নেয়া হয়েছে। এ জন্যে আমাদের দেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে দীর্ঘদিন থেকে অপসংস্কৃতির ধারকরা সক্রিয় রয়েছে। স্থানীয়ভাবে তারা নিজেদের বহু অনুসারীও সৃষ্টি

www.pathagar.com

করে নিয়েছে। এ কারণেই দেখা যায়, বর্তমান জোট সরকার অপসংস্কৃতির সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য করে এ ব্যাপারে দেশের চলচ্চিত্রসহ বিনোদনের সকল মাধ্যমে কুরুচিমুক্ত ও জাতীয় মূল্যবোধের সহায়ক চলচ্চিত্র তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন এবং একদল অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ বংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতি অশ্লীলতা বর্জিত রুচিসম্মত চলচ্চিত্রের সপক্ষে জোর আন্দোলন চালাচ্ছেন। সরকার এ ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে এসব বিনোদন মাধ্যমে অশ্লীলতার জন্যে শাস্তিও ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু তারপরও লক্ষ্য করা যায়, কি চলচ্চিত্র, কি সংবাদপত্র এগুলোর কোনো কোনোটিতে এমন সুকৌশলে অশ্লীলতা ছড়ানো হয় যে, -তা যেন কর্তৃপক্ষ এবং অপসংস্কৃতি বিরোধী ও রুচিসম্মত চলচ্চিত্রের দাবীদার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেরই শামিল। কোনো কোনো কাগজের ছায়াছবির পাতায় দেশী-বিদেশী চিত্র তারকার দৃষ্টিকটু নগ্ন এবং অশ্লীল ছবিসমূহ তারই বড় প্রমাণ।

তাই বলতে হয়, দেড়হাজার বছর পূর্বে খোদাদ্রোহী নসর বিন হারিস যেভাবে অপসংস্কৃতির দ্বারা ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো, আমাদের সমাজে সেই অপসংস্কৃতির নায়ক নসর বিন হারিসের যেসব প্রেতাত্মা অতীব চাতুর্য্যের সাথে এ দেশ ও সমাজকে অপসংস্কৃতির কলুষতা দ্বারা ক্ষতি সাধনে সক্রিয় রয়েছে তাদের অসদুদ্দেশ্য নস্যাত করার জন্যেও সরকার, দেশের রুচিবান সংস্কৃতিসেবী ও ইসলামপ্রিয় জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে মহানবী (সাঃ)-এর মিরাজ সফর শেষে প্রত্যাগমনের পর তাঁর প্রদত্ত এক হাদীস দিয়েই আজকের লেখা সমাপ্ত করছি। হযরত (সাঃ) এরশাদ করেছেন,- আমি মিরাজে গিয়ে দেখেছি, অশ্লীল গানের গায়িকা ও নর্তক-নর্তকীদের চেহারা সম্পূর্ণ কালিমাযুক্ত। তাদের গলে আগুনের মালা আর তাদের বস্ত্র অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত। আর ফিরিস্তারা তাদের শাস্তি দান ও ভর্ৎসনা করে চলেছে। মনে রেখো, সকল মানবীয় গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমি আবির্ভূত হয়েছি। অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিধ্বংসী নৃত্য সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্র ধ্বংসের জন্যেই আমার আবির্ভাব।

পারমাণবিক গুণ্ডামি ঃ আজ ইরান কাল সিরিয়া পরশু পাকিস্তান?

[প্রকাশ ঃ ২৪. ৯. ২০০৩ ইং]

জাতিসংঘের পরমাণু সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ইরানকে তার পরমাণু কর্মসূচীর ব্যাপারে ৩১ শে অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিয়ে ঘোষণা করেছে যে, এই মেয়াদকালের মধ্যে ইরানকে তার পরমাণু সংক্রান্ত সকল কর্মসূচী বন্ধ করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিটিকে তা বিনা আপত্তিতে তদন্ত করার অনুমতি দিতে হবে। পরন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তাকে একথা বলতে হবে যে, এই বিভাগের জন্যে সে কি কি বস্তু

www.pathagar.com

কি পরিমাণ কোত্থেকে সংগ্রহ করেছে? ইরানী প্রতিনিধি তখন এর প্রতিবাদে জাতিসংঘের এ সংক্রান্ত বোর্ড অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করেন। পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষকরা মত ব্যক্ত করেন যে, ইরান জাতিসংঘের পরমাণু সংক্রান্ত সংস্থার দাবী মোতাবেক কাজ না করলে তার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়বে।

আমেরিকা কি তার পশ্চিমা মিত্র এবং নিজের প্রভাবাধীন জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ইসলামী দুনিয়ার বিরুদ্ধে গুণ্ডামিতেই অবতীর্ণ হবে? এ প্রশ্ন আজ সঙ্গতভাবেই উঠছে। ইরানের ব্যাপারে তার উল্লেখিত ঘোষণা প্রকাশ্যে পারমাণবিক গুণ্ডামি ছাড়া আর কি হতে পারে? কারণ, পারমাণবিক অস্ত্র এবং এর বিস্তার একটি আন্তর্জাতিক গুরুতর সমস্যা। কিন্তু আমেরিকা এবং তারা পশ্চিমা মিত্ররা এ ব্যাপারে একমাত্র মুসলিম দেশগুলোকেই টার্গেট করেছে এবং তাদেরকে ফেলেছে উদ্বেগজনক অবস্থায়। পারমাণবিক অস্ত্রের উদ্ভাবক যেমন মুসলমানরা নয়, তেমনি এর বর্বরতাপূর্ণ ব্যাপক বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের অপরাধেও মুসলমানরা অপরাধী নয়। এই নৃশংস মহা অপরাধের কাজটির হোতাও আমেরিকাই। পরমাণু অস্ত্র আবিষ্কার করে আমেরিকাই গোটা মানব পরিমণ্ডলকে বিষাক্ত ও শংকিত করে তোলে এবং ৪০-এর দশকে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ব্যবহার করে মনুষ্য জাতির বিরুদ্ধে ভয়াবহ মারণাস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা মানবতার চরম অমর্যাদা ঘটায়। যার ভয়াবহ প্রভাব আজও সেখানে শিশু বিকলাঙ্গতার মধ্য দিয়ে সেই বর্বরতার স্মৃতি বার বার বিশ্ববাসীর চিত্তকে নাড়া দিয়ে থাকে।

পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের কাজটি কি ঢাকা-ছুপার কোনো ব্যাপার? আমেরিকা এ জন্যে নিজ দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে কি? ঐতিহাসিকভাবে তো এটাই জানাজানি যে, আমেরিকা এবং অন্য কয়েকটি পশ্চিমা দেশই ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচী বিস্তারে আগ্রহ দেখিয়ে আসছে। পাশ্চাত্য কতিপয় দেশই ইসরাইলে পারমাণবিক প্রযুক্তি স্থানান্তর করেছে। অতঃপর একে 'পারমাণবিক তথ্য চুরি'র অভিধায় আখ্যায়িত করে বিশ্ববাসীর চোখে ধূলা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারত ১৯৭৪ সালে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। কিন্তু ভারতের এই পারমাণবিক যোগ্যতা অর্জন প্রয়াসে না যুক্তরাষ্ট্র, না অপর কোনো পশ্চিমী রাষ্ট্রে এ নিয়ে কোনো প্রকার উদ্বেগ পরিলক্ষিত হতে দেখা গেছে। ইসরাইল গত ২০ বছর ধরে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। খোদ সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যানুযায়ী ইসরাইলের কাছে ১০০ থেকে ১৫০ শ'-র কাছাকাছি এটম বোমা রয়েছে। কিন্তু আমেরিকাকে ইসরাইলের এই পারমাণবিক যোগ্যতার প্রশ্নে আদৌ কিছু বলতে দেখা যায় না। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ভয়াবহ পারমাণবিক কর্মসূচী সম্পর্কে সম্প্রতি এক প্রামাণ্য ছবি প্রচার করেছে, যদিও বৃটিশ সরকারকে এর পরও ইসরাইলের কোনো সমালোচনা করতে দেখা যায়নি। ইসরাইলের কাছে যেমন আছে রাসায়নিক অস্ত্র, তেমনি তার কাছে জীবাণু অস্ত্রও প্রচুর। কিন্তু

www.pathagar.com

বোধগম্য কারণেই সেগুলোর প্রতি কারও নজর যায় না। ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশও পারমাণবিক যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু সেদিকে কেউ দেখেও যেন না দেখার ভান করে। কেবল মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধেই সকল প্রচার-প্রপাগ্যাণ্ডা এবং এর উপরই এ সংক্রান্ত সকল চাপ অব্যাহত। পাশ্চাত্য দুনিয়া পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচীর প্রতি নিজেদের শেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। তারা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে এর নাম দিয়েছে 'ইসলামী বোমা'। এ কর্মসূচীর বিজ্ঞানী ডক্টর আব্দুল কাদিরের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ইরাক পারমাণবিক কর্মসূচীর প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজও আরম্ভ করতে পারেনি, ইসরাইল হঠাৎ একদিন দস্যু তস্করের ন্যায় তার ওপর সরাসরি হামলা চালিয়ে ইরাকের সকল পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়েছে। পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনাসমূহের উপর কয়েক বারই হামলার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিলো। ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর থেকে তো পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচী বিরাট চাপের মুখেই রয়েছে।

এখন পাশ্চাত্য শক্তি আরেকটি মুসলিম দেশ ইরানকে টার্গেট করেছে। এ ব্যাপারে হম্বিতম্বিতে মনে হয়, তার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পদক্ষেপের সময় বোধ হয় বেশি দূরে নয়। পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো এ ব্যাপারে নানান পর্যালোচনা ও খবরা-খবর সামনে আনতে শুরু করেছে। ইরানকে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বার বার সতর্ক করা হচ্ছে। ইরাক হামলার প্রাক্কালের ন্যায় প্রচারণা চালানো হচ্ছে, পাকিস্তান ইরানে স্পর্শকাতর প্রযুক্তি স্থানান্তর করেছে। ইরান নাকি এতদূর এগিয়ে গেছে যে, ইসরাইল তো দূরের কথা, খোদ আমেরিকা-ইউরোপ পর্যন্ত ইরানের পারমাণবিক অস্ত্রের রেইঞ্জের মধ্যে এসে গেছে।

পারমাণবিক অস্ত্র গোটা বিশ্ববাসীর অস্তিত্বের প্রশ্নেই অতীব ভয়াবহ। নিরস্ত্রিকরণের দাবীটি হতে হবে বিশ্বজনীন। সেক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কতিপয় বৃহৎ শক্তির হাতে এটম বোম থাকবে আর অন্য কারও কাছে থাকতে পারবে না -- এরূপ মতলবি ও বৈষম্যমূলক দাবী মূলতঃ পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশসমূহ বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে 'এটমিক ব্লেক মিলিং'-এর শিকারে পরিণত করারই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই প্রশ্নে পশ্চিমা দুনিয়ার ভূমিকা হলো, আমেরিকা খোদ সিটিবিটিতে (পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি) দস্তখত করছে না, কিন্তু পাকিস্তানের উপর তার চাপ হলো — শিগগির এতে দস্তখত করো- আত্মহননের চুক্তিপত্রটি জলদি গলায় পরে নাও। ইরানের ব্যাপার হলো, পাশ্চাত্য দুনিয়া ইরানকে এখন এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে, ইরানের সামনে এখন দু'টি রাস্তাই খোলা আছে-একটি হলো, নিজের জাতীয় মর্যাদা ও পাশ্চাত্যের সামনে আত্মসমর্পণ করা অথবা তাকে 'পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি' থেকেই বের হয়ে আসা, যেমনটির ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছে উত্তর কোরিয়া। ইরানী নেতৃত্বে কেউ কেউ এমন রয়েছেন যারা মনে করেন, পাশ্চাত্যের সাথে একটা বুঝা-পড়া ও আপোস-রফার পথ গ্রহণ করা উচিত, যেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ভিত্তিতে

www.pathagar.com

বিষয়টি মিটমাট করা যায় অথচ এটি যে নিছক এক আত্মঘাতী চিন্তা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনটি কি করেই বা সম্ভব, বিশেষ করে সদ্য সংঘটিত বিভিন্ন স্থানের ভয়াবহ সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর প্রতি যদি কেউ লক্ষ্য দেয়, দেখতে পাবে যে, কতো মিথ্যা ও প্রতারণামূলক প্রচারণা দ্বারা এসব বিরাট ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এসব ঘটনার পরও ইরানী নেতৃত্ব কোন্ দিকে পথ বেছে নেয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচী বিরোধী পদক্ষেপের পর যে পাকিস্তানের পালা আসবে, এই বাস্তবতাও এখন আর রাখ-ঢাক কিছু নয়। আসলে আমেরিকা এবং তার পাশ্চাত্য দোসররা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী প্রমাণ করার জন্যে এতো উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তারা নিজেদের আস্তিনের ভিতরকার সন্ত্রাস ও উগ্রপন্থীদের দেখতে পাচ্ছে না। ইসরাইলী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তারা দেখে না। এছাড়া বড় প্রমাণ সুইডিশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যালান্ডের হত্যাকাণ্ড। তাকে রাজধানী স্টকহোম-এ অজ্ঞাত নামা এক ব্যক্তি ছুরি মেরে মারাত্মকভাবে জখম করে। তিনি সে সময় একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে সদাই করে ফিরছিলেন। পরে সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেন। নিহত মহিলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক অভিজ্ঞ, খ্যাতিমান রাজনীতিক এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এমনিভাবে পশ্চিমী জগত বিশেষ করে আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের বৈরিতায় এতোই অন্ধ হয়ে পড়েছে যে, পারমাণবিক বোমার অধিকারী ইসরাইলের ন্যায় নগ্ন সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আনীত নিন্দা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সে ভেটো প্রয়োগ করেছে।

মূলতঃ ইরান-পাকিস্তানকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য ভূমিকা সম্পর্কে যা আলোচনা করা হলো এবং তার পূর্বে আফগানিস্তান ও ইরাককে নিয়ে যা ঘটলো এবং এখনও ঘটছে, এই প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডই হচ্ছে গোটা মুসলিম দুনিয়াকে পদানত করার এক গভীর কর্মসূচীর অংশ। এই লক্ষ্যে– আলকুফরু মিল্লাতুন্ ওয়াহিদাহ্–"আল্লাহর অবাধ্য মানবতাবিরোধী সকল অপশক্তিই এক।"- সেই লক্ষ্যেই তারা মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি দেশ ইসরাইলের শক্তিবলয়ের অধীন আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। গত সপ্তাহের লেখার শেষাংশে এ ব্যাপারে কিছুটা ইঙ্গিতও দিয়েছিলাম যে, ইরাক এবং ঐ এলাকার তেল সম্পদ দখল, আরবদেরকে তাদের মজুরে পরিণত করা, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম কৃষ্টি-কালচার সেখানকার জনগণের অন্তর থেকে মুছে ফেলার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যেই তারা উপসাগরীয় এলাকার কয়েকটি দেশ ইসরাইলের আওতায় আনতে চাচ্ছে। ইসরাইলকে একটি বলিষ্ঠ অবকাঠামোর উপর বসানোই তাদের দুরভিসন্ধি। সংশ্লিষ্ট এলাকার মুসলিম দেশগুলো যেন তা বুঝেও কোন্ মস্তবড় ভুল বুঝা-বুঝির শিকার হয়ে আছে।

ইরাকে মার্কিন দখল মজবুত হবার পর এ সুবাদে ইসরাইলের সম্প্রসারণ পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক নিয়ে খোদ্ আরবী সংবাদপত্রেও বিস্তর আলোচনা আসছে, যা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং উদ্বেগজনক। এ ব্যাপারে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, অর্থের গোলাম কিছু ইরাকী দালালও এ মর্মে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থার জন্যে গোপনে কাজ

www.pathagar.com

করে যাচ্ছে। এ জন্যে তারা বাগদাদ নগরীর "হোটেল যাহরাতুল খালীজা" খরিদ করে তাকে মোসাদ-এর দফতর বানাবার চেষ্টায় আছে। তুর্কী ভাষার সিএনএন স্টেশন জানিয়েছে, মোসাদ ইরাকের কয়েকটি শহরে নিজ গোপন দফতর স্থাপন করেছে। যেমন, বাগদাদ, মোসেল, সোলায়মানিয়া। এ প্রত্যেকটি শহরই তুরস্ক, ইরান ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। বাগদাদের মধ্যবর্তী 'ইকাল' অভিজাত হোটেলটি ইতিমধ্যেই এক ইহুদী বহু মূল্যে কিনে নিয়েছে।

বাগদাদের পতনের পর ইহুদীরা ফোরাত উপকূলে উল্লাস করার লক্ষ্য এটাই। মার্কিন সৈন্যদের ছত্রছায়ায় বহু ইহুদী ইরাকে ঢুকে পড়েছে এবং ভিতর থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। কয়েকটি রহস্যপূর্ণ ভয়াবহ সন্ত্রাসী ঘটনাও ইতিমধ্যে ঘটেছে। সুতরাং ইরাক জয়ের পর ইসরাইলের স্বার্থে এ ব্যাপক ইহুদী-নাসারা চক্রান্তের প্রেক্ষিতেই ইরানকেন্দ্রিক বর্তমান পরিস্থিতি ও পাকিস্তানকেন্দ্রিক সম্ভাব্য আসন্ন ঘটনাবলীর প্রতি সারাবিশ্ব মুসলিমের সতর্ক দৃষ্টি রেখে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন অত্যাবশ্যক।

আরাফাতের বহিষ্কৃতি সকল আরব-নেতারই বহিষ্কৃতির সংকেত

[প্রকাশ ঃ ১৭. ৯. ২০০৩ ইং]

আরব ভূমির পরগাছা ইসরাইল ও তার মন্ত্রীরা ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাতকে তার নিজ জন্মভূমি ফিলিস্তীন থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মানবতার খুনী, সন্ত্রাসী ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন সম্প্রতি এই ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তার মন্ত্রিসভার অন্যতম খুনী উপ-প্রধানমন্ত্রী ইয়াহুদ অলমার্ট গত ১৪ই সেপ্টেম্বর আরাফাতকে খুন করার সংকল্পও প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বলেছে যে, শান্তির পথে বাধা হিসাবে দেখা দেওয়ায় ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করা যেতে পারে। ঐ দিনই তার এই ঔদ্ধ্যত্যপূর্ণ হুমকি রেডিওতেও প্রচারিত হয়। ইয়াহুদ অলমার্ট বলেছে, আমরা সন্ত্রাসের সব হোতাকে নির্মূল করার চেষ্টা করছি। আরাফাত ঐ হোতাদেরই একজন। এ বক্তব্যের জবাবে যেখানে আরাফাতের বক্তব্য হওয়া দরকার ছিল, "আমি আমার দেশেই আছি ও থাকবো। তোমরা পরগাছারা দখলদার অপশক্তি হিসাবে, তোমাদেরকেই আরব ভূমি থেকে বহিষ্কার হতে হবে", কিন্তু তিনি সেই জবাব দানে ব্যর্থ হয়েছেন। পরোক্ষে পরগাছাদের দাবী মানার মতো উক্তি করে বলেছেন, জীবন থাকতে ফিলিস্তিন ত্যাগ করবো না। মরলে এখানেই মরবো। তার পরবর্তী পর্যায়ে ইসরাইলী উপ-প্রধানমন্ত্রী তাঁকে হত্যার মাধ্যমে সরানোর কথা বলে। তার জবাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রধান ফিলিস্তিন আলোচক বলেন, কোনো দেশের সরকারের এই বক্তব্য হতে পারে না–এ ধরনের চিন্তা বা কাজ একমাত্র সন্ত্রাসী মাফিয়া চক্রেরই হতে পারে।

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পিছনে যেই সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র সক্রিয় ছিল, ইসরাইল ও তার প্রতিষ্ঠাতারা ইরাক জয়ের পর এখন নিজেদের সেই লক্ষ্যের কাছাকাছি এসে গেছে বলে মনে করছে। অন্যথায় তাদের মুখে এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ সন্ত্রাসী ভাষা উচ্চারিত হতো না। ইসরাইলের যারা আজ হর্তাকর্তা তারা নিজেরাই পরগাছা। ২য় বিশ্ব যুদ্ধের পর কেউ এসেছে যুক্তরাষ্ট্র, কেউ বৃটেন ও ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশ থেকে। বৃহৎ শক্তিবর্গের সহায়তায় আরবদের ভূমি জবরদখল করে তারা এখানে বসেছে। আন্তর্জাতিক সকল নীতি উপেক্ষা করে সন্ত্রাসী তৎপরতার মধ্য দিয়েই চরম দমননীতি ও হত্যালীলা চালিয়ে তারা এ পর্যন্ত এসেছে। আক্রান্ত আরব ফিলিস্তিনীরা তাদের পৈত্রিক ভিটামাটি উদ্ধারে এ যাবত যেই সংগ্রাম চালিয়ে আসছে এবং সহ্য করে এসেছে জুলুম-নিপীড়ন, সন্ত্রাসী ইসরাইল ও তার পৃষ্ঠপোষকরা তাদের সেই সংগ্রামকেই উল্টো সন্ত্রাসী তৎপরতা আখ্যায়িত করছে। বিশাল আরব ভূমিতে যেখানে সমুদ্রের খড়কুটার মতোই ইসরাইলের ভীতসন্ত্রস্ত থাকার কথা ছিল, সে ক্ষেত্রে 'চোরের মায়ের বড় গলা করে কথা বলার সাহস পাবার কারণ একটিই, আর তা হলো–আরব মুসলমানদের অনৈক্য ও ঈমানী চেতনা থেকে বিচ্যুতি হেতু তাদের দোস্ত-দুশমন চিনতে অজ্ঞতার পরিচয় দান নিজস্ব শক্তির উৎসকে তারা হেয় দৃষ্টিতে দেখেছে। আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের যথার্থ ব্যবহারেও তারা চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। নিজেদের যথার্থ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা তারা করেননি। সেসব শক্তির কুপরামর্শ ও মিষ্টি কথাতেই তারা অভিভূত হয়েছেন, যাদের চক্রান্তে আজ ফিলিস্তিনী নেতাসহ সেই দেশের শীর্ষ স্থানীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব শেখ ইয়াসিন, সেখানকার জনগণের প্রিয় সংগঠন হামাসের নেতাদেরকে হত্যার প্রকাশ্য ঘোষণা এসেছে। ক্ষুদে ইসরাইল যাদের শক্তি-সাহসের উপর ভর করে এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণা দিয়েছে, সে শক্তিটি উপরি উপরি নিজের বড়ত্বের মর্যাদা বজায় রাখার জন্যে লোক দেখানো দু'চারটি মুরব্বিয়ানা কথা বললেও তার ইঙ্গিত-ইশারা ও চক্রান্তেই যে মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, তা এখন সকলের কাছেই স্পষ্ট। এই শক্তিটি একদিকে আরবদেরকে "শান্তি ফরমুলার মুলা" দেখিয়ে দেখিয়ে এ পর্যন্ত এনেছে, অপরদিকে তলে তলে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য দখলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ইরাক, ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়া, সৌদি আরব এসব দেশ পর্যায়ক্রমে ইসরাইলের প্রভাববলয়ে আনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজই জোরে শোরে শুরু হয়েছে। রোড ম্যাপ, অমুক শান্তি ফরমূলা, তমুক আলোচনা বৈঠক, ইত্যাদি যে সম্পূর্ণ ভাওতাবাজি ছাড়া কিছুই ছিল না, ইসরাইলের সন্ত্রাসী খুনী নেতাদের আন্তর্জাতিক রীতিনিয়ম বিরোধী বর্বর হম্বি তম্বিই তার প্রমাণ।

শান্তি উদ্যোগের মূলা দেখিয়ে ইসরাইল ফিলিস্তিনী আরবদের প্রতিদিন হত্যা করে সেখানে গণহত্যা চালিয়ে গেলেও তাতে কারও টনক নড়েনা। বিশ্বমোড়লদের দৃষ্টিতে সেটা অন্যায় হয় না। এই চরম জুলুমের হাত থেকে রক্ষার সকল আইনগত ও কূটনৈতিক চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আত্মঘাতী পন্থায় এর প্রতিকারের জন্যে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেই সেটা সন্ত্রাসী তৎপরতা হিসাবে গণ্য হয়। এমন অবিচার

www.pathagar.com

মানব ইতিহাসে খুবই বিরল। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ইসরাইলের রাজধানী তেলআবিব ও জেরুসালেমে মাত্র ৬ ঘন্টার ব্যবধানে ফিলিস্তিনী ২টি আত্মঘাতী বোমা হামলায় কমপক্ষে ১৫ জন ইসরাইলী নিহত হওয়ার ঘটনাকে উপলক্ষ করেই ইসরাইল এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। কোনো ঘটনার পর কি প্রতিক্রিয়া হবে ইসরাইল এটা ভালো করেই জানে। তবুও ক্ষিপ্ত হবার প্রয়োজন এ কারণে যে, একে অজুহাত বানিয়েই যে তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে। সন্ত্রাসী শ্যারনের মন্ত্রিসভার কট্টরপন্থী সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরেই আরাফাতের বহিষ্কারের দাবী করে আসছে। এ ঘটনা দুটিকে সে দাবী বাস্তবায়নের নিমিত্ত হিসাবে কাজে লাগালো। শুধু তাই নয়, ইসরাইলী সংবাদপত্র "জেরুসালেম পোষ্ট" সপ্তাহ খানিকের মাথায় ফিলিস্তিনী হামলার বিষয়ে এক দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলেছে, "আমাদেরকে যতোটা সম্ভব হামাস ও ইসলামিক জিহাদ গোষ্ঠীর সকল নেতাকে হত্যা করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের অবশ্যই ইয়াসির আরাফাতকে হত্যা করতে হবে। এটা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদুর্বৃত্ত ছাড়া কোনো রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃত্বের পক্ষ থেকে এ ধরনের বর্বরতাপূর্ণ উক্তি করার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই কম। কোথাও এরূপ বর্বর গোষ্ঠী কোনো দেশের শাসন ক্ষমতায় আসলেও সেখানে তাদের অবস্থান বেশী দিন ছিল না, বরং চরম পরিণতি বরণ করেই ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ইসরাইলের ন্যায় একটি ক্ষুদে রাষ্ট্র যা ভৌগোলিক ও জনসংখ্যার দিক থেকে বিশাল বিশাল আরব রাষ্ট্রের তুলনায় চুনিপুঁটি তুল্য। তার এ জাতীয় বড় বড় কথা ও আস্ফালন থেকে এটাই স্পষ্ট যে, তার নেপথ্যে যারা এই অপশক্তিকে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে, সেই শক্তি আরও বড় সন্ত্রাসী এবং মানবতার বড় দুশমন। অন্যথায় যেই ইসরাইল নিজেরা সন্ত্রাসীর মাধ্যমে ফিলিস্তীনে অব্যাহত গণহত্যা চালিয়ে আসছে, সেই অপশক্তি নিজের অপরাধ স্বীকার করে মূল সমস্যার সমাধানে না গিয়ে কি করে আরও বড় সন্ত্রাসী ঘটনার হুমকি দিতে পারে?

আরাফাত এবং ফিলিস্তিনী অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে বহিষ্কার ও পরে হত্যার ঘোষণা দেয়ার অর্থ যে কত ভয়াবহ ইঙ্গিত, বিশাল আরব ভূমির বিভিন্ন নেতা তা কতদূর উপলব্ধি করছেন, আমরা জানি না। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সন্ত্রাসী ইসরাইল ও তার নেপথ্যের মহাসন্ত্রাসী পৃষ্ঠপোষক যে মধ্যপ্রাচ্যে ইতিহাসের এক মহাঅঘটন ঘটিয়ে গোটা মুসলিমবিশ্বকে তাদের পদানত করতে চায় এবং তার সকল সম্পদ লুট করার মহাপরিকল্পনা সক্রিয়, সেই লক্ষ্যেরই এটি এক মহা হুঁশিয়ারী। এমনটি হলে প্রত্যেক আরব নেতা ও তার আশপাশের সকল মুসলিম শাসককেই একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আরাফাত, শেখ ইয়াসীন গং ফিলিস্তিনী নেতৃবৃন্দের এই বহিষ্কার ও হত্যা পরিকল্পনা মূলত সকল আরব নেতার বহিষ্কৃতি ও হত্যারই মহা সংকেত। অন্যথায় আরব ভূমির পরগাছা ইসরাইল তার ছোটমুখে এত বড় ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ সন্ত্রাসী হুমকি দানের সাহস কি করে দেখাতে পারে? ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিন হামলার পেছনে বহুমুখী উদ্দেশ্য সক্রিয় রয়েছে।

www.pathagar.com

আরব দুনিয়াকে নিজেদের পদানত করার স্বপ্ন ইহুদীদের বহু পুরাতন। এ জন্যে তাদের প্রস্তুতিও অনেক দিনের। এ লক্ষ্যে তারা নেটওয়ার্ক তৈরী করে আসছে অনেক আগে থেকেই। হালে ভারতেও সে তার প্রভাব বিস্তারের কাজ প্রায় সম্পন্ন করেছে। আজকের দিনের বৃহৎ শক্তিরূপে আবির্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের উপর এ লক্ষ্যে আগে থেকেই ইসরাইল নানানভাবে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। বুশ প্রশাসনের বহু আগে থেকেই সে তার এই প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট। ইসরাইলী ষড়যন্ত্রে প্রভাবিত বুশের আমলে তার অন্যান্য সমমনা যোগ্য দোসরদের পেয়ে নিজ লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে এ সময়কেই সে উপযুক্ত মনে করেছে। ইতিপূর্বে আফগান দখল, তার পরপরই ইরাক এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনের নামে পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম, অমুসলিম শক্তিকে নরম-গরম আচরণে সঙ্গী বানিয়ে সহজে বাজিমাত করার এ অবস্থাই তাদেরকে কথিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে উদ্বুদ্ধ করছে বলে মনে হয়।

উল্লেখ্য, যেই বহুমুখী লক্ষ্যে ইরাকের উপর হামলা করা হয়েছে, সেগুলোকে তিনটি প্রধান খাতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন–(১) ইরাকের তেল এবং এর সম্পদ কুক্ষিগত করা ও ইহুদী-নাসারা গোষ্ঠীর স্বার্থে সে সম্পদের বন্টন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে আরবদেরকে নিজেদের গোলাম বানানো, তাদেরকে কুলি-মুজুরের ন্যায় খাটানো, তাদের উন্নত মাথাকে অবনমিতকরণ ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে সার্বিক দিক থেকে তাদের দারিদ্র্যবোধ এবং অসহায়ত্বকে নিশ্চিতকরণ।

(২) গোটা উপসাগরীয় এলাকার মানচিত্রকে নতুন করে তৈরী করা, যেন এরপর মার্কিন ইসরাইলের ইহুদী-নাসারাদের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে আর কোন প্রতিবন্ধকতাই অবশিষ্ট না থাকে। এই নতুন নীল-নকশায় শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহ্যিক কাঠামোর বিকৃতিসাধনও শামিল রয়েছে।

(৩) ইহুদীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং পরে ইহুদীবাদের প্রভাবিত অনুগত দাস মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরবদেরকে "নতুন পরিস্থিতি" মেনে নেয়ার জন্যে বাধ্য করা ও দাজলা-ফোরাতের মধ্যবর্তী সুবিশাল এলাকায় বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র বিস্তারের মাধ্যমে ইহুদীবাদী নীল-নকশা বাস্তবায়ন করা।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা জরুরী

[প্রকাশ : ৪. ৬. ২০০৩ ইং]

নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার সচেতনতা ও নারী কর্মসংস্থান এখন অতীতের তুলনায় অনেক বেশী। নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখন সংসারে নগদ পয়সা আয় করে। দেশের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিভাগে এমনকি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দায়িত্বও নারীরা আজকাল পালন করছে। কিন্তু সে তুলনায় আমাদের দেশে নারীদের জীবনে যেই নিরাপত্তা থাকার কথা ছিল, তা অনুপস্থিত। বরং নারীদের কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতির সাথে সাথে তাদের নিরাপত্তাহীনতার পরিধিরও যেন বিস্তৃতি ঘটে চলেছে।

www.pathagar.com

সাধারণ নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্নে যেমন দেখা যায়, নারীদের উপর এসিড নিক্ষেপসহ অনেক জুলুম-নিপীড়ন সংঘটিত হয়ে থাকে, তেমনি তাদের সম্ভ্রম রক্ষার প্রশ্নটিও হুমকির সম্মুখীন। বিশেষ করে কর্মজীবী মহিলাদের সম্ভ্রম নিরাপত্তার সমস্যাটি অতি প্রকট আকার ধারণ করেছে। এমনকি খোদ ভোগবাদী জীবন দর্শনের অনুসারী পাশ্চাত্য সমাজে পর্যন্ত নারী সম্ভ্রমবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে আজ সেই সমাজের মেয়েরা স্বোচ্চার। নারীকেন্দ্রিক বেলেল্লাপনার জন্যে বিশ্ববিখ্যাত বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিকে পর্যন্ত ঐ সমাজের মেয়েরা বহু নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমাদের নারী নেতৃত্বাধীন দেশের কর্মজীবী মহিলারা একশ্রেণীর লম্পট বস ও কারখানা মালিকের ঘৃণ্য আচরণে অসহায় জীবন-যাপন করছে। অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে নানান নোংরামির। গত ২৯শে আগস্ট এ মর্মে দৈনিক সংগ্রামের প্রথম পৃষ্ঠায়–"কর্ম ক্ষেত্রে মেয়েদের নানা সমস্যা" শীর্ষক রিপোর্টটিতে তারই এক করুণ ও ন্যক্কারজনক ছবি ফুটে উঠেছে। রিপোর্টটিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কয়েকজন মেয়ের বক্তব্যের যেই উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, তার কয়েকটি এ রকম–যেমন, শিল্প-কারখানার রিসিপশনিস্ট একজন বলেছেন, মেয়ে হিসাবে এই পেশা সংবেদনশীল। কারণ, চাকরি থাকা না থাকা নির্ভর করে বসের খেয়াল-খুশীর ওপর। সুতরাং তাঁর সাথে 'মন রাখা' গোছের আচরণ করতেই হয়। অফিস আওয়ারের পরেও অনেক সময় অফিসে থাকতে হয়। এরূপ ঘটনা নিজের জন্যে মর্যাদাহানিকর জেনেও কিছুই করার থাকে না। আরেক মেয়ে নাইট শিফট নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। নারীদের জন্যে নাইট শিফট না থাকারই সে পক্ষে। তার বক্তব্য অনুযায়ী, গার্মেন্টিসে যে সব পুরুষ সুপারভাইজার নাইটে থাকে, তাদের দ্বারা সে নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। কিন্তু চাকরি হারানোর ভয়ে মুখফুটে কিছু বলতে পারে না। তেমনি চাতালে কর্মরত উত্তরাঞ্চলের এক মেয়ে শ্রমিকের বক্তব্য হলো, চাতালেই নাকি তাদের রাত্রে থাকতে হয়। তাই মালিকের মনোরঞ্জন না করে উপায় থাকে না। আপত্তির সাহস পায় না এ জন্যে যে চাকরি গেলে মাথা গুঁজার কোনো ঠাঁই নেই। এমনিভাবে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যেসব নারী কর্মচারী রয়েছে, তাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিলে হয়তো কর্মস্থলে নারী সম্ভ্রমবিরোধী এর চাইতেও আরও বহু জঘন্য তথ্য সামনে আসতে পারে। যেগুলো থেকে নারী সম্ভ্রমবিরোধী ন্যক্কারজনক ঘটনাবলীর বিচিত্র তথ্য সম্পর্কে জানা যাবে।

সমাজের বিভিন্ন শিক্ষিত মহিলা আজকাল পুরুষদের অনুরূপই সরকারী-বেসরকারী অফিসে চাকরির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তারা এসব চাকরিতে নিয়োগ পান। এছাড়া নদী শিকস্তি, ভূমিহীনতা, অভিভাবকহীনতা, স্বামী পরিত্যক্তা হওয়া নারীরা ছাড়াও স্বাভাবিক নানান কারণে একশ্রেণীর মেয়ে নিজের ও পরিরবারের বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হয়ে চাকরি করে থাকে। কিন্তু নিজেদের কর্মস্থলে যদি তাদের চাকরি ও মানসম্ভ্রমের নিশ্চয়তা না থাকে, তাহলে এর চাইতে লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। বিশেষ করে দীর্ঘদিন থেকে নারী নেতৃত্বাধীন একটি দেশের চাকরিজীবী নারীদের চাকরি কিংবা কর্মস্থলের এরূপ কলুষিত পরিবেশ খুবই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়।

www.pathagar.com

আমাদের এই দেশ পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সমাজের মতো নয়। যেখানে এসব আচরণ সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টি থাকলেও সেখানে পর্যন্ত আজ নারী সম্ভ্রমবিরোধী এরূপ নোংরামি আচরণকে বিবেকবান নারীরা মানবাধিকার বিরোধী বলে গণ্য করতে শুরু করেছে। এরূপ আচরণের প্রতিবাদে পশ্চিমের কোনো কোনো দেশে কর্মজীবী নারীরা প্রকাশ্যে মিছিল পর্যন্ত বের করে থাকেন। যেমন অবাধ নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির দেশ খোদ বৃটেন, যেখানে একসময় নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার অবাঞ্ছিত ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতিসমূহকে উপেক্ষা করা হতো আর তার দেখাদেখি অন্যান্য পাশ্চত্য সমাজেও একই দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য চলেছিল, সেই সমাজের নারীরাও এখন ঐসব ন্যক্কারজনক কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করেছে। এটা নিছক কথার কথা নয়, গত ৮ই সেপ্টেম্বরের কাগজেও এ মর্মে তথ্য রয়েছে যে, বৃটিশ সেনাবাহিনীর এক মেজরকে তার যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় স্বেচ্ছায় অবসর নিতে হয়েছে। অতঃপর অবসর সুবিধা হিসাবে এককালীন ৮০ হাজার এবং বার্ষিক এক হাজার ৬শ পাউন্ড অর্থ তার পাওনা। ৩৯ বছর বয়সী এই সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তিন তিনটি যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। এর পরই তাকে অবসরে যেতে হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এই চরিত্রহীন সেনা কর্মকর্তা চাকরি থেকে অবসর নিলেই কি তার অপরাধের সাজা হয়ে গেল? কিংবা হওয়া উচিত? তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই বিখ্যাত ধর্ষণ ঘটনার শিকার লিউনস্কির মতো বৃটেনের যেসব নারীর ঐ সেনা অফিসার দ্বারা সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়েছে, যৌননিপীড়নের শিকার সেই মহিলারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তারা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, এটা খুবই অন্যায় কথা যে, একজন লোক নারী জাতির মর্যাদা হানির ন্যায় ঘোরতর অপরাধ করেও বিনাবিচারে "ফুল বেনিফিট" পেয়ে চাকরি থেকে অবসর নেবে বা তাকে অবসর দেয়া হবে, এ অন্যায় কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না। যৌন অপরাধী সেনা অফিসারের বিরুদ্ধে বৃটেনের উক্ত নারীদের এই কঠোর ও ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে আগামী ফেব্রুয়ারীতে সেই সেনা কর্মকর্তাকে আদালতে হাজির করা হবে বলে সূত্র জানিয়েছে। আইনগত কারণে আপাতত উক্ত মেজরের নামটি গোপন রাখা হয়েছে। নিপীড়িত মহিলারা নাকি ঐ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ঐ তারিখেই আদালতে অভিযোগটি বিস্তারিতভাবে পেশ করবেন। সেক্ষেত্রে একটি মুসলিম দেশে এরূপ কর্মজীবী মহিলাদের এহেন করুণ অভিযোগ যাতে না উঠতে পারে, কর্মস্থলের পরিবেশ ও নিয়ম-বিধি সে রকমই থাকা জরুরী ছিল। কিন্তু তাতো নেইই, পরন্তু চাকরির নিশ্চয়তা না থাকায়, কর্মজীবী মহিলাদের নিজ-ইচ্ছা বিরোধী ও অপমানকর কাজে বিনা উচ্চবাচ্যে সব মাথা পেতে নিতে হয়। বিশেষ করে পোশাক শিল্পের যেই মেয়েদের কষ্ট-পরিশ্রমের ফলশ্রুতি দ্বারা জাতি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে, সেই কর্মজীবী মেয়েরা হোক কিংবা অন্যকোনে সাধারণ সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সর্বত্রই মেয়েদের চাকরির নিরাপত্তা এব মানসম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের একান্ত কর্তব্য বলে আমরা মনে করি

www.pathagar.com

অন্তত একটি মডারেট মুসলিম দেশ হিসাবে সারাবিশ্বে মহিলা নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের এই আদর্শ স্থাপন করা উচিত যেন এদেশের শিক্ষিত মহিলারা রন্ধনশালার বাইরে দায়িত্ব পালনকালেও নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের সাথে সাথে ধর্মীয় নৈতিকতা, চারিত্রিক পবিত্রতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও নিজেদের মানসম্ভ্রম সব কিছু রক্ষা করে চলার মতো ব্যবস্থা এখানে নিশ্চিত থাকে।

স্মরণ রাখা দরকার যে, চাকরিক্ষেত্র হোক বা অন্যত্র, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সমাজের অন্ধানুসরণে মুসলিম-অমুসলিম সমাজে কেউ তেমন প্রকৃত শান্তির মুখ দেখেনি। কেননা, ইসলাম একটি প্রকৃতিসম্মত ধর্ম। ইসলামী বিধান ও মূল্যবোধবিরোধী জীবনাচার গ্রহণ মূলত প্রকৃতিবিরোধী কাজ করা, যাতে কিছুতেই সফলকাম হওয়া যায় না। প্রকৃতিরই দাবী হলো, যেসব নারীর জীবনোপকরণের অপর কোন পথ নেই, সেসব নারীর কর্মস্থল ও কর্মপরিমণ্ডল এমন হওয়া উচিত, যাতে তাদের সকল প্রকার অধিকার পুরোপুরি সংরক্ষিত থাকে। একারণেই এই ব্যবস্থাকে ইসলামে অপরিহার্য করা হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ প্রকৃতিবিরোধী এই ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে শুধু নিজেদের সমাজেরই সর্বনাশ করেনি, তাদের দীর্ঘদিনের প্রভাব বলয়ের অন্যান্য সমাজেরও ক্ষতি করেছে। এখন তাদের মধ্যেই যেখানে এর ক্ষতিকর দিকটি আপত্তিকর মনে হচ্ছে এবং এসবকে অপরাধ গণ্য করে এর শাস্তি দাবী করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তো মুসলিম সমাজের এ ব্যাপারে আরও দ্রুত এগিয়ে আসা উচিত। তেমনি প্রসঙ্গত বলতে হয়, পাশ্চাত্য সমাজের নারীরা পর্যন্ত যেখানে নারীসম্ভ্রম বিনষ্টে প্রতিবাদেও তা রক্ষায় স্বোচ্চার, সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের নারী সংগঠনগুলোকে এ ব্যাপারে সে তুলনায় নিজেদের স্বকীয়তা, জীবনাদর্শ ও ধর্মীয়মূল্যবোধ রক্ষায় সক্রিয় ও স্বোচ্চার দেখা যায় না। তারা নারী অধিকার নিয়ে কখনও স্বোচ্চার হলেও সেখানে আপন স্বকীয়তা ও ধর্মীয়মূল্যবোধ রক্ষার দিকটি অনেক ক্ষেত্রেই গৌণ থাকে। তাদের এটা জানা উচিত যে, মুসলিম নারীরা নিজেদের ধর্মীয়মূল্যবোধ বজায় রেখেই ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, যদিও সেগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন ও চর্চা খুব কমই হয়েছে। সময়ের বিবর্তনের প্রেক্ষিতে নিজেদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রেখে কি করে জীবন সংগ্রামের এই প্রতিযোগিতাশীল বিশ্বে বাস করা যায়, এখন মুসলিম নারীদেরকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির এই মোকাবেলার মনোভাব ও আদর্শিক দৃঢ়তা নিয়েই গড়ে উঠতে হবে। সময়ের কঠোর বাস্তবতা সকল সময় এক থাকে না। বর্তমান বাস্তবতা যা উপেক্ষা করা যায় না, তাকে সাথে নিয়েই নিজেদের ঈমানী চেতনা বজায় রেখে সমাজে এগিয়ে যেতে হবে। নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে অন্যায় অসুন্দর ও যাবতীয় কুলুষতার বিরুদ্ধে নারীদেরও সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু সামগ্রিক এই চেতনা না থাকায় এবং বর্তমানে দেশে নারী নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও এখনও সামাজিক ও কর্মস্থলগত পরিবেশ নারী উপযোগী না হওয়ায় দেশে নারীদের কষ্ট ও পরিশ্রমের যেমন শেষ নেই, তেমনি তাদের নিরাপত্তারও তীব্র অভাব। সমাজের কর্মজীবী মহিলাদের কর্মস্থলে যাতায়াতের সমস্যাটির পর্যন্ত এখনও সমাধান হয়নি। ফলে তাদের যাতায়াতের দুর্গতির দৃশ্য এদেশে নারী অধিকার সম্পর্কিত

www.pathagar.com

বক্তব্যদাতাদের যেন বিদ্রূপই করে চলেছে।

আজকের মুসলিম নারী সমাজকে জীবনের বাস্তবতার দাবী পূরণ করতে গেলে পশ্চিমের ভোগবাদী জীবন দর্শনের অনুসারী হতে হবে–এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে হবে। যা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এক শ্রেণীর তথাকথিত আধুনিকা প্রগতিবাদী মহিলারা পেশ করেন। বরং নিজস্ব স্বকীয়তা ও ধর্মীয়মূল্যবোধ রক্ষা করেই যে জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের কঠোর বাস্তবতার মোকাবেলা করা যায়, সেই দৃষ্টান্তই তাওহিদীজনতার এই দেশের নারীদের স্থাপন করতে হবে। আর রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমাদের নারী নেতৃত্বকেও এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই নারী কল্যাণে এগিয়ে আসা কর্তব্য। মুসলিম নারীদের প্রশ্নে বর্তমান মিসরের হীনমন্যতাগ্রস্ত অনুসৃত নীতি সকল দেশের মুসলিম নেতাদের পরিহার করা উচিত। মিসরীয় নেতৃত্ব পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী শক্তিকে খুশি করার জন্যে টেলিভিশনে বোরকা নিষিদ্ধ করেছে। বহির্বিশ্বে নিজেকে এবং পশ্চিমা মনোভাবাপন্ন ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে মিসরীয় নেতারা উঠে পড়ে লেগেছেন। দেশ শাসনে শাসনতান্ত্রিকভাবে ইসলামী শরীয়া আইন স্বীকৃত হলেও পশ্চিমাদের কাছে নিজেদেরকে উদার মানসিকতাসম্পন্ন বলে প্রমাণ করতে অঘোষিতভাবেই বোরকা ব্যবহারকারী উপস্থাপিকাদের টিভির পর্দায় নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামী অনুশাসন অনুকরণ করে পর্দাপ্রথা মেনে চলাই ছিল উপস্থাপিকাদের 'অপরাধ'। এতে বোরকা ব্যবহারকারী প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। তারা জানিয়েছেন, রাষ্টনিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনের এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তারা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা চিন্তা করছেন। ইসলামী প্রথানুসারে পোশাক ব্যবহারের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই মিসরে বিতর্কিত। সাম্প্রতিক সময়ে মিসরের মহিলারা অধিক হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। ফলে এ বিতর্ক আরো জোরদার হয়েছে। টিভি উপস্থাপিকারা বলেছেন, তাদের পোশাক পরার মতো ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো আলোচনাই করেননি। তারা বলেছেন, পর্দা বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায় তেমন ধরনের আপাদমস্তক ঢেকে তারা পর্দা করেন না। অর্থাৎ তারা যেটা করেন সেটা দৃষ্টিকটু নয় বরং নারীমর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

পরকাল বিমুখ ভোগবাদী জীবনদর্শন ও জীবনাচার গ্রহণের দ্বারা মানব সমাজকে বিপদগ্রস্ত ও অশান্তিময় করা ছাড়াও ইসলামী জীবনাচার, মূল্যবোধ, রীতি-নিয়ম, কৃষ্টি-কালচার বজায় রেখে শান্তিময় আধুনিক সমাজ সংগঠন সম্ভব। বর্তমানে তুরস্ক, মিসর, ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন আধুনিক মুসলিম সমাজের নারীদের মধ্যে এই নতুন চেতনা ও উপলব্ধি জোরদার হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর সেখানকার উচ্চশিক্ষিত নারীদের ইসলামী আচার-আচরণ ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ জীবনধারা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সাংবাদিকতায়, রাজনীতিতে ও সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন অফিসে, কলকারখানায় ধর্মীয় সবকিছুতেই পর্দা রেখে তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষমতাই মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের আধুনিক শিক্ষিত নারীদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রাখার এই নবজাগরণকে উদ্দীপিত করছে। এ ব্যাপারে তাদের

www.pathagar.com

করে তুলছে আত্মপ্রত্যয়ী। খোদ্ চিত্তবিনোদনের সর্বাধুনিক মাধ্যম চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ইরানের উচ্চশিক্ষিত আধুনিক মহিলারা ইসলামী পর্দাপ্রথায় তাদের ঐতিহ্যবাহী কালো বোরকা ধারণ করেও এব্যাপারে স্বার্থক ও মানোন্নীত যেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে বিরাট প্রভাব ফেলেছে।

ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনাসমৃদ্ধ আমাদের আধুনিক শিক্ষিত মহিলারা যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই ভাবধারা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন, তাতে মানব সমাজে দেহ-আত্মার সম-উন্নতি সমৃদ্ধ কাঙ্ক্ষিত বিপ্লব মানব জাতিকে মর্যাদার এক উচ্চশিখরে নিয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। তবে শর্ত হলো, প্রতিটি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বকে মিসরীয় এবং তুর্কী সেনা মানসিকতার অনুরূপ স্বকীয় আদর্শের ব্যাপারে হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হতে হবে। নারীদের যারা কলকারখানা, অফিস, আদালত তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করবে, তাদের সার্বিক নিরাপত্তা ও যোগ্যতার বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। তাদেরকে পশু চরিত্রের বিকৃতধারার কলুষিত পুরুষ মানসিকতা ও এর নষ্টামি থেকে দূরে রেখে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াবার সুযোগ দিতে হবে। সুতরাং মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে বিভিন্ন অফিস, কলকারখানা বিশেষ করে পোশাক শিল্প কারখানাসহ যেখানে যেখানে একশ্রেণীর বিকৃত রুচির পুরুষ কর্তৃত্বের কারণে নারীদের যোগ্যতার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদের সম্ভ্রমবিরোধী পরিবেশ-প্রবণতা রয়েছে, সেখানে তাদের অর্থনৈতিক, পেশাগত, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও মানসম্ভ্রম রক্ষার সার্বিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সরকারের এগিয়ে আসা কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিদেশী কোনো ভ্রান্তদৃষ্টিভঙ্গি বা নেতৃত্বের হীনমন্যতা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হোক, এটাই সকলের কাম্য।

আজকাল অর্থের লোভে বিভিন্ন হোটেল, অভিজাত আবাসিক এলাকা, চিত্তবিনোদন ও প্রচার মাধ্যম এবং পণ্যের বিজ্ঞাপনসহ নানান প্রকার প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করে একশ্রেণীর বিকৃত রুচির মহিলা যেসব কর্মকাণ্ডের দ্বারা দেশের নারী সমাজের মর্যাদাহানি করে চলেছে, তাদের বেলেল্লাপনা ও অসামাজিক কর্মতৎপরতা শিক্ষিত রুচিশীল মহিলা সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করে রাখছে। এসব নোংরা অপতৎপরতাও রোধ করা সরকারের কর্তব্য। নারী সংগঠনগুলোর এদিকে নজর দেয়া উচিত।

শ্বেতপত্রের সব দুর্নীতির বিচার না হওয়াতেই দুর্নীতি উৎসাহ পাচ্ছে

[প্রকাশ ঃ ৪. ৬. ২০০৩ ইং]

কারও প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সমর্থনের একটি সংগত কারণ থাকে। সেই গুণগত কারণ চলে গেলে তখন আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দলের প্রতি সেই সম্মান-শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সমর্থন থাকে না। তখন সমর্থিত ব্যক্তি বা দলও তা দাবী করার নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলে। দাবী করলেও তাতে কোনো কাজ হয় না। একারণে সকল সময়

www.pathagar.com

এসম্পর্কিত অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর্তব্য। কিন্তু এটাও ইতিহাসের আরেক বাস্তবতা যে, স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চায় না। যখন বিপর্যয় দেখা দেয় তখন শিক্ষা নিতে চাইলেও তাতে ব্যর্থ হতে হয়। বিশেষ করে আমি এখানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন দলের আকাশচুম্বী জনসমর্থন আবার জনগণ দ্বারা তার প্রত্যাখ্যাত হবার কথাই বলতে চাচ্ছি।

১৯৫৪ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন। ক্ষমতায় বসা মুসলিম লীগ সরকার। বিরোধী দলীয় ফ্রন্ট গঠিত হলো শেরেবাংলা একে ফজলুল হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক পার্টি, মাওলান ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী মুসলিম লীগ, মাওলানা আতাহার আলী সাহেবের নেজামে ইসলাম পার্টি ও মাহমুদ আলীর গণতন্ত্রী দল ও আবুল হাসিম ও অধ্যক্ষ আবুল কাসেম সাহেবদের খেলাফতে রাব্বানী পার্টির সমন্বয়ে। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ইংরেজ শাসন থেকে দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার আন্দোলনকারী দল হিসাবে দেশবাসীর প্রতি তাদের অবদান বিরাট। তাই নির্বাচনে তাদের বলার অনেক কিছু থাকবে এটাই স্বাভাবিক। মুসলিম লীগ একেতো স্বাধীনতার জনক দল, দ্বিতীয়ত ক্ষমতাসীন হিসাবে তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয়ী হওয়া বড় কঠিন হবে বলে অনুভূত হলো। কারণ, গোটা দেশের মানুষই যেই দলের সমর্থক ছিল, নির্বাচনে সেই দলের সমর্থক ছুটে গিয়ে বিরোধী দলে যোগ দিলেও আর কত যোগ দেবে? ৩শ' আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ সব কয়টি না পেলেও দুই-তৃতীয়াংশ তো তাদের থাকবেই। অপরদিকে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কিছু আসন পেলেও বিরোধী দলের ব্যাঞ্চে বসার উপযোগী আসন তারা পাবে। কিন্তু মুসলিম লীগের এই হিসাব সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণিত হলো। ৩শ' আসনের মধ্যে তারা পেলো মাত্র ৯টা আসন।

৫৪-এর সাধারণ নির্বাচনে ৪৭-এর স্বাধীনতার জনক দল মুসলিম লীগের মারাত্মকভাবে ভরাডুবি ঘটার ব্যাপারটি মামুলি ছিল না। এর অর্থ দাঁড়ালো, ভারত বিভক্তির মধ্য দিয়ে মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্রের প্রচণ্ড বিরোধী হিন্দু নেতৃত্ব এবং ইংরেজের সাথে সংগ্রামে সারা দেশের মানুষ এক বাক্যে যেই দলটির প্রতি সমর্থন দিয়েছিল, নির্বাচনে বাংলাদেশ (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান)-এর জনগণের স্বল্পসংখ্যক বাদে সিংহভাগ মানুষই রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে সেই দলটির উপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল। দলটির নেতৃত্বের প্রতি জানাল অনাস্থা।

কিন্তু যেই দলটির নেতৃত্বে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ৪৭-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণ সমবেত হয়েছিল, সেই দলটির প্রতি মাত্র ৭ বছরে মানুষ কেন এত বিরক্ত হলো যে, ৩শ' ভাগের মধ্যে ২৯১ ভাগ সমর্থন দলটির উপর থেকে প্রত্যাহৃত হলো? কারণ আর কিছু নয়, সেটা হলো জনগণের যে সব স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে তারা ক্ষমতায় গিয়েছিল, সেসব স্বার্থ রক্ষায় তারা ব্যর্থ হয়েছিল। একইভাবে ৭১-এর স্বাধীনতার জনক দল আওয়ামী লীগের আকাশচুম্বী জনসমর্থনে ৭৫ সালে জিরোতে এসে যাওয়া, যা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি নিমিত্ত ছিল, তারও

www.pathagar.com

কারণ একই ছিল। তারপর পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হবার পরও ৯১-এর নির্বাচনে সেই সমর্থন থেকে বঞ্চিত হওয়া, -এই সব কিছুর পেছনে কারণ সেই একটিই আর তা হলো, জনগণ যেই বুকভরা আশা-ভরসা নিয়ে নির্বাচনে দলটিকে সমর্থন দিয়েছিল, তারা ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের ঐসব আশা-আকাংখার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। এই গরীব দেশের জনগণের স্বার্থরক্ষার প্রতি উদাসীনতা দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রতিই বেশী মনযোগী হয়ে পড়েছিলেন। পরন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন ও নির্বাচনে জনগণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে জনগণও তাদের ভুলতে শুরু করে। বিশেষ করে জনগণ নিজেদের চাহিদা অপূর্ণ থাকার ব্যাপারটি নিয়ে যত না ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়, তার চাইতে অধিক ক্ষিপ্ত হয়ে যখন সরকারের অনেককে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে দুর্নীতিতে লিপ্ত হতে দেখে এবং পত্র-পত্রিকায় শত সমালোচনা সত্ত্বেও তা সংশোধনে উদাসীন থাকে।

জোট সরকার ২০০১-এর নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসার আগে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এমন এক অবস্থায় জনগণ অতিবাহিত করছিল, যা ছিল বর্ণনাতীত। সেই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার জন্যই মানুষ ঐক্য জোটের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করে। তারা বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গঠিত এ জোট সরকারকে একটি সাধারণ সরকার মনে না করে একে একটি সংস্কারক সরকারের মর্যাদায় দেখে আসছে। তারা প্রত্যাশা করেছিল, অতীত সরকারের সৃষ্ট সকল দুর্নীতি কলুষতা থেকে দেশ ও সমাজকে পবিত্র করে এ সরকার বাংলাদেশকে একটি যথার্থ কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করবে। নিজেদের নির্বাচনী ওয়াদাসমূহ যথাযথ পূরণ করবে। তাদের ক্ষমতা গ্রহণের সময় দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসাবে বিদ্যমান ছিলো বিগত সরকার কর্তৃক সৃষ্ট জাতীয় অর্থনীতিকে অগুছালো অবস্থা থেকে গুছানো এবং সমাজে বিরাজমান সন্ত্রাস দমন। সে ব্যাপারে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যা করেছে, তাতে জনগণ যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করছিলো। এই সাথে রাজধানী ঢাকার দূষিত পরিবেশ দূরীকরণ, পরিবহন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবং এখানকার মানুষের প্রাত্যহিক দুঃখ যানজট দূর করার লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা হিসেবে নগরীর বিভিন্ন স্থানে ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজে হাত দেয়া (যার সুফল পেতে হয়তো আরও অপেক্ষা করতে হবে)-এগুলো নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

এই সাথে দেশ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ এবং অতীত শাসনামলে যারা অকল্পনীয় দুর্নীতির দ্বারা দেশের জাতীয় অর্থ ভান্ডার শূন্য করেছিলো, তাদের সেসব অপরাধ-অপকর্মেরও শ্বেতপত্র এ সরকার প্রকাশ করেছিলো। তাতে জনগণ স্বাভাবিকভাবে এটাই আশা করেছিল যে, এবার হয়তো দেশ থেকে দুর্নীতি শিকড়সহ উৎপাটিত হবে। সরকারও তার নির্বাচনী ওয়াদা যথাযথভাবে পূরণ করবে। বিশেষ করে শ্বেতপত্র প্রকাশের দ্বারা জনগণ এটাই ধরে নিয়েছিলো যে, এ সরকার একদিকে একেরপর এক

www.pathagar.com

পুরাতন দুর্নীতিবাজদের বিচারের কাজ শুরু করবে, অপর দিকে ভবিষ্যতে যাতে দুর্নীতি না ঘটতে পারে তার সকল দুয়ার কঠোরভাবে বন্ধ করে দেবে। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় বসার পর দু'বছর প্রায় অতিক্রান্ত হতে চললেও যে উদ্দেশ্যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যমাফিক আশানুরূপ কিছুই দেখছে না। অতীত দুর্নীতিবাজ অপরাধীদের বিচারের কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না। অপরদিকে বর্তমানেও বিভিন্ন সেক্টরে দুর্নীতির এমন তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে, যা দেখে জনমনে জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে যে, তবে কি পরিস্থিতি আগের দিকেই যাচ্ছে? যার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে জনগণ এই সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে? শুধু তাই নয়–শ্বেতপত্র মোতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত হতে না দেখে এবং তা থেকে প্রশ্রয় পেয়ে একই দুর্নীতির ব্যাধি সংক্রামক রোগের আকারে পুনরায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দেখে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছে যে, এ সরকারেও কি এমন কেউ এসে বাসা বেঁধেছে, যারা অতীত বড় বড় দুর্নীতিবাজদের সাথে আপোস করার মানসিকতা পোষণ করে যে, "আমরাও তোমাদের কৃত অপরাধের বিচার করবো না, তোমরাও আমাদের এ শ্রেণীর কোনো কাজ নিয়ে বেশী হৈ চৈ করো না। এমনকি কোনো সময় যদি বিধিবামও হয়ে যায়, তোমরাও আমাদের কোন বিচার করবে না।" এ ধরনের জল্পনা-কল্পনার ভিত্তি কি সেটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই ভালো বলতে পারবেন। তবে ঢাকঢোল পিটিয়ে যাদের বিরুদ্ধে যেই শ্বেতপত্র বের করা হলো এবং অনুরূপ আরও যাদের অস্তিত্বের কথা ঐ সময় ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিলো, এগুলোর যে বিচার হচ্ছে না তাতো দেখাই যাচ্ছে। তাই বলতে চাই – জোট সরকার নির্বাচনে যতোই জনপ্রিয়তা লাভ করুন এবং জনগণ যতো বিপুল সংখ্যক ভোটে এ জোটকে জয়যুক্ত করুন না কেন, যখন তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন যে, এ সরকারও আগের সরকারের মতোই এবং ওদের সময় দেশ-সমাজের যেই অবস্থা ছিলো, এখনওতো অবস্থা তথৈবচই, তাহলে এ সরকারও যে অতীতের সেসব জনপ্রিয় সরকার যেগুলোর কথা উপরে উল্লেখ করেছি, জনসমর্থনহীনতার দিক বিচারে সমভাবে প্রত্যাখ্যাত হতে পারে, সে বিষয়টি স্মরণে রাখা এ লেখার উদ্দেশ্য।

অপরাধী তার যথার্থ শাস্তি না পাওয়া অপরাধের আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। সুতরাং আমরা মনে করি, এ সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও অন্যান্য সেক্টরকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে অতীত দুর্নীতিবাজদের দ্রুত বিচারের সম্মুখীন করে তাদের নতুন শাগরিদদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

এদেশের জনগণের বহুবার আশাভঙ্গ হয়েছে। এভাবে আবারও আশাভঙ্গের ঘটনা ঘটলে তাদের মধ্যে যেই হতাশা দেখা দেবে, সেটা জাতির উৎসাহ-উদ্দীপনাকে চরমভাবে বিনষ্ট করে দিতে পারে, যার পরিণতি এ দেশ ও জাতির জন্যে ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ পরিণতি, আর সরকারের জন্যেও সেটা যেমন হবে কলঙ্কজনক তেমনি যন্ত্রনাদায়ক। এমনটি এ সরকার দ্বারা না হোক, দেশবাসী দ্রুত তাই দেখতে চায়, দেখতে চায় যাবতীয় আবীলতামুক্ত হয়ে দেশ দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

রাজনীতি নিরপেক্ষ আলেমদের সুরে দেশে মওদূদী বিরোধিতার রহস্য কোথায়?

[প্রকাশ ঃ ১৩. ৮. ২০০৩ ইং]

গত ৬ই আগস্ট দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত "রাজনীতি নিরপেক্ষ আলেমদের সুরে দেশে মওদূদী বিরোধিতার রহস্য কোথায়?" শীর্ষক লেখাটি পড়ে জনৈক পাঠক আমাকে টেলিফোনে জানালেন–আপনার লেখাটি পড়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশের বঞ্চিত মজলুম মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের দাবীর সপক্ষে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর ক্ষুরধার যুক্তির অবদান সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম। তেমনি একশ্রেণীর আলেম এর পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ কিছু লেখক, রাজনীতিকও তাঁর বিরুদ্ধে সেই ভারত বিভাগ থেকে কেন আদাপানি খেয়ে লেগেছেন, তাও উপলব্ধি করলাম। আরও জানতে পারলাম, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের বিরোধী ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী আলেমদের শিষ্য ও তাদের শিষ্য আলেমগণও বর্তমানে কেন বাংলাদেশে মাওলানা মওদূদী সাহেবের জ্ঞানগর্ভ ইসলামী সাহিত্য ও গ্রন্থাবলীর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছেন, যেসব গ্রন্থ প্রায় অর্ধশত ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বের দেশে দেশে শুধু মুসলমানই নয় অনেক অমুসলমানকেও খোদায়ী পথের সন্ধান দিচ্ছে। কিন্তু একটি কথা বুঝে আসলো না, লেখাটির শিরোনামে "রাজনীতি নিরপেক্ষ আলেমদের সুরে" কথাটি আপনি কেন ব্যবহার করলেন? কারণ আমরা দেখে আসছি আপনার লেখা বহু পরিচিত "আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা" বইটিতে আপনি ইংরেজবিরোধী সংগ্রামে ঐ সমস্ত ওলামায়ে কেরামের চিন্তাধারার ফসল দেওবন্দের অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বইটিতে তুলে ধরেছেন, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট তৎকালীন ত্যাগদীপ্ত বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামী জীবনের অবদানের কথা। তাহলে আপনার এ লেখার শিরোনামে "রাজনীতি নিরপেক্ষ আলেম" কথাটির তাৎপর্য থাকে কোথায়? এটা কি ঐসব ওলামা-এ-কেরামের ব্যাপারে আপনার মতের পরিবর্তন, না তাতে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য কোনো তথ্য আপনার কাছে আছে?

যেই সম্মানিত প্রশ্নকর্তা পাঠক এ বিষয়টির অবতারণা করেছেন, তাকে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত ৬ই আগস্টের লেখাটি পাঠের জন্য মোবারকবাদ। তাঁর প্রশ্নটি যথার্থ, সন্দেহ নেই। শিরোনামে এ শব্দ ব্যবহারের পেছনে যেই বিরাট প্রেক্ষাপট রয়েছে, প্রশ্নটি এভাবে না আসলে হয়তো সেই আলোচনা থেকেই যেতো। প্রথম কথা হলো, আমাদের শ্রদ্ধেয় ঐসব মহান পূর্বসূরীর ব্যাপারে মতের পরিবর্তনের তো প্রশ্নই উঠে না। এ ছাড়া আমার মতো ক্ষুদ্র লোকের মতের পরিবর্তনেই বা কি আসে যায়।

www.pathagar.com

"রাজনীতি নিরপেক্ষ আলেম" বলার পটভূমিটি হলো এই, – যেই মহান প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলুম দেওবন্দ'–উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের চরম দুর্দিনে এখানে ইসলাম ও তার মূল্যবোধের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে, সেই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় সংগ্রামী ওলামা-এ-কেরাম যেমন শায়েখুল হিন্দ, মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ), মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) (যিনি ভারতস্থ কোটি কোটি মুসলমানের কথা স্মরণ করে হোক কিংবা খণ্ড ভারতের সমর্থক লীগ নেতৃত্বের উপর আস্থা আনতে না পারার কারণে, ভারত বিভক্তিতে একমত না হয়ে অখণ্ড ভারতের সমর্থক ছিলেন) এবং পরবর্তীতে মাওলানা হেফজুর রহমান (রহঃ) প্রমুখের ইন্তেকালের পর পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, এই প্রতিষ্ঠান যেন তার প্রেরণার উৎস শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্লভী (রহঃ), শাহ্ আবদুল আজীজ দেহ্লভী (রহঃ) এবং শহীদে বালাকোট সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহঃ) ও ইসমাইল শহীদ দেহ্লভী (রহঃ) প্রমুখের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে সর্বাঙ্গীনভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি শেষের দিকে শিক্ষানীতির প্রশ্নে সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে নেমে আসে। উপমহাদেশের সকল দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাদপীঠ এই মহান প্রতিষ্ঠান ও এর শাখা-প্রশাখা সবগুলো যেন কেবল ইসলামের ব্যবহারিক নিয়ম-বিধি ও আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহের বিশেষ তালীমগাহ হিসাবেই কাজ করতে থাকলো। 'ইকামতে দ্বীন', 'ইজহারে দ্বীন' যা নবী প্রেরণের একমাত্র লক্ষ্য ও 'তাসীসে খেলাফতে ইসলামিয়া'–র ভাব যেন এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষানীতি ও শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে অনেকটা গৌণ হয়ে গেলো। মহানবী (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী অর্থনীতির আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অনুভূতি ও প্রেরণা একরকম অনুপস্থিত হয়ে পড়লো। এমনকি মাঝখানে পরিস্থিতির এতটুকু পর্যন্ত অবনতি ঘটলো যে, অনেক বড় বড় খ্যাতনামা আলেমের মধ্যেও আধুনিক যুগ-সমস্যার মোকাবেলায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখার ধারণা অনুপস্থিত হয়ে গেল। তারা যেন ধরেই নিয়েছিলেন যে–রাষ্ট্র পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্ব তো পালন করবেন অন্যেরা, আমরা কেবল প্রচলিত সাধারণ দ্বীনী খেদমত আনজাম দিতে পারলেই হলো। আর সাধারণ আলেমদের তো এ ব্যাপারে প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, মুসলিম শাসনাধিপত্যের অবসানের পর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণ ও তখনকার ঘটনাবহুল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দরুন মাঝখানে অনেকের দ্বীনী চিন্তার বিভ্রাটও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইসলামকে তারা খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষা-আদর্শবিরোধী যেসব চ্যালেঞ্জ একের পর এক আসছিলো, ঐগুলোর মোকাবেলার উপযোগী শিক্ষিত লোক তৈরির লক্ষ্যে যেই শিক্ষা দর্শন ও কার্যক্রম মাদ্রাসাগুলোতে চালুর তীব্র প্রয়োজন ছিলো, যেখান থেকে পাসকরা শিক্ষিতরা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রসহ জাতীয় জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতো, সেই উপযোগী ব্যবস্থার কথা যেন কেউ চিন্তাই করতে রাজি নয়। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে কুরআন-হাদীস, উসূল, ফিকাহ্, বালাগত, মান্তিক তথা জ্ঞানের বিভিন্ন ধারা আয়ত্তে আনার পরও এসব প্রতিষ্ঠানে

www.pathagar.com

পড়ুয়া সমাজের বহু মেধাবী আলেমের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল থাকতো যে, ইসলামের অনুশীলন কেবল মসজিদের চার দেয়াল, মাদ্রাসাসমূহ, খানকাহ্ ইত্যাদি কয়েকটি স্থানেই সীমাবদ্ধ। এর সঙ্গে আবার এসেম্বলী, রাষ্ট্র পরিচালনা, দেশের প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রচার মাধ্যম, সমাজ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক? অথচ বিশ্বমানবের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে যেই কুরআন আল্লাহ নাজিল করেছেন এবং যেই মহানবীকে (সাঃ) সারাবিশ্বের মানুষের পথনির্দেশনার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সেই কুরআন-হাদীস ও আনুষঙ্গিক জ্ঞানের অন্যান্য বহু মূল্যবান বিষয়াদি মাদ্রাসা ছাত্ররা কষ্ট করে এ জন্যেই পড়লেন, যেন সেই শিক্ষার আলোকে মহানবীর আদর্শের আদলে সমাজ বিনির্মাণের নেতৃত্ব দিতে পারেন। কিন্তু আগেই বলেছি, নানান ঐতিহাসিক কারণে দ্বীনী চিন্তা ও দ্বীনী শিক্ষার মূল লক্ষ্যের ব্যাপারে বিভ্রান্তি বাসা বাঁধার দরুন তাদের কাছে এগুলো গৌণ হয়ে যায় এবং সেই উপযোগী শিক্ষার ফরমুলা তৈরীরও তারা প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ অপরাধমুক্ত, শোষণমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, শান্তিময় জনপদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথার্থ ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্যে প্রধান যে ৫টি বিভাগ ইসলামী নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে আনা অত্যাবশ্যক ছিলো সেই পাঁচটি হলো ঃ ১। রাষ্ট্রীয় আইন, ২। শিক্ষা ব্যবস্থা, ৩। প্রচার মাধ্যম, ৪। সমরশিক্ষা, ৫। অর্থ ব্যবস্থা। এসব বিভাগ আবু জাহ্ল, আবু লাহাবী চরিত্রের নেতৃত্ব কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ কোনো নেতৃত্বের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থাই প্রকারান্তরে হলো। কারণ দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতির সন্তানদেরকে যে শিক্ষা দিয়ে আত্মতৃপ্তি অনুভূত, সেখান থেকে পাস করা লোকেরা ওসব পদে যাবে না। অথচ এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মহানবী (সাঃ)-এর ইসলামী শিক্ষা লক্ষ্যের যেমন সম্পর্ক নেই, তেমনি তাতে ইসলামের মূল লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব নয়। ৫ ইঞ্চি পাইপ দিয়ে ময়লা ছড়ানো হলে কোয়াটার ইঞ্চি পাইপ দিয়ে আতর ছিটানোতে কখনও দুর্গন্ধ দূর করা সম্ভব নয়। এজন্য আগে ৫ ইঞ্চি পাইপের উৎসমুখ বন্ধ করতে হবে। জাতির ঐ পাঁচটি মাধ্যম অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে দ্বীনের যথার্থ দায়িত্ব পালন হয় না। নবী জীবনই এর প্রমাণ। এক কথায়, ইসলাম যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং যেকোনো রাষ্ট্রে এ দৃষ্টিভঙ্গিতে তার বিধিব্যবস্থা সর্বত্র চালু করলে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ কায়েম হতে পারে, এ ধরনের রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণকারী শিক্ষিত লোক তৈরির দৃষ্টিভঙ্গিটিই যেন মাদ্রাসার কথিত শ্রেণীর আলেমদের মধ্য থেকে চলে গিয়েছিল।

এভাবে দেখা যায়, একদিকে ধর্মীয় চিন্তার এই অবস্থা, অপরদিকে দুশো বছরের স্থায়ী ইংরেজী শাসনের প্রভাবে উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলমানরা ক্রমে ইংরেজী শিক্ষা সভ্যতা, জীবনবোধ ও তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে। নিছক বস্তুবাদী শিক্ষার প্রতি সকলে ঝুঁকে পড়ে। তখন জাতীয় জীবনের সকল দিকে বিপরীতমুখী সয়লাব থেকে মুসলিম উম্মাহ্কে রক্ষাকারী একজন পথিকৃৎ মনীষীর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। তখনই আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে বর্তমান বিশ্বে ইসলামী রেনেসাঁ সৃষ্টির মহান চিন্তানায়ক এবং ভারত উপমহাদেশে ইসলামের আলো বিস্তারকারী আওলাদে রসূল খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর বংশধর খাজা মওদূদ

www.pathagar.com

চিশতীর অধস্তন ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহঃ) প্রথমে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইর মাধ্যমে ময়দানে আসেন। কুরআন ও সুন্নাহ্র ব্যাপারে অগাধ ইল্মের অধিকারী ব্যতিক্রমধর্মী যোগ্যতার এই মহান ব্যক্তিত্বের দ্বারাই যেন প্রথমে এই উপমহাদেশের মুসলমানরা দ্বীনী চিন্তা ও দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের হারানো দৃষ্টিভঙ্গি ফিরে পায়। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা সেই বিস্মৃত চিন্তা পুনরায় সকলকে উদ্বেলিত করে তোলে। একারণেই পাকিস্তান গঠিত হবার পর তার জন্যে ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরির দায়িত্বটি পাকিস্তানের জন্যে সংগ্রামকারী তখনকার ওলামাকুল শিরোমনী আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী প্রমুখ (রহঃ) মাওলানা মওদুদীকেই দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, ভারত বিভাগ প্রশ্নে সৃষ্ট মতানৈক্যের ফলে দেওবন্দ সংশ্লিষ্ট ওলামা-এ-কেরাম তখন দুভাগে বিভক্ত ছিলেন, যা "আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা" বইতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। '৪৭ থেকে '৮০-এর দশক পর্যন্ত দীর্ঘসময় ঐ প্রতিষ্ঠানে অনেক কিছুই ঘটে। অখণ্ড ভারতের সমর্থক ওলামা-এ-কেরামের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দেরও এ সময়ের মধ্যে অনেকেরই ইনতেকাল হয়ে যায়। কিন্তু যেই দারুল উলুম দেওবন্দ অগণিত ইসলামের খাদেম, বিজ্ঞ আলেম, ওলী, বুজর্গ, শিক্ষাবিদ, লেখক, সাংবাদিক ও বড় বড় সংগ্রামী রাজনীতিক ত্যাগী ওলামা জন্ম দিল, '৮০-এর দশকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি এবং পরে সেখানকার দীর্ঘস্থায়ী ভাইস চ্যান্সেলর আধ্যাত্মিক নেতা বিজ্ঞ আলেম আল্লামা কারী তাইয়্যেব সাহেবের অপসারণের পর প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্বে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মনে হয়, সেখানকার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মধ্যে রাজনীতি নিরপেক্ষ ইসলামী ভাবধারা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

খোদ ঐ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র "দারুল উলূম" নামক ম্যাগাজিনে "ইসলামী হুকুমত" সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। '৮৭/৮৮ সালের একটি সংখ্যা (যা হাতের কাছে না থাকায় সঠিক তারিখটি দিতে পারছি না) তাতে "হুকুমতে এলাহিয়া" শিরোনামে লিখিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়–ইয়েতো আল্লাহ্ তায়ালা কা এক ওয়াদা হ্যায়, ওয়ারনা তাখ্লীকে ইনসানিয়্যাৎ কা আছল মাকাসাদ হ্যায় ইবাদৎ-" খোদায়ী রাষ্ট্র হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার একটা ওয়াদা। মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্যতো হলো ইবাদৎ"। অতঃপর এ সংক্রান্ত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে যা বলার চেষ্টা করা হয়েছে, তার লক্ষ্য হলো, ইসলামী হুকুমত, ইসলামী খেলাফত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যেই আন্দোলন ও চেষ্টা তদবীর চলছে (যার উপর মওলানা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত জামায়াত এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিতরা জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ ও পাকিস্তনসহ অন্য সব দেশে অধিক জোর দিচ্ছে, তার থেকে লোকদের দূরে সরানো।) বাংলাদেশে অবস্থানকারী বিশেষ করে দেওবন্দ থেকে পড়ে আসা সেমতের অনেক আলেম, কোনো কোনো পীর, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি, সেই প্রতিষ্ঠানেরই অঙ্গসংগঠন আজকের তাবলীগে জামায়াতের কোনো কোনো নেতা-অনুসারীর চিন্তা-কর্মে তারই ছাপ পাওয়া যায়। তদ্রূপ সেখান থেকে পরবর্তী সময় এমনকি সাম্প্রতিককালে পড়ে আসা অনেক মেধাবী ছাত্র ও অন্যান্য

www.pathagar.com

ভক্তবৃন্দের মধ্যে কংগ্রেসী রাজনৈতিক ও শিক্ষা দর্শন-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ন্যায় 'রাজনীতি নিরপেক্ষ ইসলাম' এর মতবাদ প্রকাশ করতে দেখা যায়। এই সাথে এ বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপকারী জামায়াতে ইসলামী এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহঃ)-এরও তীব্র সমালোচনা করা হয়ে থাকে। একারণেই বাংলাদেশে মওলানা মওদূদী (রহঃ) ও তাঁর জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যের বিরুদ্ধে হঠাৎ একশ্রেণীর আলেম ও কোনো কোনো পীর কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষ লেখক ও রাজনীতিকদের ন্যায় বিভ্রান্তিকর প্রচারণায়রত ব্যক্তিদের আলোচনায় প্রবন্ধটির শিরোনামে "ইসলাম নিরপেক্ষ আলেমদের সুরে" শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, তাদের চিন্তার উৎস যেহেতু অন্যত্র এবং মুসলিম হত্যাযজ্ঞের ভূমি ভারতের মূল সংগঠন কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে সঙ্গতিশীল, কাজেই সেই সুরের কিছু প্রতিধ্বনি করে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনকে কেউ ক্ষতি করতে উদ্যত হলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন না জেগে পারে না যে, হঠাৎ তাদের মধ্যে ধর্ম নিরপেক্ষতার সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিধ্বনি কেন?

উল্লেখ্য এ সম্পর্কিত যেই লেখাটি পূর্বে ৬. ৮. ২০০৩ই তারিখে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়েছে, সেটি হলো এই—

কথায় বলে "যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা" কখন কোন্ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এই বাক্যটি রচনা করেছিলেন, তা জানিনা। তবে ন্যায়-অন্যায় কোনো কারণে যদি কেউ অপরের কাছে হেরে যায় কিংবা অন্যকে সে তার স্বার্থের পথে অন্তরায় মনে করে অথবা তার কোনো কথা-কাজের সাথে একমত হতে না পারে, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির অতি ভাল কাজটিও যে একশ্রেণীর লোকের কাছে মন্দ রূপেই মূল্যায়িত হয়, সেই অসুস্থ মানসিকতাটিই স্বল্প শব্দের এ প্রবাদ বাক্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

বাংলাদেশে নতুন করে মাওলানা মওদূদীর প্রসঙ্গ নিয়ে মাঠে নামার ব্যাপারটিও আমাদের কাছে সে রকমই একটা কিছু মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, পুরাতন এবং বহুল আলোচিত পর্যালোচিত এসব বিষয়ের নতুনভাবে চর্চার দ্বারা মনের ঝাল মিটানো হচ্ছে। অন্যদিকে সুদূরের কোন নেপথ্য শক্তি বাংলাদেশের কয়েকজন আলেমের সাহায্যে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাচ্ছে। এদিকে তারাও ধরে নিয়েছেন যে, এদ্বারা যদি কিছুটা লাভবান হবার সুযোগ আসে মন্দ কি? অন্যথায় মুসলিম উম্মাহ্ নিজেদের ছোটখাটো মতবিরোধ ভুলে গিয়ে যেই ইসলামী ঐক্য সংহতির পরিচয় দানে ব্যর্থ হওয়ায় বর্তমানে বিপদগ্রস্ত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বময় তাদের উপর নেমে এসেছে ইতিহাসের চরম বিপর্যয় এবং বিধর্মীরা মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত লুটছে আফগানিস্তান ও ইরাকে, বাংলাদেশসহ অন্য মুসলিম দেশের প্রতি হাত বাড়াবার চলছে পাঁয়তারা, ঠিক এই পরিস্থিতিতে দ্বীনের প্রকৃত দরদি কোনো আলেম কিছুতেই নতুন করে অনৈক্য ও তিক্ততা সৃষ্টি করতে পারেন না। অন্তত অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থক উপমহাদেশীয় যে সমস্ত বিশ্ববিখ্যাত সংগ্রামী ওলামা আমাদের পূর্বসুরী 'আকাবের' ছিলেন, তাদের অনুসারীরা তো কিছুতেই এই ভুল করতে পারেন না। যে দু'একজন

www.pathagar.com

যুবক রাজনীতিক আলেম বা পীর বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর সাথে দীর্ঘদিন এক সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং এর বিরোধীদের অন্যায় তৎপরতা রুখতে আন্দোলন করে আসছেন, এখন নানান ভুল বুঝাবুঝির কারণে (যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে) হঠাৎ তারা মাওলানা মওদূদী (রহঃ)'র বইয়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে সংবাদপত্রের শিরোনাম হচ্ছেন। তাদের কেউ হচ্ছেন দেওবন্দের উল্লেখিত জগদ্বিখ্যাত আলেম ও ইসলামী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের শিষ্যের শিষ্য কিংবা তারও কোনো শিষ্যের শিষ্য। সেসব মহান ওলামা-মাশায়েখ যদি মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহঃ)'র গভীর ইসলামী জ্ঞান প্রজ্ঞার প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা জানিয়ে কুরআন-হাদীসের প্রমাণাদির আলোকে তাঁর উপস্থাপিত দ্বিজাতিতত্ত্বের দর্শনে এক সাথে কাজ করতে পারেন এবং ৫০-এর দশকে তাঁকে দিয়ে সর্বদলীয় আলেমদের ঐতিহাসিক ২২ দফার ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া তৈরি করে তাঁর সাথে দেশময় দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কোনো দোষ না দেখেন, তাহলে সেই পূর্বসুরী আকাবেরদের বাংলাদেশী এসব অধস্থানীয় শিষ্য হঠাৎ কেন আজ মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর ব্যাপারে অযৌক্তিক প্রসঙ্গের অবতারণা করছেন? সম্মানিত এই যুবক আলেম নেতৃত্ব ও পীর সাহেবরা কি আমাদের সেসব মুরব্বী মুফতী-এ-আজম শফী (রহঃ) আল্লামা শাব্বীর উসমানী (রহঃ), আল্লামা সোলায়মান নদভী (রহঃ), আল্লামা, জাফর আহমদ উসমানী (রহঃ), মাওলানা ইহতেশামুল হক থানভী (রহঃ), লালবাগ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ), নেজামে ইসলাম নেতা মাওলানা আতাহার আলী (রহঃ), মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রহঃ) ফুরফুরা এবং শর্ষিনার বড় পীর সাহেবান প্রমুখের চাইতে ইসলামের অধিক জ্ঞানের অধিকারী হয়ে গেলেন?

জামায়াতে ইসলামীর দু'জন নেতা বর্তমানে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন জোট সরকারের মন্ত্রী। জোটের অন্যতম অঙ্গ সংগঠন হিসাবে তারাও এ সরকারে ন্যায্যত মন্ত্রিত্ব পান, সে ব্যাপারে কারও দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু নিজেদের সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল হোক কিংবা সরকার প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার সাথে তাদের আলোচনায় কোনোরূপ জটিলতা সৃষ্টির দরুন যদি উল্লেখিত সমালোচক আলেমরা মন্ত্রিত্ব না পান, তাতে হঠাৎ তারা জামায়াতের উপর ক্ষেপে যাবেন কেন? কেনই বা অন্যায়ভাবে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী মনীষী মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী-এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করবেন? আদর্শিক সংঘাত বিক্ষুব্ধ আধুনিক বিশ্বের জন্যে ইসলামের এই আলোর দিশারীর বিরুদ্ধে সম্প্রতি তাঁরা আদাপানি খেয়ে লেগেছেন। এটা কতদূর সততা, নিষ্ঠা ও ইসলামের খেদমত, তা খোদ্ তাঁদেরই চিন্তা করা কর্তব্য। অন্যথায় তার অর্থ অন্যকিছু দাঁড়ানোটা অসম্ভব নয়। কেননা, একথা প্রায় সকলেই জানে যে, ইংরেজ শাসকদের বিদায়ের মুহূর্তে যখন কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং আলেমদের মধ্যে দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক হেড মুদার্রিশ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানীর নেতৃত্বে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে, তখন কংগ্রেস নেতারা নিজেদের মতবাদের অনুকূলে অখণ্ড ভারতের সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতাদের দ্বারা এরূপ

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ফতওয়া জারির জোর চেষ্টা চালায় যে, ভারতে বসবাসকারী সকল অধিবাসী একজাত এ মর্মে যেন তারা জনমত সৃষ্টি করেন। এই মর্মে, উর্দূতে লেখা–"মুত্তাহিদা-এ-কওমিয়ত" -'ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তা' নামে একটি বইও প্রচার করা হয়। যার লক্ষ্য হলো, অবিভক্ত ভারতের মুসলমানরা যাতে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের দাবী সমর্থন না করে এবং ভারতকে খণ্ড করে বঞ্চিত মজলূম মুসলমানদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলমানদের জন্য 'পাকিস্তান' নামক স্বতন্ত্র কোনো রাষ্ট্রের দাবীর প্রতি কান না দেয়। তখন মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী এই বইয়ের যুক্তি খন্ডন করে "মাসআলা-এ কওমিয়াত" (যা বাংলায় "জাতীয়তাবাদের সমস্যা" রূপে প্রকাশিত) নামক কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যুক্তিপূর্ণ একটি বই লেখেন। তাতে তিনি বলিষ্ঠভাবে একথা তুলে ধরেন যে, হিন্দু-মুসলিম বা অন্য কোনো জাতি একই ভূখণ্ডে বাস করলেই একজাত হয় না। মুসলমানদের জাতীয়তার ভিত্তি হলো বিশ্বাস। সেদিক থেকে মুসলমান স্বতন্ত্র জাতি; আর আল্লাহ্ই এ জাতীয়তার ভিত্তি নির্দেশ করে দিয়েছেন। মওলানা মওদূদীর এই বই সারা ভারতের মুসলমানদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পাকিস্তান আন্দোলন অধিক জোরদার হয়ে ওঠে। মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত সাধক আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) সহ দেওবন্দের আরও বিশিষ্ট আলেম মুফতী শফী (রহঃ) প্রমুখ এরপর জোরালোভাবে পাকিস্তান দাবী সমর্থন করেন। অতঃপর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তি যা সুদৃঢ়করণে মওলানা মওদূদীর লেখা বিরাট অবদান রাখে, তাতে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যায়। তখন থেকে ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী অখন্ড ভারতের সমর্থক জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের কোনো কোনো আলেম সাহেবান মওলানা মওদূদীর ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠেন। কারণে-অকারণে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করতে থাকেন মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে। অতঃপর ৬০-এর দশকে মওলানা মওদূদী (রহঃ) ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানের ইতিহাসের পার্থক্য রেখা টেনে 'খেলাফত ও মুলকিয়ত' শিরোনামে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন, যার মধ্য দিয়ে ইসলামী ইতিহাসের সমালোচকদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়। তাঁর মাসিক পত্রিকা "তারজুমানুল কুরআনে"– সেটি প্রকাশ পায়। তখন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ সমর্থক আলেম সাহেবানের কেউ কেউ তাঁদের পুরাতন রাজনৈতিক ঝাল মেটানোর জন্যে এই লেখাটির বিভ্রান্তিকর উদ্ধৃতি দিয়ে মওদূদী সাহেবকে সাহাবায়ে কেরামের সমালোচক বলে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার শুরু করে দেন। তারা নিজেদের সেই রাজনৈতিক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে "খেলাফত ও মুলকিয়ত" বইয়ের কিছু জায়গার অপব্যাখ্যা দিয়ে নিজেদের সেই রাজনৈতিক বিরোধকে শরয়ী বিরোধে রূপ দেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস চালান, যার বিস্তারিত বিবরণ আল্লামা জাস্টিস মালিক গোলাম আলীর লেখা "খেলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থের ওপর অভিযোগের পর্যালোচনা" নামক "গ্রন্থে সবিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। অনেকের মতে ইসলামের ইতিহাসের দেশী বিদেশী সমালোচকদের জবাবে এরূপ যুক্তি গ্রাহ্য বই অন্য কোনো ভাষায় আজও লেখা হয়নি। অথচ সেজন্যে মওদুদী সাহেবের শুকরিয়া না জানিয়ে অতি স্থূল দৃষ্টিতে তা দেখা হয়েছে।

www.pathagar.com

সুতরাং যারা এখন বাংলাদেশে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের কারও কারও সুরে মওলানা মওদূদীর ইস্যু তুলে দেশের সকল শ্রেণীর জনতা ও সব মতের ওলামা-মাশায়েখ ও তাদের সমর্থিত জোট ভাঙ্গার নিমিত্ত সৃষ্টি করে চলেছেন, এটাকে যদি 'র'-এর চক্রান্ত বলে কেউ মন্তব্য করে, তাকে কি বলা যাবে? ভারতের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং সেখানকার 'ইসলাম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক মতে'র আলেমদেরই মওদূদী বিরোধী মানসিকতা প্রকট। আমিনী সাহেবান মাওলানা থানভী (রহঃ), মওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ), মুফতী শফী (রহঃ), মাওলানা ফরিদপুরী (রহঃ), মাওলানা আতহার আলী (রহঃ), মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খাঁ (রহঃ), খতীবে আজম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (রহঃ), মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী (রহঃ) প্রমুখ আকাবেরের অনুসারী বলে জানি, যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মওলানা মওদূদীকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র অর্জন ও তাকে ইসলামীকরণের জন্য দীর্ঘদিন এক সাথে কাজ করে গেছেন। এখন অন্য কারও প্রভাবে প্রভাবিত এবং ঐক্য পরিপন্থী ইস্যু তুলে দেশে ইসলামপন্থীদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টিতে জেদ ধরলে, ইসলামেরই ক্ষতি হবে। কেউ ভারতপন্থী মহলের সাহায্য পেলেও, তাতে শেষ পর্যন্ত কোনো ফায়েদার আশা বৃথা। মেঘের ঘনঘটা সত্যের সাময়িকভাবে অন্ধকার করতে সক্ষম হলেও, পরে সূর্যের প্রখরতার সামনে সে অন্ধকার টিকতে পারে না।

বিপথগামী সন্তানের নির্মম শিকার এবার খোদ মা-বাবাও

[প্রকাশ ঃ ৩০. ৭. ২০০৩ ইং]

সেদিন একটি জাতীয় দৈনিকের ছোট্ট এক খবরের প্রতি নজর পড়লো। এর শিরোনাম ছিল "বাবাকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়"। ঘটনাটি হচ্ছে মালয়েশিয়ার এক কুলাঙ্গার ছেলের। ঐ ছেলে আবার কলেজ পড়ুয়া। মুক্তিপণ আদায় করার লক্ষ্যে তার বাবাকে সে অপহরণ করে। মালয়েশীয় মুদ্রায় ৫০ হাজার রিংগিত (১৩ হাজার মার্কিন ডলার) মুক্তিপণ আদায় করার জন্যে গত ১লা জুলাই মালয়েশিয়ার জোহর বারুর কলেজ ছাত্র পি জ্যাকব জেবারাঝ (২০) ৫ সহযোগীকে নিয়ে তার পিতাকে অপহরণ করে। কলেজ ছাত্রটি তারই মায়ের কাছ থেকে মুক্তিপণের অর্থ আদায় করে। অপহৃত বাবার নাম 'জোনোসামি নালা থাম্বি'। তিনি মেরিন ডিপার্টমেন্টের হেড ক্লার্ক। ৫৩ বছর বয়সী বাবা জোনোসামি নালা থাম্বিকে তার সন্তান জ্যাকব ৫ সহযোগীসহ এক গোপন স্থানে ২৪ ঘন্টা আটকে রাখে। জ্যাকবের মা সারোজোনি আর স্যামুয়েল (৪৮) নামক অপর জন মুক্তিপণের অর্থ প্রদান করলে অক্ষত অবস্থায় অপহরণকারীরা জোনোসামিকে ছেড়ে দেয়। গত ১৬ই জুলাই (০৩) জোহর বারু-র ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অপহরণের দায়ে ছাত্র জ্যাকব দোষী সাব্যস্ত হয়। এই অপরাধে তার মৃত্যুদন্ড বা কারাদণ্ড হতে পারে। ম্যাজিস্ট্রেট নুয়ামান মাহমুদ জুহুদী আগামী ১০ই অক্টোবর এই মামলার রায়ের তারিখ নির্ধারণ করেছেন।

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার জনৈক কলেজ ছাত্র কর্তৃক বাবা অপহরণের এই খবর চাঞ্চল্যকর হলেও বাংলাদেশের পাঠক মহলের অনেকের কাছেই হয়তো এটা তা মনে হয়নি। বিশেষ করে যারা নিয়মিত পত্র-পত্রিকা পড়ে থাকেন, তাদের মনে এ খবরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না হবারই কথা। কারণ যেখানে বাংলাদেশে নিজ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আপন কলেজ পড় য়া কুলাঙ্গার সন্তান কর্তৃক অনেক বাবাকে শুধু অপহরণ নয় নির্মমভাবে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে লাশ গোপন করে রাখার একাধিক নজির রয়েছে, সে তুলনায় অপহরণ বড় অপরাধ হলেও এই নির্মমতার কাছে সেই অপরাধ নগণ্য বিবেচিত হতে বাধ্য। মাত্র কয়েক মাস আগের ঘটনা। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক উপদেষ্টাকে তার মদাসক্ত শিক্ষিত বয়স্ক ছেলে ড্রয়িং রুমে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। তেমনি তার পরবর্তী আরেক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে রাজশাহীতে। স্থানীয় সিটি কলেজের জনৈক শিক্ষককে তার কলেজে পড় য়া মাদকাসক্ত ছেলে অন্য সহযোগীদের যোগসাজশে নির্মমভাবে হত্যা করে। শুধু তাই নয়, পিতাকে হত্যার পর তার লাশটিও লুকিয়ে রাখে। বেশ কয়েকদিন চলে যাবার পর থানা পুলিশ অন্য লাশের 'সন্ধান করতে গিয়ে প্রাপ্ত এক তথ্যের সূত্র ধরে নিখোঁজ অধ্যাপকের লাশের সন্ধান পায়। এই সঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয় যে, ঐ লাশের অন্যতম আসামীই হচ্ছে নিহত অধ্যাপকের মাদকাসক্ত পুত্র ও তার সহযোগীরা। তেমনি গত ৫ই জুলাই শ্যামপুরে তানজিরুল ইসলাম মিশেল নামক যেই স্কুল ছাত্রটিকে ৩ লাখ টাকার জন্যে জিম্মি করে অতঃপর তাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়, সে ঘটনাটি সন্তান কর্তৃক পিতা হত্যার নিষ্ঠুর ঘটনা না হলেও এর পেছনেও ঐ দুই ঘটনার অনুরূপ মদাসক্তিই কাজ করেছিল। মিশেলের বাবা-মা যেই বাড়িতে ভাড়া থাকতো সেই বাড়ীর মালিকের পুত্র মদাসক্ত শোয়েব সরাসরি এই হত্যাকান্ডের জন্যে জড়িত বলে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, যেই সন্তানকে বাবা-মা এত স্নেহ আদর করে লালন-পালন করলেন, তাকে শৈশব থেকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিয়ে তার পেছনে ব্যয় করলেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলা কষ্টার্জিত অর্থ, ঠিক সেই কলিজার টুকরো শিক্ষিত সন্তান কেন আজ জন্মদাতা বাপকেও নির্মমভাবে হত্যা করতে দ্বিধা করলো না? বা অপরের নিষ্পাপ সন্তানকে তিন লাখ টাকার জন্যে জিম্মি বানিয়ে অতঃপর তাকে নির্মমভাবে হত্যা করলো? তাকে কোন্ বিষয়টি এত নির্মম করলো? তার মদাসক্ত হবার ও সুস্থ জ্ঞান বিনষ্ট হয়ে যাবার জন্যে দায়ী কে? এমনিভাবে মদাসক্ত সন্তান কর্তৃক মাদক দ্রব্যের টাকার জন্যে আপন মা-বোনের উপর অত্যাচার এমন কি হত্যার ঘটনাও বিরল নয়।

বলা বাহুল্য, যেসব কিশোর যুবক মদাসক্তির শিকার হয়ে মাদকদ্রব্যের টাকার জন্যে এভাবে নিজ জন্মদাতা মাতা-পিতা ও নিষ্পাপ শিশুকে পর্যন্ত খুন করতে দ্বিধা করে না, তারা যে নিজেদের এই তীব্র নেশা চরিতার্থ করার জন্যে অপরের উপর কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়, এ থেকেই সহজে অনুমেয়। যুবক-কিশোরদের দ্বারা এ জাতীয় নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড একটি সমাজের চরম অসুস্থতার দিকেই ইঙ্গিত করে। আমাদের সমাজ ও তারই শিকার।

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার জনৈক কলেজ ছাত্র কর্তৃক অন্যের সহযোগিতায় নিজ বাবাকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের উল্লেখিত ঘটনা হোক কিংবা আমাদের দেশের কোনো উচ্চ শিক্ষাঙ্গনের কোনো ছাত্র বা অন্য কারও দ্বারা তার মাতা-পিতা হত্যার ঘটনা, এসব অকল্পনীয় নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার সাথে সাথে এ নিয়ে কয়েকদিন চর্চা ও বহু লেখালেখি হয়। কিন্তু এই জঘন্য প্রবণতা ও তার উৎসমূল কোথায় সে ব্যাপারে খুব কমই অঙ্গুলি সংকেত করা হয়। এই প্রবণতা নির্মূলের সুষ্ঠু পরিকল্পনা আবশ্যক।

এক পরিসখ্যানে দেখা যায়, আমাদের দেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী ছাত্রদের মধ্যে ঢাকা শহরে ৪০ শতাংশ, চট্রগাম শহরে ২৮ শতাংশ এবং রাজশাহী শহরে ১০ শতাংশ গাঁজায় আসক্ত বলে জানা যায়। গত বছরের মাদক বিরোধী সংস্থা 'লাইফ'-এর একটি জরিপের ফলাফলে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৪০টি হল ও হোস্টেলে বসবাসকারী আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৪০ শতাংশই সিগারেটসহ মদ, ফেনসিডিল, গাঁজা ও ঘুমের নেশাজাত ওষুধে আসক্ত। এ জরিপের ফলাফল অনুযায়ী ১৭ দশমিক ৭৩ শতাংশ ছাত্র ও ১ দশমিক ৭ শতাংশ ছাত্রী মদপান করে। ১০ দশমিক ৪ শতাংশ ছাত্র ও ১ দশমিক ৫৩ শতাংশ ছাত্রী গাঁজা সেবন করে এবং ৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ ছাত্র ও ১ দশমিক ৭৬ শতাংশ ছাত্রী ফেনসিডিল আসক্ত। মাদকদ্রব্যকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন, তা কেন করা হয়েছে, সমাজ, দেশ জাতি নির্বিশেষে যেখানেই আল্লাহর এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হচ্ছে, সেখানেই মানবচরিত্রে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। দেশী, বিদেশী অসংখ্য ঘটনা থেকে তা সহজে অনুমেয়। নিকারাগুয়ায় দু'সপ্তাহে মাদকাসক্ত চালক দ্বারা যানবাহন দুর্ঘটনায় বহু সংখ্যক লোককে হতাহত হতে হয়েছে। আমাদের দেশেও অনেক যানবাহন দুর্ঘটনার জন্যে চালকদের মাদকাসক্তিই যে দায়ী তা অস্বীকারের উপায় নেই। তাই দেশে মাদকাসক্তের ক্রমবর্ধমান অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক।

মাদকদ্রব্য হোক কি অপর কোনো নিষিদ্ধ বস্তু তা হাতের কাছে পাওয়া যায় বলেই সেটি লোকজন পান করে। মাদকদ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার এবং তার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির তথ্যটি আমাদের দেশের কর্মকর্তাদের কাছে নতুন কোনো ঘটনা নয়। বিশেষ করে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যৌথবাহিনী দ্বারা মাদকবিরোধী যেই অভিযান চলছিল এবং সেসময় এই সর্বনাশা নিষিদ্ধ বস্তু যেভাবে ধরা পড়ছিল, এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে সচেতন। কিন্তু পরিসংখ্যান থেকে এর ব্যাপকতার যেই ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে তা থেকে মনে হয় না, যৌথবাহিনীর অভিযানের পর এ অভিশাপের বিরুদ্ধে কোনো সুষ্ঠু চিন্তাভাবনা চলছে।

দেশ-বিদেশী সকল সমাজের যুব-কিশোরদের মধ্যকার এই সর্বনাশা প্রবণতা রোধে যেই ব্যাপারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর, নানান বাস্তব কারণে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের সেই পথে অনেক দেশের বর্তমান ক্ষমতাসীনরাই হয়তো যাবেন না।

www.pathagar.com

অথচ সেই পথে যাওয়া ছাড়া মাদকাসক্তির দুরোরোগ্য প্রবণতা হ্রাস করা, সমাজের যুব শক্তিকে সার্বিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা, সর্বোপরি এর অবৈধ ব্যবসায় কেন্দ্রিক সমাজের ভয়াবহ অপরাধপ্রবণতা নির্মূল কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমাদের সমাজকে মাদকাসক্তি ও এর আনুষঙ্গিক বিভিন্ন অপরাধ যেভাবে তলে তলে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে, এর হাত থেকে দেশের ভবিষ্যত যুব শক্তিকে রক্ষা এবং তার ভয়াবহ পরিণতি থেকে গোটা সমাজকে বাঁচানো সুকঠিনই হয়ে দাঁড়াবে। দেশের কোনো কোনো এলাকায় প্রায় পরিবারে মাদকাসক্তির এই অভিশাপ দেখা দিয়েছে। পারিবারিক শান্তি সেখানে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এটি এমনই এক অভিশাপ যে, সমাজের উপর-নীচ সকল স্তরের পরিবারকেই যে তা গিলে খেতে শুরু করেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন উপদেষ্টা এবং একটি কলেজের অধ্যাপক পরিবারের উল্লেখিত দু'টি ঘটনাই তা আঁচ করার জন্যে যথেষ্ট। মদ, মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য যখন জাতির তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং জাতির সর্বস্তরে বিচিত্র আকারে এর কুপ্রভাব বিস্তার করে, তখন ধরে নিতে হবে জাতি এক মহা অসুস্থ পথে পা বাড়িয়েছে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ধ্বংস ছাড়া কিছু নয়। পৃথিবীতে বহু সভ্য জাতির পতন ঘটেছে একমাত্র এই কুঅভ্যাসে। নেশার এই দুষ্ট প্রবণতা যার চরিত্রে একবার অনুপ্রবেশ করে, তাকে ঐ মাদকাসক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা খুব এক কঠিন কাজ। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক আর্থিক পারিবারিক সকল দিক থেকেই তাকে ধ্বংস করে ফেলে। মাদকাসক্তিতে পশ্চিমা সমাজ ডুবে আছে। অন্যান্য কারণসহ তার পরিণতিতে তাদের পারিবারিক কাঠামোও আজ ভেঙ্গে পড়ছে। সেই স্রোতের কবল থেকে মুসলিম সমাজ দীর্ঘ দিন বহুলাংশে রক্ষা পেয়ে আসলেও এখন আমাদের দেশসহ প্রায় মুসলিম সমাজকেও তা গ্রাস করতে চলেছে।

মাদকাসক্তি ও অন্য যেসব অপরাধাপ্রবণতা আমাদের সমাজ জীবনকে কলুষিত ও বাসের অনুপযোগী করে তুলছে, তার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে (আর পরিত্রাণ পেতে হবেই) ইতিপূর্বে লেখায় যেই পথের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, সেটি কেউ স্বীকার করুক বা না করুক, ঐ পথে যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। সেটি হলো, বস্তুগত আদর্শিক নৈতিক ও দর্শনগত ভোগবাদী জীবনদর্শনকেন্দ্রিক যেসব ভ্রান্ত কারণে আমাদের এই তওহীদবাদী সমাজ ও পারিবারিক কাঠামোতে বিকৃতি ঘটছে ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের তাতে ঘুণে ধরা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেসব কারণ অপসারণের বলিষ্ঠ পরিকল্পনা নিতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ বর্তমান সমাজ কাঠামোকে তার খোল নইচা বদলিয়ে পুনর্গঠনের নতুন পদক্ষেপ নিতে হবে। আর তা সফল করতে হলে নিম্নোক্ত বাস্তবতাকে আগে স্বীকার করে নিতে হবে।

এ ব্যাপারে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃত্বের-এই বাস্তব বিষয়টি আগে স্বীকার করে নিতে হবে যে, সমাজের কোনো যুবক-কিশোর বা অপর কোনো নাগরিক অপরাধী হয়ে জন্মায় না। সে যেই পারিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, সেই পরিবেশই তাকে সৎ বা অসৎপ্রবণ

www.pathagar.com

করে তোলে। তাকে করে অপরাধী, সন্ত্রাসী, খুনী ছিনতাইকারী, মাতাল, নেশাখোর, আর এসবের মধ্যে নাগরিক চিন্তা ও মনন তৈরিতে সবচাইতে প্রভাব বিস্তার করে জাতীয় শিক্ষা, শিক্ষা দর্শন। চারিত্রিক ভালমন্দ গুণাবলী সৃষ্টিতে প্রাথমিক অবস্থায় পারিবারিক পরিমণ্ডলের প্রভাবটিকে প্রধান বলে গণ্য করা হলেও পরিবারপ্রধান পিতা-মাতার শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও আচার-আচরণে যেহেতু তার শিক্ষা জীবনের প্রভাব থাকে, তাই ঘুরে ফিরে কথা দেশের শিক্ষার দিকেই আসে। এই শিক্ষাই যেমন একটি জাতিকে উঠায়, তেমনি শিক্ষার দর্শনগত কারণেই শিক্ষিতের মন-মানসিকতা বিনির্মিত হয়, যাদের প্রভাবে সমাজ উঠে আবার ক্ষেত্রবিশেষে ডুবেও। আমাদের সমাজজীবন আজ যেই অপরাধপ্রবণতার দন্ত-নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, তার অধিকাংশই হচ্ছে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে শিক্ষিত অপরাধ প্রবণদের কারণে। সুতরাং সমাজের অপরাধপ্রবণতার স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ করতে হলে শিক্ষায় আনতে হবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

অন্যান্য কারণসহ শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়াটাই দেশ ও সমাজে আদর্শ মানুষ তৈরির পথে অন্তরায়। বুদ্ধিবৃত্তিক যথার্থ বিকাশের দ্বারা শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েই একটি জাতি তার নিজ সত্তা ও পরিচিতি যথাযথভাবে খুঁজে পায়। সন্ধান করতে পারে তার সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের সঠিক পথ। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে পারে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী। এজন্যে এমন শিক্ষাই আমাদের প্রয়োজন, যেই শিক্ষা দেহ ও আত্মা উভয়ের উন্নতি-উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক। নিছক দেহের উন্নতির সহায়ক শিক্ষা মানুষকে সৎ ও নীতিবান করতে পারে না বরং পাশবিক বৃত্তিগুলোকে অধিক চাঙ্গা করে তাকে অনৈতিক সত্তায় পরিণত করে। সে হয়ে ওঠে অপরাধপ্রবণ, নিষ্ঠুর। অথচ মানুষ একটি নৈতিক সত্তা আর দেহ-মনের সমন্বয়ে গঠিত মানুষের ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ সকল কর্মকাণ্ডের নিয়ামক শক্তি হলো তার আত্মা। যার আত্মা যত পরিশুদ্ধ ও তার কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ ও সকল তৎপরতাও তত স্বচ্ছ, পরিশীলিত। তাই মানুষের ভাল-মন্দ প্রবণতার মূল উৎস – আত্মার উন্নতি ও পরিশুদ্ধিমূলক শিক্ষা প্রশিক্ষণকে আমাদের শিক্ষানীতির ভিত্তি বানাতে হবে। একে উপেক্ষা করে নিছক জড় দেহের উন্নতিমূলক শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষানীতি দিয়ে সমাজে সৎ নাগরিক সৃষ্টি সম্ভব নয়। এজন্যে যত কোটি কোটি টাকাই ব্যয় করা হোক তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তেমনি এ শিক্ষার ফসলস্বরূপ যেসব নাগরিক সমাজ সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বসে থেকে একে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে কিংবা যারা গোটা সমাজে সন্ত্রাস, সকল প্রকার অপরাধ প্রবণতার বিস্তার ঘটিয়ে সমাজকে বাসের অনুপযোগী করে তুলছে, তাদের উচ্ছেদের ব্যাপারটিও দুরূহ হতেই বাধ্য।

বলাবাহুল্য, একটি তওহীদবাদী সমাজ হিসেবে দেহ-আত্মার সম-উন্নতি, উৎকর্ষ বিধানকারী শিক্ষা ব্যবস্থাই যেখানে আমাদের দেশে চালু হবার কথা ছিল, যার অভাবে আজ আমাদের সমাজ অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন, সেটি না হবার পেছনে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও দর্শনগত বহু কারণ কাজ করেছে। অভিন্ন কারণে তাতে

www.pathagar.com

নানান ভুল বুঝাবুঝিও কম অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। কিন্তু আত্মিক উন্নতিবিহীন নিছক দৈহিক উন্নতির দর্শনকেন্দ্রিক শিক্ষা নীতির যেই 'সুফল' আমরা আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে প্রত্যক্ষ করছি, এরপরও যদি আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের কাছে দেহ-আত্মার সম-উন্নতির ধারক শিক্ষা নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হয়, তাহলে এটা দেশ জাতির জন্যে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। কারণ, তখন এটা প্রমাণিত হবে যে, সবকিছু জেনে শুনেও দেহ-আত্মার সম-উন্নতি বিধানকারী শিক্ষানীতি দেশে চালু না করে আমরা নিজেরাই আমাদের নাগরিকদের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি থেকে বঞ্চিত রাখছি এবং নিছক দৈহিক উন্নতির সহায়ক শিক্ষাব্যবস্থা দেশে চালু করে তাদেরকে সমাজবিরোধী, সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, মাদকাসক্ত এমনকি পিতামাতার হত্যাকারীরূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করছি।

এই বিপুল অস্ত্রসম্ভার কার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে?

[প্রকাশ ঃ ৩. ৭. ২০০৩ ইং]

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তলে তলে কতবড় ষড়যন্ত্র চলছে, বগুড়ায় উদ্ধারকৃত বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের সন্ধান তারই বড় প্রমাণ। আনারসের আবরণে ঢাকা ট্রাকভর্তি বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৬২ হাজার রাউন্ড গুলী এবং ১১৪ কেজি বিস্ফোরক। বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এটাই এ যাবত উদ্ধারকৃত সর্ববৃহৎ গোলাবারুদ। জনৈক সেনা কর্মকর্তার বক্তব্য হলো, ধৃত বিস্ফোরক দ্রব্য এত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন যে, এর মাত্র ২শ গ্রাম দ্বারা একটি ৫তলা ভবন উড়িয়ে দেয়া সম্ভব।

বগুড়ার কাহালুতে ধরাপড়া আনারস আবৃত অস্ত্রবোঝাই ট্রাকটি কোনো নির্দিষ্ট বাহিনীর পরিকল্পিত প্রহরার ফলশ্রুতি নয়। ঘটনাচক্রে জনগণের সন্দেহ থেকে পুলিশকে খবর দেয়া এবং তারপর "কেঁচো খুঁড়তে এই গোখরা সাপ" বের হয়ে আসে। এই বিরাট অস্ত্র সম্ভার নিশ্চয়ই শিশু-কিশোরদের 'খেলনা' হিসাবে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে আনা হয়নি। এর একেকটি বুলেট দ্বারা অন্তত একটি লোক মারার অভিপ্রায় এবং বিপুল বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত এদেশের বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করার ভয়াবহ দুরভিসন্ধিই নিঃসন্দেহে এর পেছনে সক্রিয়। এদেশের বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলে ধৃত এই হাজার হাজার অস্ত্রের টার্গেট হয়তো এ অঞ্চলের কয়েকটি জেলার হাজার হাজার মানুষ অথবা তা স্থানান্তর করা গেলে দেশের অন্যান্য জেলার হাজার হাজার মানুষ এর টার্গেট হতো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এত কৌশল করে কারা এসব অস্ত্র এনেছে, কাদের হত্যা করার জন্যে এই বিরাট আয়োজন। এই আয়োজনটি কোন্ হত্যাকারীদের নেপথ্য সন্ত্রাসী তৎপরতার পরিণতি? এসবের স্থানীয় এজেন্ট হিসাবেই বা কারা নিয়োগপ্রাপ্ত? এসমস্ত প্রশ্ন দেশের যে কোনো মানুষের। কেন না তাদেরও আশংকা যদি তারাও এর শিকার হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

এই সাথে আরেকটি বড় প্রশ্ন হলো, এ তো ঘটনাচক্রে আনারস পাবার ইচ্ছা থেকে অস্ত্রভর্তি ট্রাকটি ধরা পড়লো, কিন্তু দেশের ঐ অঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চল, বিশেষ করে সীমান্ত সংলগ্ন জেলাসমূহে এভাবে আম-আনারস ও কাঁঠাল ইত্যাদি ফলে আবৃত হয়ে এ জাতীয় আরও যে বহু অস্ত্রের ট্রাক দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি, তার কি নিশ্চয়তা রয়েছে? বিরাজমান পরিস্থিতির বিভিন্ন ঘটনা তো এ সন্দেহকেই প্রবল করে তোলে। উল্লেখিত ধৃত ট্রাকটির মতো ফলভর্তি কত ট্রাকই না আমাদের বিভিন্ন প্রহরীদের চোখের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করে। বিভিন্ন অভিযোগ অনুযায়ী ঐসব ট্রাক থেকে কয়েক টাকা পেলেই তো সংশ্লিষ্ট অনেকে খুশি। ঐগুলোর অভ্যন্তরে বিরাট অস্ত্রভান্ডার লুকায়িত থাকলেও সেসব দেখার মতো যে কেউ নেই। ঘটনাক্রমে ধৃত বগুড়ার ট্রাকটিই তার বড় প্রমাণ। হবিগঞ্জের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বগুড়া পর্যন্ত আসাতে ঘটনার অসতর্কতাজনিত দিকটিও উদ্বেগজনক কম নয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী বগুড়া থেকে উদ্ধারকৃত এসব গুলী ও বিস্ফোরক দ্রব্যের সাথে আওয়ামী লীগের জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছেন। তিনি আওয়ামী লীগের হরতাল, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড, হরতালের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ইত্যাদি উল্লেখ করে বলেন, দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও পরশু সংসদে এজন্যে একই অভিযোগে দলটিকে অভিযুক্ত করেছেন। বগুড়া জেলার দুপচাচিয়া থানা পুলিশ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন কৃষক লীগ নেতা আখলাকুর রহমান পিন্টুর বাড়ী থেকে চাইনিজ রাইফেলের হাজার হাজার গুলীসহ সর্বমোট ৬২ হাজার ১০০টি গুলী উদ্ধার করেছে। ৫৭টি প্যাকেট বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যও পুলিশ উদ্ধার করেছে। এই অভিযোগে পলাতক কৃষকলীগ নেতা আখলাকুর রহমান পিন্টুসহ ট্রাকের ড্রাইভার ও হেলপারদেরকে গ্রেফতারের জোর প্রচেষ্টা চলছে।

দেশের একটি রাজনৈতিক দলের ব্যাপারে আনীত এজাতীয় অভিযোগ সত্য হলে সেটা যে দেশ-জাতির জন্যে কত ভয়াবহ এবং উদ্বেগজনক তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে অভিযুক্ত দলটির দলীয় প্রধানের হুমকি-ধমকি, অপরকে হত্যার প্রকাশ্য উস্কানি, তার অগণতান্ত্রিক ও আক্রমণাত্মক ভূমিকার সাথে এই অভিযোগকে মিলিয়ে দেখলে এ ব্যাপারে উদ্বেগ আরও অধিক বেড়ে যায়। কারণ কোথাও অস্ত্রের রাজনীতি শুরু হলে সেখানে গণতন্ত্র আর স্থান পায় না। হিংসা-প্রতিহিংসার আগুনেই সংশ্লিষ্ট জাতিকে জ্বলে-পুড়ে মরতে হয়। পৃথিবীর এ জাতীয় অন্যান্য সংঘাত-বিক্ষুব্ধ দেশই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং তার অগ্রগতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিরাট অস্ত্রসম্ভার উদ্ধারের ঘটনাটির পশ্চাৎভূমির প্রতি তাকালে, তার যেই প্রধান কারণটি আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, সেটা স্পষ্ট। তা হলো কোনো খুন-হত্যাকাণ্ড এমনকি বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা কয়েক ডজনের মতো লোককে হত্যা এবং বিপুল অংকের বেআইনী অস্ত্রের অস্তিত্ব, বড় ধরনের উৎকোচ ও বড় অংকের

www.pathagar.com

চোরাকারবারী, বিপুল অর্থমূল্যের জাতীয় সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদি অপরাধের সাথে রাজনীতির সম্পৃক্ততা থাকলে এ জাতীয় অপরাধের বিচার না হওয়া ও তাতে দীর্ঘসূত্রতার সংস্কৃতিই এই নাশকতামূলক তৎপরতার প্রধান কারণ। এই গরীব দেশটিতে জঘন্য অপরাধসমূহের এই প্রবণতাই বর্তমান নাজুক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। উল্লেখ্য শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস বৃদ্ধির কারণও একই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট ক্যাম্পাসে স্বাধীনতার পর থেকে ছাত্র সংঘর্ষ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে এ পর্যন্ত ৭০ জন নিহত হয়েছে। কিন্তু বুয়েটের ছাত্রী সনি ছাড়া কোনো হত্যা মামলার রায়ে কারো শাস্তি হয়নি। ডাঃ শামসুল আলম মিলন হত্যা মামলায় সাক্ষীর অভাবে কারো কোনো শাস্তি হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্টরা মামলা করারও সাহস দেখায়নি। পুলিশ নিজে বাদী হয়ে যেসব মামলা করেছে, তার প্রতিটিতে আসামীরা ছিল অজ্ঞাত। ১৯৭৪ সালে সংঘটিত সেভেন মার্ডার মামলা হয়েছিল সামরিক আদালতে। ১৯৭৮ ওই মামলার রায়ে কয়েক জনের কারাদন্ড হয়। এছাড়া বেসামরিক আদালতে কারও কোনো শাস্তির নজির নেই। আমাদের দেশে এই একই রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গ হলো কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বা তার কোনো নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে উল্লেখিত ধরনের অপরাধের অভিযোগ উত্থাপিত হলে, সাথে সাথে কোনো বিবৃতি কিংবা প্রেস কনফারেন্স ডেকে ঘটনাটি ভিত্তিহীন, সাজানো, মিথ্যা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ইত্যাদি মার্কামারা কথা বলে তা অস্বীকার করে বসা। অতঃপর আইনের দর্পণে সেই অস্বীকৃতিসূচক বিবৃতি পরীক্ষা-অনুসন্ধান না করে ঘটনাটিকে বিস্মৃতির দিকে ঠেলে দেয়া। অতীতের বিভিন্ন সরকারের আমল থেকে চলে আসা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাদুষ্ট মারাত্মক অপরাধসমূহ ধামাচাপা পড়ার এই গণবিরোধী সংস্কৃতিই আজ এদেশ ও জাতির অস্তিত্বের বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক কারণজনিত এই অপরাধসমূহ আর কিছুতেই চলতে দেয়া যেতে পারে না। জাতির পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। ব্যাপারটি বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারের আমলেই বেশি সংঘটিত হওয়া এবং বেসামরিক প্রশাসনের তুলনায় সামরিক ধরনের কোনো অভিযানে অপরাধী বেশি ধরা পড়ার কারণ কোথায়, দেশবাসীর কাছে এটা আজ বড় জিজ্ঞাসা হয়ে দেখা দিয়েছে।

কারও কারও মতে রাজনৈতিক সরকারগুলোতে দলে বা মন্ত্রিত্বে দায়িত্বদানকালে লোক বাছাইর সময় যোগ্যতা, দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার চাইতে বৈধ-অবৈধ পন্থায় বিপুল অর্থবিত্তের অধিকারী হওয়াকে অগ্রাধিকারের মানদণ্ড বানানোর কারণেই রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা দুষ্ট অপরাধসমূহের বিচার হয় না, অথচ সামরিক লোকদের যৌথ অভিযানে এরূপ অপরাধীরা ঠিকই ধরা পড়ে। সে অনুযায়ী ধরপাকড় ও বিচার শুরু হলেই এ নিয়ে ক্ষমতাশীন ও ক্ষমতাহীন রাজনৈতিক মহলের চেহারা মলিন হয়ে ওঠে। এমনকি তখন মানবাধিকারের ধুয়া তোলা হয়।

আশার কথা যে, রাজনৈতিক কারণজনিত অপরাধসমূহের বিচার না হবার সংস্কৃতি থেকে সৃষ্ট অপরাধসমূহের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় যৌথ অভিযানের সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণে কথা ঘোষণা করেছেন। ফলে তার এ ঘোষণা বিষয়টির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টিকে

www.pathagar.com

অধিক আকৃষ্ট ও আশান্বিত করেছে। কারণ, জনগণ ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছে যে, এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপ বৈষম্যবোধের ঊর্ধ্বে থাকে। কেননা তাঁর বহু সমর্থকও গতবারের পদক্ষেপের হাত থেকে রেহাই পায়নি। দেশের সর্বত্র এ জাতীয় অপরাধ ও সন্ত্রাসী তৎপরতার যেই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী সম্ভাব্য এই পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন, জনগণ এর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গ্রহণের আরেকটি কারণ হলো, রাজনৈতিক ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কোনো কোনো মহল থেকে মানবাধিকারের দরদ উথলে ওঠা জনগণ দেখেছে, যখন ঐসব খুনী ডাকাত সন্ত্রাসী জনসম্পদ ধ্বংসকারী সমাজের নিরপরাধ মানুষের প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তখনই ওসব অপকর্মকে তারা সাক্ষী বানিয়ে দেশ চালানোতে সরকারের ব্যর্থতার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে। নেপথ্যে অপরাধীদের প্রশ্রয়দাতা এ শ্রেণীর নেতৃত্বে এই দ্বিমুখী ভূমিকার রাজনীতি জনগণ বহুবার দেখেছে। এভাবে প্রতারিত এ দেশবাসী এখন সব ধরে ফেলেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ জনগণ শুধু সমর্থনই নয় অতীতের চাইতেও তা প্রতিরোধে যে অধিক এগিয়ে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

অপরাধের ধরন ও চরিত্রের প্রেক্ষিতে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাসৃষ্ট অপরাধ দমনকল্পে সাধারণ অপরাধ দমন প্রক্রিয়া স্থায়ী সাফল্য আনতে ব্যর্থ হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন এরূপ অপরাধীদের বিরুদ্ধে গোটা জাতির মধ্যে দেশপ্রেমসমৃদ্ধ ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলা আর তা তখনই হতে পারে যখন দেশের একজন নাগরিক মনে করবে যে, এ শ্রেণীর অপরাধী মূলত গোটা সমাজ ও জাতি সত্তারই বিরোধী আর জনমনে এ ধারণা সেই রাজনৈতিক সরকারই দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে পারে, যাদের সংগঠন সদস্যরা বৈধ বিত্তের অধিকারী দক্ষ লোকদের সমন্বয়ে গঠিত। বর্তমান জোট সরকার এ ভূমিকা পালনের দ্বারা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাদুষ্ট অপরাধীদের বিচারে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করুন জনগণ এটাই চায়।

বাংলাদেশের যুবশক্তি কি এভাবে খুনাখুনি করে শেষ হতে থাকবে?

[প্রকাশ ঃ ২৫. ৬. ২০০৩ ইং]

৫০-এর দশকের প্রথমার্ধে ভাষা আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে দেশের মানুষের মধ্যে অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐ সময়, এমনকি তার পরবর্তী সময়েও কোথাও আন্দোলন বা অন্য কোনো কারণে কোনো ছাত্র মারা গেলে, তখন সরকারী ও বিরোধী দলীয় উভয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এজন্যে দুঃখ ও শোক প্রকাশ করা হতো। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশে কোনো একজন তরুণ বা যুবক গুলীবিদ্ধ ও রক্তাক্ত হলে সাধারণভাবে আগে চিন্তা করা হয় যে, যুবক বা তরুণটি কোন দলভুক্ত? সে হিসাবে তার প্রতি নিজের মনোভাব স্থির করা

www.pathagar.com

হয়। কথাটা যদিও শুনতে পীড়াদায়ক কিন্তু এটাই যে বাস্তব, তা দেশের যেকোনো নাগরিকই নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলে সঠিক জবাব পেয়ে যাবে। এজাতীয় বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর খবর ও সংবাদপত্র পাঠে সময় আমাদের অনেকের দৃষ্টি এদিকে যায় না যে, সংশ্লিষ্ট গুলীবিদ্ধ নিহত যুবকটিকে যেই মা-বাবা শৈশব থেকে বহু প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে কষ্ট-পরিশ্রমে লালন-পালন করে বড় করলো, বহু অর্থ ব্যয়ে লেখাপড়া শিখালো, ছেলে বড় হয়ে মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করবে, বার্ধক্যের অক্ষম দিনগুলোতে তার উপার্জন দ্বারা বাকি জীবনটি সুখে- কাটাবে, মা-বাবার সেই বুকভরা স্বপ্ন, সেই আশা-আকাঙ্খার এখন কি হবে? নিহতের মা-বাবা কিভাবে তাদের অন্তরকে সান্ত্বনা দেবে? কোটি কোটি টাকা দ্বারাও কি ছেলের ক্ষতি পূরণের কাজ হবে? যেই পরিবারে নিহত যুবকটিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, যার উপার্জনের উপর নির্ভরশীল পরিবারের শিশু, বৃদ্ধ সকলের জীবিকা, শিশু-কিশোরদের লেখাপড়া, পরিবারের সকলের চিকিৎসা, তার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে সংশ্লিষ্ট পরিবারে কি যে ঘোর অমানিশা নেমে আসে, সেই ভয়াবহ দৃশ্যের কথা কেউ কি একবারের জন্যেও চিন্তা করে? অথচ ভোরবেলা সংবাদপত্র হাতে আসার সাথে সাথেই প্রায় প্রতিদিনই প্রথমে নজরে পড়ে এধরনের বেদনাদায়ক খুন-হত্যার খবরাদি।

খুন হওয়া যুবক সে যে দলেরই হোক, তার পরিচয় যাই থাকুক, দৈনিক খুন, পাল্টা খুনের দ্বারা এভাবে দেশের যুবশক্তি নিঃশেষ হতে থাকবে আর তাদের মোরুব্বী সংগঠনের নেতারা দল-অঙ্গদলের সেই নিহত যুবকটির জন্যে শোক প্রকাশ, এজন্যে অপরকে অভিযুক্তকরণ, লাশ নিয়ে রাজনৈতিক ময়দান উত্তপ্ত করার মধ্যদিয়ে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্যেই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করবেন, -এটাই কি এ জটিল সমস্যার একমাত্র সমাধান? এতে তো দিনের দিন হিংসা, প্রতিহিংসা, সন্ত্রাস, পাল্টা সন্ত্রাসের ক্ষেত্রই প্রশস্ত হতে থাকবে। জাতীয় নেতৃবৃন্দ অন্তত এজন্যে কি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের বর্তমান খুন, পাল্টা খুনের মূল কার্যকারণ চিহ্নিত করে শান্তির কোনো গণতান্ত্রিক আইনানুগ পন্থা উদ্ভাবন করতে পারেন না? এটাতো আজ স্পষ্ট যে, বর্তমানে সমাজে যেই সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ রাজনীতি ও জড়িত হয়েছে। সাধারণ অপরাধপ্রবণতা আর রাজনীতিআশ্রিত অপরাধপ্রবণতা বা সন্ত্রাস দুই জিনিস। উভয়টিই সমাজের জন্যে মারাত্মক। এই দুই প্রবণতাই এখন একাকার হয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। অন্য নানাবিধ কারণসহ আমাদের পুলিশ প্রশাসনের নানান ইচ্ছা-অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কারণে বর্তমানে সন্ত্রাসীরা দৌরাত্ম্যের শীর্ষে অবস্থান করছে। এর সাথে রাজনীতি আশ্রিত সন্ত্রাস-পাল্টা সন্ত্রাস জড়িত হয়ে, এই ঘটনাবলীর মধ্যদিয়ে পরিস্থিতি যে কত ভয়াবহ আকার ধারণ করছে পারে সকলেরই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, একথা আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভেবে দেখার সময় এসেছে। শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ অশান্ত পরিস্থিতির আলোকেই নয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেও দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক নেতৃত্বের এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। বিশেষ করে অন্তত এই

www.pathagar.com

ইস্যুটিকে সামনে রেখে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বানে সরকারের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা কর্তব্য। এ ধরনের একটি উদ্যোগে দেশবাসীও সন্তুষ্ট হবে বলেই আশা করা যায়। তখন সকলেই জানতে ও দেখতে পারবে যে, সমাজে বিরাজমান সাধারণ সন্ত্রাসী তৎপরতার সাথে রাজনীতিআশ্রিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূলে কারা আগ্রহী আর কারা আগ্রহী নয়। কারণ, এমনিতে সকলেই তো এই পরিস্থিতির জন্যে একে অপরের উপর দোষ চাপায় এবং সন্ত্রাসী দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাবার জন্যে কারও উদ্বেগের অন্ত নেই। সকলে যৌথভাবে বসলে এক দিকে এসবের মূল কার্যকারণ জনগণের সামনে আসবে, অপরদিকে জনগণের জানার সুযোগ হবে যে, কারা দেশ-জাতির জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর এই তৎপরতা নির্মূলে বদ্ধপরিকর আর কারা নয়।

দেশ-জাতির ঐক্যবদ্ধ নিঃস্বার্থ সেবা'র মানসিকতা যে কোনো জাতীয় সমস্যার সমাধানে সহায়ক না হয়ে পারে না। সমাজে এজন্যে গণতান্ত্রিক সহনশীলতা অবশ্যই থাকতে হবে। অন্যায়ভাবে স্বমতের প্রাধান্য দানের প্রবণতা কিংবা প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভঙ্গি সংশ্লিষ্ট সকলেরই পরিহার করে চলতে হবে। রাজনীতির সাথে দেশের কোটি কোটি মানুষের সমস্যাবলীর সমাধানের প্রশ্ন জড়িত। এক্ষেত্রে যে কারণেই হোক, নিজেদের অন্যায় মত অপরের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা অবশ্যই বর্জনীয়। এই প্রবণতা দ্বারা কোনো সময় বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমতার স্পর্শ পাওয়া গেলেও তার পরিণতি যে শুভ হয় না বরং জনগণও শেষ পর্যন্ত পাল্টে গিয়ে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এদেশে নিকট ও দূর অতীতে বহুবার তা লক্ষ্য করা গেছে।

দীর্ঘ মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন উত্থান-পতন ও বিপর্যয়ের ঘটনাবলীর প্রতি তাকালে আমাদের সামনে এ সত্যই বার বার প্রতিভাত হয়ে উঠে। গোটা মুসলিম উম্মাহ্র উপর যত বিপর্যয় এসেছে, ঐগুলোর প্রত্যেকটিরই প্রধানতম কারণ ছিল মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত। নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা। আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক পারস্পরিক ঐক্য বজায় না রেখে অনৈক্য ও দ্বিধাবিভক্তির শিকারে পরিণত হওয়া। ঐতিহাসিক বাগদাদ নগরীতে হালাকু খানের ধ্বংসযজ্ঞের পটভূমি কি ছিল? প্রশাসনের অনৈক্যই এই বিদেশী আগ্রাসী শক্তিকে দাওয়াত দিয়ে এনেছিল। প্রধানমন্ত্রী ইবনে আলকামীর সাথে খলীফা পুত্রের মনোমালিন্যকে কেন্দ্র করে ইবনে আলকামী হালাকু খাঁকে বাগদাদ আক্রমণের জন্যে গোপন চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন। তারপরও হালাকু এই প্রাচীন নগরীর উপর আক্রমণের সাহস করছিল না। পুনরায় প্রধানমন্ত্রী তাকে এই বলে অভয় দিয়ে পত্র পাঠান যে, অন্য এক অজুহাতে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে বাগদাদের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং অনায়াসেই বাগদাদ দখল করা যাবে। আলকামী হয়তো ভেবেছিলেন, হালাকু খাঁ বাগদাদ দখল করে তাকেই সেখানকার কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। কিন্তু ইতিহাস হলো তার উল্টো। মুসলিম অনৈক্যের পরিণতিতে বাগদাদে

www.pathagar.com

লাখো মুসলমানের রক্তের ঢেউ বয়ে গেল। ধ্বংস হলো দীর্ঘদিনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপায়-উপকরণ। তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রাণসত্তা বাগদাদের পতন মুসলিম অনৈক্যের কলঙ্কজনক পরিণতির সাক্ষ্য হয়ে রইল। কারবালার রক্তাক্ত বিয়োগান্ত ঘটনাও এ মাটিতেই সংঘটিত হয়েছে। আর কারণও ছিল অভিন্ন। ইহুদী ষড়যন্ত্রকারী আবদুল্লাহ বিন সাবার অনুচরদের দ্বারা খলীফা উসমানের শাহাদাতের মধ্য দিয়ে মুসলিম অনৈক্যের যেই পটভূমি রচিত হয়েছিল, তারই পরিণত রূপ ছিল কারবালার ঘটনা। দীর্ঘ ৭শ বছর স্পেন শাসন করার পর মুসলমানদের অনৈক্যের নির্মম পরিণতি হিসাবেই সেখানে তৎকালীন প্রতিবেশী খ্রিস্টান রাজ্যগুলো মুসলিম স্পেনে রক্তগঙ্গা বয়ে দিয়েছিল। মুসলমানদেরকে নির্মূল করা হয়েছিল স্পেন থেকে। সেই কর্ডোভা গ্র্যানাডা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম গৌরবোজ্জ্বল অতীতের আজও নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।

যেই পলাশীর বিপর্যয়ের বেদনাদায়ক স্মৃতি হিসাবে ২৩শে জুন আমরা পালন করলাম, এই পলাশী দিবসও কি মুসলমানদের অনৈক্যের নির্মম পরিণতি ছিল না? যদ্দরুন শুধু এদেশকেই নয়, গোটা হিমালয়ান উপমহাদেশকেও দীর্ঘ পৌনে দু'শ বছর পরাধীনতার অক্টোপাসে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল? মুসলমানরা পুরো ভারতের শাসক থাকলেও শেষে তা থেকে বঞ্চিত হয়ে এর ক্ষুদ্র দু'টি অংশ নিয়ে থাকতে হয়েছে। তারই এক অংশ হচ্ছে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, এর উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের জন্যে যেখানে দেশের মানুষের মধ্যে ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আমরা পারস্পরিক রাজনৈতিক হীনস্বার্থে অনৈক্যে লিপ্ত হয়ে এখানকার জনজীবনকেই দুর্বিষহ করিনি, নিজেদের অস্তিত্বকেও আজ হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছি। সুতরাং আজ দলমত নির্বিশেষে আমাদের কর্তব্য, অতীত ইতিহাসের সেসব অনৈক্যের পরিণতির কথা স্মরণ করে নিজেদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে বাংলা দেশকে একটি নিরুপদ্রব আবাসস্থলে পরিণত করার লক্ষ্যে সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং সকল হিংসা-প্রতিহিংসা ভুলে যাওয়া।

আমাদের ক্ষয়িষ্ণু পারিবারিক কাঠামো ও ক্রমবর্ধমান সামাজিক অপরাধপ্রবণতা

[প্রকাশ ঃ ১১. ৬. ২০০৩ ইং]

আমাদের সমাজ এমনিতেই সমস্যা বহুল। এসব সমস্যা হ্রাস করার জন্যে চিন্তা, গবেষণা, আলোচনা, পরিকল্পনা কর্মসূচীর কোনো অন্ত নেই। কিন্তু সমস্যামুক্তির বদলে আমরা যেন দিনের দিন সমস্যার বেড়াজালে অধিক জড়িয়ে যাচ্ছি। একটি দূর করার উদ্যোগ নিয়ে তা মাথায় নেয়ার আগেই দেখা দিচ্ছে নতুন আরেক সমস্যা। তারপরও এটা এত উদ্বেগজনক হতো না, যদি আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে ঐক্য-সংহতি বিরাজমান থাকতো। সেই ঐক্যবল ও যৌথ শক্তিসামর্থ্য প্রয়োগ করে জাতীয় জীবনের যে কোনো জটিল সমস্যারই মোকাবেলা করা যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়,

www.pathagar.com

আমাদের মধ্যে সেই ঐক্যের অভাবে না আমরা নিজেদের সমস্যাবলী হ্রাস করতে পারছি, না দূর হচ্ছে আমাদের সামাজিক অস্থিরতা। বর্তমানে তো সামাজিক অপরাধপ্রবণতা, খুন, ডাকাতি ও সন্ত্রাসের দৌরাত্ম্য সমাজে বড় সমস্যাই হয়ে দেখা দিয়েছে, যা আমাদের দেশ গড়ার পথে নিঃসন্দেহে অন্তরায় সৃষ্টি করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই সমস্যা এখন বহুমাত্রিকতার রূপ নিয়ে তার ধরন-প্রকৃতি ও চরিত্রগত শাখা-প্রশাখারও বিস্তার ঘটছে, যার কোনো কোনোটির ধরন দেখে রীতিমতো বিস্মিত হতে হচ্ছে।

সন্তানের হাতে পিতা-মাতার খুন হওয়া এবং আরও অন্যবিধ অশ্রাব্য ঘটনা তারই বড় প্রমাণ, যা স্মৃতিতে আনতেও যে কোনো মানুষের মন ভারাক্রান্ত না হয়ে পারে না। এ সংক্রান্ত বেদনাদায়ক ঘটনাবলীর আরও হতাশাজনক দিক হলো, যে সব সন্তানের হাতে জন্মদাতা পিতাকে ছুরিকাঘাতে বা অন্যভাবে নিজের জীবন দিতে হলো, সে সব সন্তান সেই বর্বরযুগের ও প্রাক সভ্যতাযুগের কোনো মূর্খ সন্তান নয়, বরং পুরোপুরি শিক্ষিত অথচ জন্মের পর থেকে এ সন্তানেরই লালন-পালনের দুঃখ-কষ্ট, রোগব্যাধিতে তাকে নিয়ে অস্থিরচিত্তে বিনিদ্র রজনি যাপন, নিজের চরম কষ্টার্জিত অর্থে তার শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, নিজে আর্থিক কষ্ট পেয়েও সন্তানের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের প্রতি পূর্ণ নজর দান, কোনো কর্তব্যই এমন পিতামাতা বাদ রাখেননি। আশা তো ছিল একটাই যে সে বার্ধক্যে পিতা-মাতার কল্যাণে আসবে, তাদের মুখ উজ্জ্বল করবে, বিশেষ করে বার্ধক্যের দুর্বিষহ দিনগুলোতে বিরাট অবলম্বন হিসাবে সন্তান কাজে আসবে। কিন্তু সব কষ্ট-পরিশ্রম, সব আশা-প্রত্যাশাকে ধূলিসাৎ করে সন্তান পিতা-মাতার সাথে এ কি আচরণ করলো? কেন করলো? এই অস্বাভাবিক অকল্পনীয় মর্মান্তিক ঘটনা কি করে তার পক্ষে সম্ভব হলো, তার এই মানসিকতার মূল কার্যকরণ কোথায়, তা কি আমরা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি? চেয়েছি কোনো সময় এর মূলে যেতে? রোগের মূলকারণ চিহ্নিত না করে রোগ রোগ করে শত চিৎকার দিলে তার কিছুই উপশম হবে না। কেউ হয়তো বলতে পারেন, সমাজবিজ্ঞানীরা তো এ সব ঘটনার বহু দিক নিয়েই আলোচনা করেন, তারপরও এমনটি কেন হচ্ছে?

এর কারণ সম্পর্কে আলোচনায় যাবার আগে শুধু সম্প্রতি সংঘটিত পুত্রের হাতে পিতা খুন হবার মাত্র দুটি ঘটনাই এখানে আলোচনার প্রয়াস পাবো। এর একটি ঘটেছে অতি সম্প্রতি রাজশাহীতে। রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজের উপাধ্যক্ষ নজরুল ইসলামকে (৫০) তার ছেলে ও ছেলের বন্ধুরাই খুন করেছে। গত ১৪ই এপ্রিল বিকেলে উপাধ্যক্ষ নজরুল তার কলেজ থেকে বাড়ী ফিরেই খুন হন। তবে বোধগম্য কারণেই পরিবারের পক্ষ থেকে এই চরম বেদনাদায়ক ঘটনা গোপন করা হয় এবং সবাইকে বলা হয় যে, তিনি হার্টএটাকে মারা গেছেন। কিন্তু কথায় বলে, খুনী তার অপরাধের চিহ্ন লুকাবার শত চেষ্টা করলেও কিছু না কিছু চিহ্ন থেকেই যায়। পুলিশ অন্য হত্যাকাণ্ডের তদন্তে গেলে উপাধ্যক্ষ নজরুলের হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। রাজশাহী মহানগরীর একটি স্কুলের দশম শ্রেণীর নিহত ছাত্র ফিজার (১৪) এর লাশ পাওয়া যায়

www.pathagar.com

গোদাই নামক স্থানে। শিক্ষাবোর্ডের মনোগ্রাম ছাপানো ফিজারের লাশভর্তি বস্তাকে সূত্র ধরে গত ৫ই মে বাড়ী ভাড়া নেয়ার অছিলায় পুলিশ উপাধ্যক্ষ নজরুলের বাসায় যায়। অনুরূপ আরো বস্তা উপাধ্যক্ষের বাসায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশের সন্দেহ বদ্ধমূল হয়। অতঃপর এই বস্তার সূত্র ধরে পুলিশ নিহত ফিজারের বোনের বাসায় যায়। বোন চুমকি খাতুনের কাছে পুলিশ জানতে পায় তার নিহত ভাই ফিজার কিছু দিন আগে রাতে বাড়ী ফিরে তাকে বলেছিল, উপাধ্যক্ষ নজরুলের ছেলেসহ তার বন্ধুরা একটি বড় অপরাধ করে ফেলেছে, উপাধ্যক্ষকে খুন করেছে। বয়সে ছোট বলে বোন চুমকি ভাইয়ের কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। এই বক্তব্যকে অবলম্বন করে পুলিশ ফিজারের বন্ধু বাবু, রাজেশ এবং আরিফকে সবজি পাড়ার বাসা থেকে গ্রেফতার করে। তারা জানায়, ফিজার উপাধ্যক্ষ নজরুল হত্যার বিষয়টি ফাঁস করে দিতে চাওয়ায় তারা ফিজারকে খুন করেছে। উপাধ্যক্ষের ছেলে বাবু স্বীকার করে যে, সে ফেনসিডিলে আসক্ত থাকায় বাড়ী থেকে প্রতিদিনই টাকা নিত। তার বাবা টাকা বন্ধ করে দেয়ায় সে তার বন্ধু রাজেশ, আরিফ এবং ফিজার মিলে তার বাবাকে খুন করে। পরিবারের অন্যদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে চার বন্ধু চেতনা নাশক ট্যাবলেট এনে গুঁড়া করে তরকারীতে মিশিয়ে দেয়। তাতে তিনি ভাত খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন নাইলনের রশি পেঁচিয়ে চারজনে শ্বাসরুদ্ধ করে উপাধ্যক্ষকে খুন করে।

ছেলের হাতে ছুরিকাঘাতে খুনের অপর চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে ২৪শে এপ্রিল (০৩) রাজধানীর অভিজাত গুলশান এলাকায়। পিতাও নামি দামী লোক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সচিব এ কে মূসা। তিনি তাঁর পুত্র ইমরান ইসলাম মূসার (৩৮) হাতে নিহত হন। থানায় ঘটনার দিন নিহত এ কে মূসা ড্রইংরুমে বসে টিভি দেখছিলেন। এ সময় পুত্র মদ্যপ অবস্থায় ড্রইংরুমে আসে এবং পিতার সাথে অসংলগ্ন কথাবার্তা শুরু করে। এক পর্যায়ে ইমরান ফল কাটার ছোরা পিতার বুকে বসিয়ে দেয়। সাথে সাথে জনাব মূসা সোফার উপর ঢলে পড়েন। এমন সময় ইমরানের বোন মিতা দৌড়ে এসে চিৎকার দেয়। প্রতিবেশীরাও ছুটে আসে এবং গুলশান থানায় খবর দেয়। হাসপাতালে নেয়ার পথে জনাব মূসা মারা যান। মদ্যপ ইমরান জানায়, ঐ সময় তার মাকে পেলেও সে হত্যা করতো। প্রতিবেশীরা জানায়, সে মদ্যপ ছিল। প্রায়ই টাকা পয়সার জন্যে মা-বাপের সাথে দুর্ব্যবহার করতো। তার কামরায় বহু দামী বিদেশী মদের বোতল পাওয়া যায়।

আমাদের সমাজে প্রায় প্রতিদিনই আজকাল হত্যাকাণ্ড ঘটছে। কিন্তু ইতিপূর্বে সংঘটিত সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতা হত্যার অন্যান্য ঘটনাসহ হালের এই দুটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা একথাই প্রমাণ করে যে, আমাদের সমাজের যুব তরুণদের অপরাধ প্রবণতা বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, যার হাত থেকে পরিবারের আপন লোক এমনকি জন্মদাতা মাতা-পিতাও রেহাই পাচ্ছে না। পরিস্থিতির এই চরম অবনতির মূল কারণ পর্যালোচনায় অনেক সমাজ পণ্ডিতই হয়তো অনেক কথা বলবেন, কিন্তু আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে একথাই বলতে চাই যে, এটা হচ্ছে মানব স্রষ্টার প্রদত্ত

www.pathagar.com

পরিবার গঠন প্রক্রিয়া অমান্য করার ফল এবং পশ্চিমা ভোগবাদী জীবন দর্শন ও জীবনাচারেরই অবশ্যম্ভবী নির্মম পরিণতি, যা আমাদের ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজের পারিবারিক কাঠামোকে আজ নানাভাবে তিলে তিলে -ধ্বংস করে সর্বনাশের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এখন এটি পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা আমাদের গোটা জাতিসত্তার জন্য এক মস্তবড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শত আইনের বাঁধনেও তা রোধ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। আমরা লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে পশ্চিমা ভোগবাদী জীবনদর্শন ও জীবনাচার আত্মস্থ করে 'জাতে ওঠার' এই বানর অনুকরণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে নিজেকে ও জাতিকে ধ্বংসের যেই অতল গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছি, পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে আমাদের সম্বিত ফিরে আসা উচিত। স্মরণ রাখা দরকার যে, পাশ্চাত্য জীবনদর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গোটা মানবজাতিকে যা দিয়েছে, তা পুরোপুরি এক অসম্পূর্ণ জীবন চেতনারই ফল যা মানুষকে নিছক ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক আত্মপূজারী জীবে পরিণত করা ছাড়া তার সৎ গুণাবলী বিকাশের কোনো উপাদান এই দর্শনে নেই। তাদের বৈষয়িক সকল আবিষ্কার মানবজাতির বাহ্যিক সত্তারই সেবা দিচ্ছে, তাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটার কিছুই নেই। এটা একমাত্র তওহীদ, রেসালত ও আখেরাতভিত্তিক জীবনদর্শন ও জীবনচেতনার দ্বারাই সম্ভব। পরজীবনে মহাস্রষ্টার কাছে ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতার তীব্র ও সার্বক্ষণিক অনুভূতিই শুধু পারে মানুষকে কাঙ্ক্ষিত মানুষে পরিণত করতে। এটাই যে বাস্তব, বস্তুবাদী সভ্যতার অকল্পনীয় চাকচিক্য সত্ত্বেও এই সভ্যতা-সংস্কৃতির হোতাদের মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য পাশবিক মনোবৃত্তি এবং সার্বিক মানব কল্যাণে তাদের অনুসৃত নীতির চরম ব্যর্থতাই এর বড় প্রমাণ।

সুতরাং আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক বর্তমান দুরবস্থার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত পারিবারিক জীবনকাঠামোর দিকে। ইসলাম পরিবার গঠনের যেসব নিয়মবিধি দিয়েছে, সেই অমোঘ নিয়ম বিধিই একমাত্র পালনীয়। কেননা, মহান স্রষ্টা আল্লাহ মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন। তিনি জানেন, কিভাবে তার ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন গঠন করতে হবে, যার উপর ভিত্তি করে গঠিত হবে আল্লাহর অনুগত কাঙ্খিত মানবসমাজ।

পরিবার হচ্ছে জাতি রাষ্ট্রের প্রথম স্তর। গোটা জাতি সৌধের প্রাথমিক ভিত্তি কাঠামো হচ্ছে পরিবার। সমাজ ও জাতিসত্তা বা রাষ্ট্র হচ্ছে পরিবারেরই বিকশিত রূপ। ব্যক্তি নিয়েই পরিবার, পরিবার নিয়েই সমাজ বা রাষ্ট্র। এর মূল ভিত্তি 'ব্যক্তি মানুষ' গড়ে ওঠার পারিবারিক পরিমণ্ডল যদি ক্রটিপূর্ণ হয়, এর রাষ্ট্র ও সমাজরূপ সৌধটি অবশ্যই ক্রটিপূর্ণ হতে বাধ্য। এ কারণেই মহান আল্লাহ স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পরিবারকে লক্ষ্য করে নির্দেশ করেছেন ঃ

'কূ আনফুসাকুম ওয়া আহ্‌লীকুম নারা'

-"তোমরা নিজেকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।"

আল্লাহর নবী নির্দেশ করেছেন ঃ মুরো আওলাদাকুম ইযা বালাগূ সাবআ'ন, ওয়াদ্‌রিবূহুম্‌ ইযা বালাগূ আশারা অর্থাৎ -"তোমরা সন্তানদিগকে সাত বছরে পৌঁছুলে

www.pathagar.com

নামাজের নির্দেশ করো আর দশ বছরে উপনীত হলে কঠোরতা প্রয়োগে হলেও তাদের নামাজে অভ্যস্থ করে তোলো।" মহান আল্লাহ্ সমাজ বিনির্মাণের প্রাথমিক সোপানকে আদর্শিক দিক থেকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তোলার জন্যে আরও নানানভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা তোমাদের নিকটতম বংশ-গোত্রস্থ লোকদেরকে ও প্রতিবেশীদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতাজনিত শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দাও।" শুধু তাই নয়, সন্তানকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তুলবে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্র পরম বন্ধু মহাত্যাগী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উদ্ধৃত একটি মুনাজাত থেকেও তার স্পষ্ট পথনির্দেশনা মিলে। যেমন, তিনি তাঁর বংশধরদের জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ

"হে প্রভু পরোয়ারদেগার! এমন একজন বাণীবাহক তাদের মধ্যে পাঠাও সে যেন তোমার আয়াত বা নিদর্শনসমূহ মানুষকে পড়ে পড়ে শুনাতে পারে এবং তাদেরকে তোমার কিতাবের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দিতে ও জ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয়াদির তালীম দিতে পারে আর পরিশুদ্ধ করতে পারে তাদের আত্মাসমূহকে (অর্থাৎ তাদের চিন্তা-মননকে নির্ভেজাল করে তাদেরকে আল্লাহ্র অনুগত সৎপ্রবণ বান্দারূপে গড়ে তুলতে পারে)।

সুতরাং এ থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো পিতা-মাতার সন্তান সম্পর্কিত প্রাথমিক কর্তব্য হলো এই যে, (১) তারা তাদের সন্তানকে এমন শিক্ষায় প্রথম শিক্ষিত করে তুলবে, যাতে সন্তান আল্লাহ্র আয়াতসমূহের উল্লেখিত খোদায়ী নির্দেশসমূহ নিজে বুঝে ও মেনে চলতে পারে এবং অপরকেও তা পড়ে পড়ে শোনাবার ও বুঝাবার যোগ্যতার অধিকারী হয়।

(২) প্রতিটি মাতা-পিতার কর্তব্য হলো, সন্তানকে এভাবে আল্লাহ্র কিতাব শিক্ষাদান করা যেন তারা সেই কিতাব (কুরআন) অপরকে তালীম বা শিক্ষা দেয়ার যোগ্যতা রাখে। আর যোগ্যতা রাখে সূক্ষ্ম জ্ঞান অপরকে শিক্ষা দেয়ার।

(৩) তৃতীয় যেই বিষয়টি এখানে স্পষ্ট সেটা হলো ঃ সন্তানকে এমনভাবে কিতাবের শিক্ষক বানাবে, সে যেন মানুষের অসৎ প্রবণতা দূরীকরণ ও তার মধ্যেও সৎপ্রবণতা সৃষ্টির দ্বারা তার আত্মা ও চিন্তা-মননকে পরিশুদ্ধ ও সৎপ্রবণ করে তোলার যোগ্যতা অর্জন করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ইসলাম ও কুরআন পাঠানো হয়েছে বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষের পথ নির্দেশনার জন্যে। সে পথপ্রদর্শক গ্রন্থের শিক্ষার আলোকে আমাদের পারিবারিক জীবন গঠনেই আসবে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাবলী থেকে মুক্তি। অন্যথায় খোদায়ী বাণী অনুসারেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইহ-পারলৌকিক উভয় লোকে আমাদের কঠোর পরিণতির জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে, যেই পরিণতি আমরা এখন ভোগ করে চলেছি।

কেউ স্বীকার করুন আর না করুন, আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি পারিবারিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত এই দর্শনের ভিত্তিতে রচিত হওয়া ছাড়া সমস্যা মুক্তির বিকল্প কোন পথ নেই।

www.pathagar.com

মার্কিনী বক্তব্য : "ইসলামী সরকার হতে দেবো না"

[প্রকাশ ঃ ৪. ৬. ২০০৩ ইং]

গত ২৭শে মে ওয়ালস্ট্রীট জার্নালে প্রকাশিত এক তথ্য মতে, মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামস ফেল্ড বলেছেন, ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের পতনের পর সেখানে ইরানের মতো ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেবে না। তিনি বলেন, সাদ্দামের পতনের পর ইরাকের প্রতিবেশী দেশগুলো সেখানে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, যা ওয়াশিংটন কখনও মেনে নেবে না। রামস ফেল্ড বলেন, ইরাক পুনর্গঠনে প্রতিবেশী দেশগুলোর সহযোগিতাকে আমরা স্বাগত জানাব, তবে সরকার বা এর ধরন-প্রকৃতি কি হবে সে ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না তথা কারও মতামত ও প্রভাব খাটানোকে বরদাশ্‌ত করা হবে না।

এ কথা সকলেরই জানা যে, ইরাকের প্রতিবেশী দেশ বলতে এখানে ইরানকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ, বিবিসির আরেক খবরে মার্কিন সূত্রের বরাত দিয়ে এটা স্পষ্টই বলে দেয়া হয়েছে যে, ইরানের ইসলামী সরকার বদলাতে হবে, ইরান তার দেশে আল-কায়েদা পোষন করে এবং ইরাকেও সে তার আল-কায়েদা বাহিনী পাঠিয়েছে। সেখানে তারা ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী তুলছে। ইরানকে অবশ্যই ইরাক থেকে তার দেশ থেকে আগত আল-কায়েদা সদস্যদের সরিয়ে নিতে হবে। একই খবরে এও বলা হয় যে, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ করছে। আমরা চাই না যে, দেশটি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করুক।

উল্লেখ্য, এসব খবর আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে তখনই আসে যখন মার্কিনবাহিনীর হাতে বাগদাদের পতনের পর সেখানে লক্ষ জনতা মার্কিনবিরোধী শ্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং ইরাকের শাসন ক্ষমতা ইরাকবাসীদের হাতে ছেড়ে দেয়ার দাবী জানিয়ে সে দেশে ইসলামী আইন প্রবর্তনের সংকল্প ব্যক্ত করে।

এসব ঘটনা থেকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে একথাটি আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আসলে মার্কিনীদের পরিভাষায় 'আল-কায়েদা' বলতে সেসব ধর্মপ্রাণ মুসলমানকেই বুঝানো হয়, যারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের আইন-বিধিসমূহ নিজ নিজ রাষ্ট্রে চালুর দ্বারা সন্ত্রাস ও শোষনমুক্ত কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রত।

'সন্ত্রাস বলতে সাধারণত যা বুঝায় এর সাথে এসব ইসলামী লোকের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও তারা আল-কায়েদা, উসামা বিন লাদেনের অনুসারী। উসামা এবং আল-কায়েদা বলতে যে বা যাদেরকে বুঝানো হচ্ছে, তাদের কাজ কোনো নিরপেক্ষ আদালতে দলীল প্রমাণ দ্বারা আপত্তিকর বলে কখনও প্রমাণিত না হলেও এই শ্লোগান, এই প্রতীকী শব্দই এখন দেশে দেশে ইসলামী লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগে আনয়ন

www.pathagar.com

করা হচ্ছে। তার পূর্বে এ শ্রেণীর ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে অভিন্ন মতলবে কয়েক বছর ধরে বেশী বেশী উচ্চারিত হয়েছে 'মৌলবাদী' চরমপন্থী (Fundamentalist) ইত্যাদি শব্দ। পঞ্চাশ ষাটের দশকে একই লক্ষ্যে উল্লেখিত ধরনের ইসলামপন্থীদেরকে রক্ষণশীল, (Reactionary) বলে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু বিশ্বময় যতই পাশ্চাত্য ভোগবাদী জীবনবোধ ও জীবনাচারের অন্তসারশূন্যতা নগ্নভাবে প্রকাশিত পেতে থাকে আর তারই পাশাপাশি মুসলিম সমাজের আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে সৃষ্ট হতাশার মাঝে স্বকীয়তাবোধের উন্মেষ ও ইসলামী পুনর্জাগরণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো, তখনই এই পরিভাষা বদলিয়ে মৌলবাদী শব্দের আমদানী ঘটলো। এই গালিটি মূলতঃ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে অযৌক্তিক সমালোচনাকারী খ্রিস্টান ধর্মের এক শ্রেণীর পাদরীর ক্ষেত্রে পশ্চিমারা ব্যবহার করতো। তাতে ঐ সমাজের আধুনিকমনা শিক্ষিতদের কাছে তাদের ভাব মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। এমনকি বিজ্ঞানবিরোধী ঐ সব গোড়া পাদরীকে শেষ পর্যন্ত তারা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে অবসর দিয়ে সম্পূর্ণ গীর্জাকেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় কাজে পাঠিয়ে দেয়। খ্রিস্টান ঐ ধর্ম যাজকরা শেষে সমাজ সেবামূলক কাজে ও এর আড়ালে ধর্ম প্রচারেই নিয়োজিত থাকেন।

'রাজনীতি ও ধর্ম'কে এভাবে আলাদা করণে সফল হবার পশ্চিমা অভিজ্ঞতাকেই তারা মূলতঃ ইসলামী আন্দোলন ও এর বিভিন্ন নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু দেখা গেলো, 'মৌলবাদী' গালিটি আজকের মুসলিম বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনকারীদের বেলায় তেমন জোৎসই হচ্ছে না। বরং খ্রিস্টান সমাজের মৌলবাদী বা Fundamentalist শব্দটি ঐ সমাজে লক্ষ্য অর্জনে সফল হলেও মুসলিম সমাজে তাতে তেমন কাজ হচ্ছে না। এই গালির মূল পটভূমি ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যারা অনবহিত, তারাতো এই শব্দ ব্যবহারে ইতিবাচক আরেক ধারণা নিয়েই মৌলবাদীদের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠতে থাকে। তারা মনে করতে থাকে, যারা মূল নিয়ে থাকে তারাই মৌলবাদী। আর সত্য ধর্ম ও খোদায়ী বিধান হবার দিক থেকে কুরআন ইসলাম ও শেষ নবীর আদর্শই-তো হলো মূল ও খাটি। সুতরাং এই মৌলবাদ ও তার অনুসারী মৌলবাদীরাই তো সঠিক পথের অনুসারী। বলাবাহুল্য, এসব কারণে মৌলবাদ ও মৌলবাদী গালি দ্বারা বিশ্বময় ইসলামী আন্দোলন ঠেকাবার কাজ তেমন সুবিধাজনক না হওয়াতেই তার সাথে হালে যোগ করা হয় 'আল-কায়েদা', যা সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে আফগানিস্তানে প্রথম ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পরে একই শব্দ যখন অন্য দেশের গণতন্ত্রকামী শান্তিপ্রিয় ইসলামী সংগঠন বা কোনো দেশের ন্যায্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বেলায়ও গালি হিসাবে মিডিয়ার সাহায্যে মাত্রাতিরিক্তভাবে ব্যবহার শুরু হয়, তখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রথম "সন্ত্রাসী অভিযানে' শরীক হয়েছিল, তাদের অনেকেই বিষয়টির আসল রহস্য ধরে ফেলে এবং তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, বিশ্বময় ইসলামী রেনেসাঁ দমন এবং কোনো কোনো ভূ-খণ্ডের মুসলমানদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের ন্যায্য সংগ্রাম প্রতিরোধের

www.pathagar.com

নিন্দাসূচক শব্দ হিসাবেই মূলতঃ আল-কায়েদা, জঙ্গী ইসলামী চরমপন্থী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার চলছে। এই অনুভূতি থেকেই কোনো কোনো দেশের রাষ্ট্র প্রধানতো খোলা-খুলিই বলে দিয়েছেন যে, উসামা, উসামাপন্থী আল-কায়েদা ইত্যাদি নামের আসলেই কারও অস্তিত্ব বর্তমানে আছে, না কি এটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আমেরিকার উচ্চারিত শব্দ, তা এখন এক বিরাট জিজ্ঞাসা হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ইরাকে ইসলামী রাষ্ট্রের দাবীদার লাখো ইরাকী জনতাকে ইরান থেকে পাঠানো ইরানী সরকারের পোষ্য আল-কায়েদা বলে যখন আখ্যায়িত করা হয় এবং এ জন্যে ইরানের বিরুদ্ধেও হুমকি-ধমকী প্রদর্শিত হতে থাকে, তখন অনেকেই অবাক হয়েছে। কারণ, ইরান সরকার আগাগোড়াই আল-কায়েদা বা তালেবান বিরোধী ছিল বরং আফগানিস্তানে যাদেরকে আল-কায়েদা বা তালেবান বলা হতো, তারা সে দেশের ক্ষমতায় থাকাবস্থায় ইরানের সাথে আফগানিস্তানের যুদ্ধ বাধার পর্যন্ত উপক্রম হয়েছিল। পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে ছিল যে, আফগান সীমান্তে লাখো ইরানী সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছিল। তখন মুসলিম বিশ্বের নামি দামি ব্যক্তিদের অনুরোধে ইরানী বিজ্ঞ নেতারা আফগানিস্তানের উপর হামলা থেকে বিরত থাকেন। তাই সেই ইরানকেই আল-কায়েদার পৃষ্ঠপোষক বলে অভিযুক্ত করাতে সকলেই এখন এটা ধরে নিতে বাধ্য হয়েছে যে, 'আল-কায়েদা' অস্ত্রটি আসলে এখন বিশ্বের এমন সকল ধার্মিক মুসলমানের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত এক অস্ত্র ছাড়া কিছু নয়। যারা হয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠা চায় নতুবা নিজেদের প্রিয় মাতৃভূমির হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে লিপ্ত, তারাই এই অস্ত্রবাণে বিদ্ধ হবে।

১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ারে রহস্যপূর্ণ আত্মঘাতী হামলার প্রতিশোধ হিসাবে পরে বহু "১১ই সেপ্টেম্বর" ঘটানো হলেও আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র এ ঘটনার প্রকৃত অপরাধী প্রমাণে সক্ষম হয়নি। সেই প্রমাণ কোনো দিন পেশ করতে পারবে কিনা তাও সন্দেহ। তাই বিশ্বের অনেক পর্যবেক্ষকের ধারণা, টুইন টাওয়ারের ভয়াবহ ঘটনা ঘটানোর মতো প্রযুক্তি একমাত্র ইসরাইল ও তার পরম বন্ধুদেরই আছে, উসামা বা কোনো মুসলমানের কাছে তা থাকার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই মুসলিম দেশসমূহ ও ইসলামী উম্মাহর বিরুদ্ধে আক্রমণের ছুতা হিসাবে সেখান থেকেই এ ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকবে। অন্যথায় আক্রান্ত ভবনে হাজার হাজার ইহুদী চাকরি করলেও ঘটনার দিন কেন তারা সেখান থেকে অনুপস্থিতি?

যাহোক, তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রেসিডেন্ট বুশ যেই উত্তেজনাকর বক্তব্য এবং সন্ত্রাসবিরোধী যেই দীর্ঘ যুদ্ধের সূচনার কথা বলেছিলেন, তখন এক পর্যায়ে তাঁর 'মুখ থেকে একে 'ক্রুসেডের যুদ্ধ' বলে ফেলা হয়েছিল, যা ছিল মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ঐতিহাসিক লড়াই। পরে তিনি মুসলিম উম্মাহ্র প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে হোক কিংবা অন্য উদ্দেশ্যে, ক্রুসেড শব্দটি প্রত্যাহার করে নেন এবং কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে ইসলামী শিক্ষা-আদর্শ ও মূল্যবোধের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতা দেন। তাঁর অনুগত দোসর বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী টনী ব্লেয়ারও গৌরবোজ্জল মুসলিম অতীত ও

www.pathagar.com

মানব সভ্যতায় মুসলমানদের ঐতিহাসিক অবদানসমূহ তুলে ধরে ভাষণ দেন। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বুশ-ব্লেয়ারদের প্রশংসিত সেই ইসলামের নীতি-আদর্শ যখন কোনো মুসলিম সংগঠন নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়, তখন কেন তারা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেন এবং তাদেরকে আল-কায়েদা ও সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য বলে আখ্যায়িত করেন, কঠোর হস্তে দমনে উঠে পড়ে লাগেন ঐসব মুসলমানকে? মুসলমানরাতো না সন্ত্রাসী, না তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করছে? জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী নিজেদের প্রাপ্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতারই অনুশীলনকল্পে তারা তা করে থাকেন।

তারপরও তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ইঙ্গ-মার্কিন উত্তেজনা থেকে দু'টি জিনিসই স্পষ্ট হয়ে উঠে। এক, বুশ-ব্লেয়াররা ইসলামের সুমহান শিক্ষা-আদর্শের প্রশংসায় যেই বক্তৃতা করেছিলেন, সেটি তাদের মনের কথা ছিল না বরং 'ক্রুসেড যুদ্ধ' বলে মনের যেই আসল কথাটি অলক্ষ্যে বের করে দিয়েছিলেন, তার প্রতিক্রিয়া রোধকল্পেই মুসলমানদের শান্ত রাখার উদ্দেশ্যে তা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে উৎখাত করার লক্ষ্যেই যে তারা বর্তমানে ক্রুসেডের লড়াই শুরু করেছেন, আজ সরাসরি ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকাশ্য বিরোধিতা এমনকি এজন্যে যুদ্ধের হুমকি থেকে তাই প্রমাণিত হচ্ছে। নতুবা আমেরিকার এককালের মহান মনীষী প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের সংজ্ঞায়িত গণতন্ত্র Government of the people, for the people and by the people অনুযায়ী যদি কোনো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান নিজেদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক সেখানে ইসলামী শাসন কায়েম করতে চায়, তারা কেন জাতিসংঘ প্রদত্ত নিজেদের সেই গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারবে না? তাহলে কি এটাই প্রমাণিত হলো যে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় এখন গণতন্ত্রের সেই স্বীকৃত সংজ্ঞাও প্রত্যাখ্যান করে সরাসরি বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদী নীতিরই অনুসারী হলো এবং সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধেই অবতীর্ণ হলো? যদি এটাই হয় আর বাস্তবেও তাই শুরু হয়েছে বলে প্রতীয়মান তাহলে কি আল-কায়েদা নামের আড়ালে ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা দ্বারা বিশ্বময় আরও ব্যাপক ও ভয়ানক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আগুনেই ঘৃতাহুতি দেয়া হলো না?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সন্ত্রাসী ও আল-কায়েদার প্রকাশিত নতুন অর্থ সম্পর্কে বিশ্ব মুসলিম অবহিত হবার পর তাদের ইসলাম বিরোধী এই অভিযান ইসলামের সাময়িক ক্ষতি করতে পারলেও তা কিছুতেই সফল হবার নয়: কেননা, ইসলামের বিরুদ্ধে এই অভিযান নতুন নয়, বহু পুরানো। সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নও দীর্ঘ ৭২ বছর ইসলাম উৎখাতের চেষ্টা কি কম করেছিল? কিন্তু ইসলাম এখনও আছে, থাকবে। অথচ নিজেরাই উৎখাত হয়েছে। এক্ষেত্রেও যে কোনোরূপ সামরিক অস্ত্র ও সামরিক প্রতিরোধ ছাড়াই এমন কিছু ঘটবে না, তা কে বলতে পারে? আল-কুরআনে উল্লেখিত অতীতের বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা তো তা-ই বলে।

www.pathagar.com

তবে আমাদের এই পর্যালোচনা যদি ভুল হয় এবং ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এখনও এটা বলতে চায় যে, তারা ইসলামের বিরোধী নয়, তাহলে বুঝতে হবে এরও একটি অর্থ রয়েছে। সেটা হলো ইসলামের দীর্ঘ অনুশীলনের ইতিহাস বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে ঔপনিবেশিক শাসনের জোঁয়াল চেপে বসা থেকে মুসলিম বিশ্বের মুক্তির পরবর্তী সময়টিতে ইসলাম সম্পর্কিত ধারণা। তা দু'রকম, একটি এর খণ্ডিত রূপ অপরটি পরিপূর্ণ রূপ, যা প্রতিষ্ঠার জন্যে শুরু হয়েছে ইসলামী রেনেসাঁ আর একেই উল্লেখিত শক্তি ভয় করছে। ইসলামের খণ্ডিত রূপ যা মাঝখানে কয়েকশ' বছর চলে আসছে, এর সাথে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব,কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও প্রশাসনের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যেই ইসলামের প্রশংসা করে এটিই হচ্ছে সেই ইসলাম। মনে হয় এই ইসলামের ব্যাপারে তাদের আপত্তি তো দূরের কথা বরং এজন্যে তারা নানানভাবে সহযোগিতা করতেও গররাজি নয়। বারান্তে এ নিয়ে আলোচনার প্রয়াস রইল।

বিশ্বময় সৃষ্ট গণ-চেতনাকে এগিয়ে নেয়াই সমস্যা উত্তরণের পথ

[প্রকাশ ঃ ২৮. ৫. ২০০৩ ইং]

ইরাকের উপর সম্পূর্ণ বেআইনী হামলার জন্যে যেখানে ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রদের কৈফিয়ত তলব ও আন্তর্জাতিক আদালতে এ নিয়ে বিচারের কথা বিশ্ববাসী ভাবছিল, সেক্ষেত্রে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ইরাকের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও স্পেনের প্রস্তাব অনুমোদন করায় এখন ইরাকের উপর তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব বৈধ হয়ে গেল। ইরাকের আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ, সেখানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন, ইরাকের তেল বিক্রি এবং নিজ খুশিমতো তা ব্যবহার ও বিভিন্ন দেশের সাথে এ সংক্রান্ত স্বাক্ষরিত চুক্তি ইত্যাদি বহাল রাখা না রাখা ইত্যাদি কর্তৃত্ব এখন যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ারেই দিয়ে দেয়া হলো বা তাদের এখতিয়ারে চলে গেলো। মোটকথা, জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাকে যা খুশি তা করার বৈধতা দিয়ে দিল। এটা করে জাতিসংঘ প্রকারান্তরে নিজ অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা নিজেই অস্বীকার করলো কি করলো না, সে প্রশ্নের দিকে এই মুহূর্তে না গিয়ে, জাতিসংঘের অনুমোদনের তাৎক্ষণিক ফল কি দাঁড়িয়েছে তা লক্ষ্য করা যাক। এ ব্যাপারে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, গত ২৬ শে মে, চীন ও রাশিয়ার সাথে ইরাকের স্বাক্ষরিত তেল চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র বাতিল করে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সরকার রাশিয়া এবং চীনের সঙ্গে তেল সংক্রান্ত তিনটি চুক্তি করেছিল। এই চুক্তি বাতিলের পর ইরাকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আরও কত কিছু বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকী তেল ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্যে উদগ্রীব ছিল। তারা ইতিপূর্বে

www.pathagar.com

বলে আসছিল যুদ্ধপরবর্তী ইরাককে পুনর্বাসনের জন্যে যুদ্ধের আগে স্বাক্ষরিত সকল চুক্তি পুনর্বিবেচনা করা হবে এবং খুব শিগগির নতুন চুক্তির কথা ঘোষণা করা হবে। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে যে, ইরাকের উপর হামলা করে এই গোছালো দেশটিকে ধ্বংস ও সবকিছু এলো মেলো করারই বা কে হুকুম দিয়েছিলো, আবার তার পুনর্গঠনের এই কসরতেরই বা পরিস্থিতি কেন সৃষ্টি করা হলো? রাশিয়ার সবচেয়ে বড় তেল কোম্পানী 'লুকওয়েল'পশ্চিম কুরনা এলাকায় তাদের স্বত্ব হারিয়েছে। এমনকি আল-আহদাফ তেলক্ষেত্র উন্নতির কথাবার্তা চলাকালে এক সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে চীনা কর্তৃপক্ষকেও বাদ দেয়া হয়েছে। তৃতীয় চুক্তিটি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। জাতিসংঘ নিরাপত্ত পরিষদের ইরাকে বরাদ্দ বৃদ্ধির একদিন পরেই মন্তব্যটি করা হলো। ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীনা কোম্পানীগুলো কয়েক বছর ইরাকে কাজ করার অনুমতি পেয়েছিল। কিন্তু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরাকের উপর অন্যায় ও অযৌক্তিক হামলার বিরোধিতা করার ফলে দেশগুলোর প্রতি এই আচরণ করা হলো। গত ২০শে মার্চ/০৩ মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনী ইরাকে হামলা করার পরই পর্যালোচকরা আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, বুশ প্রশাসন গণবিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংসের নামে ইরাকে তেল সম্পদ কুক্ষিগত করতে চায়। চীন ও রাশিয়ার সাথে ইরাকের তেল চুক্তি বাতিলের ফলে এখন সেই আশংকাই শুধু সত্যে প্রমাণিত হয়নি, এর মূল লক্ষ্য যে কত সুদূরপ্রসারী, বিশ্ববাসী হয়তো অচিরেই তা প্রত্যক্ষ করবে।

ইরাকের উপর আমেরিকার দখলদারিত্বকে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতিমূলক অনুমোদনে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদে একমাত্র সিরিয়া সমর্থন দেয়নি, তবে বিরোধিতাও করেনি, অনুপস্থিত ছিল। ফ্রান্স, জার্মানী এবং রাশিয়া প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দিয়েছে। কারণ, তারা মার্কিনী হুমকিতে শংকিত হয়েছে। ফ্রান্স, জার্মানী এবং রাশিয়ার পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবস্থা এই যে, তারা যুক্তরাষ্ট্র এবং তার প্রভাবাধীন পুঁজি বিনিয়োগকারী ও মাল্টি ন্যাশনালসের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। তিনটি দেশই জাতিসংঘের ঐসব পুঁজিবাদী শক্তির অর্থনৈতিক মুঠোয়। এসব সরকার যদিও নিজ নিজ দেশের স্বার্থ ও জনগণের ইচ্ছা-বাসনার প্রেক্ষিতে ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং বাধ্যবাধকতা আরোপের হুমকির ফলে, তারা নিজেদের অনুসৃত নীতি পাল্টাতে বাধ্য হয় এবং প্রস্তাবের অনুকূলেই তাদেরকে ভোট দিতে হয়। তা থেকে এই বাস্তবতাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যেসব সরকার আন্তর্জাতিক-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীন, তাদের পক্ষে মার্কিনী নতুন সাম্রাজ্যবাদের বলিষ্ঠ বিরোধিতা ও মোকাবিলা করার কোনো শক্তি নেই। রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানীর ন্যায় চীনেরও অবস্থা এই যে, সে তার অর্থনীতির জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী। তা সত্ত্বেও ন্যায় এবং সত্যের সপক্ষে কথা বলেই যেতে হবে। বিশ্বের প্রতিটি দেশের জনগণের চিন্তা-চেতনা এখন অভিন্নই বলা চলে। প্রায় এক কোটি মানুষ যেই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছে, তা বিফলে যেতে পারে না। এ

www.pathagar.com

দ্বারা বিশ্বময় অবশ্যই এক নতুন আন্দোলনের সূচনা ঘটেছে। ইউরোপীয় সরকারগুলো আমেরিকার সাথে থাকতে বাধ্য হলেও জনগণ যে তাদের সাথে নেই এবং মুসলিম বিশ্বের জনগণও নতুন মার্কিন সাম্রাজ্যকে গ্রহণ করতে রাজি নয়, তা স্পষ্ট। একারণে বাস্তবতার স্বাভাবিক দাবী অনুযায়ী বিশ্ব জনগোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী আর এই সংগ্রামে জনগণই জয়ী হবে।

আমেরিকা তার পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা সত্ত্বেও আফগানিস্তানের পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে পারেনি। ইরাকেও অনুরূপভাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবে বলে আলামতে বুঝা যাচ্ছে না। খোদ আমেরিকাও সেখানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক কারণে কতদূর আন্তরিক, তা এক প্রশ্ন হয়ে আছে। কারণ, এই অজুহাতে সে দু'বছর তার পুতুল সরকার ইরাকে রাখার কথা প্রচার করে আসছে। ইরাক সংকটে জাতিসংঘের অনুসৃত ভূমিকা এই বিশ্বসংস্থাকে ব্যর্থ ও গুরুত্বহীন করে দিয়েছে। রাশিয়া, ফ্রান্স এবং জার্মানী নিজেদের যেই অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে নতি স্বীকার করলো, সেই অর্থনৈতিক স্বার্থও তাদের কতদূর অর্জিত হবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বরং আমেরিকা তেলসহ যাবতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ করায়ত্ত করে সকলকে পেছনে ফেলার যেই পদক্ষেপ নিয়েছে, সেই পদক্ষেপের বদৌলই সবকিছুকে স্থায়ী রাখার প্রবণতা থাকারই লক্ষণ স্পষ্ট। তাই এর হাত থেকে রক্ষার পথ একটিই হতে পারে। তাহলো ইরাক যুদ্ধপর্বে বিশ্বময় ন্যায় ও সত্যের স্বপক্ষে যেই অভিন্ন জনমত গড়ে উঠেছে, তাকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্যে সকলের সচেষ্ট হওয়া।

আত্মঘাতী হামলা ও বিশ্বনেতৃত্বের ভাববার বিষয়

[প্রকাশ ঃ ২১. ৫. ২০০৩ ইং]

ফিলিস্তীনে সারাবছর কয়েক দিন পরপরই আত্মঘাতী হামলা ও প্রতিশোধমূলক ইসরাইলী হামলা হয়। তাতে তিন-চারগুণ বেশি ফিলিস্তিনীকে তারা হত্যা করে। তাদের বাড়ী-ঘর চূর্ণবিচূর্ণ করে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার পটভূমিতেই নতুন ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলা একের পর এক ঘটে চলেছে। ইরাক যুদ্ধের পর মুসলিম বিশ্বকেন্দ্রিক আত্মঘাতী এসব হামলা ও বিপুল সংখ্যক প্রাণহানির ঘটনাবলী রুটিন মাফিক চলছে। বড় ধরনের এই আত্মঘাতী হামলার প্রথমটি সৌদী আরবের রিয়াদে, তারপর মরক্কোয় কাসাব্লাংকাতে সংঘটিত হয়। এই চরিত্রের হামলা ও তাতে বিপুল সংখ্যক প্রাণহানিতে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত এবং উদ্বিগ্ন। এসব হামলার তীব্র নিন্দা-প্রতিবাদ চলছে চলবে।

নিজেকে নিজে ধ্বংস করার জন্য মানুষ যেই ধ্বংসাত্মক কাজ করে, তাকে প্রচলিত পরিভাষায় আত্মহত্যা বলা হয়। এভাবে নিজেকে আঘাত ও ধ্বংস করার সাথে সাথে

www.pathagar.com

অপরেরও প্রাণহানি ঘটাবার অভিপ্রায়ে যেই কাজের উদ্যোগ নেয়া হয়, তাকেই আত্মঘাতী হামলা বলা হয়। শুধু মানুষই নয় প্রাণী মাত্রের কাছেই সকল কিছুর চাইতে নিজের সত্তা, নিজের জীবনটাই একমাত্র প্রিয়। মানুষ সমাজিক জীব হিসাবে আপন পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, প্রিয়জন ও অর্থসম্পদ নিজ বাড়ী-ঘর সকল প্রিয় বস্তুর প্রতি যত ভালাবাসাই পোষণ করুক না কেন, প্রকৃতিগতভাবে নিজের জীবনের মায়াই থাকে তার কাছে বেশি। এ জগতে একজন মানুষের যত কষ্ট-পরিশ্রম, তৎপরতা, ন্যায়-অন্যায় প্রতিটি কাজের পেছনে দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, জীবনের ঝুঁকি নেয়া- এই স-ব কিছুই মূলত তার নিজ জীবনটিকে সুখীসমৃদ্ধ, পরিতৃপ্ত ও উপভোগ্য করে তোলার জন্যেই। কিন্তু যখন শোনা যায় যে, উমক আত্মহত্যা করেছে কিংবা আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে নিজেকে সহ বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করেছে, হামলার শিকার দেহগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, এই লোমহর্ষক খবরে কার না অন্তর কেঁদে ওঠে? কিন্তু হলে কি হবে, আজকাল এই আত্মঘাতী হামলা ও পরিণতিতে বিপুল প্রাণহানির ঘটনা উপর্যুপরি ঘটেই চলেছে আর সেটার তুলনামূলক বেশি অকুস্থলই হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোকে কেন্দ্র করে। এই সেদিন (১২ মে/ ০৩) সৌদী আরবের রিয়াদে আত্মঘাতী হামলায় ৯১ জনের বেশি নিহত ও শতাধিক ব্যক্তির গুরুতর আহতের ঘটনাটির আলোচনা ও নিন্দাবাদ শেষ হতে না হতেই ১৭ই মে/০৩ মরক্কোর বাণিজ্যিক রাজধানী কাসাব্লাংকাতে কয়েক দফা আত্মঘাতী বোমা হামলায় আবারও ৪১ জন নিহত ও ৭০ জনের আহতের ঘটনা ঘটেছে। রিয়াদের ঘটনা ঘটে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল সৌদী আরবে পৌঁছার কয়েক ঘন্টা আগে। মরক্কোর কাসাব্লাংকায় যুগপৎ ৫টি বোমা বিস্ফোরণে ১৩ জন আত্মঘাতী হামলাকারী সহ ৪১ জন নিহত হয়। মরক্কোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফা সোহেল শনিবার জানিয়েছেন, ১৪টি সন্ত্রাসী ৫টি দলে ভাগ হয়ে এই হামলা চালায়! তবে একজন ছাড়া সব সন্ত্রাসীই নিহত হয়। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করে অবশ্যই শাস্তি দেবে। স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ও আরবলীগ এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ঘটনা ঘটে শহরের একটি ইহুদী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, স্পেনীয় ক্লাব, রেস্টুরেন্ট ও বেলজীয় কনস্যুলেট অফিসে। এই হামলার দায় দায়িত্ব কেউ স্বীকার না করলেও তাৎক্ষণিভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে ওসামার আল-কায়েদা গোষ্ঠী বা তাদের সহযোগী অন্য কোন জঙ্গী সংগঠন এ হামলা চালিয়ে থাকতে পারে।

একজনের অপরাধে অপরজনকে শাস্তিদান, হয়রানি করা সম্পূর্ণ অন্যায়। সাধারণভাবে এ ধরনের কর্মকাণ্ডই অমানবিক। কারণ, এতে নিরপরাধ মানুষেরই প্রাণহানি ঘটে এবং ধ্বংস হয় মূল্যবান বিষয়-সম্পদ। মরক্কোসহ সাধারণভাবে সকল স্থান এবং বিশেষভাবে ইসলামের পবিত্র ভূমি খোদ্ সৌদী আরবেও এজাতীয় সন্ত্রাসী

www.pathagar.com

তৎপরতা গভীর উদ্বেগের বিষয়। কোনো বৈধ অথোরিটির আইনানুগ সিদ্ধান্ত ছাড়া জাতি ধর্ম, মত-পথ, দেশী-বিদেশী, স্বজাতি-বিজাতি, সাদা-কালা নির্বিশেষে কোনো মানুষ হত্যা করা কিংবা আত্মহত্যার মতো চরম জঘন্যতম পথ বেছে নেয়ার ঘটনা ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ, লক্ষ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞ কোনো জাতির লোকেরা নিজেদের অজ্ঞতা বশতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে বৈরিতা ও প্রতিরোধমূলক মনোভাব থেকে সন্ত্রাসী পথ বেছে নিলেও, আইনানুগ পন্থা ছাড়া ইসলাম কাউকে হত্যার ঘোর বিরোধী। কারণ, পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো- "একের অপরাধের বোঝা অপরে বহন করবে না।" অর্থাৎ যে অপরাধে লিপ্ত সেই অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে। তার অপরাধের বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপানো যাবে না।

এই বহুজাতিক পৃথিবীতে অপরের কাছে ইসলামের বাণী, এর শিক্ষা-আদর্শ পৌঁছাবার ধরন নির্দেশ করতে গিয়ে আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা গায়রুল্লাহ্‌র উপাসনাকারীদেরকে গালি দিও না, তাহলে বৈরী ভাবাপন্ন হয়ে অজ্ঞতা বশতঃ তারাও আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে।" অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে "তোমরা নিজেদের প্রভুর দিকে মানুষকে ডাকো বুদ্ধিবৃত্তিক তথা যুক্তিগ্রাহ্য পন্থায় ও সদুপদেশের মাধ্যমে।" এ সব খোদায়ী নির্দেশে বহুজাতিক এই পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্ম এবং মত ও পথের লোকদেরকে আল্লাহর বিধানের প্রতি আহ্বানের এক গণতান্ত্রিক সহনশীলতাপূর্ণ রীতিই ফুটে উঠে। ফুটে উঠে ইসলামের আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং পরমতসহিষ্ণুতার মধ্যদিয়ে খোদায়ী বিধান প্রচারের মহান শিক্ষা, যেই শিক্ষা শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সহাবস্থানের এক অনন্য দৃষ্টান্তও তুলে ধরে। বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, ইসলামের এই পথনির্দেশনার মধ্যদিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত এই অশান্ত মানবসমাজের উত্তেজনামুক্ত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠারও একটি গাইড লাইন সামনে আসে। মূলতঃ ইসলামের এই মানবিক ও শান্তিপূর্ণ আবেদনের ফলেই বিশ্বময় একদিন এর প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। অপর মত ও পথের মানুষ, অপর ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের ছায়াতলে আসাকে নিজের জন্য ধন্য মনে করেছে। এই যেখানে অবস্থা, সে ক্ষেত্রে মুসলমানের পক্ষ থেকে ইসলামের শিক্ষা-আদর্শ বিরোধী পন্থায় কিংবা জবরদস্তির আশ্রয় নিয়ে কাউকে মুসলমান বানাবার কোনো অবকাশ নেই। এরূপ কেউ ভাবে বলে আমরা মনেও করি না। তবুও কোনো বিশেষ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ইসলামের নীতিবিরোধী কোনো পদক্ষেপের দ্বারা কেউ ইসলামের দুর্নাম রটানোর নিমিত্ত সৃষ্টিকারী কিছু করলে, সেটার দায়িত্ব তাদেরই বহন করতে হবে, এ জন্যে কেউ গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌কে দোষারোপ করলে কিংবা এ জন্যে তাদের প্রতিশোধের শিকারে পরিণত করতে চাইলে, সেটা হবে আরেকটি জঘন্য অপরাধ ও বাড়াবাড়ি। এ কারণেই অনেকের ধারণা, কোনো প্রমাণ ছাড়া কথায় কথায় আল কায়েদা, উসামা, মুসলিম সন্ত্রাসী ইত্যাদি শব্দ মূলত মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের একটি বাহানা হিসাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

শুধু রিয়াদ, মরক্কো ও ফিলিস্তিনই নয়, পৃথিবীর অনেক ভূখণ্ডেই আজ ভয়াবহ আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটে চলেছে। এভাবে এসব ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চললে এই মাটির পৃথিবী মানুষের বাসেরই অনুপযোগী হয়ে উঠবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সকল মানবিক মূল্যবোধ এবং মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সকল নিয়মরীতি ও বিধি ব্যবস্থা।

এ জন্যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে চলমান বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় এখন অধিক ভাবতে হবে। ভাবতে হবে উত্তেজনামুক্ত ঠাণ্ডা মাথায়, কি করে পৃথিবীকে সন্ত্রাসমুক্ত করা যায় এবং মানব সমাজে ফিরিয়ে আনা যায় শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার।

আত্মহত্যা বা আত্মঘাতী হামলার মতো চরম ও প্রান্তিক পন্থা জঘন্য অপরাধ ও বর্বরতাপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এসব ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু কেন, এর সার্থকতা ও এর শেষ কোথায়? এখানে এসেই স্বাভাবিকভাবে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আগে এসমস্ত লোমহর্ষক মর্মান্তিক ঘটনাবলীর কারণসমূহ খুঁজে বের করতে হবে। অপর মানুষকে হত্যা করার জন্য আপন ধন-জন সকল কিছুর মায়া পরিহার করে আত্মহননের মানসিকতা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কেন সৃষ্টি হয়? কোন্ দুঃখ-যন্ত্রণার শিকার হয়ে তারা এই নির্মম পন্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কর্তব্য সেই জিজ্ঞাসার জবাব অনুসন্ধান করা। এ কারণটি উপেক্ষা করে পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের চিন্তা করা বাতুলতা বরং প্রহসন মাত্র। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরসহ মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এই নির্মম কাজটিই বছরকে বছর ধরে চলে আসলেও এ ব্যাপারে বিশ্বনেতৃত্বের প্রতিকারমূলক কোন উদ্যোগ নেই। পরন্তু বিশ্বদরবার ও পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত নিয়মবিধিকে উপেক্ষা করে তাদের মধ্যকার বড় বড় দায়িত্বশীলরা সাম্প্রতিককালে এমন সব ঘটনা ঘটিয়ে চলেছেন, পর্যবেক্ষকদের মত তাদের অনুসৃত নীতি এ জাতীয় অসংখ্য আত্মঘাতী হামলার নিমিত্তই সৃষ্টি করে চলেছে। মূলত এ কারণেই মরক্কোর আত্মঘাতী ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জ্ঞাপন করতে গিয়ে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন, "বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের যে বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন আন্তর্জাতিক আইন-কানুন উপেক্ষারও রয়েছে বিরাট ভূমিকা।"

এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, পৃথিবীর কোনো জনপদের মানুষ যখন জুলুম নিপীড়নের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে থাকে এবং তা থেকে রক্ষার আইনানুগ কোনো শক্তি তাদের পাশে এসে না দাঁড়ায়, তখনই সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষেরা জীবন-জগতের সকল মায়ামমতা ভুলে যেতে বাধ্য হয়। হাজারো হতাশা তাদের ঘিরে ফেলে। তখনই তারা এই নিপীড়ন বঞ্চনার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে বাঁচার চাইতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাকেই শ্রেয় মনে করে। এমতাবস্থায় আত্মহননকারী ঐ মজলুম মানুষদের জুলুমের প্রতিকার না করে এবং সংশ্লিষ্ট

www.pathagar.com

জালিমদেরকে জুলুম থেকে বিরত রাখার উদ্যোগ না নিয়ে যারা উল্টো তাদের সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে তাদের দ্বারা এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কিছুতেই হতে পারে না। ফিলিস্তিনী ও কাশ্মীরী জনগণ আজ অর্ধশতাধিক বছর ধরে এভাবেই নিজের মাতৃভূমি উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে জুলুম নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে। চেচনিয়ার জনগণও যাবতীয় অধিকার বঞ্চিত হয়ে বছরকে বছর নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববাসীর কাছে ন্যায়বিচার বঞ্চিত হয়েই যে তারা আত্মঘাতী হামলায় লিপ্ত, এই বাস্তবতা কিভাবে অস্বীকার করা যাবে? এই সত্য যতদিন বিশ্বনেতৃবৃন্দ উপলব্ধি না করবেন, মানবতা ও বিশ্বমানব সভ্যতার জন্য অবমানকর এই জঘন্য প্রবণতা রোধের যেমন কোনো সম্ভাবনা নেই, তেমনি তাদের ন্যায় নীতি বোধও জগদ্বাসীর কাছে প্রশ্ন বিদ্ধ থেকে যাবে। সুতরাং নেতৃবৃন্দও এটা স্বীকার না করে পারবেন না যে, যুগ যুগান্তরের অত্যাচারের বহিঃপ্রকাশ নিজের ও পরের অস্তিত্ব বিনাশের ব্যাপারটি আমাদের কাছে যতই নিন্দনীয় হোক, এর কার্যকারণ দূর করার উদ্যোগ আগে নিতে হবে, অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। এ নিপীড়িত মানুষেরা বিচারহীনভাবে আর কত কাল মার খেতে থাকবে? এই যে হাজারো মানুষকে ইরাকে হত্যা করা হলো, ইরাককে ধ্বংস করা হলো, যে গণবিধ্বংসী অস্ত্র রাখার অভিযোগে তা করা হলো, সে অস্ত্র আজ কোথায়? জাতিসংঘের ন্যায় বিশ্বদরবারকে উপক্ষো করে, বিশ্ব জনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অন্যায়ভাবে এ ধ্বংসলীলা চালানোর ফলে এখানেও হাজার হাজার উসামা হাতে ধরে সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া তৈরী হলো, এ জন্যে দায়ী কে? এসব ক্ষেত্রে সুবিচারের দাবী পূরণ করতে হবে। তাহলে বহু নিন্দিত এই আত্মঘাতী হামলা নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে, এ জন্যে বিশ্বময় এত তোড় জোড়েরও কোনো দরকার হবে না। রোগী প্রলাপ বকে তার জ্বরের তীব্রতায়। জ্বর চলে গেলেতো সে সুস্থই হয়ে গেল। তখন প্রলাপ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। এই সহজ সত্যটি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অন্যথায় প্রমাণিত হবে এটাই যে, সকল অঘটনের নাটের গুরু তারাই।

রাজনৈতিক অঙ্গনের অপসংস্কৃতি দূর হোক

[প্রকাশ ঃ ১৪. ৫. ২০০৩ ইং]

প্রত্যেক সরকারের আমলেই একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, সরকার সমর্থক বলে কথিত একশ্রেণীর লোক এবং সরকারী দলের একশ্রেণীর কর্মী-সমর্থক তাদের দল ক্ষমতায় যাওয়ার পরই হঠাৎ নিজেকে এমন শক্তিধর মনে করতে থাকে যে, তারাই এখন দেশের সর্বেসর্বা। তাদের উপর দিয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। ন্যায় বলুক অন্যায় বলুক সকলকেই তাদের কথা মেনে চলতে হবে। তারা অন্যায় করলেও

www.pathagar.com

কেউ তার প্রতিবাদ করতে পারবে না। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে থানায় কেউ কোনো কেইসও দায়ের করতে পারবে না। তাহলে ওসি-দারোগাকে বদলীর হুমকি শুনতে হবে। তারা সেই ভয়ে সরকার সমর্থকদের অমতে কেইস নথিভুক্ত করতে চায় না। কোথাও তার ব্যতিক্রম ঘটলে এবং থানা কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হলে বিবাদীদের দাপটে বাদীর পক্ষে বাড়ীঘরে থাকাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এমন একটি অশান্তিকর পরিস্থিতি যেমন কারও ভাল লাগবেনা, তেমনি কোনো সভ্য সমাজই তা মেনে নিতে পারেনা। বিশেষ করে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হওয়া এবং সরকার কর্তৃক তার কোনো প্রতিকার না করার অর্থই হবে দেশটিতে গণতন্ত্রকে দাঁড়াতে না দেওয়া বরং দলীয় স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠিত করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকাবস্থায় তার দলের কর্মী-সমর্থকদের এই অন্যায় আচরণকে চলতে দেয়া এবং তাদের কোনো প্রকার বিচার না করার অর্থই হলো, সরকারও চায় যে, তাদের ক্ষমতায় থাকাকালীন সংশ্লিষ্ট এলাকাটি এমনই থাকুক, যেন প্রতিপক্ষ মাথা তুলতে না পারে। কিন্তু কোনো সরকারের এহেন অনুসৃত ভূমিকার ফল শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়? তাতে যেমন জনগণের মধ্যে ক্ষমতাসীন সরকারের জনপ্রিয়তা ও সমর্থন বাড়ে না, তেমনি এর ফলে আইনের শাসন লজ্বিত হয়ে সমাজে জুলুম অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধিজনিত গণ অসন্তোষই তীব্রতর হয়ে ওঠে।

নিকট ও দূর অতীতে এদেশবাসী উল্লেখিত অন্যায় কাজে কর্মী-সমর্থকদের প্রশ্রয়দাতা প্রতিটি সরকারকে একারণেই গণধিকৃত অবস্থায়ই বিদায় নিতে দেখেছে। দেখেছে তাদের শাসনামলে অন্যায় দাপটের ঐ কর্মী-সমর্থকদেরও হয়রানী ও পাল্টা জুলুমের শিকার হতে। এভাবে এক সরকারের ক্ষমতা থেকে বিদায়, অপর সরকারের ক্ষমতা আরোহনের মধ্যদিয়ে সমাজ জীবনে যেই হিংসা প্রতিহিংসার সৃষ্টি হয়, তাতে শুধু জাতীয় ঐক্য-সংহতিই ব্যাহত হয় না, জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতিও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু কি তাই, গণবিক্ষোভ ও গণবিস্ফোরণের দ্বারা এভাবে ক্ষমতার হাত বদলের মধ্যদিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে প্রতিশোধ স্পৃহাও উত্তুঙ্গে উঠে। পরবর্তীতে সরকারের সদস্যবর্গ যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে জাতীয় অর্থ-স্বার্থের ক্ষতি করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও মামলা-মোকদ্দমা দায়ের হতে শুরু হয়। কিন্তু আবার মজার ব্যাপার ঘটে এই- ঐসব মামলা-মোকদ্দমার মাধ্যমে যেখানে ন্যায় বিচার ত্বরান্বিত ও জাতীয় আত্মসাৎকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করে পুনরায় জাতীয় তহবিলে ফিরিয়ে আনা, অপরাধীদের আদর্শ শাস্তি দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সৎ ও আদর্শ নাগরিক করার উদাহরণ তুলে ধরার কথা, সেক্ষেত্রে বিচারের বদলে দরকষাকষির জন্য তাঁদের রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করে রাখার প্রবণতাই অধিক কাজ করে। তাই দীর্ঘ দিন থেকে এদেশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিভিন্ন সরকার বদলের পর ক্ষমতার অপব্যবহারজনিত যে সব মামলা-মোকদ্দমা হয়ে থাকে, সে সব মামলা-মোকদ্দমা কিছু দিন চলতে থাকে, অতঃপর অর্ধেক পথে গিয়ে রাজনৈতিক দরকষাকষির পণ্যে পরিণত হয়। আবার কিছু হুমকির হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। এতে জনগণের কোনো স্বার্থ তো হয়ই না বরং এ জাতীয়

www.pathagar.com

প্রত্যেক অপরাধই যেন এখন রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবখানা এমন, যারা রাজনীতি করেন, তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, রাষ্ট্রদ্রোহীতা এজাতীয় অভিযোগ যত উঠুক, এই সংক্রান্ত যত মামলা-মোকদ্দমাই হোক, এস-ব কিছুই এদেশের রাজনীতির বিভিন্ন স্পেয়ার পার্টস। কারণ, কারুর মধ্যে এসব থাকলে তাতে দোষের কিছু নেই। মূলত এসব অপরাধের ক্ষেত্রে সমাজে এমন এক ধারণারই সৃষ্টির ফলে দেশের রাজনীতির স্বার্থজড়িত বিশেষ কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উঠলেও সেটাকে আর মানুষ তেমন দোষের কিছু মনে করে না। আবার সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত নেতা বা বিশিষ্ট ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদারও ইতর বিশেষ হ্রাস পায় না। বরং তিনি 'সাবেক' উমক সাহেব, তুমক সাহেব হিসাবে পরিচিতির বাড়তি বেনিফিট দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হন। এক সময় দেখা যায় 'সাবেক' উমক সাহেব তার ক্ষমতায় থাকাকালীন বিশেষ প্রক্রিয়ায় অর্জিত সেই অঢেল অর্থের জোরে ও খ্যাতিতে এবার নির্বাচনে "জনসমর্থন পুষ্ট" হয়ে মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছেন। এমতাবস্থায় স্বভাবতই সমাজের ব্যতিক্রমধর্মী সাধারণ চিন্তার মানুষদের মনে প্রশ্ন না জেগে পারে না যে, তা হলে উমক সাহেব ক্ষমতাচ্যুত বা ক্ষমতা হারাবার পর তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে সব মামলা হয়েছিল, ঐসব মামলার কি হলো? ঐ যে বলা হয়েছিল, উমক গদীতে থাকাবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি করে যে সব অঢেল অর্থ কামাই করেছে, সেগুলো এবার বাজেয়াপ্ত হবে এবং জনগণের অর্থ জনগণের তহবিলেই ফেরত আসবে, সেই অর্থেরই বা কি হলো? কে ভোগ করলো ঐ অর্থ?

আমাদের দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা বদল পর্বের এসব রাজনৈতিক মামলা-মোকদ্দমার এই হাল অবস্থা দেখে যদি জনগণ এটাই ধরে নেয় যে, এসব হচ্ছে এ দেশের রাজনীতির চরিত্র, তা হলে তাদের কোনো দোষ দেয়া যাবে না। বলার অপেক্ষা রাখেনা, আমাদের দেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এভাবেই দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। ফলে জনগণ এত বছর পরেও এটা টের পাচ্ছে না যে, কোন্ ক্ষমতাসীন দলটি এদেশবাসীর জনদরদী রাজনৈতিক দল ছিল আর কোন্‌টি গণবিরোধী। বিশেষ করে এক দল অতীতে ক্ষমতায় থাকার পর যখন সেটি নানান দুর্নামের বোঝা মাথায় নিয়ে ক্ষমতা থেকে অবতরণ করে তখন মনে হয়, জনগণ তার বা তাদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ ক্ষেপেছে ঐ দল আর তার কোনো লোক জীবনে এদেশের ক্ষমতায় আসার সুযোগ পাবে না। কিন্তু দেখা যায়, কয়েক বছর পরেই আবার সেই জনগণই ধিকৃত ঐ দলটিকে মাথায় নিয়ে নির্বাচনে তাকে জয়মাল্য পরিধান করায়। এটা কি ষড়ঋতুর এ দেশের মানুষের স্মৃতি হ্রাসজনিত কারণে ঘটে, না রাজনৈতিক অঙ্গনে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক স্বার্থে অনুসৃত নীতির সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দরুনই এমনটি হয়, এটা আজ বিরাট জিজ্ঞাসা হয়ে দেখা দিয়েছে।

এ জিজ্ঞাসা দেখা দিত না যদি জনগণ দেখতো যে, সাবেক সরকারের আমলে যেখানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ দুর্নীতির দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকারকারী

www.pathagar.com

একটি দেশ হওয়ায় বর্তমান সরকারের আমলে ন্যায়ের খাতিরে ঐ সব দুর্নীতিবাজদের বিচার হচ্ছে এবং দুর্নীতির অবৈধ সম্পদ সম্পত্তি যথা মালিকদের হাতে বা জাতীয় তহবিলে এনে জমা করা হচ্ছে। বরং উল্টো ঐ আমলের ক্ষমতাসীন শীর্ষ ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সহকর্মীরা বলে বেড়াচ্ছেন, গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশটিকে ক্ষমতাসীন সরকার ও তার অঙ্গদলসমূহের কর্মী-সমর্থকরা লুটেপুটে খেয়ে ফেলছে। এই সরকারের আর ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। অবিলম্বে ইস্তেফা দিয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া উচিত, নয়তো সরকারের বিরুদ্ধে সকলের জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলা কর্তব্য।

শুধু লুটপাটের অভিযোগই নয় বর্তমান জোট সরকারের বিরুদ্ধে সাবেক নেতা-নেত্রীরা এমন সব জুলুম- অত্যাচার ও গণতন্ত্র বিরোধিতার অভিযোগও তুলছেন, যেই জুলুম-অত্যাচার, লুটপাট, জবরদখল ও অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে সাবেক আওয়ামী সরকারের এত অধিক দাপট ও ক্ষমতার জৌলুস থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনে জনগণ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। যেমন, গত শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতারা আওয়ামী লীগ সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীরের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও অবিলম্বে দায়ী সকল অপরাধীর আইনানুগ বিচার ও শাস্তির দাবী করেছেন। ঐদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতারা এ হামলা সরকারের সর্বোচ্চ নির্দেশে হয়েছে বলে অভিযোগ করে বলেন, একজন রাজনৈতিক নেতার ওপর হামলা করে এ সরকার প্রমাণ করেছে, তারা জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। ধানমণ্ডিস্থ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য শাহ এএমএস কিবরিয়া। এ সময় দলের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতা-নেত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা অভিযোগে বলেন যে, দেশে যেভাবে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, তাতে আমরা আশঙ্কিত। "সরকারের সন্ত্রাসী"রা শুধু হামলাই নয় দলের কার্যালয় পুড়িয়ে দিয়েছে। আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দোকানপাটে হামলা চালিয়ে লুটপাট করেছে, তারা আরও অভিযোগ করেন যে, এ হামলা গণতন্ত্রের জন্য জঘন্য নজির। জোট সরকার নিজেরাই দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। দেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার নেই। সরকার গণতন্ত্রকে জবাই করছে। নিরপেক্ষ প্রশাসন বলতে কিছু নেই। প্রশাসন সম্পূর্ণ সরকারের 'তল্পিবাহক' এবং পুলিশ প্রশাসন আজ্ঞাবহ রূপে কাজ করছে। অতঃপর হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলা হয় যে, আজ যারা সরকারের ছত্রছায়ায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে ভবিষ্যতে তারাও এ থেকে মুক্তি পাবে না। অপরদিকে কচুয়া থানার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কিত খবরে প্রকাশ, কচুয়া উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যাদি ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও নেতা-কর্মীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীরের গাড়ীতে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনায় কচুয়ায় দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছে। গত শুক্রবার দিন তাই থানা সদরের লোকজন আতঙ্কিত ছিল। বৃহস্পতিবারের

www.pathagar.com

ঘটনায় আওয়ামী লীগ থানায় মামলা দায়ের করলে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়নি বলে দলীয় সূত্রের বরাতে প্রকাশ। এ ব্যাপারে নাকি সংশ্লিষ্ট থানার ওসি'র বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে "তিনি মন্ত্রীর ডিউটিতে রয়েছেন" বলে থানা থেকে জানানো হয়।

কচুয়া কেন্দ্রিক ঘটনাবলী ও এগুলোকে উপলক্ষ করে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সরকারের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছেন এবং ক্ষমতাসীন জোট সরকারের সমর্থকদের কর্মকাণ্ডের যেই চিত্র তারা তুলে ধরেছেন, এ সব অভিযোগ ও কর্মকাণ্ড কতদূর বাস্তবভিত্তিক এবং এ জন্যে প্রথমে কারা উস্কানিমূলক কাজ করেছে, সে ব্যাপারে অতীতের ন্যায় পুলিশ বিভাগ থেকে সরকারী কোনো প্রেস রিলিজ না থাকায় আমরা এ সম্পর্কে শুধু একথাই বলতে পারি যে, অভিযোগগুলো সত্য হলে, তা অবশ্যই অন্যায় নিন্দনীয়। বর্তমান জোট সরকার আমলেও সাবেক আওয়ামী সরকার আমলের মতো এ ধরনের ফ্যাসিবাদী অগণতান্ত্রিক জুলুম-নিপীড়নমূলক তৎপরতা জনগণ বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার থেকে আশা করে না। সরকারের কোনো সমর্থক গ্রুপ এমনটি করে থাকলে, নিশ্চয়ই তারা এসব কর্মকাণ্ডের দ্বারা না সরকারের কোনো কল্যাণ সাধন করছে, না তারা এ দ্বারা জনগণের কোনো উপকার করছে। বরং ঘটনা যদি সত্য হয়, প্রকারান্তরে তাদের এই কাজ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হবে যে, অতীত "লুটপাটের আওয়ামী শাসন, আওয়ামী রাজনীতি" আর বর্তমান শাসনামলের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। এ জন্যে সরকারের উচিত, কচুয়ার বাস্তব অবস্থা, সেখানকার ঘটনাবলীর মূল কার্যকারণসমূহ কি ছিল, এ ব্যাপারে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাবলীর ছবি তার পটভূমিসহ জনগণের সামনে তুলে ধরা। তা না হলে অতীতের মতোই রাজনৈতিক প্রচারণা, পাল্টা প্রচারণার দ্বারা জনগণ বিভ্রান্তিতে থেকে যাবে। তাতে ভবিষ্যত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে তাদের ভুল হয়ে যেতে পারে- যেই ভুলে আজ আমাদের দেশ এখনও দলাদলি, অনৈক্য, অসহনশীলতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতেই ব্যস্ত রয়েছে। অপরদিকে আমাদের প্রতিবেশী অন্যান্য দেশ তাদের বিভিন্ন পুরাতন সমস্যার সমাধান করে আজ স্বনির্ভরতার মর্যাদায় গিয়ে পৌঁছেছে। অথচ এদেশবাসী আজও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে চালিত হতে হতে তাদের কয়েক যুগ চলে গেছে। পুরাতন হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ, পাল্টা প্রতিশোধ, একের বিরুদ্ধে অপরের মিথ্যা অভিযোগ প্রচার, আবার সেই অভিযোগের বিচার না করে 'পুনরায়' তার সমাজ নেতৃত্ব পাবার অনুসৃত মতলবী নীতিতে কারুরই চলা সঙ্গত নয়। দেশবাসী এখন আর রাজনৈতিক দিক থেকে অনভিজ্ঞ নয় বরং তারা সকল সময় সঠিক সিদ্ধান্তই দিয়ে আসছে। তারা যদি বিভ্রান্তিতে পড়ে তো সেটা রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিপরীতধর্মী বৈষম্যমূলক নীতির দরুনই পড়ে। জনগণ আগামীতে যাতে এ ধরনের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আর নিজেদের ক্ষতির সম্মুখীন না করে, এদিকে যেমন সরকারের দায়িত্বশীলদের কড়া নজর থাকা প্রয়োজন, তেমনি বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছেও দেশবাসী দায়িত্বশীল ভূমিকাই আশা করে।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গ দিয়েও সাদ্দাম রক্ষা না পেলে অন্যেরা পাবে কিভাবে?

[প্রকাশ : ৭. ৫. ২০০৩ ইং]

পরিবর্তিত পরিস্থিতি আজ দিবালোকের ন্যায় সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে একথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে, লোভী সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদীদের তাবেদারী এবং তাদের দুরভিসন্ধির অনুকূল অনুসৃত নীতিতে সাদ্দাম যখন রক্ষা পায়নি, অন্য তাঁবেদার মুসলিম শাসকরাও রক্ষা পাবার কথা নয়। এমনিভাবে ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে বিশ্বময় সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার ঝড় একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, শাসক এবং জনগণের চিন্তা-চেতনায় আবেগ-বাসনায় রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার প্রবল ইচ্ছার কাছে অনেক সত্য, অনেক বাস্তবতা ও মহৎ কিছুকেই অন্যায়ভাবে হার মেনে যেতে হয়, যা ইরাকের ন্যায় এক সময় জাতির জীবনে বড় বিপদই ডেকে আনেনা, জাতির যথাসর্বস্ব লুট ও ধ্বংস হয়ে যায়। মুছে যাবার উপক্রম হয় জাতীয় পরিচিতি পর্যন্ত। মুসলিম শাসকবৃন্দ এবং নিজ দেশের জনগণ ও নিজেদের পারস্পরিক চিন্তা বৈষম্য ও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অবসান বর্তমান সময়ের এক প্রচণ্ড দাবী। উভয়ের চিন্তা-আবেগের ঐক্য এবং অভিন্ন চেতনাসমৃদ্ধ কর্মনীতির অভাবে শাসকদের পরিণতি ভবিষ্যতেও একই ধরনের হওয়াটাই স্বাভাবিক, যার আলামত ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কর্মনীতি কি হওয়া উচিত এব্যাপারে আলোকপাত করার অভিপ্রায় নিয়েই আজকের এই লেখার অবতারণা।

এই মুহূর্তের প্রধান করণীয় হচ্ছে, যেসব মুসলিম শাসকের এখনও বোধোদয় ঘটেনি এবং এখনও যারা স্বকীয় নীতি-আদর্শকে এ জাতির উন্নতি, সম্মান, শ্রীবৃদ্ধি ও শক্তির উৎস মনে করতে দ্বিধাগ্রস্ত, তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই বদলাতে হবে। অন্যথায় মুসলিম জনগণেরই কর্তব্য হবে সকল দেশের ও সকল শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করা ও সকল উপায়-উপকরণকে কাজে লাগানো। এই সাথে শাসকবৃন্দের উপরও এজন্যে নানানভাবে প্রেশার সৃষ্টি করা, যেন তারা মুসলিম উম্মাহ্‌র অনুসৃত পথে আসতে বাধ্য হন। মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে যথার্থ ঐক্য সৃষ্টি এবং যৌথ প্রতিরক্ষা কৌশলের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ কর্তব্য। এ লক্ষ্যে প্রতিটি মুসলিম দেশের চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, কবি সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজ নেতৃত্ব, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, ধর্মীয় নেতৃত্ব, জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দল সংগঠন, সংস্থা ও ইসলামী আন্দোলনসমূহ, আইনজীবী, সকলের প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে।

যদি জাতীয় সকল দিক ও কর্ণার থেকে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের আওয়াজ এক সাথে উত্থিত হয়, পরিস্থিতির দৃশ্যপট অবশ্যই বদলাতে বাধ্য, তাতে কোনো সন্দেহ

www.pathagar.com

নেই। এটা এক রকম দৃঢ়তার সাথেই বলা যায়, যেদিন মুসলিম দুনিয়ার যৌথ প্রতিরক্ষার কথাটি ঘোষিত হবে, আর এটি স্পষ্ট জানানো হবে যে, আজ থেকে যদি মুসলিম জাহানের কোনো একটি ভূখণ্ডের উপর কোনো প্রকার হামলা হয়, তাহলে সেটি গোটা মুসলিম দুনিয়ার ৬০টি দেশের উপর হামলা বলে বিবেচিত হবে। আশা করা যায়, এ ঘোষণার পর কোনো মুসলিম রাষ্ট্র আর এত সহজে হুমকির সম্মুখীন হবে না। এখন কথায় কথায় তো এজন্যেই হুমকির সম্মুখীন হয় যে, হুমকিদাতারা মনে করে, আমরা যেই রাষ্ট্রকে হুমকি দিচ্ছি, তার পার্শ্ববর্তী দেশ তো আমাদের অনুগত আছেই এমনকি সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরেও রয়েছে আমাদের বহু এজেন্ট। ঐ ধরনের ঘোষণার পর হুমকি তো দূরের কথা- কারও প্রতি তির্যক দৃষ্টিতে তাকাতেও তখন আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের হিসাব না করে পারবে না।

সকল মুসলমানের আজ স্মরণ রাখতে হবে যে, আগ্রাসী শক্তি আফগানিস্তানে বর্বর হামলা চালিয়ে বোম্বিং করে গোটা দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। অতঃপর জাতিসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং বিশ্ব জনমতকে পদদলিত করে ইরাকের উপর ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। নিষ্পাপ নিরপরাধ শিশু নারীসহ বেসামরিক লোকদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়েছে। এখন সিরিয়া এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হুমকি প্রদর্শিত হচ্ছে। গোটা মুসলিম দুনিয়ার শাসকবৃন্দ ও জনতা সকলের মনে আজ একই জিজ্ঞাসা যে, মুসলিম উম্মাহ্ এতকিছু প্রত্যক্ষ করা, এতো অপমানকর অবস্থা সত্ত্বেও কি বর্তমান নিরব ভূমিকার উপরই অটল থাকবে? তারা কি একেক করে এভাবে মুরগীর মতো দুশমনের ছুরির তলে নীরবে জবেহ্ হতে থাকবে? তারা কি কুরবানীর পশুর ন্যায় একটি কবে জবেহ্ হবে আর অন্যটি তার পালা কখন আসে সে জন্যে অপেক্ষায় থাকবে? আগ্রাসনকে প্রশ্রয় দিয়ে, মহাসন্ত্রাসের জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে চোখ বুঝে বিপদ এড়ানো কি সম্ভব? মূলত বাগদাদের পতনের পর এ বাস্তবতা আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামী দুনিয়ার সামনে ঐক্য এবং যথার্থ জেহাদ ছাড়া বিকল্প আর কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। অপরদিক থেকে চিন্তা করলে, মুসলিম বিশ্ব এখন ইতিহাসের এক ভাল অবস্থানে রয়েছে। এক কোটি দশ লাখ বর্গমাইল এলাকার ৬০-এর কাছাকাছি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী দুনিয়া খোদ নিজেই একটি বৃহৎ শক্তি। আজকের ইসলামী দুনিয়া কৃষি, খনিজ সম্পদ, প্রতিরক্ষা এবং প্রত্যেক দেশ অনুকূল আবহাওয়ার দিক থেকে বিশ্বের সব চাইতে এক বিশাল উর্বর খণ্ড। শুধু তেল সম্পদের দিকে লক্ষ্য করলেই অনুমান করা যায় যে, খোদ ইরাকের কাছেই রয়েছে ১১২ বিলিয়ন বেরেল তেল এবং ১১৪ ট্রিলিয়ন ফুট গ্যাস। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে আরব দুনিয়ার শাসকবৃন্দ এই বিপুল ও বিশাল খোদাদত্ত সম্পদ নিছক বড় বড় অভিজাত ভবন নির্মাণ, বড় বড় কমার্শিয়াল প্লাজা নির্মাণের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীর প্রস্তুত পণ্য আমদানিতে ব্যয় করছেন। এই সম্পদ নিয়ে রিসার্চ এবং সাইন্স, ট্যাকনোলজি ও অস্ত্র নির্মাণ খাতে কোনো কাজ তেমন হয়নি। এখনও যদি তাদের বোধোদয় না ঘটে, তাহলে মুসলিম বিশ্বকে আরও

www.pathagar.com

নাজুকতর অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। তখন তাদের রক্ষার কোনোই উপায় থাকবে না। এই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের মোকাবেলা করার জন্যে অবশ্যম্ভাব্য যেই কর্মসূচী হাতে নেয়া জরুরী তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিচে উপস্থাপিত হলো যেগুলো এই প্রতিযোগিতাশীল বিশ্বে টিকে থাকার জন্য জরুরী।

ইসলামী দুনিয়া যদি যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যৌথ চেষ্টায় ট্যাকনোলজি অর্জন করে তাহলে নিশ্চিত করেই বলা চলে যে, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় এই ব্যবস্থা কোনো অংশে সবল কম হবে না।

প্রতিরক্ষার দিক থেকে মুসলিম বিশ্বের যেই স্ট্যাটেজিক অবস্থান রয়েছে এবং বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের রয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী ও শক্তি, রয়েছে অঢেল পুঁজি ও উপযুক্ত বিজ্ঞানী, এমতাবস্থায় যদি প্রতিরক্ষার যৌথ সামরিক কৌশল গৃহীত হয় তাহলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি সাধিত হতে পারে। মোটকথা, মুসলিম দুনিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে। বলার অপেক্ষা রাখে না, দুশমনদের পক্ষ থেকে মুসলিম বিশ্ব এবং মুসলিম উম্মাহকে নানানভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার যাবতীয় ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য এটাই, যাতে তারা এক না হতে পারে। সুতরাং দলমত নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার সকল শ্রেণীর মুসলমানের আজ আগ্রাসী শক্তির এই ষড়যন্ত্র গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের পারস্পরিক পণ্য বিনিময় আমদানির মাত্র শতকরা সাত এবং রফতানির পরিমাণ মাত্র শতকরা ২৮ ভাগ। এই বিনিময়ের মাত্রা উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে মার্কিন ও পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে বাধ্য। এতে মুসলিম বিশ্বও অর্থনৈতিক দিক থেকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। সময়ের এ দাবী পূরণ এবং ইহুদী অর্থনীতির ষড়যন্ত্রের মোকাবিলার জন্যে যৌথ কারেন্সীও চালু করা, চিন্তা করা যেতে পারে।

মুসলিম বিশ্বের সেটেলাইট সিস্টেম, প্রতিরক্ষা, প্রচার মিডিয়া, তথ্য সম্প্রসারণ ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে ইসলামী বিশ্বের হাতে সেটেলাইট সিস্টেম নেই। আধুনিক যুগ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজেদের সেটেলাইট ব্যবস্থা থাকা এন্তান্ত জরুরী।

এবার ইরাক যুদ্ধে আলজাযীরা টিভি ও এ জাতীয় অন্য মাধ্যম চরম ত্যাগ শিকার করে মার্কিন বর্বরতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। বর্তমান যুগে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে এবং ইরাক যুদ্ধে মার্কিনী প্রচারণা একতরফা প্রচারণার সুযোগ না পাওয়াটা মুসলিম দুনিয়ার ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া চ্যানেল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরছে।

জেহাদী চেতনা এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গোটা মুসলিম বিশ্বে চালু করা এজন্যেও জরুরী যে, জাতিসংঘের অনুমতি ছাড়া বর্তমান ইরাক যুদ্ধ যেই পথ দেখিয়ে গেছে, তাতে ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে আক্রান্ত

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জনযুদ্ধ ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর তা করতে হলে প্রতিটি নাগরিকেরই সামরিক প্রশিক্ষণ থাকা জরুরী। এভাবে গোটা মুসলিম বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত থাকলে কার বাপের সাধ্য এ জাতির কারও গায়ে হাত উঠায়?

মুসলিম দেশসমূহের পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠাও একান্ত জরুরী। গোটা মুসলিম বিশ্বের অভিন্ন শিক্ষানীতি তৈরিরও পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন হতে পারে, এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ কে নেবে? কারণ বর্তমান মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতায় সমাসীনরা নিজের থেকে হয়তো তা করতে চাইবে না বা পারবে না। কারণ, ক্ষমতাসীনরা কেউ নিজেদের রাজত্ব, কেউ নিজেদের সামরিক একনায়কত্ব ও দীর্ঘদিনের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার পক্ষপাতী। তারা ন্যায় অন্যায় যেকোনো উপায়ে নিজেদেরকেই রক্ষা করতে চাইবে। ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব বাঁচুক মরুক তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। একারণে প্রবন্ধের শুরুতে বলেছি যে, এবারকার ইরাক যুদ্ধে শাসকদের নিরবতা ও তার বিপরীতে সর্বত্র গণজাগরণ এটাই জানান দিয়ে গেছে যে, জনগণকে নিজ দেশ জাতি ধর্মের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং শাসকদের দিয়ে তা করিয়ে নেয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। এটা কতই না দুঃখজনক ব্যাপার যে, এবার যেখানে জনজাগরণ হলো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, সেখানে কতিপয় দেশে শাসকরা ছিলেন আগ্রাসী শক্তির অনুকূলে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা ও প্রস্তাবসমূহের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের আজ এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা কি সকলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে একসাথে রুখে দাঁড়ানোর পথ গ্রহণ করবে, না আলাদাভাবে একেক করে মরবে। আসলে যেকোনোভাবে বাঁচতে চাইলেই বাঁচা যায় না বরং মরতে তৈরি থাকলে বাঁচার সম্ভাবনা থাকে।

ইরাক-আফগানযুদ্ধ মুসলিম নেতাদের চোখ খুলে দিক

[প্রকাশ ঃ ২৩. ৪. ২০০৪ ইং]

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বীর সেনানী ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার। ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে এই সংগ্রামী নেতা জাতীয় চেতনা উদ্দীপক একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। মুসলমানদের দুর্দিনের পর সুদিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে নিজেদের অনুকূলে আনয়নকারী ঐ কবিতাটি ছিল এরূপ–কত্‌লে হোসাইন আসলমে মর্গে ইয়াযীদ হ্যায়, /ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালাকে বা'দ অর্থাৎ "হোসাইন হত্যা ছিল মূলতঃ এজীদেরই মৃত্যু ঘন্টা। আর যুগে যুগে যত কারবালা আসবে, তার পরেই ইসলাম সজীবতা নিয়ে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে।"

www.pathagar.com

সম্প্রতি ইঙ্গ-মার্কিন দুই পরাশক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে আফগানিস্তান ও পরে ইরাকের উপর অবৈধ হামলা চালিয়ে যেই 'কারবালা'র সৃষ্টি করেছে, নারী-শিশুসহ হাজার হাজার মানুষের রক্তে যেভাবে কারবালা ভূমি বুকে ধারণকারী গোটা ইরাক ভূখণ্ডকে হোসাইনী বংশধরদের রক্তে লালে লাল করে মানবিক সকল মূল্যবোধকে পদদলিত করেছে, নব্য এজীদদের সৃষ্ট এই 'কারবালা' এবং এই গণহত্যাযজ্ঞও মূলতঃ সাবেক এজীদের অনুরূপ তাদেরই মৃত্যু ঘণ্টার আওয়াজ বিশ্ববাসীকে বজ্র নিনাদে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, বুশ-ব্লেয়াররা মধ্যপ্রাচ্যের তেল অস্ত্র নিজেদের করায়ত্ত্বে নেয়ার জন্যে যেই দস্যুবৃত্তির পরিচয় দিল এবং তাদের স্বার্থের পাহারাদার অভিশপ্ত ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরাইলকে শক্তিশালী করার মানসে ইয়াহুদীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে গোটা ইরাককে যেই গণহত্যার 'কারবালায়' রূপান্তরিত করলো, এই কারবালাও অতীত কারবালারই অনুরূপ নব্য এজীদদের ধ্বংস ও নামনিশানা মুছে ফেলার নিমিত্ত সৃষ্টি করবে। অনাগত দিনের সেই উজ্জ্বল সফলতারই প্রাথমিক লক্ষণ হলো খোদ্ বুশ-ব্লেয়ারের দেশসহ জাতি-ধর্ম-বর্ণ অঞ্চল নির্বিশেষে বিশ্বের দেশে দেশে শান্তিকামী সাধারণ গণমানুষের মধ্যে নব্য এজীদদের বিরুদ্ধে ধিক্কারের বাণী উচ্চারিত হওয়া, মানবতার দুশমন বলে তাদের আখ্যায়িত করা এবং বিশ্বের দিকে দিকে বুশ-ব্লেয়ারদের কুশপুত্তলিকা অগ্নিদহ করা। বুশ-ব্লেয়াররা প্রাণ সম্পদের হানি ও নিজেদের দীর্ঘদিনের ভাবমর্যাদাকে জলাঞ্জলি দিয়ে এবারের কারবালা সৃষ্টির দ্বারা যা অর্জন করেছেন, অনেকের বিশ্বাস তার চাইতে তারা হারিয়েছেন আরও বহুগুণ বেশী। কারণ, মুসলমানদের প্রতি তাদের বহু অন্যায় আচরণ সত্ত্বেও আরব বিশ্বসহ গোটা মুসলিম দুনিয়ার সাথে তাদের যেই সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, সেই সম্পর্কের আরও উন্নতি ঘটিয়ে তারা বর্তমান গণহত্যা ও লুটের দ্বারা যা অর্জন করেছেন বা করবেন, এর চাইতে মুসলমানদের দ্বারা আরও বহুগুণ বেশী উপকৃত হতে পারতেন। অপরদিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নিজেদের ভাবমর্যাদা পূর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পেতো। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও এর উন্নতি সমৃদ্ধিতে এ সম্প্রীতি বিশ্বময় বড় অবদান রাখতে পারতো। কিন্তু ইরাকে নতুন কারবালা সৃষ্টির দ্বারা এসব নব্য এজীদ, বিশ্ববাসীর কাছে চরম মিথ্যুক, দস্যু, খুনী, নীতিভ্রষ্ট, প্রতারক ও মানবতার দুশমন রূপে চিহ্নিত হয়েছে। অপরদিকে এর দ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ অঞ্চল নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে এক ব্যাপক মানবিক চেতনার উজ্জীবন ঘটেছে। যদ্দরুন আমরা বলতে পারি, অতীত প্রতিটি কারবালার পর যদি "ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়" এবার বুশ-ব্লেয়ারের সৃষ্ট কারবালা দ্বারা বিশ্বময় "ইনসানিয়াত জিন্দা হুই" অর্থাৎ এবারের 'কারবালা'র পর বিশ্ববাসীর অন্তরে সৃষ্টি হয়েছে এক ব্যাপক মানবিক চেতনা, আর সেই চেতনার আগুনেই হয়তো নব্য এজীদদের ক্ষমতার মসনদ শুধু জ্বলে-পুড়ে ছাই ভস্মেই পরিণত হবে না, তাতে বিশ্বময় মানবিক চেতনায় শান্তির অনুকূলে এক ব্যাপক ও সার্বিক জাগরণেরও সৃষ্টি হবে। গোটা বিশ্ববাসী এক কাতারে সমবেত হয়ে অচিরেই এসব বিশ্বভণ্ডের সকল

www.pathagar.com

ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, নিজেরা প্রতিষ্ঠিত করবে নতুন এক বিশ্ব দরবার-নতুন জাতিসংঘ।

শান্তি, নিরাপত্তা, মানবতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, স্বাধীনতা ইত্যাদি নীতিবাক্য বিশারদরা এসব আকর্ষণীয় শ্লোগানের ব্যাপারে বিশ্ব জনমত গঠনের দ্বারা মূলত নিজেদের স্বার্থদুষ্ট আধিপত্যবাদী কর্তৃত্বই সকলের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট, ইরাকের উপর অবৈধ হামলা তারই প্রমাণ দিয়ে গেল। অন্যান্য ঘটনাসহ তাদের এই ঘটনা অপর যেই বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে এসেছে সেটা হলো, এই প্রতিযোগিতাশীল বিশ্বে কি উন্নয়ন কর্মে সহযোগিতা, কি অবাঞ্ছিত কোনো অপশক্তির অনিষ্টকারিতার হাত থেকে মানবতাকে রক্ষা, উভয় অবস্থায় শান্তিকামী বিশ্ববাসীকে যেমন থাকতে হবে এককথায়, তেমনি তাদের হাতে থাকতে হবে এমন হাতিয়ার, যা প্রয়োজনে মানবতার দুশমনদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুহূর্তে ব্যবহার করা যায়। অন্যথায়, বিশ্বশান্তির ভণ্ড তাপসদের চক্রান্তের সামনে সাম্প্রতিক ইরাককেন্দ্রিক যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির ন্যায় নীরব দর্শক কিংবা অকার্যকর ব্যর্থ নীতিবাক্য উচ্চারণকারীর ভূমিকাই পালন করতে হবে। এই চিন্তা আগে থেকে করা হলে যেখানে খোদ্ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ সারাবিশ্বের লাখ লাখ মানুষ অসংখ্য প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং হাজার হাজার নিন্দা বাণী উচ্চারণ করেও যেই বর্বরতা রোধ করতে ব্যর্থ হলো, এই ব্যর্থতা আসতো না। প্রকাশ্যে এত বিপুল প্রতিবাদ না করে আগ্রাসী বাহিনী যেই তাবীজের জোরে গোটা বিশ্ব জনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছিল, সেক্ষেত্রে নীরবে একই বস্তু দ্বারাই তার আগ্রাসী দাঁত ভেঙ্গে দেয়া যেত। রোধ করা যেতো এই অন্যায় হত্যাকাণ্ড ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা পরসম্পদ লুণ্ঠনের এই দুর্বৃত্তপনা।

একশ্রেণীর দুর্বৃত্তের দ্বারা যখন মানবসভ্যতার এই অধঃপতন ঘটলো, মানবিক সকল মূল্যবোধ যখন হলো পদদলিত, অন্যায় অসত্যের দাপটের সামনে যখন জাতিসংঘের ন্যায় প্রতিষ্ঠানকেও নতজানু হয়ে আগ্রাসী শক্তির দাসানুদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হলো এবং বিশ্ববাসীকে হতে হলো চরম হতাশার শিকার, এই পরিস্থিতিতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ অঞ্চল নির্বিশেষে বিশ্বের সকল শান্তিকামী মানুষের সামনে করণীয় হিসাবে যেই দায়িত্বটি সামনে আসে সেটা হলো, জাতিসংঘ সনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জাতিগোষ্ঠীসমূহের সমন্বয়ে নতুন জাতিসংঘ গঠন করা। মানবতা, বিশ্বশান্তি, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি আপ্তবাক্য উচ্চারণকারীরা এসব মহান নীতি ও শিক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সারা পৃথিবীকে আবার প্রাকসভ্যতার দিকে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে মানবতাকে যেকোনো মূল্যে ফিরিয়ে আনতেই হবে। এ ব্যাপারে বিশ্বের দায়িত্বশীল বৃহৎ শক্তিগুলো যদি তেলের ভাগ পেয়ে কিংবা অপর কোনো সংকীর্ণ স্বার্থের লোভে ন্যায়নীতির আদর্শকে উড্ডীন করার কাজে এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়, তাহলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই অন্যায় সমর্থনের অপরাধে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং সকলকেই একদিন সাদ্দাম ও তার দেশবাসীর ন্যায় অপমান-যিল্লতীর একই পরিণতি ভোগ করতে হবে।

www.pathagar.com

ইরাকে আগ্রাসী শক্তি অন্যায় ও মিথ্যাচারের দ্বারা যেই সফলতা অর্জন করেছে, তার এই সফলতা তাকে অনুরূপ আরও অধিক মিথ্যাচার, ষড়যন্ত্র ও অন্যায় পদক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করবে। পূর্বাপেক্ষা তার গলার স্বর উত্তুঙ্গে উঠবে, তার হুমকি-ধমকির মাত্রা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। প্রথমে আফগানিস্তান ও পরে ইরাকের মতো দেশকে যেই অস্ত্র বলে কাবু করেছে, একই অস্ত্র সে এখন প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের বেলায়ও প্রয়োগ করবে। যেমন, সিরিয়াকে সে ইতিমধ্যেই রাসায়নিক ও অন্য ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে শুরু করেছে। ইরান, সৌদী আরব, পাকিস্তান, লিবিয়া, উত্তর কুরিয়াসহ অন্যান্য রাষ্ট্র সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কি তাতো সে ইতিমধ্যেই ব্যক্ত করে রেখেছে। পরন্তু সিরিয়ার বিরুদ্ধে এখন পৌনপুনিক অভিযোগ আনতে শুরু করেছে যে, সিরিয়া নাকি অন্যান্য আপত্তিকর কাজে জড়িত তো আছেই, পরন্তু সে হালে সাদ্দামসহ ইরাকের 'মোস্ট ওয়ান্টেড" ব্যক্তিদের তার দেশে আশ্রয় দিয়েছে। এছাড়া ইরাকের যুদ্ধোত্তর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে, সে ব্যাপারে যেমন সে জাতিসংঘ ও অপর সম্ভাব্য সকলের প্রশ্নটি বিরক্তির সুরে প্রত্যাখ্যান করছে, তেমনি অন্যদের ব্যাপারে তার আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গিটিও ধামাচাপা থাকছে না। এসব দেখেও যদি অন্যান্য বিশ্ব শক্তির বোধোদয় না ঘটে এবং ইরাকে তেলের ভাগ ও অন্য কোনো দেশের লুটের মালের লোভে তারা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন, তাহলে এটাই ধরে নিতে হবে যে, বিশ্বের শান্তিকামী সাধারণ মানুষ যা চায়, তার শাসকগোষ্ঠী সম্পূর্ণ তাদের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারে এমন ধরনের প্রশ্ন আমাদের মনে দেখা দিত না যদি না সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধের বিরোধী পৃথিবীর কয়েকটি বৃহৎ শক্তির পূর্বাপর নীতিতে ব্যত্যয় না ঘটতো। কারণ, সকলে ইরাকের উপর অন্যায় হামলাকারী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন, তাতে বিশ্ববাসী আশা করেছিল যে, হয়তো ইউরোপ-এশিয়াসহ সারাবিশ্ব রাজনীতিতে একটি মেরুকরণ ঘটবে। বিশেষ করে, রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স সম্ভবত একটি নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তাদের মধ্যে যেন সেই ভাবধারার অনুপস্থিতির প্রাধান্য ঘটছে। তাঁরাও পুঁজিবাদীতার লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে যেন ইতস্ততঃ করছেন। বলাবাহুল্য, যেই দৃষ্টিভঙ্গিই হোক, তারা বিশ্ব রাজনীতির মেরুকরনের এই সূবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে, এটাকে গোটা মানবগোষ্ঠীর জন্যে এক দুর্ভাগ্যই বলতে হবে বৈ কি।

তরপরও আমরা বলতে চাই যে, সারাবিশ্বে মানুষ এক সময় রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত ছিল। শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থের যাঁতাকল থেকে রক্ষা পাবার সকল চেষ্টাই তাদের ব্যর্থ হতো। কিন্তু গণজাগরণ অতঃপর সেই বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করেছে। সর্বত্র ঔপনিবেশিক শাসন শোষনের অবসান ঘটেছে এবং শেষ পর্যন্ত জনগণেরই জয় হয়েছে। তেমনি আজ বিশ্বময় অন্যায় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যেই গণজোয়ার দেখা দিয়েছে এবং জাতিসংঘের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে যেই জোর প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে ফলে নতুন জাতিসংঘ গঠনের দাবী উঠেছে, দুদিন আগ

www.pathagar.com

আর পর এই ইস্যুতে বিশ্বের সাধারণ গণমানুষের জয় অবধারিত বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

প্রসঙ্গক্রমে এক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ্‌র শাসকদের কথা বলতে হয়, তাদের উপর বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ বিধানকল্পে মহান আল্লাহ্‌ দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত করেছে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ইতিবাচক কাজের মধ্য দিয়ে সঠিক ও সুচারু রূপে পালন করার নির্দেশ রয়েছে, তেমনি মানবতার কল্যাণ বিরোধী যেসব অপশক্তি মানুষকে নিজেদের গোলাম বানাবার চক্রান্তে লিপ্ত তাদের হাত থেকেও মানবতাকে রক্ষাকল্পে সক্রিয় হবার আদেশ রয়েছে। সেই অপশক্তির বিরুদ্ধে বস্তুগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রযুক্তি জ্ঞান ইত্যাদি সকল উপায়ে সচেষ্ট থাকারও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু জনশক্তি, সম্পদ শক্তি, ভৌগোলিক সহাবস্থান শক্তি এত কিছু সহায়ক শক্তি পেয়েও তারা সে দায়িত্বটি পালন করেননি। বরং ক্ষেত্র বিশেষে অপশক্তির ক্রিড়নক বৃত্তিতে লিপ্ত হওয়ায় বিশ্ব মানবতা আজ অশান্তির আগুনে জ্বলছে। স্মরণ রাখা দরকার, তাদের অবহেলায় এবং অনৈক্য ও ইতিবাচক পদক্ষেপের অভাবে এ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়ে গেছে এবং এখনও হচ্ছে। এই পরিস্থিতি কিছুতেই একই কেন্দ্র বিন্দুতে স্থির থাকবে না। মুসলিম শাসকদের এই বিলাস নিদ্রা থেকে জনতার গর্জনে একদিন অবশ্যই জাগতে হবে। তবে সে সময় আর কর্তৃত্ব তাদের হাতে থাকবে না। বিশ্বের সাধারণ গণমানুষ তখন একই প্লাট ফরমে সমবেত হয়ে সকল গণদুশমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরাক বিরোধী যুদ্ধে বাগদাদ পতনের বেদনাদায়ক ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত ছিল না। তারপরও বিশ্ববাসী বিশেষ করে মুসলমানরা এ ব্যাপারে আল্লাহর মদদের প্রতিক্ষায় ছিল। হয়তো এর ভেতর দিয়েও আল্লাহ্‌ অলৌকিকভাবে কিছু করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য যেহেতু সত্যানুসারীদের জন্যে আর তাও ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর, তাই হয়তো ব্যতিক্রম ঘটেছে। তা সত্ত্বেও ইরাক পতনের ঘটনাটি মুসলিম উম্মতের মন-মস্তিষ্ক উভয়কে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। কারণ, বাগদাদে শুধু একটি ক্ষমতাকেই ছিন্নভিন্ন করা হয়নি, বরং এর পতনের মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘ শাসনকালের অবসান ঘটেছে এবং সূচনা ঘটতে যাচ্ছে আরেকটি নতুন যুগের। শুধু মুসলমানই নয়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে গোটা বিশ্ববাসীর সামনে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, গণবিধ্বংসী ও মানবতার প্রতি হুমকি অস্ত্রধারী একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সকল দেশের উপর নিজ অবৈধ থাবা বিস্তারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, নীতিনৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রতি যার কোনো আদৌ শ্রদ্ধাবোধ নেই। সাম্রাজ্যবাদী এই অপশক্তি আফগানিস্তান থেকে তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে শুরু করেছে। ইরাক পর্যন্ত এসে যে সে থেমে যাবে, তা নয়। তারও আগে সে অগ্রসর হবে। কারণ, বাগদাদের পতনের পরই তাদের বিতির সুর অধিক হুমকি-ধমকির রূপ নিয়েছে। বৃটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, ভবিষ্যতেও এ ধরনের রাষ্ট্রসমূহের উপর হামলা হতে পারে। পতন ঘটতে পারে এরূপ সরকারসমূহের, যাদের হাতে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে

www.pathagar.com

বলে মনে হবে। বিশেষত যারা সন্ত্রাসী তৎপরতায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন যে, এমন কতিপয় রাষ্ট্র আছে, যাদের কাছে ভয়াবহ অস্ত্র না থাকলেও তারা সেসব অস্ত্রের অধিকারী হবার জন্যে আদাপানি খেয়ে লেগেছে। সুতরাং ঐসব দেশের উপর হামলার জন্যে আমরা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে এ ব্যাপারে জরুরী কথাবার্তা বলবো। ভবিষ্যতে আমাদেরকে এসব ভয়াবহ হুমকির বিরুদ্ধে আগেভাগেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। অবশ্য এ জন্যে সবক্ষেত্রেই যে সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করা হবে তা নয়, এ চরিত্রের সরকারগুলোকে অন্যভাবে সরানোরও চিন্তা করা হবে, যেন সংশ্লিষ্ট দেশে আমরা নিজেদের পছন্দের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী মন্ত্রীও এ ধরনের বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, ইরাকের বিপর্যয় থেকে অন্যান্য দেশের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যাদের কাছে ব্যাপকবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে কিংবা যারা এর অধিকারী হতে আকাঙ্ক্ষী তারা এ থেকে সবক হাসিল করুন আমরা এটাই চাই। তবে মার্কিন মন্ত্রী এই দম্ভোক্তির সময় হয়তো ইসরাইলের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, ইসরাইলের কাছে ব্যাপকবিধ্বংসী বহু অস্ত্র রয়েছে। মার্কিন মন্ত্রী এ প্রসঙ্গে সিরিয়া, ইরান এবং উত্তর কোরিয়ার নাম উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন, সিরিয়ার উচিত রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র তৈরির কর্মসূচী পরিহার করা।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড বলেছেন, সাদ্দাম সমর্থক ও সহকারীরা পালিয়ে সিরিয়াতে ঢুকছে। সিরিয়ার গতিবিধির উপরও আমরা লক্ষ্য রেখে আসছি। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এর আগেও এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ইরাক যুদ্ধের পরে আমরা সিরিয়ার সাথে বুঝবো। উত্তর কোরিয়া সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র বলে রেখেছে, এ দেশটির সাথে যুদ্ধ করার অভিপ্রায় আমাদের নেই। আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের সাথে সমস্যাটির সমাধান করবো। উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারটি জাতিসংঘের হাওলা করা হবে।

বাগদাদ সম্পর্কে এমন একটি ধারণা ছিল যে, এর অলিগলিতে সর্বত্র হাতাহাতি যুদ্ধ হবে। কিন্তু ৯ই এপ্রিলের প্রত্যূষে যখন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে আলোর ছটা দেখা দিচ্ছিলো আর ইরাকের উপর নতুন সন্ধ্যা নেমে আসছিলো, তখন মুসলিম দুনিয়ার সেই শোক সন্ধ্যাকালীন মুহূর্তে না ইসলামের জন্যে লড়াই করার জন্যে কাউকে দেখা গেল, না দেখা গেলো কোনো ইরাকী বীর যোদ্ধা। গোটা বাগদাদ ইঙ্গ-মার্কিন যোদ্ধাদের জন্যে ছেড়ে দেয়া হলো। নিয়মিত সেনাবাহিনী তো দূরের কথা পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক কাউকেও তখন দেখা যাচ্ছিলো না। সরকারী কর্মকর্তারাও নিজ নিজ কর্মস্থল থেকে গায়েব। খবর সেন্সরকারী যেসব অফিসার সাংবাদিকদের পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন তথ্যমন্ত্রী সাইদে সাহাফসহ সেদিন তাদের কাউকেই দেখা যায়নি। তাতে অভিযোগ উঠে যে, সাদ্দাম হোসেন রাশিয়া এবং আমেরিকার সাথে এমন আপোষ করে ফেলেছেন যে, তাদের বাগদাদ দখলের বিনিময়ে সাদ্দাম ও তার

www.pathagar.com

সঙ্গীদেরকে নিরাপদে বাগদাদ ত্যাগের সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো তারা যদি বেরই হয়ে যাবেন, তাহলে কোথায় গেলেন? তাদের ভবিষ্যত কর্মসূচীই বা কি হবে, এতো কেউ বলতে পারছে না? কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে, সাদ্দাম হোসেন দেশ ত্যাগের প্রাথমিক প্রস্তাব গ্রহণ করলে তো পরাজয়ের এই গ্লানি থেকেই ইরাক রেহাই পেতে পারতো! অপর কারও কারও মত হলো, আমেরিকা যে কোনো মূল্যে ইরাক দখলের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলো। সাদ্দাম দেশ ত্যাগ করুক বা নাই করুক তারা ইরাককে কোনো অবস্থায় ছেড়ে দিতো না। খোদ্ জাতিসংঘের অস্ত্র অনুসন্ধানকারী প্রধান হান্স ব্লিক্স বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র অনেক আগেই ইরাক দখলের সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলো।

টেলিভিশনে কিছু কিছু লোককে বাগদাদ পতনে উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা গেলেও মূলত এই ঘটনায় শুধু ইরাকী জনগণই নয়, বরং গোটা ইসলামী দুনিয়া শোকাহত হয়েছে। অবশ্য এটা ঠিক যে, সাদ্দাম অতীতে যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্টের ভূমিকা পালন করেছেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে ব্যর্থ করার জন্যে ইরানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ বছর যুদ্ধ করে ১০ লাখ লোকের প্রাণহানি ও মুসলিম দেশের কোটি কোটি টাকা ধ্বংস করিয়েছেন। কুয়েতের উপর হামলা করেছেন। কুর্দীদের উপর বিষাক্ত গ্যাস বোমা প্রয়োগ করে হাজার হাজার কুর্দীকে হত্যা করেছেন। শীয়া মুসলমানদের উপর জুলুম-নিপীড়নের স্টীম রোলার চালিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রকে উপসাগরীয় এলাকায় নিজেদের সামরিক অবস্থান সুদৃঢ় করা ও সম্পদশালী আরব দেশগুলোকে দেউলিয়া হবার পথ তিনি তৈরী করে দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এতো সব সেবা করেও জনাব সাদ্দাম তাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষাক্ত নখরাঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি।

ইরাকে সাদ্দামের দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসনামলে বিশেষ করে গত ১২ বছরে ইরাকী সরকার ও জনগণ নানা বিপদ-আপদের মাধ্যমে দিন গুজরান করেছে। পরিশেষে তাদের ভাগ্যে বর্বর বোমা হামলা এবং নিজ জন্মভূমি হাতছাড়া হবার ঘটনা ঘটলো। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত হলো এই যে, যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের অনুরূপ ইরাকেও শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনায়নে ব্যর্থ হবে। শুধু ইরাকই নয় বরং ইরাকের উপর আমেরিকার এই অবৈধ ও দস্যুসুলভ হামলা, হত্যা, লুট ইত্যাদি গোটা মধ্যপ্রাচ্যের সকল আরব দেশেই তার বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ ও গেরিলা তৎপরতাকে জোরদার করে তুলবে। নিউইয়র্ক পত্রিকারও ভাষ্য এই যে, "ইরাক যুদ্ধ ইসলাম ও আরব দুনিয়ায় আমেরিকা বিরোধী ঘৃণা ও ক্ষোভের যেই ঝড় তুলেছে, 'তা আমেরিকার বন্ধু সরকারগুলো কিছুতেই রুখতে পারবে না।"

ইরাক যুদ্ধের দ্বারা আমেরিকা শুধু ইসলাম ও আরব বিশ্বেরই নয় বরং সমগ্র দুনিয়ার স্বাধীনতা ও শান্তিকামী মানুষদের ঘৃণার পাত্র হয়েছে। তবে আমাদের মতে, যারা কোনো হীনস্বার্থে নিজেদের সকল লাজ-লজ্জা, ভাবমর্যাদা ও নীতি-নৈতিকতাকে

www.pathagar.com

বিসর্জন দিতে পারে, তাদের প্রতি ধিক্কার ও ঘৃণা পোষণকে তারাকিছুতেই অপমান মনে করে না। তাই বলতে হয়, ঘৃণা ও ধিক্কারজনিত কার্যক্রম যা বিশ্বময় প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও নিন্দা ইত্যাদির দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে, তা দ্বারা মূল লক্ষ্যের কিছুই কল্যাণ আসবে না। এই মুহূর্তে যা সব চাইতে প্রয়োজন সেটা হলো, মুসলিম শাসকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মার্কিন খয়েরখাদের কর্তব্য হলো সাদ্দামের পরিণতি থেকে শিক্ষা নেয়া এবং নিজেদের মধ্যে যথার্থ ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে এই নতুন সাম্রাজ্যবাদের দন্ত নখরাঘাত থেকে মুসলিম জাহানকে রক্ষার চিন্তা-তদবির করা। অন্যথায় এই নব্য সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসীদের হাতে শুধু মুসলিম দেশগুলোই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি-ধর্মের মানুষরাও বিপন্ন হবে। স্মরণ রাখা দরকার যে, ইরাক যুদ্ধ বিশ্বময় বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের আপামর প্রতিটি মানুষের মধ্যে যেই রেনেসাঁ ও জাগরণ সৃষ্টি করেছে, মুসলিম শাসকরা এক না হলে সেই রেনেসাঁর আগুনে ভবিষ্যতে ঐসব মুসলিম শাসকের গদী জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। কারণ, তখন পরিস্থিতি আর তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। এ কারণেই না বলে পারিনি যে, ৯ই এপ্রিলের কারবালার পর বিশ্ব-মানবতা নতুনভাবে প্রাণোচ্ছলতা লাভ করেছে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহারের ভাষায়- যদি

"কতলে হোসাইন আসল মে
মর্গে ইয়াজীদ হ্যায়,
ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়
হার কারবালা কে বাদ"

তাহলে ইরাকে ৯ই এপ্রিলের 'কারবালা'র পর শুধু ইসলাম তার প্রাণসত্তা নিয়ে প্রতিটি মুসলিম চিত্তে উজ্জীবিত হয়ে উঠেনি বরং গোটা ইনসানিয়াৎ তথা বিশ্ব মানবতাও এই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিঃসৃত নতুন চেতনা, নতুন অনুভূতি ও জাগৃতি নিয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে, যার ফলশ্রুতি নিকট ভবিষ্যতের পৃথিবীই হয়তো প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে।

বিশ্বব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জনের ডাকে সাড়া

[প্রকাশ ঃ ৯. ৪. ২০০৩ইং]

যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্যে বিশ্বের কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষ অনুরোধ জানিয়ে দাবী পেশ করে ব্যর্থ হয়েছে। দেশে দেশে লাখো মানুষের অসংখ্য প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল, শ্লোগান এখনও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু তথাকথিত গণতন্ত্রের প্রবক্তারা বিশ্ব 'গণ'দের কোনো কথার প্রতিই কান দিতে প্রস্তুত নয় বরং তারা বিপুল আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত লাখো সৈন্য নিয়ে নিজেদের তুলনায় সকল দিক থেকে ক্ষুদ্র দুর্বল একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর অবৈধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে

www.pathagar.com

পড়েছে। আজ প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ইরাকের বাগদাদ নগরীসহ অন্যান্য শহরে ক্ষেপণাস্ত্র, বোমা ইত্যাদি নিক্ষেপ করে নারী-শিশু সমেত হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষই হত্যা করছে না, সেদেশের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন, পবিত্র স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস করে চলেছে। রাত-দিন বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে লাখো গোলাবারুদ। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর এই বর্বর হামলা সম্পর্কে বিশ্বের অপরাপর দেশের জনগণতো বটেই খোদ্ তাদের দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বও মন্তব্য করছেন যে, এই যুদ্ধ মানবতা ও সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বস্ততা ও সকল ভাব-মর্যাদাকে এই যুদ্ধ ধূলিস্যাত করে দিচ্ছে। বিশ্বময় এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লাখো কোটি মানুষের প্রতিবাদ বিক্ষোভ সত্ত্বেও ক্ষমতা মদমত্ততায় আচ্ছন্ন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় এসব প্রতিবাদকে উপেক্ষাই করে চলেছে। সব কিছু যেন অরণ্যে রোধনেরই শামিল হচ্ছে। তাদের ধারণা, পৃথিবীতে এমন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি আরেকটি নেই যা তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে। বাস্তবেও তাই দেখা যাচ্ছে। মৌখিক সমর্থন ছাড়া কার্যত কেউ ইরাকের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না। এমন কি প্রতিবেশী যেসব আরব দেশ রয়েছে, যাদের সম্পর্কে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা হলো আগ্রাসী শক্তি ইরাককে কাবু করতে সক্ষম হলে ঐসব প্রতিবেশী রাষ্ট্রকেও একের পর এক নতুন অভিযোগ এনে অভিন্ন কায়েদায় গোলাম বানাবার প্রক্রিয়া শুরু করবে। তারপরও তারা ন্যায় ও সত্যের খাতিরে ইরাকের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না।

তবুও বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ এই বর্বর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং ইরাকের সমর্থনে এক শান্তিপূর্ণ পাল্টা যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে। সেটা হলো, প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ইরাকে গিয়ে সেখানকার মজলুম জনতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার দীপ্ত শপথের অভিব্যক্তি। বিশ্বের সর্বত্র তারা আলাদা আলাদাভাবে ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছে। সৌদী আরবের শীর্ষ স্থানীয় ওলামা সহ মুসলিম বিশ্বের প্রায় সবদেশের ধর্মীয় ওলামা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জনের আহবান জানিয়ে আসছেন। এ যাবত আরও অনেক ঘটনায় আগ্রাসীদের জুলুম-নিপীড়ন দুনিয়ার মানুষ মুখ বুঝে সহ্য করলেও নানান দিকের বিচারে বিশ্ব শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে চক্ষু লজ্জার খাতিরে কেউ এরূপ প্রান্তিক দাবী তোলেনি। কিন্তু যেই পারস্পরিক সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে তারা যে কথাটি এ যাবৎ বলেনি, এখন দেখা যাচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন নেতারা সেটার আদৌ পরোয়া করছে না বরং দুনিয়ার সকলকে তাদের আজ্ঞাবহ দাস-তস্যদাস ভাবতে শুরু করেছে, তাই বিশ্ববাসী ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জনের ক্ষয়ক্ষতির কোনো তোয়াক্কা না করেই তারা এ ডাক দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের আত্মনির্ভরশীলতার এক নতুন চেতনা ও নতুন সংকল্পেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

মূলতঃ ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জনের এসব আহ্বানে সাড়া দিয়েই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এ ব্যাপারে কাজ শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশর বড় বড় হোটেল

www.pathagar.com

রেস্টুরেন্টসমূহে ঝুলানো খাবার মেনুলিস্ট থেকে মার্কিন আইটেমসমূহ বাদ দিয়ে দিয়েছে। জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন এবং সুইজারল্যান্ডে উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা অনেক মার্কিন রেস্টুরেন্টে ভাংচুরও করেছে এবং ঘরের জানালাসমূহে তাদের পণ্য বর্জনের পোস্টারসমূহ লটকিয়ে দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়াতেও ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জনের হিড়িক পড়ে গেছে। বাংলাদেশেও বর্জনের সেই ঢেউ লেগেছে। ইন্দোনেশিয়ায় তো একশ্রেণীর যুবক ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জন আন্দোলনকে সফল করার লক্ষ্যে এ দুই দেশের যে-কোনো ধরনের ফিল্ম বর্জনেরও ঘোষণা দিয়েছে। "কাবা ইয়ুথ মোভমেন্ট" নামক একটি সংগঠন ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংগ-এর ১৭টি সিনেমা হলে ইঙ্গ-মার্কিন ছায়াছবি প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়ে বলেছে, এই বর্জন দেশের জনগণের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রী জোটের আগ্রাসী দুরভিসন্ধিকে উন্মোচিত করবে। এমনিভাবে ইন্দোনেশিয়ার একটি পরিবেশ রক্ষা সংস্থাও পশ্চিমা এনজিওর সাথে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ১২টি সদস্য রাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী দাবী জানিয়েছে যেন যুক্তরাষ্ট্রকে বয়কট করা হয় এবং তার পণ্য সামগ্রী ক্রয় থেকে সকলে বিরত থাকে। সৌদী আরবসহ সকল আরব রাষ্ট্রে মুসলমানরা যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি সকল পানীয় পেপসী কোক, মিনার‍্যাল ওয়াটার ব্যবহার বাদ দিয়ে দিয়েছে। গত ২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় ঐতিহাসিক দিনে সেখানকার জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের সহসভাপতি ও পার্লামেন্টারী দলের নেতা কাজী হোসাইন আহমদ এক বিশাল সমাবেশে জনগণের কাছে ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং তার বদলে লাহোরে নির্মিত ঐতিহ্যবাহী পানীয় ও নেহারী খাবার অনুরোধ জানিয়েছেন। কাজী হোসাইন আহমদ শান্তিপূর্ণভাবে এই পণ্য বর্জন অভিযান চালাবার নির্দেশ দিয়েছেন। সমাবেশে লাখো শ্রোতা পশ্চিমা কোম্পানিগুলো বয়কটের এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছে এবং প্রচন্ড উত্তেজনা সত্ত্বেও সেখানে এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ভাংচুরের ঘটনা ঘটেনি। করাচী জামায়াতে ইসলামীর মহিলা শাখার নেত্রী রাবেয়া আলমও পাকিস্তানী নারী সমাজকে ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন।

ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিন অবৈধ হামলার প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী সাধারণ গণমানুষের মধ্যে আগ্রাসীদের পণ্য বর্জনের ব্যাপারটি এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এটি হচ্ছে শান্তিপূর্ণ, শালীন ও মার্জিত প্রতিবাদের ধরন। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসী অন্তত আগ্রাসী শক্তিদ্বয়ের বর্বরতাপূর্ণ আগ্রাসনের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে, যা আগ্রাসন বিরোধী প্রতিবাদের একটি কার্যকর মাধ্যম।

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে অবাঞ্ছিত কোনো শক্তির পণ্য বর্জনের ইতিহাস ঐতিহ্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। যখন ব্রিটেন ও তার মিত্র শক্তিগুলো তুরস্কের বিশাল উসমানীয় খেলাফত ও মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতীক খেলাফতকে বিভক্ত করলো এবং তুর্কী মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালালো, তখন এই উপমহাদেশের মুসলমানরা নিজেদের তুর্কী ভাইদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে

www.pathagar.com

ছিল। খেলাফত কমিটি গঠন করে তারা এই কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তারা এভাবে ব্রিটিশ আগ্রাসন ও তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে নিজেদের ঘৃণা-ক্ষোভ প্রকাশ করে বৃটিশ শাসিত অবিভক্ত ভারতে বিরাট অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছিল বৃটিশ পণ্য। খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছিল হিন্দু-মুসলিম উভয়ের যৌথ উদ্যোগে। খেলাফত কমিটিসমূহ এবং কংগ্রেস উভয় সংগঠনের প্রচণ্ড আন্দোলনে যেই বৃটিশ বিরোধী গণবিপ্লব দেখা দিয়েছিল, মূলত সেই আন্দোলই ভারতে পরাক্রমশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যের গদিকে নড়বড় করে দিয়েছিল। সে সময় বৃটিশ পণ্য বর্জন যেমন শুধু পণ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সেই আন্দোলন বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে বৃটিশ বিরোধী এ বর্জনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল।

সুতরাং ঐতিহাসিক খেলাফত আন্দোলনের ন্যায় আজকের ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জন আন্দোলনও নিছক এই শান্তিপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ও বর্জন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এটিও ক্ষমতাদর্পী ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসী শক্তির ক্ষমতার ভিৎ নাড়িয়ে দেয়া পর্যন্ত অব্যাহত চলবে। কারণ এই দুই পরাশক্তি যেই অবিমৃষ্যকারীতার পরিচয় দিয়ে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে, তাদের প্রতিও দুনিয়াবাসী একই ভাবে ঘৃণা ও ক্ষোভের দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা অসম্ভব কিছু নয়।

খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ অন্দোলনের ন্যায় আজও এ ধরনের পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত নিছক আবেগতাড়িত প্রতিক্রিয়া না হয়ে ন্যায়, সত্য ও ইমান দীপ্ত আবেগেরই বহিপ্রকাশ। মানবতা ও সভ্যতার দুশমনরা ইসলামেরও দুশমন। ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাইল এই ত্রিশক্তি আজ মজলুম ইরাকবাসীর বিরুদ্ধে যেসব বোম-মিসাইল ব্যবহার করে চলেছে, এসব মারণাস্ত্র মুসলমানদেরই অর্থ সম্পদে নির্মিত। ইহুদী-মার্কিন পণ্যসামগ্রীর সবচাইতে বড় ক্রেতা হচ্ছে মুসলিম বিশ্ব। মুসলিম দেশসমূহ থেকে অর্জিত অর্থ-সম্পদ, উপায়-উপকরণ দ্বারা নির্মিত অস্ত্রই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই মুসলমানদের বিবেক ও সময়ের বড় দাবী হলো আজ ইহুদী-মার্কিন পণ্য বর্জন করা এবং ইসলাম ও মানবতার দুশমনদের শক্তিকে কিছুটা হলেও দুর্বল করা।

ইঙ্গ-মার্কিন-ইহুদী পণ্য বর্জনের এই অভিযানের আরও দু'টি দিকও বিবেচনার যোগ্য। এক. এ দুই দেশের পণ্য বর্জনের শূন্যতা পূরণার্থে মুসলিম পুঁজি বিনিয়োগকারীদেরকে জাতীয় ও মানবিক চেতনা সমৃদ্ধ হয়ে কর্মাঙ্গনে অবতীর্ণ হতে হবে। মার্কিন পণ্যের বিকল্প এবং মানোন্নীত পণ্যসামগ্রী ক্রেতা সাধারণের সমীপে উপস্থাপন করতে হবে। অনেক মুসলিম দেশের পুঁজি বিনিয়োগকারীদের কাছে যেমন আছে পুঁজি, তেমনি রয়েছে যোগ্যতা। তারা আন্তর্জাতিক মানের বিকল্প পণ্য নির্মাণে সক্ষমতার অধিকারী। নিছক সাময়িক প্রতিক্রিয়া হিসাবে নয় বরং স্থায়ী ভিত্তিতে এটা

www.pathagar.com

করা কর্তব্য। মুসলমান আজ এ জন্যেই অন্যদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার যে, তারা অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে দুর্বল। এই দুর্বলতা দূরীকরণার্থে আত্মপ্রত্যয় সহকারে আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হতে হবে। পণ্য বর্জনের এই অভিযানকে শুধু শ্লোগানে নয় এর মধ্যে বিকল্পতার প্রাণ সঞ্চার করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় দিকটি হলো, ইঙ্গ-মার্কিনীদের আগ্রাসনের বিরোধিতাকে শুধু পণ্য বর্জনের মধ্যে সীমিত না রেখে তাদের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামাজিক বয়কটও করতে হবে। সারাবিশ্বের প্রতিবাদ ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত নিয়ম-বিধিকে অগ্রাহ্য করে এই দুই পরাশক্তি ইরাকের উপর হামলা ও গণহত্যা চালিয়ে যেই জঘন্য অপরাধ করেছে, ঠিক এই মুহূর্তেই তাদেরকে এ নিষ্ঠুরতা থেকে বিরতরাখার সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালানো জরুরি। বিভিন্ন দেশ ও জাতির নিরাপত্তা, তাদের স্বাধীনতা রক্ষা ও এর স্থায়ীত্ব বিধান কল্পে এই শক্তিদ্বয়কে এটা সমঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা না হলে, কাবুলের পরে যেমন তারা ইরাকের উপর হামলা করেছে, তেমনি ইরাকের পরে পাকিস্তান, ইরান, সিরিয়া অন্য দেশের প্রতিও তারা আগ্রাসনে উৎসাহী হয়ে উঠতে পারে। বরং এ ব্যাপারে তারা আগেভাগে ঘোষণা দিয়ে অনেকটা অবকাঠামো তৈরি করেও রেখেছে। মোটকথা, ইঙ্গ-মার্কিন-ইহুদী পণ্য বর্জনের বিশ্বব্যাপী অভিযানে বক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সকলকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। দৃঢ় চিত্তে আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দ্বারা অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগতভাবে নিজেদের শক্তিশালী করতে হবে।

ইঙ্গ-মার্কিনীদের মুসলিম বিদ্বেষী মানসিকতা ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার এক নগ্ন দৃষ্টান্ত সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সেদিন ভারতীয় সংবাদপত্রে এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে যে, কুয়েতে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে কিছু লোককে চাকরিতে নিয়োগ করা হবে। তবে উক্ত চাকরির কোনো পদের জন্যে কোনো মুসলমান দরখাস্ত করতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্র ইরাকের তেল লুণ্ঠনের জন্যে সেখানে অযৌক্তিকভাবে আগ্রাসন চালিয়েছে, সাদ্দাম হোসেন বাধ সাদায় সেখানকার লোকদের প্রতি মার্কিনীদের বৈরীতা থাকতে পারে কিন্তু ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলমানরা এ ব্যাপারে কি অপরাধ করলো? তারা তো যেমন সাদ্দাম নয়, তেমনি উসামা বিন লাদেনও নয়। তদ্রূপ তারা মার্কিনীদের আতঙ্ক সন্ত্রাসীও নয়। তারপরও তারা মুসলিম বিদ্বেষের এমন পরিচয় দেয়ার কারণ কি ইসলাম নয়? তারা এ যাবত মুসলিম শাসকদের সাথে বন্ধুত্বের বাহ্যিক অভিনয় করলেও আসলে তারা মুসলমানদের ব্যাপারে আন্তরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে। এটা শুধু মুসলমানদের বাহ্যিক চেহারার দরুন নয় বরং নিজেদের ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের দরুনই তা করে। অন্যথায় এর বৈধ ও যৌক্তিক কোনো কারণ নেই যে, তাদের কোনো প্রতিষ্ঠানে হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কাজ করার সুযোগ পেলেও সেখানে মুসলমানদের জন্যে দ্বার রুদ্ধ থাকবে।

www.pathagar.com

ইরাকে মার্কিন সামরিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও এক লাখ বিশ হাজার সৈন্য আনা হয়েছে ইরাকে মার্কিন সৈন্য বৃদ্ধি করা এবং যুদ্ধের জন্যে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ মুসলিম দেশসমূহের বিরুদ্ধে তৈরি নীল-নকশা বাস্তবায়নেরই অংশ বৈ কিছু নয়। সম্প্রতি মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামাসফেল্ড সিরিয়া এবং ইরানের বিরুদ্ধে ইরাককে সামরিক সাহায্য সরবরাহের অভিযোগ এনেছেন এবং ইরানের বিপ্লবী গার্ডদের ইরাকে পাঠানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ মর্মে হুমকিও দিয়েছেন যে, তারা এ কাজ থেকে বিরত না হলে তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হবে। আগ্রাসীরা শুধু ইরাকের উদ্দেশ্যেই আসেনি। বরং, তাদের এই দুরভিসন্ধির মূল লক্ষ্য হলো গোটা মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া। সিরিয়া-ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিনীদের অভিযোগ যে কতদূর সত্য কতদূর মিথ্যা, তা বলা মুশকিল। কিন্তু এসব দেশের উপর হামলার একটা অজুহাত তো চাই। বাগদাদকে কাবু করতে সক্ষম হলে এরপর সিরিয়া এবং ইরান অভিমুখে তার অগ্রযাত্রা চলবে। কারণ ইরাকের পর ঐ অঞ্চলে ইরানই থাকে শক্তিশালী। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে অত্র এলাকার অন্যান্য মুসলিম শাসকরা “দেখি চোরা কি করে” নীতি অনুসরণ করে চললে, তার ভয়াবহ পরিণতি তাদের ভোগ করা অসম্ভব নয়। —আল্লাহ্ হাফেজ!

ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিন হামলার মতো একই আশঙ্কা ব্যক্ত করে মার্কিনীদের সহায়ক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ পর্যন্ত বেশ কয়েকদিন আগে তাঁর বেতার ভাষণে বলেছেন যে, “পাকিস্তানেরও পালা আসতে পারে।” যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বিশ্বময় বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহে একের পর এক তার হিংস্র থাবা বিস্তার করে চলেছে, তাতে এরূপ আশঙ্কাই স্বাভাবিক। মার্চের শেষ সপ্তাহে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলও ফরাসী টিভিকে ইন্টারভিউ দানকালে বলেছেন, ইরাকের পর উত্তর কোরিয়া এবং ইরানের সাথে বুঝাপড়া আছে। অবস্থার গতিপ্রবাহে প্রতীয়মান হয় যে, মার্কিনীদের তালিকায় উত্তর কোরিয়ার নামটি নিচে। তালিকার উপরস্থ দেশগুলোকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইদানিং মার্কিন অফিসাররা নানান ধরনের অভিযোগ নিয়ে আসছেন। খোদ পারভেজ মোশাররফও সামরিক লোক হিসাবে অনুধাবন করেন যে, ঘটনাবলী কোন দিকে মোড় নিতে পারে। সুতরাং অত্র এলাকার দেশসমূহ যেমন পাকিস্তান, ইরান, সৌদী আরব, মিসর, জর্দান এবং সিরিয়ার কাছে বর্তমান নাজুক পরিস্থিতির এটাই দাবী যে, তাদের নিঃচেষ্ট বসে থাকা উচিত নয়। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই সকলকে এক হয়ে এই বর্বর শক্তি রোধে চেষ্টা করতে হবে। ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধী ফ্রন্ট খোলার এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। কারণ আমেরিকা অন্যায়ভাবে ইরাকের উপর হামলা চালিয়ে এমনিতেই বিশ্ববাসীর সমালোচনা ও যুদ্ধ বন্ধের দাবীতে চাপের মুখে রয়েছে, পরন্তু সে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে এসে যুদ্ধ পরিচালনা করছে, যা এত সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। সময়টির সৎ ব্যবহার পূর্বক সংশ্লিষ্ট মুসলিম দেশগুলোর উচিত ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধী কতিপয় যুদ্ধফ্রন্ট খুলে এই

www.pathagar.com

আগ্রাসী শক্তিদ্বয়কে দুর্বল করে তোলা।.... এক সাদ্দাম বাহিনীর প্রতিরোধের প্রাচীর উঙ্গাতে যেখানে এই বৃহৎ পরাশক্তিগুলোর এত কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে, যেখানে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইরাক দখল করে নেয়ার কথা ছিল, সেক্ষেত্রে আজ ৩ সপ্তাহ ধরেও মানুষ হত্যা করা ছাড়া এখন পর্যন্ত আগ্রাসী শক্তি কোথাও সুনির্দিষ্ট ভাবে পা গেড়ে বসতে পারেনি। ইরাক একাই যদি এতদূর করতে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে তার প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠলে রাশিয়ার মতো বিরাট শক্তি যেমন আফগানিস্তানে পর্যুদস্ত হয়ে বিদায় হয়েছিল, তেমনি ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকেও অভিন্ন কায়দায় বাধ্য হয়ে ইরাক ছাড়তে হতো। সংশ্লিষ্ট সকলের স্মরণ করা দরকার, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর হাতে ইরাকের পরাজয় গোটা আরব বিশ্ব তথা শান্তিকামী বিশ্বের পরাজয়, সভ্যতার পরাজয়।

জাতিসংঘের প্রতি বুশ-ব্লেয়ারদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শনের নেপথ্য রহস্যঃ দ্যাগ হেমারশোল্ডকে কেন হত্যা করা হয়েছিল?

[প্রকাশ ঃ ২. ৪. ২০০৩ইং]

ইহুদী প্রভাবিত মার্কিন প্রশাসন জাতিসংঘকে এ যাবত তার কর্মকাণ্ড স্বাধীনভাবে চালাবার পথে যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি করে আসছে। সে কারণে এই বিশ্বসংস্থা তার প্রতিষ্ঠার সুমহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে স্বাধীন ও সাবলীল গতিতে অগ্রসর হতে না পারায় অনেক আন্তর্জাতিক সমস্যারই সমাধান হতে পারেনি। বিশেষ করে মার্কিন প্রশাসনে চরম মুসলিম বিদ্বেষী ইহুদী প্রভাব মাত্রাতিরিক্ত থাকায় মুসলিমবিশ্ব কেন্দ্রিক যেসব পুরাতন সমস্যা ছিল, সেগুলো এখনও তথৈবচ অবস্থায়ই রয়ে গেছে। বরং জাতিসংঘের কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়াতে সেগুলোর সাবেক অবস্থানগত পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রও ইতিমধ্যে বহুদূর এগিয়ে গেছে। ফলে আজ দীর্ঘ অর্ধ শতাধিক বছর ধরে সেখানে অব্যাহত রক্তপাত ঘটে আসছে।। ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, চেচনিয়াসহ আরও যেসব ভূখণ্ডের আগ্রাসী প্রতিবেশী শক্তি সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছে, সেগুলোর পরিস্থিতি দিনের দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৈষম্যমূলক প্রভাবে সেখানে জাতিসংঘ কিছুতেই তার গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়ন দ্বারা ঐ সব স্থানে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কোনো ভূমিকাই পালন করছে না বা করতে পারছে না।

এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার লক্ষ্যে ইহুদী ষড়যন্ত্র সক্রিয় হয়। তাদের বিজ্ঞানীদের সূক্ষ্ম প্রযুক্তিগত কৌশলে সংঘটিত বলে কথিত টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনাটি ঘটানো হয়। এ জন্যে মার্কিনীদেরই সৃষ্ট মুজাহিদ

www.pathagar.com

লাদিনকে আশ্রয় দানের অযৌক্তিক অভিযোগে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করা হয়। তালেবান সরকারকে উৎখাত করা হয় এবং হত্যা করা হয় হাজার হাজার আফগান মুসলমান নারীপুরুষ শিশুকে। ঠিক এ সুযোগেই ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাইল ফিলিস্তীনকে তছনছ করে এবং হাজার হাজার ফিলিস্তিনী মুসলমানকে হত্যা ও তাদের বাড়িঘর নিষ্পেষিত করে ফেলে।

কিন্তু বুশ প্রশাসন অতি চাতুর্যের সাথে সন্ত্রাস দমনের নামে সকলকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে ফেলে আফগান যুদ্ধে বিশ্বের সমর্থন আদায় করে তার ও অন্ধানুসারী ব্লেয়ার যখন ১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ার ধ্বংসে অভিযুক্ত ও আফগানিস্তানে আশ্রিত লাদিন ও সঙ্গীদের বিরুদ্ধে নিজেদের দাবীর সপক্ষে কোনোরূপ প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়, তখনই বিশ্বের অন্যান্য নেতা বুশের তথাকথিত সন্ত্রাস দমন অভিযানের মতলব বুঝতে পারলেন যে, "ডাল মে কুচ্য কালা মালুম হোতা হ্যা।" এটা আঁচ করেই তারা পূর্বের সহযোগিতামূলক অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ান এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

অতঃপর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী তার অস্ত্র পরিদর্শক দলকে সাদ্দাম কর্তৃক ইরাকে যাবার ও দেশটির উপর-নীচ সব খতিয়ে দেখার অনুমতি দান সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রস্তুতি, সেখানে সৈন্য প্রেরণ সকলকে বিস্মিত করে। তদন্তে আপত্তিকর কিছুই না পাওয়া এবং বৈধ নিয়মে নিজ প্রতিরক্ষার জন্যে নির্মিত কোটি কোটি টাকার ইরাকী সামূদ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করা ও বুশের যুদ্ধ হুঙ্কারে দুনিয়াবাসী হতবাক হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতারণামূলক অভিযোগের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ বুশের অনুকূলে ইরাকের ব্যাপারে প্রস্তাবে নেবে না—জেনেই বুশ ও তার সহযোগীরা ইরাকে হামলার জন্যে জাতিসংঘের অনুমতি লাগবে না বলে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। তাতে সকলেই বুশের দুরভিসন্ধি আরও ভালভাবে উপলব্ধি করে। মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল তেল সম্পদের অধিকারী হয়ে ইউরোপসহ সারা দুনিয়ার মানুষকে যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী করা ও সকলের উপর কর্তৃত্বের ছড়ি ঘুরানোই তার ইরাক দখল চিন্তার উদ্দেশ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী প্রভাবিত রাজনৈতিক তাত্ত্বিকরা তাই নিজেদের অনুগত সেবাদাস একটি "নতুন জাতিসংঘ" গঠনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। সেই চিন্তা থেকেই জেনেশুনে বর্তমান জাতিসংঘের সাথে সে অন্যায় আচরণ করে চলেছে। বিশ্বজনীন স্বীকৃত এর মানবাধিকার সনদের তারা প্রকাশ্যে বরখেলাফ করছে। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী তার কোনো সদস্য যতবড় শক্তিশালীই হোক না কেন, অপর স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর অন্যায়ভাবে হামলা করতে পারে না। তাহলে এটা হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রাক্কালীন সেই অরাজকতাপূর্ণ দুর্বিষহ বিশ্ব পরিস্থিতির মতো, যা কারুরই কাম্য নয়। ঐ অবস্থার পুনরাবৃত্তিতে বিশ্বময় অতীত অরাজকতা, হাজারো লাখো মানুষ হত্যা, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার,মানুষের স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকার হরণ ইত্যাদি আরও অধিক ঘটবে। তা যাতে ঘটতে না পারে, এ জন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আজকের

www.pathagar.com

জাতিসংঘ গঠন করা হয়েছিল। সাবেক জাতিপুঞ্জ-লীগ অব ন্যাশান্স উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়াতেই United Nations তথা জাতিসংঘ নামের এই বিশ্ব দরবার গঠিত হয়। লীগ অব ন্যাশান্সের মৃত্যুঘন্টা বেজে ছিল তার নীতি-আদর্শ অমান্যকারী, গণতন্ত্রও মানবাধিকার বিরোধী স্বৈরাচারী শাসকদের দ্বারা। তেমনি আজ সারা দুনিয়ার প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে ইরাক আক্রমণের মধ্যদিয়ে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের নীতিমালাকে পদদলিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো জাতিসংঘের প্রভাবশালী সদস্য দেশের কোনো প্রশাসন কর্তৃক এ ধরনের অন্যায় পদক্ষেপকে বিশ্ববাসী এ জন্যেই বিভিন্ন অভিধায় আখ্যায়িত করছে। কেউ বলছে-এটা "বিশ্ব মানবের অন্ধকার যাত্রা" কেউ বলছে-"সমগ্র বিশ্ব নেতৃত্বকে অপমানিত করা" কেউ বলছে "ক্ষমতাদর্পীদের অন্যায়ভাবে পররাজ্য গ্রাসের অরাজকতার দ্বার উন্মোচন করা", কেউ বলছে, "গোটা বিশ্বের উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক একচ্ছত্র আধিপত্যের ছড়ি ঘুরানোর সূচনা।" জাতিসংঘের অন্যান্য ভেটো ক্ষমতাধারী সদস্যদের ইরাককেন্দ্রিক মার্কিন নীতির প্রচণ্ড বিরোধিতা এবং অন্যান্য বারের মতো এবার মার্কিনীদের আনুকূল্য দানে জাতিসংঘের অনমনীয়তাও তাদেরকে এ সংস্থার প্রতি বিরক্ত করেছে।

বর্তমান 'অবাধ্য' জাতিসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শনের হেতু যে বুশ প্রশাসনের তলে তলে নিজের অনুগত নতুন জাতিসংঘ গঠন এবং তার জন্যে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে নীতিমালা তৈরি করা, ইতিপূর্বেকার অন্যান্য ঘটনাবলীও এ ধারণারই পোষকতা করে বৈ কি। যেমন, মার্কিন মুখপাত্র স্পষ্ট বলেছে যে, 'ইরাকবিরোধী যুদ্ধে জাতিসংঘ আমেরিকার সাথে একাত্মতা না দেখালে জাতিসংঘের বিকল্প নতুন বিশ্বসংস্থা গঠন করা হবে।' অর্থাৎ আমেরিকা এবং বৃটেনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি নতুন জাতিসংঘ গঠিত হবে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ একাধিকবার বলেছেন যে, "জাতিসংঘ যদি ইরাকে হামলার অনুমতি না দেয় তবুও বৃটেনসহ আমেরিকা এই হামলাতো করবেই এ সংগে জাতিসংঘের পরিণতিও লীগ অব ন্যাশান্সের মতোই হবে।"

বৃটেনের পত্রিকা 'টেলিগ্রাফ'-এ এমর্মে এক রিপোর্ট ছাপা হয় যে, "জাতিসংঘকে ছাড়াই বৃটেন-আমেরিকা ইরাকের উপর হামলা করবে।" এভাবে এটা আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, যুক্তরাষ্ট এখন আর জাতিসংঘকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি প্রশ্নে আমেরিকা এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠানকে এখন নিজের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম বিশ্বের সমস্যাবলী ছাড়া জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিষয়াদির প্রশ্নে সংস্থাটি অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকাই পালন করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে যখন খোদ পাশ্চাত্যেই ইরাকের উপর ইঙ্গ-মার্কিন হামলার প্রতিবাদের প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে, এখন আমেরিকার খোদ জাতিসংঘের উচ্ছেদ চিন্তা করাটা অসম্ভব কিছু নয়। সামরিক বলদর্পী আমেরিকা যদি এটা করেই বসে, তাহলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

www.pathagar.com

যেমন এর ভয়াবহ পরিণতি দেখা দেবে, তেমনি বিশ্ব রাজনীতিতেও নিঃসন্দেহে এক নতুন মেরুকরণের প্রক্রিয়া শুরু হতে বাধ্য।

আসলে জাতিসংঘের উপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তারের মার্কিনী কার্যক্রম বহু পুরাতন। জাতিসংঘের সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল দ্যাগ হেমাশোল্ড মার্কিন অনুসন্ধানী সংস্থা এফবিআই-এর জাতিসংঘের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। তখন ছিল রুশ-মার্কিন স্নায়ু যুদ্ধের মুহূর্ত। বিশ্ব তখন সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী এই দুই শিবিরে বিভক্ত ছিল। জাতিসংঘই ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্র। মার্কিন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এবং এফবিআই-এর উচ্চ পর্যায়ের অধিবেশনসমূহে জাতিসংঘের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মনিটরিং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল জাতিসংঘকে মার্কিন ইন্টেলিজেন্স এবং এফবিআই-এর অধীন করা ১৯৫৩ সালে মেকার্থীজম ছিল উর্ধমুখী। জনফ্যাস্টার ডলাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী অব স্টেট ছিলেন। তিনি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল দ্যাগ হেমার্শোল্ডকে যখন জানালেন যে, মার্কিন এফবিআই জাতিসংঘের কোনো কোনো প্রতিনিধির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে চায়, তখন হেমার্শোল্ড কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দ্যাগ হেমার্শোল্ড বলেছিলেন, এফবিআইকে জাতিসংঘের কোনো প্রতিনিধির গোপন তথ্যাবলী রেকর্ড ও অনুসন্ধানের এরূপ অনুমতি দেয়া হলে , তাতে জাতিসংঘের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হবে এবং এর পক্ষে তখন ন্যায়-নীতিপূর্ণ ভূমিকা পালন কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এর জবাবে জন ফ্যাস্টার ডলাসের বক্তব্য ছিলো এই–"মার্কিন সরকারের এই সিদ্ধান্ত জাতিসংঘকে মেনে নিতেই হবে। এফবিআই সহকারে মার্কিন ইন্টেলিজেন্স সংস্থাকে অনুসন্ধান চালাবার অনুমতি দিতে হবে।" কিন্তু দ্যাগ হেমার্শোল্ড এ ব্যাপারে মার্কিন চাপের মুখে নতি স্বীকার করেননি। তিনি জাতিসংঘের নীতি-আদর্শকে সমুন্নত রাখার এই সংগ্রামে জিতেছিলেন। কিন্তু মার্কিন ইন্টেলিজেন্স সংস্থা দ্যাগ হেমার্শোল্ডে-র এই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকাকেও সহ্য করতে পারেনি। শুরু হয়ে যায় হেমার্শোল্ডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ওপর ষড়যন্ত্র। অবশেষে দেখা গেল, নীতির প্রশ্নে অনড় জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল হেমার্শোল্ড এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

হেমার্শোল্ড ছিলেন সুইডেনের এক প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য। তাঁর পিতা ছিলো সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী এবং নোভেল ফাউন্ডেশনের প্রধান। দ্যাগ হেমার্শোল্ড ২৯শে জুলাই-১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে Uppasala ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি ডিগ্রি হাসিল করেন। ১৯২৬ সালে ইকোনমিক্স-এ গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে স্টকহোম ইউনিভার্সিটি থেকে শিক্ষাদানের সূচনা করেন। ১৯৩৬-১৯৪৫ সালের মধ্যে সুইডেন সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে আন্ডার সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬ সালে সুইডেন সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন।

১৯৪৯ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তার হাতে আসে। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত দ্যাগ হেমার্শোল্ড জাতিসংঘে সুইডেনের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১০ই

www.pathagar.com

এপ্রিল ১৯৫৩ সালে তাঁকে জাতিসংঘে ৫ বছরের জন্যে সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচন করা হয়। ১৯৫৭ সালে হেমার্শোল্ড দ্বিতীয়বার পাঁচ বছরের জন্যে সেক্রেটারী জেনারেল পদে নির্বাচিত হন। তাঁর এটাই ছিল জাতিসংঘে দায়িত্ব পালনের এমন একটি মেয়াদকাল, যে সময়টি তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আমেরিকার মধ্যে পূর্ণ স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল। গোটাবিশ্বে তখন উভয় বৃহৎ শক্তির বিরোধ ছিল উত্তুঙ্গে। কিন্তু দ্যাগ হেমার্শোল্ড অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তাঁর ভূমিকা প্রদর্শন করেন এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে জাতিসংঘকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের রূপ দেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস হলো এই যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্য শক্তিগুলো তাঁকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতে থাকলো। সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতা নিকেতা ক্রুশ্চেভ তাকে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিসাবে মনে করতে থাকে। এমনকি নিকেতা ক্রুশ্চেভ দ্যাগ হেমার্শোল্ডকে মার্কিন স্বার্থের পর্যবেক্ষক আখ্যা দিয়ে তাঁকে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের পদ থেকে ইস্তেফা দানেরও দাবী করে বসেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এই ইস্যুতে ভোটাভুটি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো তখন দ্যাগ হেমার্শোল্ড-এর সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে হেমার্শোল্ডের অনুকূলে ৮৩ ভোট পড়ে। অপরদিকে ক্রুশ্চেভ তাঁর প্রস্তাবের সপক্ষে পান মাত্র ১১ ভোট। এটা ছিল জাতিসংঘে সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের এক কূটনৈতিক পরাজয়।

নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির অনুসরণ করাতে তৎকালীন আরব লীগের প্রভাবশালী নেতা মিসরের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরকে তাঁর বিখ্যাত আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতিশ্রুত সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার যখন সিদ্ধান্ত নেয়, তখন নাসের তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে আন্তর্জাতিক সুয়েজখাল জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত নেন। এতে ২৮শে অক্টোবর ১৯৫৫ সালে বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইসরাইল মিসরের উপর হামলা করে বসে। সেই যুদ্ধের গভীর প্রভাব পড়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক চিন্তাধারায়। সে সময় জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল দ্যাগ হেমার্শোল্ড এ যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে অসাধারণ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। তার ফলশ্রুতিতে সুয়েজ যুদ্ধের দ্রুত অবসান ঘটে। ৪ঠা নভেম্বর ১৯৫৬ সাল জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সুয়েজ যুদ্ধ অবসানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উল্লেখ্য তারপরও যুক্তরাষ্ট্র সেই যুদ্ধের প্রতিশোধই নিয়েছিল পরবর্তী আরব-ইসরাইল যুদ্ধে। যেসময় মিসরের স্থল বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানরা প্রতারিত হয়ে এক ষড়যন্ত্রমূলক অনুষ্ঠানে থাকাতে যুদ্ধে অংশই নিতে পারেননি।

যাহোক, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সুয়েজ যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ২২শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে আক্রমণকারী ত্রিশক্তির সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহৃত হয়। ৭ই মার্চ ১৯৫৭ সালে গাজা উপত্যকায় ৬ হাজার মিসরীয় এবং ইসরাইলী সৈন্য মোতায়েন করা হয়। অনুরূপভাবে হাঙ্গেরীতে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে ২২শে অক্টোবর ১৯৫৬ সালে যখন ছাত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়, তাতে ৩০শে অক্টোবর ১৯৫৬ সালে রুশ

www.pathagar.com

বাহিনী হাঙ্গেরীতে হস্তক্ষেপ করলে সেই সংকট নিরসনেও দ্যাগ হেমার্শোল্ড বিচক্ষণতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি লেবান, জর্দান, ইসরাইল, ফিলিস্তীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের সকল সমস্যার সমাধানে সব সময়ই নিরপেক্ষ সালিসের ভূমিকা প্রদর্শন করেন। তবে দ্যাগ হেমার্শোল্ডের মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তখন আফ্রিকা মহাদেশের প্রতি। পশ্চাৎপদ আফ্রিকান জনগণের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালবাসা। তিনি তাদের দারিদ্র্য নিরসনকল্পে নৈতিকভাবে প্রচুর সমর্থন জ্ঞাপন করেন ও সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করেন। যখন কঙ্গো বেলজিয়ামের ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত হয়, তখন পাশ্চাত্য নীতিনির্ধারকদের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে সেটা ছিল এক বড় ধরনের দুর্ঘটনা। কারণ, কঙ্গোতে ছিল প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল কফি আনান ৭ই মার্চ (২০০৩ সাল) কঙ্গোর খনিজ ভান্ডার সম্পর্কে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেন। কঙ্গোর কাতাঙ্গা প্রদেশে ছিল হিরার খনি। কঙ্গোকে স্বাধীনতা দেয়া হলেও পাশ্চাত্য দেশসমূহ কাতাঙ্গার খনিজ সম্পদ ভান্ডারসমূহ হাতছাড়া করতে প্রস্তুত ছিল না। কঙ্গোর রাষ্ট্রনায়ক লমুম্বাকে তখন মার্কিন বিরোধী বলে গণ্য করা হতো। তাঁর সম্পর্কে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে The assassination of Lumuba নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার লেখক ছিল লডোডি ওয়াইট। গ্রন্থটির প্রকাশক হলো, ওয়ার্সো বুক্স। গ্রন্থটিতে তৎকালীন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ প্রধান ইলিন ডালস-এর কঙ্গোস্থ মার্কিন সিআইএ-র স্টেশন চীফ লরেন্স ডিউসনের নামে প্রেরিত টেলিগ্রাফের কপি প্রকাশ করা হয়। তাতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ প্রধানের নির্দেশ ছিল যে, "কঙ্গোতে লুমুম্বা নেতৃত্বের অবাধ ধারাবাহিকতা বিশ্বের এবং মার্কিন স্বার্থের জন্যে ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে। সুতরাং লুমুম্বাকে অগৌণে ক্ষমতাচ্যুত করা হোক এবং কাজটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই করা কর্তব্য।" এর পরেই ১৭ই জানুয়ারি ১৯৬১ সালে কঙ্গোর অবিসংবাদিত নেতা লুমুম্বাকে হত্যা করা হয়। তাতে মার্কিন সিআইএ-র বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে পর্যবেক্ষকদের প্রবল ধারণা। জাতিসংঘ মহাসচিব হিসাবে হেমার্শোল্ড কঙ্গোর এই পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তখন Moisc TS Homd-এর সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছিলেন, যিনি যুক্তরাষ্ট্র এবং সেখানকার পশ্চিমা কোম্পানীগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় কঙ্গোতে বিদ্রোহ করে নিজ সরকারের ঘোষণা দিয়েছিলেন। জাতিসংঘের DC-6 বিমানে দ্যাগ হেমার্শোল্ড আফ্রিকা সফর করছিলেন, যেই বিমানটি দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছিল। তিনি সেই বিমান দুর্ঘটনায়ই ১৫ জন আরোহী কর্মচারীসহ নিহত হয়েছিলেন। তাঁর এই মৃত্যুকে বিমান দুর্ঘটনাজনিত বলে প্রচার করা হয়। খোদ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডী জাতিসংঘে ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬১ সালে ভাষণ দিতে গিয়ে দ্যাগ হেমার্শোল্ডকে "বিশ্ব শান্তির দূত" অভিধায় আখ্যায়িত করেছিলেন। পরে প্রেসিডেন্ট কেনেডীকেও রহস্যজনকভাবে হত্যা করা হয়। যখন দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীনতা লাভ করে এবং সেখানে বর্ণবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তখন তা তদন্ত করার

www.pathagar.com

লক্ষ্যে যেই তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অতীত সরকারগুলোর দলিল দস্তাবিজসমূহ পরীক্ষা করা হয়, তখন (১৯৯৮ সালে) উক্ত কমিশনের প্রধান এবং অনুসন্ধানী প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষিণ আফ্রিকার South Asia Institute নামক একটি প্রতিষ্ঠানের কতিপয় দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা করতে হয়। তা থেকেও এই বিস্ময়কর তথ্যাবলী প্রকাশ পেয়েছিল যে, দ্যাগ হেমার্শোল্ডকে হত্যা করা হয়েছিল। এই ইনস্টিটিউট ছিল মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। ঐ সব দলিল দস্তাবিজ অনুযায়ী প্রমাণিত যে, জাতিসংঘ মহাসচিব দ্যাগ হেমার্শোল্ডের মৃত্যু। দুর্ঘটনায় নয়–তাকে হত্যাই করা হয়েছিল। সেসব কাগজপত্রে একটি মিটিংয়ের উল্লেখ ছিল, যেই মিটিংয়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ, বৃটিশ M-15 এবং স্পেশাল অপারেশন এক্সিকিউটিভ-এর সদস্যবর্গের প্রধান কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মার্কিন সেক্রেটারী অব স্টেট জন ফ্যাস্টার ডলস-এর ভাই এবং মার্কিন সিআইএ প্রধান উইলসন ডলস সেই মিটিং-এ বলেছিলেন, "দ্যাগ হেমার্শোল্ড আমাদের জন্যে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছেন। সুতরাং তার অপসারণ একান্ত জরুরি।" এসব দলিল-দস্তাবিজের সাথে আরেকটি প্রামাণিক দস্তাবিজ এও ছিল যাতে লেখা ছিল–"লুমুম্বার চাইতেও অধিক বিচক্ষণতার সাথে দ্যাগ হেমার্শোল্ডকে পথ থেকে অপসারণ করতে হবে।" ডলস ব্রাদার্স জাতিসংঘে মার্কিন ইন্টেলিজেন্স সংস্থার প্রাধান্যের বিরুদ্ধে দ্যাগ হেমার্শোল্ডের প্রতিবন্ধকতার কথা ভুলতে পারেননি। তাই তাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। সাবেক পাক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের মৃত্যু সম্পর্কেও এরূপ কিংবদন্তী রয়েছে। সাদ্দাম হোসেন অনুরূপ ষড়যন্ত্রেরই শিকার হলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

দত্তদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির অপচেষ্টা রুখতে হবে

[প্রকাশ ঃ ২৬. ২. ২০০৩ইং]

ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠীর চাইতে দেশ-জাতি বড়,–আমরা সকলে একথা জোর গলায় উচ্চারণ করি। কিন্তু যখন দেশ জাতির বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় কিংবা ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের অবকাঠামো সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকে, সে সময় দায়িত্বশীল লোকেরা এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেন না। কেউ করেন না নিজ দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে, কেউ করেন না অর্থ লিপ্সা, ক্ষমতা লিপ্সা চরিতার্থ করার অন্তরায় মনে করে, কেউ শক্তিশালী বিদেশী রাষ্ট্রের তাঁবেদারীর সুবিধা হারাবার ভয়ে। তেমনি দেশ-জাতির অস্তিত্ববিরোধী ষড়যন্ত্র জেনে-বুঝেও কেউ এ জন্যে এর প্রতিবাদ থেকে বিরত থাকেন যে, প্রতিবাদ করা হলে তা নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন ও তার বক্তব্যের অনুকূলে চলে যাবে। যেমন – ক্ষমতা থেকে আজীবন দূরে থেকেও জাতীয় স্বার্থে আলেমরা

www.pathagar.com

যখন কথা বলেন, অনেকেই তার সাথে উল্লেখিত কারণে সায় দেন না। অথচ এরূপ অনেক কাজের প্রতিবাদই আমাদের দেশের আলেম সমাজ, ধর্মীয় মহল এদেশে করে থাকে, যারা চিরকাল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে দূরে থেকেই দেশ-জাতির স্বার্থে এসব কথা বলে এসছেন। জাতীয় বিপর্যয়ের মুহূর্তে নিঃস্বার্থভাবে বক্তব্য দিয়ে আন্দোলন, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে দেশ-জাতি ও নিজ জন্মস্থানের স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে ভূমিকা পালন করে এসেছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত কারণে দায়িত্বশীলরা তাদের দাবীতে না পারতে সাড়া দেন না। সাড়া দেন তখনি, যখন পরিস্থিতি একেবারে ঘাড়ে এসে বসে। এদেশে ইসলামের দুশমন এবং বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার ও হিন্দুত্ববাদের প্রকাশ্য ও ছদ্মবেশী এজেন্টদের বিরুদ্ধে ইসলাম ও স্বাধীনতার প্রকৃত দরদীরা দীর্ঘদিন থেকেই স্বেচ্ছার প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে, কিন্তু প্রায় সকল ক্ষমতাসীনরাই এগুলোকে "ধর্মীয় মহলের আবেগ তাড়িত দাবী" মনে করে এর প্রতি তেমন গুরুত্ব দেননি। কোনোরূপ কার্যকর ব্যবস্থা নেননি ওসব স্বাধীনতা বিরোধী ও ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে। বরং তাদের প্রচার মিডিয়াকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পোষকতা দিয়ে অধিক জোরদার করতে যেমন দেখা গেছে, তেমনি এহেন মানসিকতার লোকদেরকেই জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যমসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে শক্তভাবে বসারও সুযোগ করে দিতে দেখা গেছে। বলাবাহুল্য, কোনো অপরাধী চক্র কৌশল করে নিজেদের অপরাধের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেলে, তখন তারা নিজ অপকর্মে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠে। অদ্রূপ কোনো মুসলিম দেশে ইসলাম ও সংশ্লিষ্ট দেশের স্বাধীনতার বিরোধী বলে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে, সাথে সাথেই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাসীন সরকারের ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। এ জন্যেই আল্লাহর রাসূল একাধিকবার সহাবস্থান চুক্তি লঙ্ঘনকারী ইসলাম বিদ্বেষী একশ্রেণীর মুশরিকের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ জারি করে বলেছিলেন, আখ্‌রিজুল মুশরিকীনা মিনজাযীরাতিল আরব–" তোমরা মুশরিকদেরকে (যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামের বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রকারী, চুক্তিভঙ্গকারীদের) জাযীরাতুল আরব থেকে বহিষ্কার করে দাও।" এমনিভাবে যারা মুরতাদ হয়েও মুস্‌লিম সোসাইটিতে অবস্থানের সুবাদে এ সমাজ থেকে ইসলাম উৎখাত ও এই মুস্‌লিম দেশটির স্বাধীনতার মুলোৎপাটনের কাজে লিপ্ত, তাদেরকে নির্ধারিত শাস্তি দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র স্থায়ী ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই রাষ্ট্র, সমাজ ও জাতি-ধর্মের বিরুদ্ধে এহেন ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের অপকর্ম অব্যাহত রাখার সুযোগ পেলে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মুসলমানদের জন্যে তখন কি হতো তা সহজেই অনুমেয়।

ঠিক তেমনিভাবে আজকের দিনেও যেসব মুসলিম দেশের ক্ষমতাসীন বা ইসলাম ও স্বাধীনতার অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শত্রুদের ব্যাপারে স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে আসছে, তাদের আজ ইতিহাসের চরম খেসারত দেয়ার

www.pathagar.com

আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। হিন্দু-বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ নামের সাম্প্রদায়িক সংগঠনটি নিজেকে সংশ্লিষ্ট ধর্মসমূহের অনুসারীদের প্রতিনিধত্বশীল বলে দাবী করলেও ঐসব ধর্মাবলম্বী অনেকেই তাদেরকে ভিন্ন ভাবেই আখ্যায়িত করে। হালে দেশের ভিতরে-বাইরে এই নামের সংগঠনটির বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভূমিকাও তারই প্রমাণ দিচ্ছে। এই সংগঠনটির নেতা সি আর দত্তের এহেন ভূমিকা সম্পর্কে বহু আগে থেকেই জনগণ বিভিন্ন সময়ের ক্ষমতাসীনদেরকে সতর্ক করে আসছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ও দোসরদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় এদের ঔদ্ধত্য এতোই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তারা এখন শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বেরই বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্য দিচ্ছে না, এদেশের কোটি কোটি মুসলমানের জীবনের চাইতে প্রিয় ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধেও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দিতে শুরু করেছে। তথাকথিত হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা সম্প্রতি "বাংলাদেশে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" বাতিল করার দুঃসাহসিকতাপূর্ণ দাবীও তুলেছে। সি আর দত্তরা দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে তাতে কোনো সুফলের আশা না দেখে বাংলাদেশের কোটি কোটি মুসলমানের ধর্মীয় আবেগে আঘাতের মতলবটি অন্যত্র। তার এরূপ বক্তব্য দানের পেছনে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—হাঙ্গামা সৃষ্টির দ্বারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারই উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। একদিকে ভারতীয় পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে সে দেশের মুসলিম নামের নাগরিকদের "পুশইন সন্ত্রাস", যা দেশপ্রেমিক বিডিআর বাহিনীর অতন্দ্র প্রহরায় সফল হচ্ছে না, অপরদিকে এদেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির মতলবে উস্কানিমূলক এ বক্তব্যকে দল-মত নির্বিশেষে দেশপ্রেমিক নাগরিকদের বিশেষ দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। এক্ষেত্রেও অভ্যন্তরীণ দলীয় সংকীর্ণ চিন্তার কোনো অবকাশ নেই। অন্যথায় সকলকেই এ জন্যে পস্তাতে হবে। স্বাধীনতা ও দেশ—জাতি—ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের গোটা জাতি-সত্তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যারা দেশে-বিদেশে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে, তারা রেখে ঢেকে কোনো কথা বলছে না। নিজেদের মনের দীর্ঘদিনের লালিত কথাটিই তারা সকলকে জানান দিয়ে দিয়েছে। এমনকি খোদ্ বাংলাদেশের লন্ডন প্রবাসী সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরীও এ ব্যাপারে মনের কথা খোলামেলাই ব্যক্ত করে ফেলেছেন, যার তীব্র সমালোচনায় কিছু ক্ষুদ্র ব্যতিক্রম ছাড়া দেশ-বিদেশে এ ভূখন্ডের প্রতিটি সন্তান ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশী জনগণের স্বাধীনতা ও প্রিয় ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে সিআর দত্ত ও তার অন্যান্য সমসুরীসহ মুসলিম নামের দোসর গাফফার চৌধুরীদের এভাবে উস্কানিমূলক বেনেকাব ভূমিকা মূলতঃ আমাদের গোটা জাতিসত্তার প্রতি একটি মস্তবড় চ্যালেঞ্জ। তারা জেনে-শুনেই এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। দেশের ১৪ কোটি মানুষের সম্মানজনক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই এই চ্যালেঞ্জের জবাবদানে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

www.pathagar.com

দলমত নির্বিশেষে দেশের ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাবহির্ভূত রাজনীতিকদের মধ্যে জাতিসত্তা বিরোধী এই অপতৎপরতা বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এর বিরুদ্ধে জাতীয় পার্টির মহাসচিব আনোয়ার হোসেন নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, গত (১৯শে ফেব্রুয়ারি) বুধবার একটি দৈনিকে সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্যপরিষদের নেতা সিআর দত্তের দুঃসাহসিক মন্তব্য—"রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিল করতে হবে", দেখে আমরা শুধু হতবাকই হইনি—বিস্মিতও হয়েছি। এ ধরনের বক্তব্যকে আমরা শুধু পাগলের প্রলাপই মনে করি না—এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য উচ্চারণ করে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অনুভূতির উপরও আঘাত করা হয়েছে। জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব আনোয়ার হোসেন তাঁর বিবৃতিতে বলেন, রাষ্ট্রপতি হিসাবে পল্লীবন্ধু হোসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য পবিত্র ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সেই ঘোষণা গোটা ইসলামী দুনিয়ায় প্রশংসিত হয়েছে। সে সময় যারা ধর্মনিরপেক্ষতার ধুয়া তুলে এইচএম এরশাদের চিরস্মরণীয় মর্যাদাময় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন, তারা ক্ষমতায় গিয়েও ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম বাতিল সম্পর্কে টু শব্দটি করতে সাহস পায়নি। অথচ হঠাৎ করে এই দত্ত বাবু গংরা মুসলমানদের ধর্মীয় মর্যাদার বিরুদ্ধে কথা বলার দুঃসাহস কোথায় পেল, সে ব্যাপারে এখনই সকলের সজাগ হতে হবে। দত্ত বাবুরা এ ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে বলেই আমরা মনে করি। তারা অবশ্যই একটি অপশক্তির এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। তিনি বলেন, সিআর দত্ত জয়দেবপুরের একটি মন্দির প্রাঙ্গণের সমাবেশে ইউপি নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার কাল্পনিক কাহিনীও উল্লেখ করেন। পত্র-পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে, ইউপি নির্বাচনের সহিংসতায় এ পর্যন্ত যারা নিহত হয়েছেন, তারা সবাই মুসলমান। অথচ সেই নিহতদের জন্য এদের কোন ব্যথা নেই। আমরা এই কুচক্রীদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই যে, এদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এই সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্যে কোনো ষড়যন্ত্রকারীদের উস্কানি আমরা বরদাস্ত করবো না। তিনি বলেন, সিআর দত্ত রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাতিল করার দাবি তুলে যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন, তার জন্যে তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায় এদেশের তওহীদী জনতা যদি ইসলামের মর্যাদার বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তার দায়দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই বহন করতে হবে। আমরা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে কথা বলা এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের অনতিবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্যে সরকারের কাছে জোর দাবী জানাই।

জাপার অতিরিক্ত মহাসচিব জনাব আনোয়ার হোসেনের নিন্দা ও ক্ষোভসূচক বিবৃতির এই উদ্ধৃতিটি এখানে পুরো উপস্থাপনের প্রয়োজন এ জন্যেই বোধ করলাম

www.pathagar.com

যে, আসলে এর মধ্যদিয়ে গোটা দেশের তওহীদী জনতারই মনের অভিব্যক্তি ঘটেছে, ইতিপূর্বে যার পৌনঃপুনিকভাবে প্রকাশ ঘটেছে।

মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈরী শক্তিগুলোর ভয়াবহ অপতৎপরতার প্রেক্ষাপটে নতুন করে প্রতিবেশী দেশের নিত্যনতুন উস্কানিমুলক কথা-কাজ এবং তাদেরই সমচিন্তার এদেশীয় আভ্যন্তরীণ একটি মহলের বিদেশে গিয়ে দেশ ও জাতিসত্তা বিরোধী বিভিন্ন মিথ্যা প্রচারণা (যা বহুল আলোচিত) দেশের সকল শ্রেণীর সকল দলের সমর্থকদেরকে এ কথারই তাগিদ দেয় যে–

অপর কোনো শ্লোগান, অপর কোনো আহ্বান ও মতাদর্শ নয়, একমাত্র নিজেদের চির গৌরব, চির পরিচয়ের ধন ইসলামের তওহীদী ঐক্যের পতাকাতলে তোমরা সমবেত হও, তোমাদের পিতা মহাত্যাগী ইবরাহীমের মহাত্যাগের শিক্ষাকে পাথেয় বানিয়ে সকল নমরুদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে জাতীয় জীবনের সকল সেক্টরে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলো। "তোমরা ভীত হইও না, বিচলিত হইও না বিজয় তোমাদেরই পদচুম্বন করবে। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি আস্থায় সত্যবাদী হও।"

"আল্লাহর রজ্জুকে তোমরা দৃঢ়হস্তে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না"–অন্যথায় অনৈক্যে তোমাদের শক্তি-সাহস নিঃশেষ হয়ে যাবে।"

ইরাকের উপর সম্ভাব্য হামলা সুদূরপ্রসারী মার্কিন পরিকল্পনারই অংশ?

[প্রকাশ ঃ ১৫.১.২০০৩ইং]

সৌদী আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদ আল ফয়সল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাকে যে কোনো ধরনের অভিযানের আগে ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের আহবান জানিয়েছেন। সৌদ আল ফয়সল বলেন, তারা যেই সিদ্ধান্তই নেবেন, তা যেন অবশ্যই ঐকমত্যের ভিত্তিতে হয়, অপরদিকে সাদ্দাম হোসেন অভিযোগ করে বলেছেন, জাতিসংঘ অস্ত্রপরিদর্শকরা গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত রয়েছে। এবং যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরীয় অঞ্চল দখলের চক্রান্ত করছে। সাদ্দামের এই বক্তব্যে ফ্রান্সও বিগড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। সে জানিয়েছে সম্ভাব্য ইরাক হামলায় সে তার সেনাবাহিনী পাঠাবে।

সৌদী সরকার যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাক হামলার বিষয়টিকে যেই দৃষ্টিতে দেখছে, ব্যাপারটি যে সেই স্বাভাবিক অবস্থার বহু উর্ধ্বে চলে গেছে, এটা নানানভাবেই আজ স্পষ্ট। বিশেষ করে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে যেখানে সবকিছু করার স্বীকৃত নিয়ম, সেই রিপোর্ট এখনও বাকী। এমনকি তদন্ত কাজও সমাপ্ত না হতেই ইরাকের উপর বিভিন্ন হামলা ও মধ্যপ্রাচ্যে হাজার হাজার মার্কিন সৈন্যের যুদ্ধ মহড়া চলছে। এ থেকে ইতিমধ্যেই অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে, জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দল প্রেরণ, আসলে একটি নাটক বৈ কিছু নয়। তেমনি জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সর্বোচ্চ এই প্রতিষ্ঠানটিও হয়তো এবার মার্কিন স্বেচ্ছাচারী ভূমিকার কাছে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণরূপে দন্তবিহীন ব্যাঘ্রে পরিণত হতে পারে। সম্ভবত এসব আলামত এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ব্যাপারে অনুসৃত নীতি ও ইরাক কেন্দ্রিক অযৌক্তিক মার্কিন ভূমিকা থেকেই ইরাকী প্রেসিডেন্ট উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। সাদ্দামের মতে এসব চক্রান্তের লক্ষ্য শুধু ইরাক দখলই নয়, তাদের উদ্দেশ্য উপসাগরীয় আরব এলাকা পুরোপুরি দখল করা। তারা চায় এই অঞ্চলের সম্পদের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। ১৯৭০-এর দশক থেকে তারা এই স্বপ্ন লালন করে আসছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ১১ই সেপ্টেম্বরের রহস্যপূর্ণ টুইন টাওয়ারের ঘটনার পর আফগানিস্তানের উপর ধ্বংসকারী হামলা এবং হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ও বিপুল সম্পদ হানির ঘটনাবলীসহ যতো নামে যতো কিছু ঘটে আসছে বা ঘটানো হচ্ছে, সবকিছুর মূল লক্ষ্য সম্ভবত ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বক্তব্যের মধ্যদিয়েই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। যদি তাই হয়, তাহলে সংঘটিত ঘটনাবলীর দর্পণে লক্ষ্য করলে এর মধ্যদিয়ে ইরাকের উপর সম্ভাব্য হামলাটি প্রথম হলেও এর ভিতর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সুদূরপ্রসারী এক পরিকল্পনার নকশাই সামনে এসে যায়। পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে সেটা হলো এই, –

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার পর আমেরিকা যেই আগ্রাসীপনা দেখাতে শুরু করেছে, এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আমেরিকা এখন নিজেকে শুধু বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার হিসাবে দেখতেই সন্তুষ্ট নয়, বরং সে এখন সারা বিশ্বকে তার পদানত করার লক্ষ্যে রীতিমতো পরিকল্পনা তৈরী করে ফেলেছে। আমেরিকা মনে করে বর্তমানে সে একমাত্র বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। বিশ্বের আনাচে-কানাচে কোথাও এমন ভূ-খন্ড থাকতে পারবে না, যা তার প্রভাব বলয়ের বাইরে অবস্থান করবে। তার আন্তরিক অভিলাষ হচ্ছে, পৃথিবীতে এমন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি থাকবে না, যা তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। বলাবাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্রের এই আগ্রাসীপূর্ণ সম্প্রসারণবাদী ও আধিপত্যবাদী মানসিকতা বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জন্য নিঃসন্দেহে এক মহা বিপদেরই পদধ্বনি এবং বিশ্ব শান্তির জন্যে মহা হুমকি।

যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারেও সচেতন যে, সে একই সময় এতগুলো লক্ষ্য একসাথে অর্জন করতে পারবে না। তাই পরিকল্পনায় এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, বিভিন্ন কিস্তিতে এসব লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। এ জন্যে যে তাকে দীর্ঘদিন পর্যন্তও অপেক্ষা করা লাগতে পারে এ ব্যাপারেও সে সচেতন। এ ছাড়া তার এই পরিকল্পনা কতদূর সফল হবে, প্রাথমিক পদক্ষেপের অভিজ্ঞতাও সে প্রত্যক্ষ দেখতে চায় বলে মনে হয়।

মুসলিম দেশ আফগানিস্তানের উপর হামলা ও দেশটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার মধ্যদিয়ে সে তার প্রথম টেস্টিং কেইসটি সেরে নিয়েছে। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সফলকামও হয়েছে। এ সফলতা তার প্রত্যাশার তুলনায় তেমন অধিক না হলেও এই সফলতাও কি কম যে, একটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম দেশকে সে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে, যা পৃথিবীর পরাক্রমশালী তৎকালীন বৃটিশ শক্তি করতে হার মেনে ছিলো, যেই বৃটিশ

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেতো না বলে প্রবাদ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই "মহৎ কাজের" সাথে দুর্ভাগ্য বশত কয়েকটি মুসলিম দেশকেও সে দোসর বানাতে সক্ষম হয়েছিলো। এখন আমেরিকার লোলুপ দৃষ্টি হলো ইরাকের প্রতি। বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আমেরিকা ইরাকের উপর হামলা করতে দু'পায়ের উপর খাড়া। এমনকি আন্তর্জাতিক সকল প্রতিষ্ঠিত নিয়মবিধির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শন করেই সে এ কাজ করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

পর্যবেক্ষকদের ধারণা, ইরাককে পদানত করার পরই আসবে সৌদী আরবের পালা। ইরান, সিরিয়া এবং পাকিস্তানও তার এই বিশেষ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পর্যায়ক্রমে একের পর এক এই প্রতিটি দেশকে কেন্দ্র করেই তার পরিকল্পনা এগিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিনীদের এই যুদ্ধ প্রস্তুতিতে সাদ্দামের সাথে দ্বিমত পোষণকারী দেশসমূহ হয়তো এই ভেবে খুশি যে, তাদের পরিবর্তে বিপদের ঘন্টাটি ইরাকের মাথার উপরই বাজছে। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, তাদের এই আত্মপ্রসাদ দীর্ঘদিন স্থায়ী হবার নয়। দু'দিন আগ আর পর তাদেরকেও একই পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে বলে পরিস্থিতি যেন ডেকে ডেকে বলছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা পাল্টাতে দেরি হয় না। কিন্তু তারপরও বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু কিছু মুসলিম দেশের ভূমিকা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। মুসলিম দেশগুলোকে যে আমেরিকার প্রথম টারগেট, তা নানান ঘটনাপ্রবাহের মধ্যদিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও কতিপয় মুসলিম দেশ এ ব্যাপারে সহযোগিতাদানের নীতি অনুসরণ করেছে। এটা যে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত হানারই নামান্তর তা হয়তো একসময় ইতিহাসই সাক্ষ্য দেবে। তাদের যদি পরিস্থিতির নাজুকতা সম্পর্কে সামান্যতমও অনুভূতি থাকতো তাহলে তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতো। কিন্তু না, তাদের অবস্থা স্পেনের পতনকালীন মুসলমানদেরই অনুরূপ মনে হচ্ছে, যারা "মরার আগেই মরে গেছিল" বলে দুর্নাম রয়েছে। মুসলমানদের ঐক্যের যেসব কথা মাঝে মধ্যে শোনা যায় এবং যেসব ঐক্য সংস্থার অস্তিত্ব আছে বলে দেখা যায়, এগুলো মুলতঃ দর্শনগত, এর মধ্যে বাস্তবতা বলতে কিছু আছে বলে মনে হয় না। শুধু তাই নয় নিকট ভবিষ্যতে তেমন আশা করার মতোও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবতঃ এ কারণেই গত শতকে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের সক্রিয় স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা জামালুদ্দীন আফগানী অত্যন্ত দুঃখ করে বলে গেছিলেন যে,

ইত্তাফাকাল মুসলিমূনা আলা আন্নাহুম লা-ইয়াত্তাফেকূন "মুসলমান (তথা মুসলিম শাসকরা) এ ব্যাপারে সকলে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে,–তারা ঐক্যবদ্ধ হবেন না।"

পর্যবেক্ষকদের মতে, আভ্যন্তরীণ যাবতীয় মতবিরোধ ভুলে গিয়ে অগৌণে সকল মুসলিম দেশের ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্যায় অযৌক্তিক বিষয়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধে সোচ্চার হওয়াই সময়ের একমাত্র দাবী।

www.pathagar.com

আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে খোদ জার্মানী, ফ্রান্স এবং জাপানের উচিত মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি তেল সমৃদ্ধ দেশের সপক্ষে কথা বলা, যেই তিনটি দেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য হামলার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। কারণ, এটা এক বাস্তবতা যে, যুক্তরাষ্ট্র তেল উৎপাদক দেশগুলোর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। ঐসব দেশ সে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেতে চায়। যদি তাই হয়, তাহলে এ প্রতিক্রিয়া হিসাবে জাপান, জার্মান ও ফ্রান্সের অর্থনীতি প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আছে বৈকি। অতএব এসব উন্নত দেশের স্বার্থের প্রেক্ষিতেও তাদের উচিত আমেরিকাকে ইরাক, ইরান এবং সৌদী আরবের উপরে হামলা থেকে বিরত রাখা।

শুধু তাই নয়, অন্যান্য সেসব দেশেরও নিরাপত্তার খাতিরে এ ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত, যাদের মার্কিন সম্প্রসারণবাদিতার শিকার হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

রুশ-চীন মৈত্রী জোট আকারেও এই মার্কিনী আগ্রাসীপনার বিরুদ্ধাচরণ হওয়া উচিত। এ জাতীয় সম্ভাব্য মৈত্রী জোটকে এ জন্যেই আমেরিকা আশংকার দৃষ্টিতে দেখে। রাশিয়া এই সাথে ভারতকে শরীক করতে সফল হলে, তাতে আমেরিকার উদ্বেগ বেড়ে যাবে। তাই আজ আমেরিকা রাশিয়াকে খুশি করার নীতি অবলম্বন করেছে। অভিন্ন লক্ষ্যে ভারতের প্রতিও দান-অনুদানের মুক্তহস্ত সম্প্রসারিত। আমেরিকা নিউক্লিয়ার টেকনোলজী এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও ভারতকে এগিয়ে এসে সাফল্য দিচ্ছে। কাশ্মীরের ব্যাপারে সে ভারতের সকল জুলুম-নিপীড়নের আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানানোকেও প্রয়োজন বোধ করে না। তার এই অনুসৃত নীতি এ কথারই প্রমাণ যে, সে এখন পুরোপুরি ভারতের দিকেই ঝুঁকে আছে। তবে আমেরিকা ভারতকে বশ করার যত নীতিই অবলম্বন করুক না কেন, ভারত সময় মতোই তার নিজস্ব স্টাইল ও নিজস্ব কৌশল পরিবর্তন করবে এবং স্বকীয়তাকেই প্রাধান্য দিয়ে চলবে। মোটকথা, বিশ্বের উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশসমূহের সমপ্রয়াসের দ্বারাই আসন্ন মার্কিন আগ্রাসন ও তার সম্প্রসারণবাদিতার কুফল থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করা যেতে পারে।

দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের রাজনৈতিক কর্মসূচি জনগণের আদৌ কাম্য নয়

[প্রকাশ ঃ ৩১.৩.২০০৪ইং]

ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার সতর্কতা অবলম্বন ও এ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণের জন্যেই ইতিহাস। মানুষ যুগে যুগে দেশে দেশে এজন্যে নিজেদের ইতিহাস সংরক্ষণ করে আসছে। কিন্তু অনেক সময় পরশ্রীকাতরতা, প্রতিশোধ স্পৃহা, অহংবোধজনিত ভ্রান্ত আত্মমর্যদাবোধ কিংবা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে ক্ষমতা উদগ্র বাসনা মানুষকে এচিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। ফলে ইতিহাসের শিক্ষাবিস্মৃত এ

www.pathagar.com

শ্রেণীর ভাবপ্রবণ অদূরদর্শী মানুষদের দ্বারাই সংশ্লিষ্ট জাতির ইতিহাসে নতুন বিপর্যয়ের ঘটনা এসে সংযোজিত হয়। অবিভক্ত ভারতকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির আন্দোলন যখন অব্যাহত তখনও ইংরেজদের ভারত ছাড়ার চূড়ান্ত কোনো লক্ষণ সামনে আসেনি, সে সময়ও বাংলাদেশের মানুষদের অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে দাবিয়ে রাখার চিন্তা লক্ষ্য করা গেছে। আজও আমাদের রাজনৈতিক মহলের কোনো কর্মসূচী দিতে একথা বিশেষভাবে ভাবতে হবে যে, সেই দূর অতীত থেকে যারা বাংলার এই অঞ্চলের মানুষদেরকে নিছক জীবনদর্শনগত কারণে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নানান উপায়ে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, সরকারবিরোধী আন্দোলন বা কোনো কর্মসূচীর নামে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে সেই ষড়যন্ত্র জালেই আমরা পেঁচিয়ে পড়ি কিনা। স্বাধীনতার প্রায় দীর্ঘ তিন যুগের কাছাকাছি সময় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতির এমন এক প্রেক্ষাপটে এসে উপনীত যে, সরকার উৎখাতের অতীত যে—কোনো আন্দোলন কর্মসূচী আর বর্তমান আন্দোলন কর্মসূচীর ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের হতে বাধ্য। অতীতেও সরকার বিরোধী আন্দোলন হয়েছে এবং সফলতাও অর্জিত হয়েছে কিন্তু অভিজ্ঞতা ও প্রেক্ষাপটগত আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কারণে এখন সেই স্টাইলের আন্দোলন কতদূর জনকল্যাণের ধারক হবে, না কি এ আন্দোলন নিকট অতীতের আন্দোলনসমূহের বিপরীত দেশজাতির অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জকারী কোনো ভয়াবহ পরিস্থিতির অবতারণা ঘটায়, দলমত নির্বিশেষে স্বকীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ সকল শ্রেণীর বাংলাদেশী নাগরিককেই এ কথা ভাববার কারণ রয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জটিল পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি-অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে এমন কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচী এদেশের ন্যায় একটি গরিব দেশের ওপর চাপিয়ে দেয়ার ফল যে অতীব মারাত্মক, একথা ক্ষমতাপাগলরা আদৌ চিন্তা করে না। তাদের এই মানসিকতা নিজেদের স্বার্থেই জনগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সেই ইংরেজ আমল থেকে গত প্রায় তিন যুগ ধরে যারা অব্যাহতভাবে পানি সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য অসমতা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্যে ক্ষতিকর মনোভাবই দেখিয়ে আসছে, তাদের মনোবাঞ্ছাই যদি এসব কর্মসূচী পূরণ করে, তাহলে এমন রাজনৈতিক আন্দোলন কর্মসূচীতে কেন জনগণ শরীক হবে? বরং নিছক প্রতিহিংসা পরায়ণ যারা সংসদীয় গণতান্ত্রিক নিয়ম-শৃঙ্খলাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরকার বিরোধীতায় অন্ধ হয়ে পড়েছে এবং নানান অযৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, তারা সত্যিকার দেশপ্রেমিক হলে এই ভ্রান্ত কর্মসূচীর পরিণাম ভেবে তা বর্জন করবে বৈকি। কারণ এদেশের জনগণের দীর্ঘ ক্ষোভ বিরক্তিজনিত কারণ ও সময়ের নাজুকতা হেতু তথাকথিত সরকার পতনের অনুসৃত এই কার্যক্রমটি অতীতের সরকারবিরোধী অন্যান্য বারের মতো না হয়ে সেটা বহিঃশত্রুর দ্বারা কোনো বিপদজনক ও নিয়ন্ত্রণহীনতার দিকেও মোড় নিতে পারে। ফলে দেশ-জাতির জন্যে তা বয়ে আনবে কোনো অশুভ পরিণতি।

www.pathagar.com

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, গঠনমূলক কাজের বদলে ধ্বংসাত্মক কাজ অতীব সহজ। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, অতীতে যারা বাংলাদেশের মানুষকে মাথা তুলতে দিতে নারাজ ছিল বরং নানান ষড়যন্ত্র এবং ইংরেজদের সাথে যোগসাজশে পূর্ববাংলার শোষিত-বঞ্চিত উপেক্ষিত মানুষদের আরও অধিক দাবিয়ে রাখার ফন্দি-ফিকিরে লিপ্ত থাকতো, ইংরেজদের পর' ৪৭-এর স্বাধীনতার পরও তারা একই মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছিল এবং এদেশবাসীকে সকল দিক থেকে নিজেদের অধীনস্থ রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাই দেখা যায়, তৎকালীন পাকিস্তানী নেতাদের সাবেক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অনুসৃত বৈষম্যমূলক নীতির ফলে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যখন পাকিস্তানী নেতৃত্ব ও তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতি ঘৃণা ক্ষোভ চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, এমনকি স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়, তখন তারা পাশের বাড়ীর আগুন লাগা থেকে আলু পোড়ার মনোভাব দেখায়। বলাবাহুল্য, ঐ সময় এদেশের জনগণ বিজয়গর্বে আনন্দ উপভোগ করলেও পূর্ব বাংলার জনগণের উন্নতি বিরোধী সেই মহলটি এ জন্যে সর্বাধিক উৎফুল্ল হয়ে উঠে যে, তারা ভারত বিভাগকারী মুসলমানদেরকে তিক্ততার মধ্য দিয়ে দুভাগে বিভক্ত করার কাংখিত স্বপ্নটি এবার বাস্তবায়নে সক্ষম হলো। স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রটির পূর্ব অঞ্চলের উপর এবার তারা পুরোপুরি নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বলয়ের মধ্যে আনার দ্বার—উন্মুক্ত করতে পারলো।' ৭১ সাল থেকে বাংলাদেশ তার বয়সের বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হওয়া পর্যন্ত ঐ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে নিয়ে আজ ২ হাজার চার সালের এ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে ঐ মহল তথা প্রতিবেশী দেশের নেতৃত্ব ও তাদের এদেশীয় বন্ধুদের অনুসৃত কর্মকাণ্ডের প্রতি তাকালে একথাই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যারা ইংরেজ শাসনামল থেকে এ দেশের মানুষকে শিক্ষা সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সকল দিক থেকে নিজেদের পদানত রেখে এই এলাকার উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক সকল দিক থেকে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে আসছে এবং সর্বোতভাবে কাজ করেছে, তারা এখনও সেই মনোভাবে অটল। তাই বর্তমানে বাংলাদেশের অগ্রগতি, ব্যাহতকারী রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মসূচী সেই মহলটির নীল-নকশা বাস্তবায়নেই সহায়ক হবে বৈকি। একথাটিই প্রধানমন্ত্রী বার বার বিভিন্ন বড় বড় সভা সমাবেশে বক্তৃতার মাধ্যমে পৌনপুনিকভাবে বলে আসছেন এবং জনগণকে দেশের উন্নতি অগ্রগতি বিরোধী এই অপতৎপরতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে আসছেন।

সুতরাং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার এই আত্মঘাতী আন্দোলন ও কর্মসূচী থেকে কেন বিরত থাকতে হবে, এই জন্যে সংক্ষেপে সেই ইংরেজ আমল থেকে যারা এদেশের উপর সর্বাধিক প্রভুত্ব বিস্তারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণের ক্ষতিসাধন করে আসছে। তাদের বিদ্বেষাত্মক সে সব কর্মকান্ডের কিছুটা চিত্র এখানে তুলে ধরা অত্যাবশ্যক। যেমন–ইংরেজদের সাথে যোগসাজশে মুসলমানদেরকে উচ্চ শিক্ষা থেকে

www.pathagar.com

বঞ্চিত রাখা। (১) হাজী মুহাম্মদ মুহসিন ফান্ডের সাহায্য থেকে মুসলিম ছাত্রদের বঞ্চিত করা এবং এ থেকে শুধু হিন্দু ছাত্রদেরই বৃত্তি দান করা। (২) জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বার মুসলিম ছাত্রদের জন্যে বন্ধ রাখা। (৩) সংশ্লিষ্ট সরকারী উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটির নাম 'হিন্দু কলেজ' রেখে চরম সাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় দেয়া, যা পরে নবাব আব্দুল লতীফ কর্তৃক বহু চেষ্টার বিনিময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়। ফলে সেই থেকে সাথে সাথে এবার সেখানে মুসলিম ছাত্রদের জ্ঞান আহরণেরও সুযোগ ঘটে। (৪) ১৮৫৭ সালে ইংরেজবিরোধী লড়াইয়ে মুসলমানরা কিছু গাদ্দারের কারণে পরাজিত হওয়ায় তাদের ওপর অপরিসীম জুলুম—নিপীড়ন চলে। সেই সূত্র দেখিয়েও হিন্দু নেতৃত্ব ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সরকারী চাকরি সকল দিক থেকে বঞ্চিত করে পথে বসিয়ে দেয়। তাদের সকল সম্পদ-সম্পত্তি এক রকম হিন্দু জমিদার মহাজনদেরই হাতে তুলে দেয়া হয়। (৫) অনেক দিন পর স্যার সৈয়দ, নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক স্বাভাবিকতায় আনার পর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ১৯০৫ সালে বৃহত্তর "ব্যাঙ্গল প্রেসিডেন্সি"কে ভাগ করে ঢাকায় রাজধানীসহ অবহেলিত "পূর্ব বাংলা ও আসাম" নামক একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। এর ফলে মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলার মানুষের উন্নতি-অগ্রগতির পথ বহুলাংশে উন্মুক্ত হয় দেখে হিন্দু জমিদার ও রাজনীতিকরা এর বিরুদ্ধে আদা পানি খেয়ে লাগেন। সম্প্রদায়ের লোকদের সংগঠিত করে উপেক্ষিত এই এলাকার মুসলিম স্বার্থ রক্ষার সহায়ক "পূর্ব বাংলা আসাম" প্রদেশ বাতিল ঘোষণা করার জন্য হিন্দু নেতৃত্ব ইংরেজ সরকারের উপর হিন্দু নেতৃত্ব তাদের প্রচণ্ড চাপ দেয়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িক হিংস্র সংকীর্ণ চিন্তারই জয় হয়। ইংরেজ সরকার মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতাদের মন রক্ষার জন্যে এই ন্যায্য সিদ্ধান্তটি শেষ পর্যন্ত বাতিল ঘোষণা করে।

"পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ" বাতিল ঘোষণায় এই এলাকার জনদরদি মুসলিম নেতা নবাব স্যার সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ অতীব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। ইংরেজ সরকার তখন মুসলমানদের অসন্তোষ দূর করার জন্যেই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। (৬) কিন্তু কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু জমিদার নেতারা মুসলিম প্রধান এলাকা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়াটাও সহ্য করতে পারেননি। এর বিরুদ্ধে তারা উঠে পড়ে লাগেন। ঢাকায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় না করার যুক্তি হিসাবে তারা ইংরেজদের বুঝাতে চান যে, এই অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসীদের অধিকাংশই চাষা-ভূষা। তাদের শিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় দরকার নেই। হিন্দু নেতারা মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক এই হিংস্র মানসিকতা দেখিয়ে একবার ইংরেজদের দিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করালেন, তারপর এই এলাকার মানুষের স্বার্থে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও বাতিলের জোর চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করলেন।

www.pathagar.com

এই এলাকার মুসলিম নেতা স্যার সলীমুল্লাহ সেই চিন্তা ও মর্মজ্বালায় অসুস্থ হয়ে এই দুনিয়া থেকেই ১৯১৫ সালে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর ইনতেকালের ৬ বছর পর নওয়াব সৈয়দ, নবাব আলী চৌধুরী, মৌলভী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক প্রমুখের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরও ষড়যন্ত্র থামেনি। (৭) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর শিক্ষাবিদ মুসলিম প্রধান এ দেশের জনগণের চিরায়ত ইসলামী মূল্যবোধ, জীবন চেতনা, জীবনবোধ ও ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, যাদের তৈরী মুসলিম শিষ্যদের চক্রান্তে আজ বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির দৌরাত্ম্যে এখানকার ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী কৃষ্টি—সংস্কৃতি এক গভীর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

বৃটিশ শাসিত বাংলার এই অঞ্চলের জনগণ জমিদার মহাজনদের শোষণের ক্ষেত্র ছিল। অধিকাংশ প্রজা ও ঋণগ্রহীতা মুসলমান ঐসব হিন্দু জমিদার মহাজনের শোষণে এক দুর্বিহ জীবন-যাপন করতো। তাদের সোজা হয়ে দাঁড়াবার কোনো উপায় ছিল না। এতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কও প্রভাবিত হয়। "ব্যাঙ্গল প্যাক্টের" মাধ্যমে সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের প্রতি সুবিচারের চেষ্টায় চিত্তরঞ্জন দাসের মতো উদার নেতারা কিছুটা চেষ্টা করলেও উগ্রপন্থী অধিকাংশ হিন্দু নেতৃত্বের মুসলিম বিদ্বেষের দরুন সেই উদ্যোগও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বলাবাহুল্য, আজ মুসলিম নামের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কারণে-অকারণে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যেসব বুলি কপচান এবং এর নামে এখানকার ইসলামপন্থী জনতা ও ইসলামী মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুকৌশলে বিষোদগার করে থাকেন, তাদের ঐসব ইতিহাস না জানার কথা নয় তবুও বোধগম্য কারণেই 'সাম্প্রদায়িকতা' বলে তাদের এই চিৎকার তুলতেই হবে। কারণ গরজ বড় বালাই।

ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগেই ১৯০৬ সালে ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ গঠিত হয়। কংগ্রেস নেতাদের মুসলিম স্বার্থবিরোধী উল্লেখিত মনোভাব লক্ষ্য করেই কংগ্রেস ত্যাগ করে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পরে এই মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র আবাস ভূমি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, যার পূর্বাঞ্চল পূর্বপাকিস্তান নামে অভিহিত ছিল। যা না হলে আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারতাম না এবং আমাদের দুর্গতি কাশ্মীরী ও গুজরাটী মুসলমানদের চাইতেও হয়তো আরও করুণ হতো।

বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থবিরোধী এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দাবিয়ে রাখার জন্যে একশ্রেণীর হিন্দু নেতৃত্ব ও তাদের তৈরী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের যেই মানসিকতা উপরোল্লেখিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, কাল-পরিক্রমার এত বিবর্তনের মধ্যদিয়েও তাতে পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ আজও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বিশেষ করে

www.pathagar.com

ঐ মানসিকতার যারা উত্তরাধিকার বহন করে বর্তমানে এদেশের রাজনৈতিক ও শিক্ষাঙ্গনে তাদের সক্রিয় বিচরণ কম নয়। বিশেষ করে মুসলিম নামের যারা জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে ঐ মানসিকতা ঘোষণাকারীদের সুরে সুর মিলিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজকাঠামোকে ভিন্নভাবে পুনর্বিন্যাস করতে সক্রিয় এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা এখানে প্রসার দানে আগ্রহী, তাদের কোনো আন্দোলন ও কর্মসূচী নিয়ে ইতিহাস সচেতন এদেশের কোনো মানুষ চিন্তা না করে পারে না। বিশেষ করে তাদেরই শিষ্যদের পক্ষ থেকে যখন দেশের বর্তমান জোট সরকার পতনের কর্মসূচী দেয়া হয়, (যেই জোটের কারও আদর্শ ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, কারও আদর্শ আল্লাহর উপর আস্থা ও ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পতাকাকে উড্ডীন করে বাংলাদেশকে একটি শোষণমুক্ত স্বাবলম্বী সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা), তখন স্বাভাবিকভাবেই এদেশবাসী নিজেদের উল্লেখিত অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলী স্মরণ করতে বাধ্য হয়।

অতএব, নিকট অতীত ও দূর অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যখন আমরা স্মরণ করি এবং সেসব ঘটনায় যারা বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থবিরোধিতায় নগ্নভাবে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, সেসব সাম্প্রদায়িক মানসিকতাদুষ্ট নেতাদের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের অনুসারীদের উন্নতি বিরোধী ক্ষতিকর কর্মসূচী দেশপ্রেমিক জনগণকে আশংকিত করে বৈকি। বলাবাহুল্য, সেই আশংকারই দাবী হলো বিরোধী নেত্রীর ঝুঁকিপূর্ণ পথ পরিহার করে প্রধান মন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতির দিকে ফিরে আসা।

❑

www.pathagar.com

ISBN 984 8685 27-8
9 789848 685273